হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মুখপত্র

সনাতনকথা

উদ্বোধনী সংখ্যা

পূজাবার্ষিকী ২০২০

শাম্ব
কালকূট

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
আনুষ্ঠানিক

কৃষ্ণচরিত
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জেবি পিন ক্যাশ

দেশীয় ব্যাংকিং সেবায় সর্বপ্রথম!

হিসাববিহীন সুবিধাভোগীকে ব্যাংকিং চ্যানেলে সেবা প্রদান।

জেবি পিন ক্যাশের সুবিধা সমূহঃ

- জনতা ব্যাংকের কোন গ্রাহক যে কোন শাখা থেকে হিসাববিহীন সুবিধাভোগীর নামে অর্থ প্রেরণ করতে পারবেন।
- প্রাপক জনতা ব্যাংকের যেকোন শাখা থেকে পিনকোড ও ফটো আইডির মাধ্যমে প্রেরিত অর্থ নগদে উঠাতে পারবেন।

"জনতা ব্যাংক পিন ক্যাশ" এর সেবা নিন
হিসাববিহীন সুবিধাভোগীকে টাকা দিন।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড

উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার

www.janatabank-bd.com, jb.com.bd

রূপালী ব্যাংকের মাধ্যমে ফরেন রেমিট্যান্স আনুন
এবং
সরকার প্রদত্ত প্রণোদনা গ্রহণ করুন

২%

রেমিটেন্স প্রণোদনা
নগদ অর্থ প্রদান

WESTERN UNION WU moving money for better · Ria · MoneyGram money transfer · XPRESS MONEY · TRANSFAST · prabhu Money Transfer · CASH EXPRESS MONEY TRANSFER · xoom A PayPal Service · BRAC SAAJAN · CBW BANK famacash · Max Money · JRF · INSTANT CASH · Ersal Money Transfer · SBC · BFC Bank · INSTANT CASH · AL FARDAN EXCHANGE · NBL QUICK PAY REMITTANCE SYSTEM · TC Turbo Cash · PFG FOREX · SF Enterprise Exchange, Sweden

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড
উত্তম সেবার নিশ্চয়তা

কর্মই ধর্ম

প্রতিষ্ঠাতা দানবীর অমৃত লাল দে
জন্ম: ২৭ জুন ১৯২৪ ॥ মৃত্যু: ১৪ জুন ১৯৯৩

অমৃত®
বাংলার স্বাদ

শারদীয়া শুভেচ্ছা

অমৃত কনজুমার ফুড প্রোডাক্টস্ লিমিটেড

ঢাকা অফিস: ৯/১, এ.সি. রায় রোড, আরমানিটোলা, ঢাকা-১১০০
বরিশাল অফিস: ১১৯, অমৃত লাল দে সড়ক, বরিশাল-৮২০০
www. amritaconsumer.com

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মুখপত্র

সনাতনকথা

পূ জা বা র্ষি কী ২ ০ ২ ০

স ম্পা দ ক প রি ষ দ

সভাপতি

নান্টু রায়

সদস্য

রাজেন্দ্রচন্দ্র দেব মন্টু ॥ রেখারানী গুণ ॥ ড. অসীম সরকার
শ্যামল সরকার ॥ সুরঞ্জিত দত্ত লিটু ॥ ববিতা রানী সরকার
বিষ্ণুকুমার সরকার এবং প্রশান্তকুমার বিশ্বাস

শিল্প নির্দেশক

ধ্রুব এষ

গ্রাফিক্স

শ্রী বিবেকানন্দ মৃধা

সম্পাদক পরিষদের সভাপতি কর্তৃক ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ১/আই পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

যোগাযোগ

ফোন: ৯৬৭৭৪৪৯, ৯৬৬৮০৪৫
ই-মেইল: hindutrustbd@ymail.com

SANATANKATHA, a Puja publication
published by Hindu Religious Welfare Trust, Ministry
of Religious Affairs, Govt. of Bangladesh

মূল্য: দুইশত টাকা

সনাতনকথায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে
সরকার বা ট্রাস্টের কোনও যোগ নেই। এ পত্রিকার কোনও অংশের
পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

সম্পাদকীয়

দুর্গা জগজ্জননী। মর্ত্যধামে তাঁর সাংবাৎসরিক আগমন অশুভশক্তির বিনাশে তাঁর সন্তানদের রক্ষাকল্পে। বিষয়টি প্রতীকী। তিনি তাঁর সন্তানদের বরাভয় দেন, সাহস যোগান– তারা যেন আত্মবলে বলীয়ান হয়ে অশুভবিনাশে তৎপর হয়, কিন্তু তাঁর সন্তানেরা এই সহজ কথাটি বুঝতে চায় না। তারা এতটাই দুর্বল হীনবল কিংবা ক্ষীণবল যে, নিজেরা কোনওকিছুই করবে না, হাত গুটিয়ে বসে থাকবে– যা কিছু করার সব মাকেই করতে হবে। মা-ও তাঁর সন্তানদের মুরোদ বুঝতে পেরে বিমুখ হয়েছেন। সন্তানের বিপদে তাদের আকুল কান্নাতেও তিনি অবিচল মৃৎপ্রতিমামাত্র। মায়ের আশীর্বাদ পেতে কান্নাকাটি না করে যদি মায়ের সন্তানেরা তাঁর অশুভনাশিনী শক্তির তাৎপর্য বুঝবার চেষ্টা করত, তাহলে দৃশ্যপট অনেকখানি বদলে যেত। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা– এই সরল সত্যটি মায়ের অপগণ্ড সন্তানেরা বুঝতে চাইছে না– সমস্যাটা সেখানেই।

বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট তার প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ৩৭ বছর পর প্রথমবারের মত *সনাতনকথা* নামাঙ্কিত একটি মুখপত্র প্রকাশ করতে যাচ্ছে। হিমালয়দুহিতা দুর্গতিনাশিনী দুর্গার স্বামী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে পিতৃগৃহে সাংবাৎসরিক ভ্রমণ *সনাতনকথার* পূজাবার্ষিকী প্রকাশে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে। প্রথমবার তড়িঘড়ি করে মাত্র কয়েকদিনের প্রস্তুতিতে একটি পূজাবার্ষিকী বের করা কঠিন চ্যালেঞ্জ নিঃসন্দেহে, কিন্তু আমাদের বন্ধুজনেরা নিরন্তর উৎসাহ দিয়ে সে-পরিশ্রম লাঘব করেছেন।

হিন্দুধর্মীয় ইতিহাস, আদর্শ, সাহিত্য, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন, ন্যায়বিচার সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা এবং হিন্দুধর্মবিষয়ক গ্রন্থাবলি প্রণয়ন, অনুবাদ এবং সাময়িকী প্রকাশ ট্রাস্টের এক্তিয়ার। সে-আলোকেই আমরা বক্ষ্যমাণ সংখ্যাটি সাজাতে চেষ্টা করেছি– আশা করি, পাঠক মনোরঞ্জনে সক্ষম হবে।

সময়-স্বল্পতার জন্যে বিজ্ঞাপন সংগ্রহে ব্যাংক, বীমা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঠিকমত যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি, তবু তাদের আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতায় আমরা কৃতজ্ঞ।

সবাইকে শারদীয় শুভেচ্ছা। জয় হোক সবার। *সনাতনকথার* চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ হোক, এই কামনা।

সূ চি প ত্র

শ্রদ্ধা — আমরা শোকাভিভূত ১৪

প্রবন্ধ — বঙ্গবন্ধু ॥ মোয়াজ্জেম হোসেন ১৬
বাঙালির দুর্গোৎসব তার বহুমুখী তাৎপর্য ॥ যতীন সরকার ২৪
সনাতনধর্মে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বিশ্বশান্তি ॥ ড. অসীম সরকার ২৯
ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী ॥ ফয়সাল আহমেদ ১৭৮

কবিতা — শেখ রেহানা ॥ প্রাণেশকুমার চৌধুরী ॥ মণিকা রায় ১৫
সন্তোষ ঢালী ॥ নির্মলেন্দু গুণ ॥ মাখনলাল রায় ১৯
রাতুল দেববর্মণ ॥ জয়ীতা চ্যাটার্জি ॥ রীপা রায় ২০
শেলী সেনগুপ্তা ॥ জ্যোতির্ময় দাশ ॥ ঈশিতা ভাদুড়ী ॥ রনি অধিকারী ২১
শুভঙ্কর সাহা ॥ জ্যোতির্ময় সেন ॥ বিমল গুহ ২২
নমিতা চৌধুরী ॥ মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায় ॥ দিলীপ কির্ত্তুনিয়া ॥ কস্তুরী চট্টোপাধ্যায় ২৩

উপন্যাস — শাম্ব ॥ কালকূট ৩২
চন্দ্রমুখী জানালা ॥ ভজন সরকার ১১৪

নিবন্ধ — দ্বারকা ॥ তৌফিকুর রহমান ৭৪
মহাভারত ॥ অনিন্দিতা বসু ৭৭
মহিষাসুরমর্দিনী ॥ শঙ্খ অধিকারী ১৯২
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ॥ বিষ্ণুকুমার সরকার ১৯৪
কংসনারায়ণের দুর্গোৎসব ॥ রুমঝুম ভট্টাচার্য ১৯৯

মহাজীবন — কৃষ্ণচরিত ॥ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৮০

স্মরণ — শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১১০
রবিশঙ্কর ॥ ড. মাহফুজ পারভেজ ১৫১

স্মৃতিচারণ — দনুজদলনী দুর্গা ও আমার ছেলেবেলা ॥ শামস্ হক ১১১

ছোটগল্প — গগনচিলের ডানা ॥ রফিকুর রশীদ ১৪৬

ঐতিহ্য — শ্রীশ্রীকান্তজীউ মন্দির স্থাপত্যশিল্পের অমর কীর্তি ॥ চিত্ত ঘোষ ১৫২

বিশেষ রচনা — শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ॥ আনুষ্ঠানিক ১৫৬
অষ্টাবক্র ও সুপ্রভা ॥ সুবোধ ঘোষ ১৬৭

শ্রদ্ধাঞ্জলি — অচেনা শ্রীচিন্ময় ॥ শংকর ১৮১

মন্দির পরিক্রমা — শ্রীশ্রী বোদেশ্বরী শক্তিপীঠ ১৯৬
শ্রীশ্রী অদ্বৈতজন্মধাম পণাতীর্থ ১৯৭
সীতাকুণ্ডের শ্রীশ্রী চন্দ্রনাথ ধাম ১৯৮

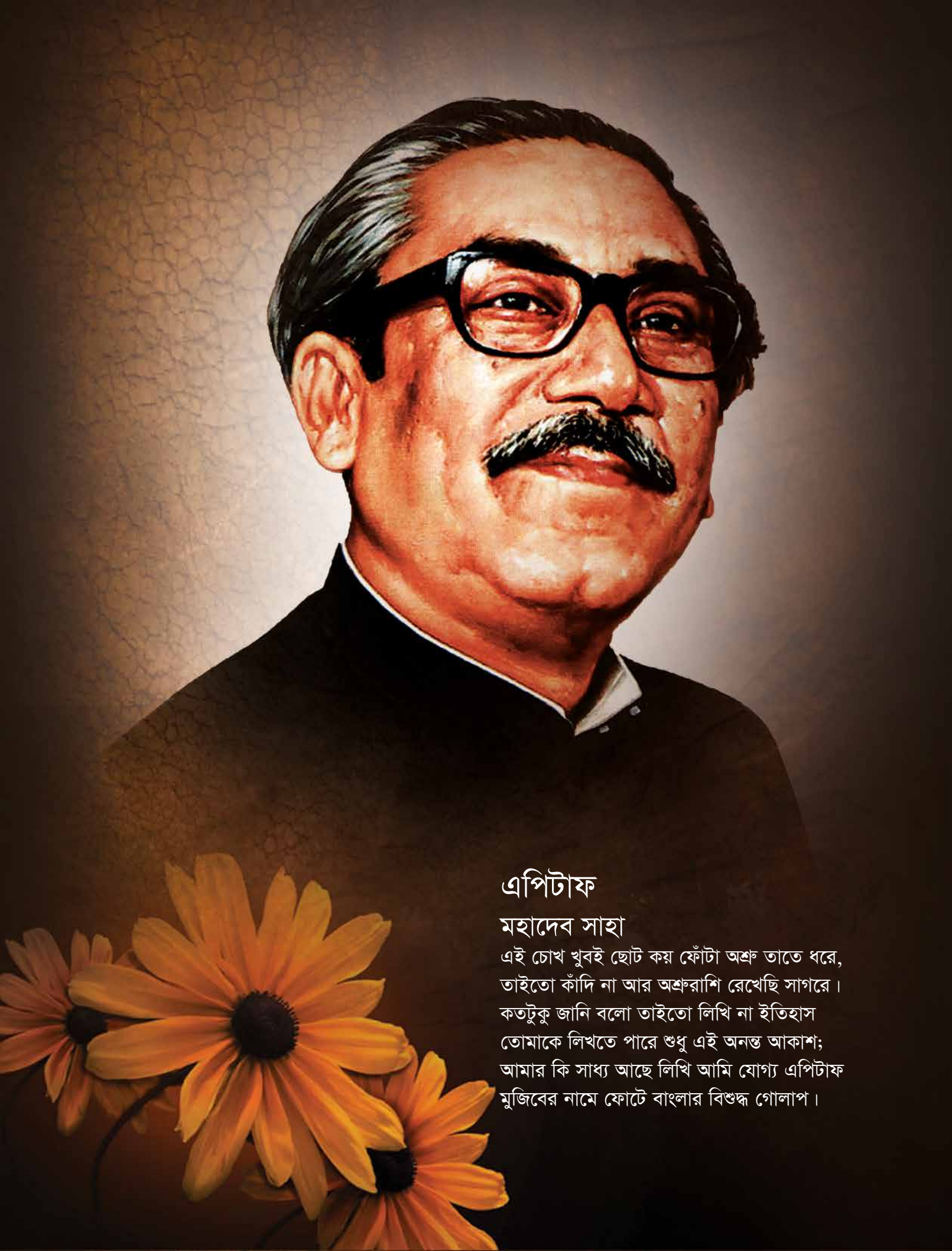

এপিটাফ

মহাদেব সাহা

এই চোখ খুবই ছোট কয় ফোঁটা অশ্রু তাতে ধরে,
তাইতো কাঁদি না আর অশ্রুরাশি রেখেছি সাগরে।
কতটুকু জানি বলো তাইতো লিখি না ইতিহাস
তোমাকে লিখতে পারে শুধু এই অনন্ত আকাশ;
আমার কি সাধ্য আছে লিখি আমি যোগ্য এপিটাফ
মুজিবের নামে ফোটে বাংলার বিশুদ্ধ গোলাপ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বঙ্গভবন, ঢাকা।

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও সারাদেশে যথাযথ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির মধ্য দিয়ে দুর্গাপূজা উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে আমি হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাঙালি হিন্দুর প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা। আবহমানকাল ধরে এ দেশের হিন্দু সম্প্রদায় বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও উৎসবমুখর পরিবেশে নানা উপাচার ও অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে দুর্গাপূজা উদ্‌যাপন করে আসছে। দুর্গাপূজা কেবল ধর্মীয় উৎসব নয়, সামাজিক উৎসব। দুর্গোৎসব উপলক্ষে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিবার-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী একত্রিত হন, মিলিত হন আনন্দ-উৎসবে। তাই এ উৎসব সার্বজনীন। এ সার্বজনীনতা প্রমাণ করে, 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার'।

দুর্গপূজার সাথে মিশে আছে চিরায়ত বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। রয়েছে প্রকৃতির সাথে নিগূঢ় সম্পর্ক। সে সম্পর্ক শরতের শুভ্রতা আর নীলিমাকে ধারণ করে হৃদয়ে এনে দেয় পুণ্যের শ্বেতশুভ্র আবহ। শুধু তাই নয়, ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি দুর্গাপূজা দেশের জনগণের মাঝে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও ঐক্য সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শারদীয় দুর্গোৎসব সত্য-সুন্দরের আলোকে ভাস্বর হয়ে উঠুক; ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সবার মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দের বন্ধন আরও সুসংহত হোক এ কামনা করি।

করোনাভাইরাস মহামারি গোটা বিশ্বকে এক চরম অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ অকালে ঝরে গেছে। বাংলাদেশেও নানা পেশার ও বয়সের মানুষ ইতোমধ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। পাশাপাশি অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, কর্মসংস্থানসহ জীবনযাত্রার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। করোনাভাইরাস এক অদৃশ্য শত্রু। এর বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পাশাপাশি সচেতনতা ও সম্মিলিত উদ্যোগ খুবই জরুরি। আমি আশা করি দুর্গোৎসবের প্রতিটি কার্যক্রম আপনারা স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে পালন করবেন।

মানবতাই ধর্মের শাশ্বত বাণী। ধর্ম মানুষকে ন্যায় ও কল্যাণের পথে আহ্বান করে, অন্যায় ও অসত্য থেকে দূরে রাখে, দেখায় মুক্তির পথ। তাই ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার পাশাপাশি আমাদেরকে মানবতার কল্যাণে এগিয়ে আসতে হবে। দুস্থ ও অসহায়দের পাশে দাঁড়াতে হবে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বাঙালির চিরকালীন ঐতিহ্য। সম্মিলিতভাবে এ ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিতে হবে আমাদের সামগ্রিক অগ্রযাত্রায়। আবহমান বাঙালি সংস্কৃতিতে ঋদ্ধ অসাম্প্রদায়িক চেতনা, পারস্পরিক ঐক্য, সৌহার্দ ও সম্প্রীতি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে উদ্বুদ্ধ করুক, বিশ্ব মানবতার জয় হোক– এ প্রত্যাশা করি।

শারদীয় দুর্গোৎসব সফল হোক, কল্যাণময় হোক– এ কামনা করি।

জয় বাংলা। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৬ কার্তিক ১৪২৭
২২ অক্টোবর ২০২০

বাণী

হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গা পূজা উপলক্ষ্যে আমি দেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকল নাগরিককে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

দুর্গাপূজা শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসবই নয়, এটি এখন সার্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। অশুভ শক্তির বিনাশ এবং সত্য ও সুন্দরের আরাধনা শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

আবহমান কাল ধরে বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। ধর্ম যার যার, উৎসব সবার– এ মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে বাংলাদেশে আমরা সব ধর্মীয় উৎসব একসঙ্গে পালন করে থাকি। আমাদের সংবিধানে সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষের সমান অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে। সকলে মিলে মুক্তিযুদ্ধ করে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছি। এই দেশ আমাদের সকলের। বাংলাদেশ ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সকল মানুষের নিরাপদ আবাসভূমি। বতর্মান আওয়ামী লীগ সরকার জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠীনির্বিশেষে সবার উন্নয়ন করে যাচ্ছে।

করানোভাইরাস সমগ্র বিশ্বকে স্থবির করে দিয়েছে। আমাদের সরকার এ সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে। আমরা জনগণকে সকল সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছি। এসময় সকলকে অসীম ধৈর্য নিয়ে সহনশীল ও সহানুভূতিশীল মনে একে অপরকে সাহায্য করে যেতে হবে। পাশাপাশি আমি এই মহামারীতে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে শারদীয় দুর্গোৎসব উদ্‌যাপনের অনুরোধ জানাই।

আসুন, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রেখে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

দুর্গাপূজা উপলক্ষে আমি হিন্দু ধর্মাবলম্বীসহ সকল নাগরিকের শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

স্পিকার
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এর পক্ষ থেকে প্রথমবারের মত *সনাতনকথা* পূজাবার্ষিকী ২০২০ শিরোনামে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। শারদীয় দুর্গাপূজার শুভলগ্নে দেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

শারদীয় দুর্গাপূজা হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় অনুষ্ঠান । সকলের অংশগ্রহণে এ পূজা প্রতিবছরই আনন্দঘন উৎসবে পরিণত হয়। প্রাচীনকাল থেকেই এদেশে সকলে মিলেমিশে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলো উদ্‌যাপন করে আসছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসাম্প্রদায়িক ও সম্প্রীতির বন্ধনে সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় আজ তাঁর স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছে। বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ আজ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশের উন্নয়নে ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সকল নাগরিক আজ ভূমিকা রেখে চলেছেন। বর্তমান কোভিড-১৯ মহামারীর প্রেক্ষিতে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনপূর্বক নিরাপদে এ শারদীয় উৎসব উদ্‌যাপিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে *সনাতনকথা* পূজাবার্ষিকী ২০২০ শিরানোমের প্রকাশনাটির বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। সেইসাথে উক্ত প্রকাশনাসহ শারদীয় দুর্গাপূজার সকল আনুষ্ঠানিকতার সফলতা কামনা করি।

শিরীন শারমিন চৌধুরী

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি

মন্ত্রী
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রথমবারের মত শারদীয় দুর্গাপূজা ১৪২৭ উপলক্ষে *সনাতনকথা* পূজাবার্ষিকী প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

অশুভ শক্তির বিনাশ ও কল্যাণের বার্তা নিয়ে আবার এসেছে শারদীয় দুর্গোৎসব। উৎসবের এ আনন্দঘন সময়ে আমি সনাতন ধর্মের অনুসারীদের জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বাংলাদেশের অর্জন প্রশংসনীয়। এদেশে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সকলের সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ অংশগ্রহণে হয়ে ওঠে সার্বজনীন। আবহমান কাল থেকে এদেশে ধর্মীয় সম্প্রীতি বিরাজ করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে নজির তৈরি হয়েছে তা অক্ষুণ্ন রেখে দেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় রূপান্তরে আমাদের হতে হবে নিবেদিতপ্রাণ।

আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে দুর্গোৎসব পালনে অতীতের মত এবছরও সরকার বিভিন্ন সহায়তা দিচ্ছে। এ উৎসব সকলের মাঝে সম্প্রীতির অনন্য উদাহরণ হবে বলে আমার বিশ্বাস।

এবছর বাংলাদেশে ভিন্ন এক পরিস্থিতিতে পালিত হতে যাচ্ছে শারদীয় দুর্গাপূজা। বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ আক্রান্ত বাংলাদেশে সকল নিয়ম-কানুন মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এবারে শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্‌যাপনের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি শারদীয় দুর্গাপূজার সাফল্য কামনা করি এবং স্মরণিকা প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ওবায়দুল কাদের এমপি

সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রথমবারের মত শারদীয় দুর্গাপূজা ১৪২৭ উপলক্ষে *সনাতনকথা* পূজাবার্ষিকী প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি।

বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শিতায় বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। বাংলাদেশ আজ স্বল্পোন্নত দেশের বৃত্ত ভেঙে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে পৌঁছে গেছে। সারাদেশে যে-ধারায় উন্নয়ন কাজ চলছে, তাতে ২০৪১ সালের আগেই আমরা উন্নত রাষ্ট্রের পঙ্‌ক্তিভুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে পারব বলে আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণে জননেত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনা মেনে আমরা একতাবদ্ধভাবে স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আমাদের তাই বার বার দরকার স্বাধীনতাপ্রসবী জনবান্ধব শেখ হাসিনা সরকার।

সকলের অংশগ্রহণ ও উপস্থিতিতে দুর্গাপূজা হয়ে ওঠে এক সর্বজনীন মহোৎসব। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে অনন্য। এখানে আবহমান কাল থেকে সকলে মিলেমিশে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলো উদ্‌যাপন করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় এবারও শারদীয় দুর্গোৎসব উদ্‌যাপিত হচ্ছে। তবে বৈশ্বিক মহামারি করোনার কারণে এ আনন্দধারায় কিছুটা হলেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। তবে আশা করি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ বাধা অতিক্রম করতে আমরা সক্ষম হবো। মহামারি কোভিড-১৯-এর কারণে সরকার কিছু স্বাস্থ্যবিধি পালন করার নির্দেশনা দিয়েছে। সকলে স্বাস্থ্যবিধিসমূহ যথাযথভাবে মেনে দুর্গাপূজা উদ্‌যাপন করবেন এবং দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে সক্রিয় ভূমিকা রাখবেন বলে আশা রাখি।

যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এ পূজাবার্ষিকী প্রকাশ হচ্ছে তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শ্রী নারায়ন চন্দ্র চন্দ এমপি

সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রথমবারের মত শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে পূজাবার্ষিকী ১৪২৭ প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি যারপরনাই আনন্দিত।

শারদীয় দুর্গোৎসব হোক আনন্দময় ও উৎসবমুখর এবং সত্য ও সুন্দরের আলোকে আলোকিত হোক প্রত্যেকের জীবন। সকল হীনতা, সংকীর্ণতা, ধর্মান্ধতা, অজ্ঞানতা, দূরীভূত হোক এবং অন্তরের পশুত্ব ও আসুরিক শক্তির বিনাশ হোক, বিনাশ হোক সকল অশুভ শক্তির, জেগে উঠুক সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্ববোধ, রচিত হোক সম্প্রীতি ও মহামিলনের সেতুবন্ধন, নির্মল হোক সকলের চিত্ত, সার্থক হোক শক্তি-সংহতি-কল্যাণ অন্বেষা, বিশ্ব থেকে চিরতরে ধ্বংস হোক আসুরিক প্রবৃত্তি, ধরণীতে নেমে আসুক শান্তির ধারা, বিশ্বমানবতার জয় হোক, সর্বস্তরের মানুষ জাত-পাতের ভেদাভেদ ভুলে দেশ ও জাতির কল্যাণে ব্রতী হোক। হিংস্র সাম্প্রদায়িক শক্তির বিনাশ ঘটে নবচেতনায় গড়ে উঠুক ধন-ধান্যে পুষ্পভরা আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ।

আবহমানকাল থেকে এদেশের মানুষ মিলেমিশে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলো উদ্‌যাপন করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় এবারও শারদীয় দুর্গোৎসব উদ্‌যাপিত হচ্ছে। তবে বৈশ্বিক মহামারি করোনার কারণে এ আনন্দধারায় কিছুটা হলেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। তবে আশা করি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ বাধা অতিক্রম করতে আমরা সক্ষম হবো। মহামারি কোভিড-১৯-এর কারণে সরকার কিছু স্বাস্থ্যবিধি পালন করার নির্দেশনা দিয়েছে। সকলে স্বাস্থ্যবিধিসমূহ যথাযথভাবে মেনে দুর্গাপূজা উদ্‌যাপন করবেন এবং দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে সক্রিয় ভূমিকা রাখবেন, এই প্রত্যাশা।

বাংলাদেশে সনাতন হিন্দু জনগোষ্ঠীর প্রধান ধর্মীয় উৎসব বাঙালি সংস্কৃতির অংশ। জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সবাই অনাদিকাল হতে এ উৎসব করে আসছে। 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার' এই বার্তার বাস্তব রূপায়ণ পরিলক্ষিত হয় শারদীয় এ দুর্গাপূজার মধ্যেই। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এ মেলবন্ধন আরও দৃঢ় হোক সে প্রত্যাশা রইল।

এ পূজাবার্ষিকী প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

শ্রী মনোরঞ্জন শীল গোপাল এমপি

সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রথমবারের মত শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে পূজাবার্ষিকী ১৪২৭ প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি।

বাংলাদেশে সনাতন হিন্দু জনগোষ্ঠীর প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা বাঙালি সংস্কৃতির অংশ। জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সবাই অনাদিকাল হতে এ উৎসব করে আসছে। 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার' এই বার্তার বাস্তব রূপায়ণ পরিলক্ষিত হয় শারদীয় এ দুর্গাপূজার মধ্যেই। মণ্ডপে মণ্ডপে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সকলের সমাবেশ ঘটে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এ মেলবন্ধন আরও দৃঢ় হোক সে প্রত্যাশা রইল।

যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এ পূজাবার্ষিকী প্রকাশ হচ্ছে তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সাথে স্বাস্থ্যবিধি ও সরকারি নির্দেশনা মেনে আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিকতার সাফল্য কামনা করি এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমরা সকল সম্প্রদায় একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠি সেই প্রত্যাশায়।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

১১.১০.২০২০

মো. নূরুল ইসলাম পিএইচডি

ভাইস-চেয়ারম্যান
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। শারদীয় দুর্গাপূজা হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্ববৃহৎ প্রধান ধর্মীয় উৎসব। পুরাণমতে, অসুরদের অত্যাচারে দেবকুল যখন প্রকম্পিত, তখন অসুর নিধনে দেবতারা যাঁর যাঁর অস্ত্র তুলে দিলেন দশভুজা দেবী দুর্গাকে। দশভুজা দেবী দুর্গার হাতে বধ হল মহিষাসুর, জয় হল দেবকুলের। দেবী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী। তিনি অন্যায়, অত্যাচার ও অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য দেবকুল থেকে মনুষ্যকুলে অবতরণ করেন।

দুর্গাপূজার ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা হিন্দুদের, কিন্তু মূলবাণী সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে নিবেদিত। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাঙালির হাজার বছরের অসাম্প্রদায়িক চেতনা। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে সর্বজনীন শারদীয় দুর্গাপূজা। সকল মানুষের সুখ-শান্তি কামনায় এবং সর্বজীবের মঙ্গলার্থে সনাতন হিন্দু সম্প্রদায় বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও উৎসবমুখর পরিবেশে নানা উপাচার ও অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে প্রতিবছর শরৎকালের আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে উদ্‌যাপন করে থাকে শারদীয় দুর্গোৎসব। সকল প্রকার হীনতা, সংকীর্ণতা ও ধর্মান্ধতার ঊর্ধ্বে উঠে ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে ধর্ম যার যার, উৎসব সবার – এই চেতনাকে মনেপ্রাণে ধারণ করে জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সকলে অংশগ্রহণ করে এ অনন্দ-উৎসবে। সকলে মিলিত হয় অভিন্ন মোহনায়, অভিন্ন চেতনায়। সকলের অংশগ্রহণ ও উপস্থিতিতে দুর্গাপূজা হয়ে ওঠে সর্বজনীন মহোৎসব। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে অনন্য। এখানে আবহমানকাল থেকে সকলে মিলেমিশে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলো উদ্‌যাপন করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় এবারও শারদীয় দুর্গোৎসব উদ্‌যাপিত হচ্ছে। তবে বৈশ্বিক মহামারি করোনার কারণে এ আনন্দধারায় কিছুটা হলেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। তবে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ বাধা অতিক্রম করতে আমরা সক্ষম হবো। মহামারি কোভিড-১৯-এর কারণে সরকার কিছু স্বাস্থ্যবিধি পালন করার নির্দেশনা দিয়েছে। আশাকরি, সকলে স্বাস্থ্যবিধিসমূহ যথাযথভাবে মেনে দুর্গাপূজা উদ্‌যাপন করে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন।

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট সমগ্র দেশে আয়োজিত পূজাসমূহ সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে নিষ্ঠার সাথে কাজ করছে। ট্রাস্টের উদ্যোগে প্রথমবারের মত শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রচার ও প্রকাশনা উপ-কমিটির তত্ত্বাবধায়নে *সনাতনকথা* পূজাবার্ষিকী ২০২০ প্রকাশিত হচ্ছে। এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। এ প্রকাশনার মাধ্যমে ট্রাস্টের সামগ্রিক কার্যাবলি এবং শারদীয় দুর্গাপূজার তাৎপর্য ও মহিমা সম্পর্কে সকলে অবগত হবেন। প্রচার ও প্রকাশনা কমিটির এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

সুব্রত পাল

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ত্রয়োদশ ট্রাস্টি বোর্ড ২০২০-২২

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
চেয়ারম্যান, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

নারায়ন চন্দ্র চন্দ, এমপি
সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান
মাননীয় সংসদ সদস্য, ১০৩ খুলনা-৫
npchanda25@gmail.com
মোবাইল নম্বর: ০১৭১১ ২১৭৫৪৮
কর্মএলাকা: নড়াইল, বাগেরহাট এবং সমগ্র বাংলাদেশ

শ্রী রাজেন্দ্র চন্দ্র দেব মন্টু
ট্রাস্টি
devmonto321@gmail.com
মোবাইল নম্বর: ০১৭১১ ১৬০২৮৯
কর্ম এলাকা:
নারায়ণগঞ্জ ও শরিয়তপুর

শ্রী মনোরঞ্জন শীল গোপাল, এমপি
সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান
মাননীয় সংসদ সদস্য, ৬ দিনাজপুর-১
dinajpur.1@parliament.gov.bd
মোবাইল নম্বর: ০১৭১২ ২২৫৪১৭
কর্মএলাকা: দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও এবং সমগ্র বাংলাদেশ

শ্রীমতী রেখারানী গুণ বীরমুক্তিযোদ্ধা
ট্রাস্টি
rekharanigoon@hotmail.com
মোবাইল নম্বর: ০১৫৫২ ৩২৬৯৮২
কর্ম এলাকা:
মানিকগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ

মো. নূরুল ইসলাম
সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ট্রাস্টি
কর্ম এলাকা:
সমগ্র বাংলাদেশ

শ্রী সুভাষ চন্দ্র সাহা
ট্রাস্টি
msgsadtangail@gmail.com
মোবাইল নম্বর: ০১৭১২ ৭০৬৬২০
কর্ম এলাকা:
টাঙ্গাইল ও গাজীপুর

শ্রী সুব্রত পাল
ভাইস চেয়ারম্যান
shubratapaul2012@gmail.com
মোবাইল নম্বর: ০১৭১১ ৬৮৯৯১১
কর্ম এলাকা: ঢাকা মহানগর, ঢাকা জেলা এবং সমগ্র বাংলাদেশ

প্রফেসর ড. অসীম সরকার
ট্রাস্টি
asim2000du@gmail.com
মোবাইল নম্বর: ০১৫৫২ ৪৫০৮৯০
কর্ম এলাকা: গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর ও রাজবাড়ি

এ্যাড. শ্রী ভূপেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক দোলন
ট্রাস্টি
bcbhowmick1949@gmail.com
মোবাইল নম্বর: ০১৭১৩ ২৬৬৮৯০
কর্ম এলাকা: কিশোরগঞ্জ ও নরসিংদী

অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত
ট্রাস্টি
prangopal@gmail.com
মোবাইল নম্বর: ০১৭১৩ ০১৫০৩৪
কর্ম এলাকা:
কুমিল্লা ও চাঁদপুর

শ্রী উত্তম কুমার শর্মা
ট্রাস্টি
uttom2005@yahoo.com
মোবাইল নম্বর: ০১৮১৫ ৬৫০৮২৩
কর্ম এলাকা: চট্টগ্রাম মহানগর, চট্টগ্রাম (উ.), নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও ফেনী

শ্রী ভানুলাল দে
ট্রাস্টি
deybhanu@gmail.com
মোবাইল নম্বর: ০১৭১৩ ৪৫০৫৬৭
কর্ম এলাকা: বরিশাল, ঝালকাঠি ও পটুয়াখালি

শ্রী বাবুল চন্দ্র শর্মা
ট্রাস্টি
sharmababul1960@gmail.com
মোবাইল নম্বর: ০১৫৫৪ ৩২৭৫১০
কর্ম এলাকা: কক্সবাজার, চট্টগ্রাম (দ.), খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান

শ্রী অশোক মাধব রায়
ট্রাস্টি
write2roy@yahoo.com
মোবাইল নম্বর: ০১৭১১ ৬৪৮১৭৭
কর্ম এলাকা: হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া

শ্রী তপন কুমার সেন
ট্রাস্টি
novaconstructionltdbd@gmail.com
মোবাইল নম্বর: ০১৭১৪ ৩৩৩৮৩৮
কর্ম এলাকা: রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ

ইঞ্জিনিয়ার পি কে চৌধুরী
ট্রাস্টি
prasunkcbd@gmail.com
মোবাইল নম্বর: ০১৭১৫ ১০২৫১৪
কর্ম এলাকা:
সিলেট ও সুনামগঞ্জ

শ্রী অংকুরজিৎ সাহা নব
ট্রাস্টি
nobonitatrading@gmail.com
মোবাইল নম্বর: ০১৯১৯ ৮৮৫৭৬০
কর্ম এলাকা: সিরাজগঞ্জ, পাবনা, বগুড়া ও জয়পুরহাট

কৃষিবিদ বিশ্বনাথ সরকার বিটু
ট্রাস্টি
bitusarker1126@gmail.com
মোবাইল নম্বর: ০১৭১১ ২৬১৮৩৩
কর্ম এলাকা: রংপুর, গাইবান্ধা ও লালমনিরহাট

শ্রী নান্টু রায়
ট্রাস্টি
nantu1111@gmail.com
মোবাইল নম্বর: ০১৭১৫ ৬২২৩০৬
কর্ম এলাকা: খুলনা, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা

শ্রীমতী ববিতা রানী সরকার
ট্রাস্টি
babitasarkar11@gmail.com
মোবাইল নম্বর: ০১৭১২ ১১৮৫৭১
কর্ম এলাকা: নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও পঞ্চগড়

শ্রী শ্যামল সরকার
ট্রাস্টি
shyamalssr@gmail.com
মোবাইল নম্বর: ০১৭১৩ ০৬৩৩২৭
কর্ম এলাকা: যশোর, সাতক্ষীরা, মেহেরপুর ও মাগুরা

এ্যাড. অসিত কুমার সরকার সজল
ট্রাস্টি
ashitsarkersajal1971@gmail.com
মোবাইল নম্বর: ০১৭১১ ১৬৩২৫১
কর্ম এলাকা:
নেত্রকোণা ও শেরপুর

শ্রী সুরঞ্জিৎ দত্ত লিটু
ট্রাস্টি
surinjitdattalitu0987@gmail.com
মোবাইল নম্বর: ০১৭২২ ৭৭৯২৯৬
কর্ম এলাকা:
পিরোজপুর, বরগুনা ও ভোলা

ইঞ্জিনিয়ার রতন কুমার দত্ত
ট্রাস্টি
rtndutta@yahoo.com
মোবাইল নম্বর: ০১৬১১-৬৪২৭৭২
কর্ম এলাকা:
ময়মনসিংহ ও জামালপুর

শ্রদ্ধা

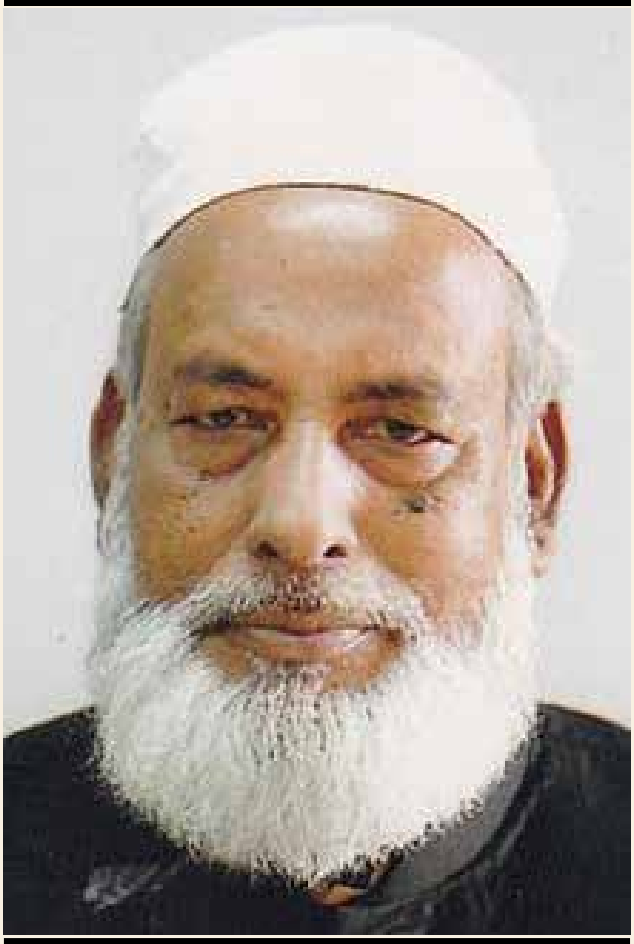

জন্ম: ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ ॥ মৃত্যু: ১৩ জুন ২০২০

আমরা শোকাভিভূত

রাজনীতিবিদ এবং জননেত্রী শেখ হাসিনার চতুর্থ মন্ত্রিসভার ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। জনাব আবদুল্লাহ ১৯৪৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জ জেলার কেকানিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম শেখ মো. মতিউর রহমান এবং মাতা মোসাম্মৎ রাবেয়া খাতুন। চারভাই ও তিনবোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম খাদেমুল ইসলাম গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসায় কোরআন হেফজের মাধ্যমে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়।

করেন। এরপর সুলতানশাহী কেকানিয়া প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করেন। ১৯৬১ সালে একই বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক সম্পন্ন করে খুলনার আযম খান কমার্স কলেজ থেকে ১৯৬৩ সালে উচ্চ মাধ্যমিক এবং ১৯৬৬ সালে বিকম (অনার্স) ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭২ সালে এমকম এবং ১৯৭৪ সালে অর্থনীতি বিষয়ে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৭৭ সালে তিনি ঢাকার সেন্ট্রাল ল কলেজ থেকে আইন বিষয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেন।

কর্মজীবনের শুরুতে শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ সুলতানশাহী কেকানিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। পরে গোপালগঞ্জ ও ঢাকা জজকোর্টে ওকালতি পেশায় জড়িত হন। প্রথমে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের বোর্ড অফ গভর্নরস-এর সদস্য ও পরবর্তীকালে ওই বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রথম সরকারের আমলে তিনি ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ছাত্রজীবন থেকেই শেখ আবদুল্লাহ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। আযম খান কমার্স কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি কলেজ ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৬-এর ছয় দফা আন্দোলনে অংশ নেন এবং সে-সময় যুবলীগে যোগদান করে গোপালগঞ্জ জেলা যুবলীগের সভাপতি ও জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও ১৯৭০ সালের সাধরণ নির্বাচনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে তিনি মুজিববাহিনিতে যোগদান করে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতালাভের পর তিনি গোপালগঞ্জ জেলা শাখা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। গোপালগঞ্জ-৩ আসনে শেখ হাসিনার সবক'টি সংসদ নির্বাচনে প্রচারণা ও কার্যক্রমে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। আবদুল্লাহ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির ধর্মবিষয়ক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৮ সালে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা গোপালগঞ্জ-৩ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকালে শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ শেখ হাসিনার পক্ষে নির্বাচন পরিচালনার গুরুদায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া ধর্মবিষয়ক সম্পাদক হিসেবে তিনি আওয়ামী লীগের সঙ্গে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশসহ বিভিন্ন ধর্মভিত্তিক দলসমূহের সম্পর্কোন্নয়ন এবং কওমি মাদরাসার সনদ স্বীকৃতির পেছনে ভূমিকা পালন করেন। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে তিনি ৭ জানুয়ারি ২০১৯ সালে শেখ হাসিনার চতুর্থ মন্ত্রিসভায় টেকনোক্র্যাট কোটায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পান এবং আমৃত্যু সে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বর্তমান বোর্ড (২০২০-২২) গঠনে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ২৩-সদস্যের বর্তমান বোর্ড দায়িত্ব গ্রহণের পর তাঁর নেতৃত্বে সচিবালয়ে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে তাঁর উপস্থাপনা, বুদ্ধিমত্তা, বাক্‌চাতুর্য এবং রঙ্গপ্রিয়তা উপস্থিত সকলের মন জয় করে। তাঁর অকালমৃত্যুতে দেশ ও জাতির এবং হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে বলে বোর্ড মনে করে।

বাবা

শেখ রেহানা

জন্মদিনে প্রতিবার একটি ফুল দিয়ে
শুভেচ্ছা জানানো ছিল
আমার সবচেয়ে আনন্দ।
আর কখনও পাবো না এই সুখ
আর কখনও বলতে পারব না
শুভ জন্মদিন।
কেন এমন হল?
কে দেবে আমার প্রশ্নের উত্তর
কোথায় পাবো তোমায়...

যদি সন্ধ্যাতারাদের মাঝে থাকো
আকাশের দিকে তাকিয়ে বলব
শুভ জন্মদিন।
তুমি কি মিটি মিটি জ্বলবে?

যদি বিশাল সমুদ্রের সামনে
ঢেউদের খেলার মাঝে থাকো বলব
শুভ জন্মদিন।

সমুদ্রের গর্জনে শুনব কি
তোমার বজ্রকণ্ঠ?
পাহাড়ের চূড়ায় যেখানে মেঘ
নীল আকাশে লুকোচুরি খেলে
তুমি কি ওখানে?
তাকিয়ে বলব
শুভ জন্মদিন।

এক টুকরো সাদা মেঘ ভেসে যাবে
ওখানে কি তুমি?
আকাশে বাতাসে পাহাড়ে উপত্যকায়
তোমাকে খুঁজব, ডাকব
যে প্রতিধ্বনি হবে
ওখানে কি তুমি?
শুভ জন্মদিন।
শুভ জন্মদিন।

লন্ডন, ১৭ মার্চ ২০১০

অন্তর্যামী

প্রাণেশকুমার চৌধুরী

কোনও একরাতে স্বপ্ন দেখেছিলাম আমি:
অপার সাগরের বালুকাবেলায় চলেছি আমি হেঁটে হেঁটে,
আমার প্রভু ছিলেন আমার সাথে।
প্রায়ান্ধকার আকাশের নীচে জীবনের অতীত দৃশ্যগুলো
ভেসে এল আমার চোখের সামনে।
আমি অবাক হয়ে দেখলাম দু'জোড়া পদচিহ্ন বালুকাবেলায়–
একজোড়া প্রভুর, অপরটি আমার।
আমি পেছনে ফিরে তাকালাম, দেখলাম, আমার দুঃখ ও বিষাদের কালে
একজোড়া পদচিহ্ন আঁকা আছে অসীম বালুকার বুকে।
আমি বিহ্বল বিস্ময়ে ভাবলাম, একি আশ্চর্য!
আমি প্রশ্ন করলাম প্রভুকে, 'তুমি বলেছিলে প্রভু,
তোমাকে অনুসরণ করলে তুমি থাকবে আমার পাশে সারাজীবন–
এখন দেখলাম, বালুকাবেলায় মাত্র একজোড়া পদচিহ্ন!
আমার বিপদে আমায় পরিত্যাগ করলে কেন?'
প্রভু বললেন, 'প্রিয় সন্তান আমার, তোমাকে ভালবাসি বলেই
তোমায় ছাড়তে পারি না আমি কোনওকালেই।
তোমার সংকট আর সমস্যায় একজোড়া পদচিহ্ন দেখেছ ঠিকই,
কারণ আমি হাঁটছিলাম একা একা, আর তুমি ছিলে আমার বুকে।'

মূল: মেরি স্টিভেনশন

বৃষ্টিবিলাস

মণিকা রায়

বৃষ্টি এলে হেলেদুলে কেয়া পাতার নৌকা ভাসে মনে
মাঠের পারের দূরের দেশে ছুটতে থাকে অপু আর দুর্গা
আমার তখন কেবলই হারানো নাকছাবিটা খুঁজে পেতে ইচ্ছে হয়।
বৃষ্টি এলে কাকভেজা হয় বুঝি আকাশের মুখটা
দু'টো শালিক অজানা সুখে ডানা ঝাপটায় বয়সী জামরুলের ডালে
আমার শুধুই ভিজতে ইচ্ছে হয়।
বৃষ্টি এলে ন্যাড়া বটগাছটার নীচে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখে মেয়েটি
একঝাঁক সাদা বক ডানা মেলে উড়ে যায় দূর থেকে দূরে

আমার কেন জানি দিকশূন্যপুরের কথা মনে পড়ে যায়।
বৃষ্টি এলে থৈ থৈ বন্যায় ভেসে যায় অন্দরের বন্দর
বিমনা বিকেল জুড়ে হাবুডুবু খায় বুকে বেঁধা বিরহী তীরটা
আমার তখন খুব পার্বতীর কথা মনে পড়ে যায়।
বৃষ্টি এলে কদম ফোটে বনে
আমার খালি তোমার কথাই মনে পড়ে যায়...

প্রবন্ধ

বঙ্গবন্ধু

আবহমান বাংলার অমর প্রেম

মোয়াজ্জেম হোসেন

আবহমান বাংলার মানুষ চিরদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিচিত্র বিস্ময়ে বারবার অনুভব করবে। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং দেশপ্রেমে পরিপূর্ণ জীবনের মাধুর্যই এই বিচিত্র বিস্ময়ের উৎস। শুধু দেশ নয়, সমগ্র মানবসমাজকে তিনি অখণ্ড শক্তি হিসেবে উপলব্ধি করতেন। স্রষ্টার প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছিল অটল। দেশপ্রেম তাঁর রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে প্রবহমান ছিল। তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, 'আপনি রাজনীতিতে এলেন কীভাবে?' উত্তরে বলেছিলেন, 'স্কুলে থাকতে রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটি পড়ে শোষিত মানুষের প্রতি আমার প্রবল ভালবাসা সৃষ্টি হয়। তখনই আমি সিদ্ধান্ত নিই– শোষিত মানুষের জন্য কাজ করব। আর আমার দেশের মানুষ বহুকাল ধরেই শোষিত ছিল।'

এই জন্য বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি ছিল স্বচ্ছ, হৃদয়গ্রাহী এবং জাগরণী শক্তির অনিবার্য প্রেরণার মত। বরিস পাস্টেরনাক বলেছিলেন, 'অন্যকে পাগল করে দেবার নামই বীরত্ব'। শেখ মুজিব যথার্থ 'বীর' ছিলেন। বাংলাদেশের মানুষকে স্বাধীনতার জন্য তিনি পাগল করে দিয়েছিলেন। জনগণের হৃদয়কে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ বিশ্বাসে ভরে দিয়েছিলেন। পৃথিবীতে জনতার হৃদয়ে এমন আবেগ খুব কম মানুষই সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

তিনি রবীন্দ্রনাথ থেকে সবসময় সেইসব পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করতেন– যা মানুষকে প্রেমে এবং স্বাধীনতার মহান অনুভবে উদ্বুদ্ধ করে। যেমন: 'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী/ভয় নাই ওরে ভয় নাই/ নিঃশেষে প্রাণ যে করিব দান/ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।' রবীন্দ্রনাথের গান থেকেই তিনি জাতীয় সংগীত নির্বাচন করেছেন। 'সঞ্চয়িতা' তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই থাকত।

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী যদিও তাঁর রাজনৈতিক জীবনের নেতা এবং গুরু ছিলেন; কিন্তু বঙ্গবন্ধুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে– শহীদ তিতুমীর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশনায়ক সুভাষ বসু, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এবং শের-ই-বাংলা ফজলুল হক– এঁদের বলিষ্ঠতা এবং তেজোদীপ্ত চিত্তসমুদ্রের জোয়ারের ভিতর। তিনি পারিবারিক ঐতিহ্যে একজন নিষ্ঠাবান ধার্মিক বাঙালি মুসলমান– যিনি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক এবং সমাজিতান্ত্রিক জীবনচর্চায় অবিচলিত ছিলেন। তাঁর সামনে কোনও মানুষকে লাঞ্ছিত করা ছিল দুরূহ ব্যাপার। তাঁর তেজস্বিতার কারণেই তাঁকে অপমান করাও কঠিন ছিল। যদিও মান-অপমান নিয়ে তাঁর ভাবনার সময় ছিল না। কিন্তু আত্মসম্মানবোধ ছিল প্রবল।

মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে, যখন শত্রুরা তাঁকে কোথাও নিয়ে যাবার জন্য চোখ বাঁধতে চেয়েছিল– তখনই প্রচণ্ড ক্রোধে হাত নেড়ে নিষেধ করে বলেছিলেন, 'আমার চোখ বাঁধার চেষ্টা করো না।' তখনই ঘাতকরা ভয়ে নার্ভাস হয়ে গুলি করে। তাঁর আত্মসম্মানবোধই মূল্যত তাঁর মৃত্যুর কারণ। কথায় আছে, মৃত্যু নয়– মৃত্যুর কারণই মানুষকে অমর করে। সমস্ত জীবনই তিনি অভয় ছিলেন। তাঁর হৃদয় পবিত্র ছিল বলেই কোনও কিছুতেই তিনি ভয় পেতেন না।

তাঁর মৃত্যুর গন্ধ পেয়েই তাঁর সহধর্মিণী ঘাতকদের উপেক্ষা করে ঘরের দরজা খুলে দিয়েছিলেন। এই মহিয়সী নারী স্বামীর মতই ছিলেন স্বাধীনচেতা এবং নির্ভয় প্রাণের মানবী। তাঁরা দু'জনে শৈশবে এবং কৈশোরেই বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। একইসঙ্গে দেশের স্বাধীনতার জন্য সমস্ত জীবন সংগ্রাম করেছেন। একইসঙ্গে নিজেদের প্রিয় সন্তানদের এবং পরিবারের প্রিয়জনদের নিয়ে দেশের শত্রু হিংস্র ঘাতকদের হাতে প্রাণ দিয়েছেন। এই সমস্ত দৃশ্য চিত্রিত করা খুব সহজ বিষয় নয়।

মহাত্মা গান্ধীর মতই তিনি জনগণের জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকতেন। জনগণের জন্য ঘরের দরজা সব প্রহরেই খোলা থাকত। তাঁর নাদ্ তাঁর কণ্ঠস্বরে মধুরভাবে প্রকাশিত হত। জনসমুদ্রে তাঁর কণ্ঠস্বর দৈবরূপে প্রভাব বিস্তার করত। মানুষকে যে প্রতিশ্রুতি দিতেন– তা তিনি পালন করতেন। বাংলার মহামানবদের প্রায় সবাই যখন প্রয়াত– সেই নিঃসঙ্গ অবস্থায় তিনি একটি জাতির জন্য স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্র নির্মাণ করেছেন।

২৫শে মার্চের আগে ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল যখন জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে বৈঠকে বসবেন– তখন হোটেলের লবিতে পাকিস্তানের সেনাবাহিনির দুজন জেনারেলকে দেখে ভুট্টোকে বললেন– 'আমার সামনে কোনও জেনারেলকে রাখবেন না।' ভুট্টো তাদেরকে সরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল।

২৫শে মার্চের রাতে পাকিস্তানের সেনাবাহিনির লোকজন যখন তাঁর বাসভবন ঘেরাও করে সেই সময়ও তিনি তেজোদৃপ্তভাবে বলেছিলেন, 'আমি তো নিরস্ত্র, তোমরা গুলি করছে কেন?' তখন সেনাবাহিনির লোকজন তাঁর ঘাড়ে বৃষ্টির মত ঘুষি মারছিল। কিন্তু তাঁর গ্রীবা ছিল হিমালয়ের মত। তিন তাঁর জনগণকে কোনওদিনই একলা ফেলে যাননি। তাঁর জনগণকে তিনি 'ভাই' বলে সম্বোধন করতেন। সম্বোধনের এই উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে জনগণ মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর কথা শুনত। জনগণ তাঁর ভালবাসাকে মণেপ্রাণে বিশ্বাস করত।

প্রকৃতপক্ষে, শেখ মুজিবের জীবন প্রবাহে কোনও বিরাম না থাকায়– পরিশ্রান্ত অবস্থাতেই তাঁকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ গভীর সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে– যার কোনও ব্যাখ্যা হয় না। এমনকি সহকর্মীরাও তাঁকে এই বিষয়ে সাহায্য করতে অনেক সময় অপ্রস্তুত থাকতেন। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি তিনি তাঁর প্রিয় মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেছেন– তাঁর শরীর, মন– সবকিছুই সীমাহীন এক শক্তির ভেতর সংগ্রাম রত। তবু পরের দিনই ১১ জানুয়ারি সকালেই তিনি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন সাহেব একান্ত আলাপে বসেন। আলাপের বিষয়বস্তু: বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপরিচালনার সামগ্রিক দায়িত্ব নেবেন– দল এবং দেশবাসীর এই ইচ্ছা। ওই মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু দেশের মঙ্গলের জন্য শাসন ব্যবস্থার একটা দৃঢ় রূপ চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর দূরদর্শিতা সহকারীদের অনেকেই ধারণ করতে পারতেন না। যে-কোনও কঠিন পরিস্থিতিকে বঙ্গবন্ধু খুব দ্রুত অনুধাবন করতে পারতেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, দুর্যোগকালের রাজনৈতিক কর্তব্যবোধ– তাঁকে অসহায় করে দিয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু রাজনীতি শুরু করেছেন ১৮ বছর বয়স থেকে। রাস্তায় রাস্তায় পায়ে হেঁটে, সাইকেল, নৌকায়, গ্রামে গ্রামে ঘুরে, ফুটপাথে ঘুমিয়ে রাজনীতি করেছেন। তাঁর পায়ের ধ্বনি বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে জনপদে আজও মর্মরিত হয়। সর্বক্ষণ দরিদ্র অশিক্ষিত মানুষকে নিয়ে তিনি ভাবতেন। এদেরকে ভালবেসেই সুসংগঠিত করেছিলেন। এই ভূখণ্ডে তাঁর মত কেউ এমন ভূমিকা নিতে পারেননি। দুর্লভ আত্মবিশ্বাস ছিল তাঁর। নেতিবাচক চিন্তা সম্পূর্ণ পরিহার করতে পারতেন। একবার বলেছিলেন, 'আমি যখন খুব ইয়ং ছিলাম, আমার নেতা সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে কেউ গালাগালি করলে আমি রাগ করে তাঁর কাছে যেতাম। তিনি হেসে বলতেন, থাক বলতে দাও। ওতে কী হবে? উনি আমাকে বলতেন, থিঙ্ক ফর এ পজিটিভ অ্যাপ্রোচ দ্যান এ নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ। আমার লাইফকে আমি ঐ দৃষ্টিতেই দেখেছি।'

শেখ মুজিব ইংরেজদের প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন চেয়েছিলেন। এই প্রবৃত্তি এবং পরিকল্পনা সুভাষ বসুর মধ্যেও ছিল। দুজনেরই রক্তে ছিল– জনগণের জীবনের প্রকৃত সম্মানকে উন্মোচিত করা। শেখ মুজিব সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, 'জনগণ থেকে আমাদের শাসন কাঠামো অনেকটা বিচ্ছিন্ন, প্রকৃত যোগাযোগ তাদের সাথে ততটা নাই। যারাই আমারা সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করতে গিয়েছি, তারাই মুরুব্বিয়ানা দেখিয়েছি। আমরা হলাম মালিক, তোমরা আমাদের গোলাম। তোমরা এসো, আমাদের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে থাকো, আমাদের হুকুম নাও, আমাদের হুকুম মত চল, আমাদের হুকুম মত কাজ কর, এই ছিল মনোভাব। কোনও স্বাধীন দেশে এই মনোভাব চলতে পারে না। তাতে দেশের মঙ্গল হয় না, তাতে দেশের

অমঙ্গল টেনে আনা হয়। ... ... আমার বাংলাদেশের যে সমস্যা এবং বাংলাদেশের যে অবস্থা, তাতে আমাদের নিজস্ব পদ্ধতি থাকতে হবে। কারণ, আমাদের মানুষকে চিনতে হবে, জানতে হবে। তাদের সাথে মিশতে হবে, তাদের মনোভাব জানতে হবে। তাদের ইতিহাস এবং অন্য যা-কিছু আছে সংস্কার ইত্যাদি অনেক কিছুই এ-দেশের মানুষের আছে, সে-সব বিবেচনা করে একটা পন্থা করে একটা পন্থা অবলম্বন করা দরকার। যার উদ্দেশ্য হল– এ-দেশের মানুষের মঙ্গল করা, এ-দেশের উপর থেকে অত্যাচার, অবিচার ও জুলুম উৎখাত করা। যাতে সহজ ও সরলভাবে মানুষের মধ্যে সোজাসুজি শাসনতান্ত্রিক কাঠামো পৌঁছে দেওয়া যায়।'

বঙ্গবন্ধুর এইসব কথা এখনও আমাদের হৃদয়কে বিদীর্ণ করে। তিনি অফিসারদের বলতেন, 'স্বজনপ্রীতির ঊর্ধ্বে উঠতে হবে, দুর্নীতির ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। যদি আপনারা কৃতকার্য না হতে পারেন, যদি মানুষ আপনাদের ভাল না বাসে, আপনারা মানুষকে যদি খুশি করতে না পারেন, তাহলে অসুবিধায় পড়বেন।'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এও বলতেন, 'বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ। এ ব্রিজ বিটুইন দ্য সাবকন্টিনেন্ট অ্যান্ড সাউথ ইস্ট এশিয়া। অন্যান্য দেশ যত বড়ই হোক না কেন, ভবিষ্যতে তারা আমাদের ফলো করবে, যদি আমাদের সিস্টেম সাকসেসফুল হয়।'...

বলতেন, 'আমাদের উদ্দেশ্য কী? কেন আপনারা রিস্ক নিয়েছিলেন? কেন স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছিলেন? যারা আমার সাথে একত্রে কাজ করেছেন– তাদের মনে রাখা দরকার যে, ২৫/২৬ বছর আমার সাথে কাজ করেছেন। আপনারা বিট্রে করেননি, বেঈমানি করেননি।

'আপনারা আমাকে ছেড়ে সরকারি দলে যোগদান করেননি। আপনারা যুদ্ধের সময় শত্রুর মোকাবিলা করেছেন। তারা আপনাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। আপনারা সংসার ছেড়ে দিয়েছিলেন, আপনারা সবকিছু করেছেন। কেন করেছিলেন? নিজের জন্য? তা নয়। এ-দেশের গরিব-দুঃখীদের জন্য। যাতে একটা শোষণমুক্ত সমাজ করতে পারেন, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি করতে পারেন। যাতে বাংলার মানুষ সুখী হয়, বাংলা মানুষ অত্যাচার-অবিচার থেকে বাঁচতে পারেন।'

বঙ্গবন্ধুর এইসব কথার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি এখনও আমাদের কানে বাজে। এইসব কথার আবেদন এখনও নতুন এবং আমাদের অস্তিত্বের জন্য অনিবার্য।

তারপর বঙ্গবন্ধু আবার বলছেন, 'বিচার ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি বদলে ফেলা দরকার। বিচারের নাম আবিচার আর চলে না। এবার নতুন একটা কাঠামো করুন। সোজাসুজি বিচার হয়ে যাক।... বাংলার দুঃখী মানুষ কোনওদিন বিচার পায় নাই। জীবনভর আমি জেল খেটেছি, কয়েদিদের সাথে জীবন কাটিয়েছি। আমি জানি তাদের কী দুঃখ, কী কষ্ট।' একদম সুস্পষ্টভাবে বলছেন, 'আমার কাছে আপনারা তওবা করে যান যে, স্বজনপ্রীতি করবেন না। ঘুষখোরদের সাহায্য করবেন না। মাত্র কয়েকটা লোকের জন্যই বাংলাদেশের মানুষ দুঃখ দূর করা যায় না। আমি এর প্রতিকার চাই।... আমার কর্মী যারা আছেন, যারা আমার কথায় বন্দুক ধরে যুদ্ধ করেছিলেন, যারা আমার কথায় সবকিছু ত্যাগ করতে পারতেন, তারা আমার একটা কথা রাখুন। ঘুষ দুর্নীতি বন্ধ করুন, আপনাদের এরিয়াতে যেয়ে দেখুন, বাংলাদেশের মানুষের দুঃখ দূর হয় কিনা তারা না খেলেও কথা বলবে না। যদি তারা দেখে যে, তাদের সামনের খাবার অন্যে না খায়। যদি তাদের

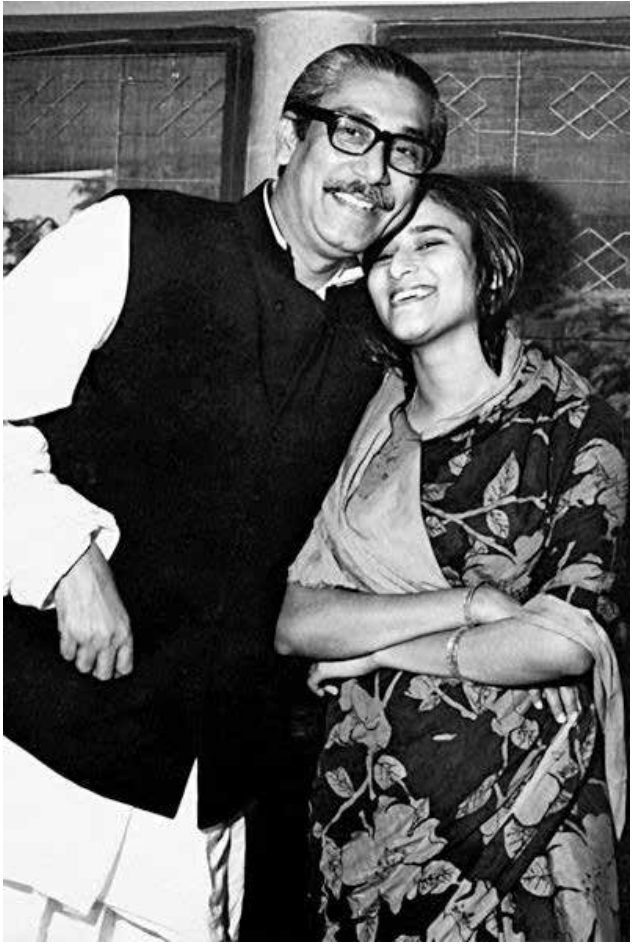

বোঝানো যায় যে, না, আমার নাই, তাহলে তারা দুঃখ করবে না। তারা যখন দেখে যে, তাদের জন্য যে আটা পাঠানো হচ্ছে, তা অন্যে চুরি করে খায়, তাহলে তাদের দুঃখের জায়গা থাকে না। তখন তারা অভিশাপ দেয়। সে অভিশাপ আপনাদের লাগে কি-না জানি না। কিন্তু আমার লাগে। কারণ, তারা আমায় দোয়া করেছে। এদেশের মা-বোনেরা যদি আমার জন্য রোজা না রাখত, মসজিদে যদি দোয়া না করত, তাহলে বোধহয় আমি ফিরে না-ও আসতে পারতাম। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ রোজা রেখেছে আমার জন্য মাসের পর মাস।... মাঝে মাঝে আমার অসহ্য লাগে, যখন ভাবি, কেন এই করাপশন সমাজের মধ্যে ঢুকেছে?... চুরি, ডাকাতি, ঘুষ, দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে– এটা ভাল করে জানবেন।... আমি এ ব্যাপারে সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়েছি।'

এই যে কথাগুলো, এগুলো আজ ৪৫ বছর পরেও একইরকম সত্য। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে যারা দেশের ক্ষতিসাধন করেছে– তাদের প্রবৃত্তি, চরিত্র, কুকর্মের ধারাবাহিক বিবরণ দেশবাসীর সামনে উপস্থিত করলে দুঃখের সাগর সৃষ্টি হবে।

এত দুঃখের মধ্যেও অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতির ভিতরে– বঙ্গবন্ধু এবং স্বাধীনতার জন্য লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্ত আজও সম্প্রসারিত হচ্ছে প্রজন্মের পর প্রজন্মের কাছে। দেশপ্রেমিক জনগণের উত্থানের কারণে, অন্তত আমরা মুক্তিযুদ্ধের শুকিয়ে যাওয়া রক্তের ওপর আবার দাঁড়াতে পেরেছি।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলেও তাঁর আত্মা– বাংলার জলে স্থলে অন্তরীক্ষে বারবার বিদ্রোহীর রূপে আবির্ভূত হবে– তাঁর অসহায় জনগণের জন্য– বাংলার মানুষের জন্য। বঙ্গবন্ধুর চিরন্তর প্রকাশ– আবহমান বাংলার অন্তত প্রেমে! তিনি 'অন্তবিহীন শেখ মুজিব'!!

মোয়াজ্জেম হোসেন
কবি প্রাবন্ধিক

আমি অহিংস

সন্তোষ ঢালী

আমি অহিংস!
তবু কেন ভাল লাগে বারুদের গন্ধ
তবু কেন ভাল লাগে রক্তের আলপনা,
তবে কি রক্তে আমার এখনও বেঁচে পিতৃহন্তার ভ্রূণ, আদিম হিংস্রতা?
ঈর্ষা রিরংসা যুদ্ধের নেশা রয়ে গেছে দৈবের ভুলে সভ্যতার তলে?
সুপক্ব ডালিমের ভেতর বিষধর তক্ষক পরীক্ষিতের মৃত্যুদূত–

আমার ভেতর এখনও বেঁচে রক্তাক্ত এক কুরুক্ষেত্র
আমিই ভীষ্ম আমিই দ্রোণ আমিই যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন
আমার ভেতর এখনও বাস করে একলব্য শকুনি অন্ধ-ধৃতরাষ্ট্র
আমিই যেন সেই অভিশপ্ত সম্রাট ভাগ্যের হাতে অসহায় ক্রীড়নক;
কুরুক্ষেত্র! হায় কুরুক্ষেত্র!!
মানুষের রক্তের ভেতর কী অদ্ভুত রয়ে যাওয়া জন্ম-জন্মান্তর!

আমি অহিংস!!
তবু কেন ঘৃণা ওঠে জেগে তরঙ্গ-ফণায়, তবু কেন অগ্ন্যুদ্গার হায়
পৃথিবীর সবুজ চিরে নৃত্যরত হিংসার লাভাস্রোত বিশ্বাসের ঘরে;
রক্তে রক্তে রয়ে গেছে রক্তবীজ অবিনাশী জাহ্নবীর স্রোতে–
তাই বুঝি যুদ্ধ ভাল লাগে পবিত্র কর্তব্যের মত,
ভাল লাগে বনপোড়া আগুনের ঘ্রাণ;

আমি অহিংস অথচ...
অথচ শিরায় শিরায় কপটতার মাদল সাঁওতালি তালে,
প্রাগৈতিহাসিক রক্তে সাঁতার কাটে দুরন্ত চিতা;
কতটুকু হিংসা বিসর্জন দিলে অহিংস বলা যায় এই ক্লেদরক্ত কালে?
কতটুকু পাথর হলে অহিংস হওয়া যায়, কতটুকু ফসিল হলে?

আমি অহিংস!!! আমি অহিংস???
অহিংসারও আগুন আছে যা পোড়ায় এবং নিঃশব্দে পোড়ে।

বসন্ত বন্দনা

নির্মলেন্দু গুণ

হয়তো ফুটেনি ফুল রবীন্দ্রসংগীতে যত আছে,
হয়তো গাহেনি পাখি অন্তর উদাস করা সুরে
বনের কুসুমগুলি ঘিরে। আকাশে মেলিয়া আঁখি
তবুও ফুটেছে জবা, দূরন্ত শিমুল গাছে গাছে,
তার তলে ভালোবেসে বসে আছে বসন্ত পথিক।

এলিয়ে পড়েছে হাওয়া, ত্বকে কী চঞ্চল শিহরন,
মন যেন দুপুরের ঘূর্ণি-পাওয়া পাতা, ভালোবেসে
অনন্ত সংগীত স্রোতে পাক খেয়ে, মৃত্তিকার বুকে
নিমজ্জিত হতে চায়। হায় কি আনন্দ জাগানিয়া।

এমন আগ্রাসী ঋতু থেকে যতই ফেরাই চোখ,
যতই এড়াতে চাই তাকে, দেখি সে অনতিক্রম্য।
বসন্ত কবির মতো রচে তার রম্য কাব্যখানি
নবীন পল্লবে, ফুলে ফুলে। বুঝি আমাকেও শেষে
গিলেছে এ খল-নারী আপাদমস্তক ভালবেসে।

আমি তাই লঘুচালে বন্দিলাম স্বরূপ তাহার,
সহজ অক্ষরবৃত্তে বাঙলার বসন্ত বাহার।

ঈশ্বরপ্রাপ্তি

মাখনলাল রায়

ভগবানের হাত আমাদের মাথা স্পর্শ করে আছে, আমরা কখনও সে-হাত সরিয়ে দিয়ে বিপথগামী হই; আর যারা তা করে না, তারা তাঁর আশীর্বাদ পায়, তাদের ভাল হয়। আমাদের কর্মফল এমনি করে কখনও আমাদের পাঁচতলায়, আবার কখনও গাছতলায় দাঁড় করিয়ে দেয়। আমাদের জীবন নির্মাণাধীন গৃহের মতই– নির্মাণকাজ চলছে নিরন্তর। এ-কাজের আরম্ভ আছে, শেষ কোথাও নেই; মহাশূন্য ফুঁড়ে কতদূর এর বিস্তার, আমরা কেউ তা জানিনে। ভগবানের আশীর্বাদ পেলে তবেই আমাদের গৃহের মঙ্গল হয়; আমরা বিশ্রাম পাই, তখন ঘুম ভাল হয়। এই ঘুম হচ্ছে আরেকটা নতুন দিন আরম্ভ করবার উপায়; আমরা তখন জেগে জেগে স্বপ্ন দেখি। এই স্বপ্ন মানুষকে নতুন করে বাঁচতে শেখায়। এই স্বপ্নের বিস্তার কতদূর, তাও আমরা কেউ জানিনে– আর জানিনে বলেই আবার ফিরে চলে যাই ভগবানের কাছে। কেউ যাই, আবার কেউ যাই না; কেউ পাই, আবার কেউ পাই না। যারা যায়, কেবল তারাই পায়– আর যারা যায় না, তারা জীবনের ঐশ্বর্য হারায়। ঐশ্বর্য হারালে আর কোনও কিছুই অবশিষ্ট থাকে না আমাদের হাতে, ঈশ্বরপ্রাপ্তি আর হয়ে ওঠে না।

রাতুল দেববর্মণের দু'টি কবিতা

ভেঙে যায় মানচিত্র

যে কবিতা একদিন রূপালী ছিল
– জীবনানন্দের বাংলার
কবিতা একদিন ছিল
হিমঋতুর শস্যডগায়
মায়াবী হেমন্তের পড়ন্ত রোদ
সে কবিতা এখন উপোসী
সোহাগিনী বিরহে কাঁদে
– শচীনকর্তার কণ্ঠে

যেখানে চেতনার আইল্যান্ডে
মানবের তরে দাঁড়িয়ে আছেন
– ভুবনডাঙার রবীন্দ্রনাথ
দু'দণ্ড মূর্ছনায় ডুবে যাবেন বলে
যেদিন ত্রিপুরা থেকে মাইহার গেলেন
তিতাসের আলাউদ্দিন
সরোদের বদলে তাঁকে–
বিকলাঙ্গ বেহালা অভিবাদন জানায়

সকল মানবের কবি প্রিয় নজরুল
চেয়েছিলেন লাল-লাল দোপাটি ফুল

ভাঙে মানচিত্র ভেঙে যায় মানুষের আকাশ

অন্ধ চাঁদ

আদানে-মাদানে ঘুরে বাউলা মরদ
নেই রাত নেই দিন অনন্ত নেশায়
ধস্ত পাড় ভাঙে জোয়ারে প্রান্তরে
থিরথির জল যায় উলটো দিশায়
জাগে না শরীরীতরী রবিঠাকুরের গানে
পৃথিবীর বসন্ত-আলো ঘুমায় অশ্রুভেলায়

চারিপাশে আসিয়াছে গোপন আঁধার

সেও কী খোঁজে কিছু মশালে-মাদানে
চর্যার ভেতরে দেখে শুধু জীবন বিলাপ
কাঁদে একা লালনহীন গড়াই-পদ্মা
আমি যে না জানি তোমার সন্ধান

কুষ্টিয়ায় কুঠিবাড়িতে দোলে একা একা চাঁদ
আমরাও অন্ধ বুঝি চাঁদের মত
তুমিও কলঙ্ক নিয়ে জাগো একা জাগো

বিস্ময়

জয়ীতা চ্যাটার্জি

ডাকবে না কেউ আর তোমাকে
এ এক অবাধ নিশ্চয়তা
এ পৃথিবীতে কেউ যদি দেখে তাকে
তোমার দু'চোখ,
কেউ যদি শুনে থাকে তোমার করুণ কথা
কেউ যদি থেকে থাকে এবারের শীতে
এ পৃথিবীতে শীত আসে
কেবল তোমাকে চিনতে
এখানে আবার তুমি আসো
তুমি বসো উঠোনে পাতার ভিড়ে
আমি রাখি তোমাকে যে ঘরে
বা রাখি দেওয়ালে আলো জ্বেলে দিতে
হঠাৎই নিভে যায় হাতের আলো
অসুস্থ পাতার মত তার মন থেকে পড়ে যাই আমি খসে,
শেষবারের মত সে ফিরে তাকাল।

উত্তরণ নামতা

রীপা রায়

ধুলা উড়ানিয়া মাটির টানে মিশে যাচ্ছে পাখির মাত।
কোথাও কিছু জমছে ধ্বনি ফুটবে বলে অষ্টধাত।

ব্যসনবোধির ব্যাপন দিন যাচ্ছে চলে ভালয় ভালয়।
ট্র্যাপিজ ঘেরা কালক্ষেপণ অনুধ্যানে মৃদু লয়।

পুত্র লাভে কুন্তির গান প্রকীর্ণ স্বর কুরঙ্গ লুট।
বালিতটে সাগর লতা লাল কাঁকড়ার জটাজুট।

মুদ্রার খেল নিপাট তাল শাস্ত্রের বোল গুলিয়ে গেল।
সমুদ্র, আকাশ, মাটির ত্রিটান দোহার, গায়েন মাতিয়ে নিল।

নিত্ত বাধন, সিদ্ধ গন্ধি ঘাই দিয়ে যায় ভেদাভেদে।
দুষবো কাকে? প্রাণ আছে যার জীবন শুধু তাকেই বলে?

'ধুতে হবে মুছতে হবে' প্রাণগন্ধি উত্তরণে।
সময় এতো রা কাটে না কণ্ঠাভরণ জনে জনে।

আবার যদি ফিরবে মাটি চোখ-পোড়া বিষ ঢালবে না তো?
আতিশয্যের বাহার ফেরা উৎকীর্ণ শঙ্কা যত।

নামমুদ্রা আছে কিন্তু নামকরণ তোমার গুণে।
চিত্ত সুধা ধুলায় ঢেলে ঘর মস্কো অন্তরণে।

বাবার খড়ম ও মূল্যবোধ

শেলী সেনগুপ্তা

মন্বন্তরের বছর সবকিছুই ফেলে
বাবার খড়মজোড়া নিয়ে এসেছি,
তারপর
দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে
পৌঁছে গেলাম মানুষের মানচিত্রে,
এখনও আমার পায়ে বাবার খড়ম,

বাবা বলেছিল, 'যত্নে রাখিস,
এ আমার পূর্বপুরুষের চিহ্ন,
আমার অহংকার',
অতঃপর
একদিন
আমার পাঁজরে শুরু হল জোনাকির নাচ,

খড়মজোড়া দেখিয়ে ছেলেটিকে বললাম,
'আগলে রাখিস,
পূর্বপুরুষের আশীর্বাদ,
আমার মূল্যবোধ',

খাটের নিচে শুয়ে থাকা খড়ম দেখিয়ে
আমার ছেলে কি এভাবেই বলবে
তার সন্তানকে–
'আগলে রাখিস,
পূর্বপুরুষের আশীর্বাদ,
আমার মূল্যবোধ'...

বিদ্যাসাগর: দ্বিতীয় ঈশ্বর

জ্যোতির্ময় দাশ

এক সময়ে একটু অন্য ধরনের ছিল আমাদের এই
ভারতবর্ষের পরিচিত মানচিত্রের ভূমণ্ডলের বিস্তৃতি
আজও ঘুমের মধ্যে দেখতে পাই মুণ্ডিত মস্তকে
ভিক্ষু অতীশ দীপঙ্কর ত্রিপিটক থেকে শোনাচ্ছেন
সিংহলের মুগ্ধ জনগণকে তথাগতের উপদেশবাণী
অন্যদিকে মানচিত্রের দ্রাঘিমাংশ ছিন্ন করে জেগে ওঠে
ব্রিস্টলে রাজা রামমোহনের জরাজীর্ণ স্তম্ভ
রেঙ্গুনের ছোটো কাঠের বাড়িতে বসে শরৎবাবু লিখছেন
রাজলক্ষ্মী আর শ্রীকান্তের প্রেমের অপার্থিব চিত্রনাট্য–
শান্তাবেনের কাঁধে ভর দিয়ে দ্রুতপায়ে হাঁটছেন গান্ধীজি
ডান্ডির পথে আইন অমান্য করে একমুঠো লবণের জন্য

আর শতাব্দীর ঝাপসা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসছেন
উত্তরীয় কাঁধে এক খর্বকায় অনমনীয় দীপ্ত পুরুষ
তালতলার প্রসিদ্ধ চটিটি একপাশে সরিয়ে রেখে তিনি
পূজাপাঠের নিষ্ঠায় রচনা করছেন খণ্ডে খণ্ডে বর্ণপরিচয়
এক ভয়ঙ্কর অজ্ঞানতার উজান স্রোতের বিরুদ্ধে

আজও ভারতবর্ষের নিরক্ষর জনতার জন্য তিনি দ্বিতীয় ঈশ্বর...

লকডাউন

ঈশিতা ভাদুড়ী

পাঁচশো চার ঘণ্টা লকডাউন এখন। ছন্নছাড়া জীবন আতঙ্কে ভীষণ। দেয়ালে একাকীত্বের ছাপ স্পষ্ট, ফাটা মেঝেতে বিচ্ছিন্নতা পড়ে আছে অসহায়। আর, একা ঘরে সিলিং ফ্যানের শব্দ অকারণ। মাঝে মাঝে ভিডিও কলে বিষণ্ণ চোখ গেঁথে যায় অন্য প্রান্তে।

বিষণ্ণ ও ছন্নছাড়া এই জীবন জানে না পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টার হৃৎস্পন্দ। জানে না কবে নদীর কাছে ফেরা হবে, কবে ভেজা মাটির আলে, কবে ঝিরঝির ঝর্নার জলে কেঁপে উঠবে প্রাণ তিরতির তিরতির। জানে না এইসব।

ততদিন এই আমাদের শীতল দিনলিপি, আমাদের শীতার্ত হাহাকার...

জগতে ধ্বংসযজ্ঞে বৃক্ষদের নিমন্ত্রণ!

রনি অধিকারী

কথা ছিল রাধাচূড়ো নদীর কিনারে একদিন ফিরে যাব একদিন বটবৃক্ষ ছায়াতলে জড় হব। আর বাউলেরা তাদের মায়াবী হাতে, আঙুলের টোকায় আনন্দে ঢেউ তুলবে একতারায়। কাঁঠালচাঁপার ঘ্রাণে ঘুম ভাঙে... বটের শেকড়ে শত শত নৌকো বাঁধা। দেখি, জল ছুঁয়ে কাদামাখা অজস্র পা হেঁটে যায় যেখানে বটের শেকড়েই সবকিছু একসূত্রে গাঁথা ছিল। তখন রাধাচূড়োর নিচে রোদ-বৃষ্টি একসঙ্গে খেলা করত, প্রতিনিয়ত। আজ রাধাচূড়ো নদী একাকিত্বে কাতরায় বুঝি! ক্রমাগত বটের শেকড় আর আমাদের শেকড় বিলীন হয়ে যায় হাওয়ায়। তথাপি জগতে ধ্বংসযজ্ঞে বৃক্ষদের নিমন্ত্রণ!

স্পর্শ-সুখ

শুভঙ্কর সাহা

তোমাকে হাত বাড়িয়ে ছুঁতে ইচ্ছে করছে ।
বিশ্বাস জুড়ে জুড়ে ছুঁতে চাইছি
রোম রোম নরম হাতের আঙুল

এ জেলখানায় খোলা আছে দরজা জানালা
প্রহরী-বিহীন ...
আলো-বাতাস আসে অহরহ
কিন্তু মানুষী কণ্ঠস্বর নেই, ভালোবাসা নেই
ভালবাসতে ভুলে যাচ্ছি নিজেকেও

তোমাকে হাত বাড়িয়ে ছুঁতে ইচ্ছে করছে খুউব...

হে অপাপবিদ্ধ শিশু

জ্যোতির্ময় সেন

রিরংসু লম্পট ঘোরে লালসার শ্যেন-দৃষ্টি নিয়ে,
তুমিও হে শিশুকন্যা, বিপন্মুক্ত নও কোনওভাবে।
কখন যে তোমাকেও হায়েনারা হিংস্র থাবা দিয়ে
আদিম উল্লাসে মেতে ধরে নিয়ে হাড়-মজ্জা খাবে–
বোঝার আগেই তুমি হারাবে তোমার শ্রেষ্ঠধন।
ধর্ষকেরা নরপশু, লাজ-লজ্জাহীন সারমেয়
নিজের মা-বোন-মেয়ে-ছাত্রী-বউ তারাও এখন
ওদের নিকটে আর নিরাপদে থাকে না মোটেও।

প্রতিবাদী ভাষা মূক, 'কাল' যেন নীরব দর্শক,
পার পেয়ে যায় তাই প্রতিবার ঘৃণিত ধর্ষক।
হে অপাপবিদ্ধ শিশু, আমাদের এই অক্ষমতা,
পারো যদি ক্ষমা করো; জাগাও ঘুমন্ত মানবতা।
ঘৃণার আগুন জ্বেলে পোড়াও বর্বর অত্যাচার,
রৌরবে জ্বলুক ওরা কামাতুর নর-কুলাঙ্গার।

বিমল গুহর দু'টি কবিতা

টোকা

আমি যেন অবিচল ধারাপাত নামতার খাতা
পড়ে খোয়াড়ে একাকী
তাকাতে পারি না আর বিহঙ্গের দিকে– দূরে,
বিহঙ্গও নই যে
বড় হব নিজের ভেতর এই আপন আকাশে!
আমার আকাশ কই
পাখিদের মত মুক্ত নীলাকাশ,
দেখি– চতুর বন্ধন চারিদিকে!

পৃথিবী দেখার মত আলো কই?
আঁধার প্রকোষ্ঠ সবখানে
আমি মনুষ্যকুলের জ্ঞাতিভাই
বড় হতে গিয়ে আজ কেবলই ক্ষুদ্রতর জীব
যেন জড় পদার্থের রূপে দণ্ডায়মান
আশেপাশে কেউ কি এখন দাঁড়াবে সাহসে
টোকা দিয়ে জাগাতে বিবেক?

ঘৃণার পঙ্‌ক্তিমালা

১.
তুমি যা হারালে আজ হীন স্বার্থে– হে মানুষ দেখ
তা তোমার জীবনসঞ্চয়,
বদলে যা পেলে আজ– ভেবেছো কি আগে
কখনো তা এর তুল্য নয়!

২.
ধর্মের বাহানায় হিংসার লোলুপ জিহ্বা মেলে ধরে যারা
তাদের চিন্তাগুলো কদাকার– ভুল,
তারা নরাদম, তারা পশু সমতুল।

৩.
মানুষ কি পশু হয়– কেনো দেখি পাশব আচার!
বেদনায় ভাঙে বুক যখন তা ভাবি
কি করে দেখাই আমি আমার ক্রন্দন?
আমি তো দেখতে চাই আলোর মিছিল
হাতে-হাত মানববন্ধন
আমি তো দেখতে চাই শ্বেত-শুভ্র মেঘ।

তাই আজ ঘৃণা করি, ঘৃণা করি যৌন নিপীড়ন!

যোজনকথা
নমিতা চৌধুরী

পুরুষ কি আগুনের ধর্ম জানে
নারীর মতন
কোন আঁচে পরমান্ন গয়ে ওঠে
কোন আঁচে সুসিদ্ধ তুণ্ডুল
কোন আঁচে নাভিমূল পুড়ে যায়
কিশোরী যেমন জানে
কিশোর জানে কি!

চাওয়া-পাওয়া
মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায়

একজন সাড়ে তিনহাত মানুষের
দশহাত ঘর চাই, বিশহাত বাগান
ত্রিশ-বত্রিশ হাত আয়, আর
একশো চল্লিশ হাত উপ-আয়!
আর তার উচ্চাশা? মাপজোক নেই,
নিতান্ত যে করনিক, সে-ও চায়
সাপলুডো খেলার নিয়মে
একদিন হবেই সে সম্রাট আমেনহোটেপ!

এই সব চাওয়া তার, অন্যদিকে সেখানে মৃত্যু এসে
সেই মহা-উচ্চাকাঙ্ক্ষী মহোদয়োশ্রীকে
ধপাস ও শূন্যচারী করে অজানা ঘাতক।

ঘুমপুকুরে
দিলীপ কির্ত্তুনিয়া

ঘুমপুকুরে ডুব দিয়েছি সারা রাত।
ঘুমের জলের বাড়ি– আর ধরেছি স্বপ্ন মাছ।
দেখলাম, সে এসে বসেছে পাশে– গভীর স্বপ্নের মাঝে।
ঘুম ভেঙে দেখি সে নেই– কিন্তু তার ঘ্রাণ ভেসে আসে।
ঘুমের মধ্যে ছিলাম– এই কী জীবন– এর কোন আছে দাম!
বাস্তবের ঘটনাও একদিন স্বপ্নের মত ছায়া ছায়া।
আমরা যা করছি– একদিন সবই অতীত– একদিন স্বপ্ন সবই।
এই জীবন হারিয়ে গেলে আমি অন্যদের কাছে স্বপ্নের মতই।
কাকে বলি স্বপ্ন তাই– কাকে বলি জীবন সত্য এই!

শূন্যতা
কস্তুরী চট্টোপাধ্যায়

মনে করো তুমি সেই মেয়ে
এই অমর্ষ পৃথিবীতে তুমি একা সেই মেয়ে
এতোদিন যা ছিল আমার জল বায়ু অংশ
যা ছিল আমার নিরাপদ শ্বাস নদী পাহাড় অরন্য
সে সব এখন পুড়ছে অগ্নি ক্রমে শিকড়ে শিকড়ে
যা কিছু ছিল অতীতবাস
যা কিছু ছিল গচ্ছিত প্রত্যয়
যা কিছু ছিল প্রতিসারী সঞ্চয়
পুড়ছে ক্রমান্বয়ে একে একে
এখন অনাবৃত অগ্নিশিখায় মেয়ে তুমি একা
স্নান করো অনাবিল ক্রোধে রোজ শতবার
হেঁটে যাও একা বিপরীতগামী বাতাসে
কোন এক সীমান্তরেখা পেরিয়ে প্রগাঢ় ঘৃণায়

২.
এ শহর তোমার কথা বলে
এ শহর তোমাকে খোঁজে রাত্রি শেষ হলে
আসলে যা থাকে তা রয়ে যায় বিন্দু হয়ে
শহর ভাসে নদী হয়ে তোমার কথা ভেবে
এ শহর তোমাকে খোঁজে পথে প্রান্তরে বসে

৩.
কিছুটা শূন্যতাই না হয় থাক
এর ভিতরেই কয়েক বিন্দু জল
ওধারে ভরাট নদীর বুক ভাসছে
আঙুলে আঙুলে নামছে গভীর প্রণয়
তবু এসো কিছুটা শূন্যতাই জড়িয়ে রাখি

৪.
রাতটুকুর নিকষ কালো শূন্য অন্ধকার
নিলাম আমার আকাশে অদম্য বিলাসীসুখে
তোকে দিলাম হিমে ভেজা সজনে ফুলের রাশি
বদলে নিলাম আমাদের অশ্বমেধের ঘোড়া
একটি দুটি করে চৌকাঠ পেরোয় দ্বিতীয়বাস এভাবে
যতোক্ষণ না দু পার ভাসিয়ে প্লাবন আসে আবার
সেদিন ফিরিয়ে দেবো তোর নদী শহর অরণ্য
সেদিন ফিরিয়ে দেবো তোর ছন্নছাড়া গলিপথ

প্রবন্ধ

বাঙালির দুর্গোৎসব তার বহুমুখী তাৎপর্য

যতীন সরকার

আমরা জানি ষোড়শ শতাব্দীতে তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ মহা-আড়ম্বরে সঙ্গে শরৎকালে দুর্গাপূজা করেছিলেন, সে-পূজা শুধু পূজা থাকেনি, হয়ে গিয়েছিল এক মহা-উৎসব– দুর্গোৎসব। সে-দুর্গোৎসবে রাজা ব্যয় করেছিলেন তখনকার। দিনের সাড়ে আট লক্ষ টাকা। সেই থেকেই বাংলার হিন্দুদের মধ্যে শারদীয়া দুর্গাপূজা বা দুর্গোৎসবের প্রচলন। আমাদের এই জানাটা হয়তো ভুল নয়। অন্তত লিখিত ইতিহাস তো এ-রকমই বলে। কিন্তু ইতিহাসেরও তো থাকে প্রাক্-ইতিহাস। সেই প্রাক্-ইতিহাসের সন্ধান না নিলে সঠিক ইতিহাসটি বোঝা যায় না। সে-কারণেই বাঙালির দুর্গাপূজার উৎস সন্ধানে ষোড়শ শতাব্দীর আরও অনেক আগের কালে চলে যেতে হবে আমাদের।

প্রাচীনকালের মাতৃপূজারই তো বিবর্তন এ-কালের বাঙালির দুর্গাপূজা। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত প্রাগৈতিহাসিক যুগের পোড়ামাটির স্ত্রীমূর্তিগুলোই মাতৃপূজা তথা দেবীপূজার সুপ্রাচীন নিদর্শন বহন করে বলে পণ্ডিতগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের একটি সিংহবাহিনি মূর্তি ক্রীট দ্বীপ থেকে আবিষ্কার করেছিলেন প্রত্নতত্ত্ববিদ ডক্টর ইভান্স। এ ছাড়া ২৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নির্মিত একটি মাতৃমূর্তি পাওয়া গেছে এশিয়া মাইনরের 'ইয়াসিলি' গিরিমন্দিরে এবং ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের অপর একটি মাতৃমূর্তির সন্ধান মিলেছে কার্থেজে। বাংলার অনার্য আদিবাসীরাই প্রথমে মাতৃপূজা করত। মুচি বা হাঁড়ির মত তথাকথিত নিচুজাতের মানুষরাই এককালে শক্তি উপাসক ছিল। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন– 'দুর্গাকে কখনও 'হাঁড়ির মেয়ে' বলা হয়, হাঁড়ির বাড়িতে বাদ্য না বাজিলে দুর্গাপূজা কোনও কোনও স্থানে আরম্ভই হইত না, এরূপ জনশ্রুত আছে। 'হাঁড়িকাঠ' শব্দ দ্বারা শুধু 'হাঁড়িদের সহিত এই পূজার সম্বন্ধ সূচিত হয় নাই, পশুবলি ব্যাপারগুলি যে এই শ্রেণির লোকেরাই করিতেন তাহা অনুমান করা যায়। এখনও কোন স্থানের কালীর মন্দিরে হাড়িরাই পূজার পাণ্ডা। দিনাজপুরের কোনও কোনও স্থানে এরূপ পৌরোহিত্যের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।' বৃহৎবঙ্গ-কলিকাতা ১৯৯৩) পৃষ্ঠা ৯৭৩]

আর্যরা প্রথমে এই মাতৃপূজাকে স্বীকৃতি না দিলেও আস্তে আস্তে তা বণিক সমাজের মধ্যে প্রচলিত হয়ে পড়ে। ১৯৩১ সনের ১৮ অক্টোবর *Advance* পত্রিকায় ডাক্তার আর এন সাহা লিখেছিলেন– 'বাঙালি বণিকেরা অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডী দুর্গার পূজা শ্যাম, কম্বোজ, চীন, কোরিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপসমূহ, সুমাত্রা, জাভা, বালী বোর্নিও, সেলিবেস এবং ফিলিপাইন দ্বীপসমূহে লইয়া যান। এই সকল স্থানে আদিম বঙ্গীয় বর্ণমালার আঠারটি অক্ষর (ব্যঞ্জনবর্ণ) মাত্র প্রচলিত। ১৮ মহাপুরাণ, ১৮ উপপুরাণ ও মহাভারতের ১৮ পর্ব, বাঙ্গলার ১৮টি বীজ-অক্ষরের মহিমা জ্ঞাপক।' ['বৃহৎবঙ্গ' পৃষ্ঠা ৯৭২]।

অনেক সংঘাত ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে যদিও অনার্য-সেবিত দুর্গা দেবী আর্য সমাজে প্রবিষ্ট হয়ে যান, এবং প্রাকৃত দুর্গার সংস্কৃত রূপ মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তা ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের অন্তর্গত হয়ে যায় যদিও, এমন কি বেদের দেবীসূক্ত পর্যন্ত যদিও দুর্গার ঐতিহ্যকে খুঁজে নেয়া যায়, তবু কিন্তু বাংলার বৈষ্ণবরা দেবী তথা শক্তিপূজার প্রতি প্রসন্নতা দেখাননি। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রচলিত দেবীপূজা ও পূজাসংক্রান্ত গীতগুলোর প্রতি বৈষ্ণব আচার্য বৃন্দাবন দাস একান্ত বিরূপতাই প্রদর্শন করেছেন। কোনও এক ব্রাহ্মণ নাকি শ্রীবাসের বাড়ির দরজায় 'বিল্বপত্র ও সিন্দুর-মাখা চণ্ডীর আশীর্বাদী সামগ্রী' রেখে গিয়েছিলেন, আর তার জন্য বৈষ্ণবসমাজ একেবারে ক্রোধে ফেটে পড়েছিল। এই মহাঅপরাধের (?) জন্য নাকি সেই ব্রাহ্মণ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। যদিও স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের মধ্যে বিন্দুমাত্র দেবী-বিদ্বেষ ছিল না, এবং দাক্ষিণাত্যে তিনি অষ্টভুজার মন্দির দর্শন করে দেবীকে ভক্তিভরে প্রণাম করেছিলেন, তবু এককালে চৈতন্যশিষ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কারো কারো মধ্যে দেবী-বিদ্বেষ একেবারে হাস্যকরতার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে। তাঁরা মুখে 'কালী'র নাম উচ্চারণ করতেন না বলে লেখার কালিকেও বলতেন 'সেহাই' এবং কালী পূজায় ব্যবহৃত হত বলে জবাফুলকে বলতেন 'ওড়ফুল' আর বিল্বপত্রকে 'অর্কপাতা'।

যাই হোক, এগুলো সব একান্ত সাময়িক ও সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক পাগলামির নিদর্শনমাত্র। বাঙালি হিন্দু সমাজে ধর্মীয় সমন্বয়ের ঝোঁকটিই প্রবল। অহিন্দু পীরের পূজা পর্যন্ত যে-সমাজে বহুল প্রচলিত হয়ে পড়ে, সে-সমাজে দেবীপূজার প্রসার রোধ করা তো অসম্ভব। তাই, উপসম্প্রদায় নির্বিশেষে বাঙালি হিন্দু দেবী-পূজক। মনসা, চণ্ডী, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী–এরকম নানা নামে ও রূপে দেবী পূজার অনুষ্ঠান হয় ঘরে ঘরে।

তবে যে-সমাজে ধনবৈষম্য অত্যন্ত প্রকট, সে-সমাজে পূজা বা পূজাসংশ্লিষ্ট উৎসবেও সেই বৈষম্যের প্রকাশ না ঘটে পারে না। ঐশ্বর্যশালীরা ঐশ্বর্যের প্রদর্শনী করবেই, সে-প্রদর্শনীতেই তাদের অহমিকা তৃপ্তি পায়। রাজা কংসনারায়ণ সে-অহমিকা তৃপ্তির জন্য দুর্গোৎসবের যে-পথ বেছে নিয়েছিলেন ষোড়শ শতাব্দীতে, পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে রাজা-মহারাজা ও হঠাৎ নবাবরা সে-পথেরই অনুসরণ করতে থাকেন। আঠারো শতকের প্রথমদিকে নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং সে-দশকের দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতায় নবকৃষ্ণ ষোড়ক শতকের কংসনারায়ণের ঐতিহ্যকেই আরও বেশি জেল্লাদার করে অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এ বিষয়ে একালের একজন গবেষক লিখেছেন–

'প্রাথমিকভাবে সনাতনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের উপায় হলেও দুর্গাপূজা হয়ে উঠেছিল সামাজিক প্রতিপত্তি, ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য দেখাবার উপায়। এই ধারার লালনে ও প্রশ্রয়ে দুর্গাপূজা ক্রমে বাঙালির প্রধানতম ধর্মীয় উৎসব হয়ে ওঠে।...

আলিবর্দি খাঁ, সিরাজউদ্দৌলার সমকালিক চুরাশিটি পরগনার অধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নবাব দরবারে রীতিমত রাজস্ব দিয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিলেন। তাঁর কৃষ্ণনগরের রাজদরবারে নৃত্যগীত কাব্যচর্চাপ্রিয়তা, পণ্ডিত সভা ও পণ্ডিতপোষণ, পালাপার্বণ উয্‌দাপনের আড়ম্বর এবং বিলাসব্যসনের যে-নিরিখ কৃষ্ণচন্দ্র তৈরি করেছিলেন, তা বাঙালি ধনপতিদের নিকট হয়ে উঠেছিল অনুকরণযোগ্য। কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন কুলরক্ষক সমাজপতি।... ধর্মরক্ষক কৃষ্ণচন্দ্র আড়ম্বর সহকারে পূজাপার্বণ পালন করতেন। তিনিই আঠারো শতকের মাঝামাঝি তাঁর বাড়ির দুর্গাপূজায় আমোদ-প্রমোদের অঙ্গ হিসেবে তয়ফাওয়ালি বা বাইনাচের প্রবর্তন করেন।

সতেরোশ আশি শকাব্দ, মাঘ, আঠারোশ আটান্নর বিবিধার্থসংগ্রহ পত্রিকায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখেছিলেন, সুচতুর, পণ্ডিত, গুণিজনের পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণচন্দ্রের গুণ গরিমা 'লাম্পট্যদোষে' কলুষিত হয়েছিল। ভাঁড়ামো যাত্রা, খেউড়, কবিগানের 'অশ্লীল বিনোদ' তিনিই প্রবর্তন করেছিলেন। কলিকাতার সুবিখ্যাত রাজা নবকৃষ্ণ ও তৎপর ক'একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ঐ কদর্য বিনোদের উৎসাহী' হয়েছিলেন। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় তাঁর আত্মচরিতে লিখেছিলেন, বর্গির উৎপাত থেকে রক্ষা পেতে কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণনগরের অদূরে গোয়াড়িতে রাজধানী পত্তন করেন। 'লোকে পূজার রাত্রিতে যেমন প্রতিমা দর্শন করিয়া বেড়াইতেন', গোয়াড়ি, কৃষ্ণনাগরিকেরা 'বিজয়ার রাত্রিতে তেমনি বেশ্যা দেখিয়া বেড়াইতেন' এবং পর্বোপলক্ষে বেশ্যালয়ে লোকের স্থান হয়ে উঠত না।

কৃষ্ণচন্দ্রের পূজার গরিমা, ধুমধাম ও তয়ফাওয়ালি নাচের ধারা নবকৃষ্ণ কলকাতায় এনেছিলেন আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে।' [শোভন সোম–সাপ্তাহিক *দেশ* কলিকাতা, ৭ অক্টোবর ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৩৫]।

'ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়'– তীক্ষ্ণধী রসজ্ঞ প্রমথ চৌধুরীর এ-মন্তব্যটি বোধহয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই বেশি করে প্রযোজ্য। সমাজের উঁচুতলার লোকেরা যা যা করে, তার মধ্য থেকে তাদের অসুস্থ আচরণগুলোই নীচুতলার লোকদের বেশি বেশি আকৃষ্ট করে। বড়লোকদের অনুকরণ করেই 'ছোটলোক'রা জাতে উঠতে চায়। কলকাতার ধনাঢ্য ব্যক্তিদের রাজসিক দুর্গাপূজার ব্যাধি শহর-গ্রামের

নিম্ন মধ্যবিত্তদের মধ্যেও দ্রুত সংক্রামিত হয়ে যায়। তাদের কারুর একার কলকাতার বাবুদের মত এ-রকম বৃহৎ আয়োজন করার সঙ্গতি ছিল না বলেই তারা সংঘবদ্ধতার শরণ নেয়। প্রচলন ঘটে 'বারোয়ারি' পূজার। বারো ইয়ারে (বন্ধুতে) মিলে অথবা 'বারো' জনের (অর্থাৎ অনেকের) চাঁদা নিয়ে এ-অনুষ্ঠান চলে বলেই তার নাম 'বারোয়ারি'। কলকাতার বাবুরা ব্যক্তিগত ধনৈশ্বর্যের বলে যে-সব অনাচার করে আপন আপন চিত্তবিনোদন করতেন, সে-গুলো সবই বারোয়ারিতে আরও উৎকট রকমে অনুকৃত হতে থাকে। উপরওলার ক্লেদাক্ত বিনোদনের প্রবাহ এসে নিচের তলাকেও প্লাবিত করে দেয়।

দুই.

কিন্তু, এই সব নয়। ক্লেদাক্ত বিনোদনই বাঙালির দুর্গোৎসবকে, সর্বাংশে আবিল করে ফেলতে পারেনি, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এ-উৎসবকে অবলম্বন করে নানাভাবে তাদের চিত্তোৎকর্ষেরই উপায় অন্বেষণ করেছে। রাজসিক দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান করার সঙ্গতি যেমন সকলের নেই, তেমনি তেমনটি করার প্রবৃত্তিও নেই। বাঙালি দুর্গোৎসবের মধ্যে পারিবারিক মিলন উৎসবকে উপভোগ করতে চেয়েছে, এবং অনিবার্য কারণেই সে-মিলনমেলা ভেঙে যাওয়ার জন্য অশ্রুবিসর্জনও করেছে। পূজামণ্ডপে ঢাকঢোল বাজে; শিশুরা আনন্দ-কোলাহলে মাতে; পুরোহিত দশভুজা দেবীর কাছে যজমানের জন্য ধন, রূপ ও মনোরমা স্ত্রী লাভের প্রার্থনা জানান। চণ্ডীপাঠক মহিষাসুর মর্দিনী দেবীর শক্তি মহিমা উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করেন। কিন্তু সাধারণ বাঙালি দুর্গাকে শক্তিময়ী ও ঐশ্বর্যময়ী দেবী বলে জেনেই তৃপ্তি পায় না, তারা তাকে একান্ত আপনার করে ঘরের মেয়ে রূপে পেতে চায়। বাঙালি মা হয়ে যান জননী মেনকা, দুর্গা তাঁর আদরের কন্যা গৌরী বা উমা। মেয়ের বিয়ে দিতেই হয়। কিন্তু বিয়ে দিয়েই স্বস্তি মেলে না মেয়ের মা-বাবার। শ্বশুরবাড়িতে নানা দুঃখ ও গঞ্জনা গাইতে হয় মেয়েকে। তার উপর মেয়ের বরটি যদি হয় অপদার্থ, দরিদ্র ও নেশাখোর, তবে তো কথাই নেই। প্রতিকারহীন দুঃখে মেয়ের মাকে সারা বছর ধরে চোখের জল ফেলতে হয়। অনেক সাধ্যসাধনা করে যদি বা বছরে একবার মেয়েকে বাপের বাড়িতে আনা যায়, তিন দিন যেতে-না-যেতেই তাকে শ্বশুর ঘরে ফিরে যেতে হয়। মিলনের সুখ চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতেই বিচ্ছেদের দুঃখে পরিণতি পায়। বাঙালির তিন দিনের দুর্গোৎসব এই মিলন-বিচ্ছেদেরই সাংবাৎসরিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে অজস্র আগমনী বিজয়ার গান। পৌত্তলিকতাবিরোধী ব্রাহ্ম পরিবারে জন্ম যে-রবীন্দ্রনাথের, তিনিও এই পৌত্তলিক উৎসবকেন্দ্রিক আগমনী বিজয়ার গানের সৌন্দর্য ও কারুণ্যে মুগ্ধ। সম্ভবত কবিগানের আসরেই আগমনী গানগুলোর প্রাথমিক বিকাশ ঘটেছিল। কিন্তু ক্রমে কবিগানের 'আগমনী' অঙ্গের গানগুলো কবির আসর ছেড়ে বাংলার সাধারণ লোকসংগীতে পরিণত হয়েছে। একসময় রবীন্দ্রনাথও আগমনী গানের সক্রিয় অনুরাগী হয়ে ওঠেন। তার 'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধে এ গানকে তিনি বাংলার মাতৃহৃদয়ের গান রূপে শনাক্ত করেন। কবিয়াল রাম বসু ছিলেন বাংলা আগমনী গানের অন্যতম প্রধান রচয়িতা। তার একটি বিখ্যাত আগমনী গান 'তবে নাকি উমার তত্ত্ব করেছিলে। এ-গানেরই এক স্থানে উমা বা তারার মা মেনকার জবানীতে বলা হয়েছে–

তারা হারা হয়ে
নয়নের তারা হারা হয়ে রই
সদা কই উমা কই উমা কই
আমার প্রাণ-উমা কই।

এই ভাবটিই পাঁচালীকার দাশরথী রায়ের গানে রূপ নিয়েছে–

নন্দি! গিরিনন্দিনী ত্রিলোকের নয়ন তারা
তারা হারা হয়ে আমি হয়ে আছি তারা হারা।

রবীন্দ্রনাথের *প্রায়শ্চিত্ত* নাটকের একটি গান রাম বসু ও দাশরথী রায়ের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকার বহন করে হয়ে উঠেছে–

সারা বরষ দেখিনে মা
মা তুই আমার কেমন ধারা
নয়ন তারা হারিয়ে আমার
বন্ধ হল নয়ন তারা।
এলি কি পাষাণী ওরে।
দেখব তোরে আঁখি ভরে,
কিছুতেই থামে না যে মা
পোড়া এই নয়নের ধারা।

সারা বছর ধরে কন্যাকে দেখার জন্যে আকুলি ব্যাকুলি করেছেন মা মেনকা। অনেক বলে কয়ে আশ্বিন মাসে মেয়েকে কোলে পেয়ে মায়ের বাৎসল্য একেবারে কূল ছাপিয়ে যায়। 'পুনঃ কোলে বসাইয়ে চারুমুখ নিরখিয়ে চুম্ব অরুণ অধরে।'

কিন্তু ঘরের মেয়ে হয়ে এলেও উমা যে মহিষ মর্দিনী দশভুজা দুর্গা কিংবা রণরঙ্গিনী কালী করালবদনী– পুরোহিতরা তো সেকথা ভুলতে দেয় না। বাঙালি কবিও তাই কখনও কখনও উমাকে দশভুজা দুর্গা বা চতুর্ভুজা কালী রূপে মা মেনকার সামনে হাজির করেন। মা তেমন রূপে মেয়েকে দেখতে রাজি নন কিছুতেই। এ-রকম রূপ দেখে ভয়ে তিনি পিছিয়ে যান,

গিরি, কার কণ্ঠহার আনিলে গিরিপুরে।
এত সে উমা নয়–ভয়ংকরী হে দশভুজা মেয়ে॥

কিংবা,

কৈ হে গিরি কৈ সে আমার প্রাণের উমা নন্দিনী।
সঙ্গে তব অঙ্গনে কে এলো রণরঙ্গিনী।

শাস্ত্রোক্ত ষড়ৈশ্বর্যশালিনী দুর্গা-দুর্গতিনাশিনীর বদলে শান্ত শ্রীময়ী কন্যাকে চান বলেই বাঙালি মা হিমালয়-জায়া মেনকার মুখ দিয়ে প্রতিবাদ জানান,

হায় আমার সেই বিমলা অতি শান্তশীলা
রণবেশে কেন আসবে ঘরে।
... ...
হায় হেন রণবেশে এলো এলোকেশে
এ নারীরে কেবা চিনতে পারে॥

মায়ের সে-প্রতিবাদে দুর্গা নিমিষেই তাঁর রূপ বদলে ফেলে একান্ত সাধারণী মানবী কন্যা হয়ে যান, আর মা তখন বিমলানন্দে সকলকে ডেকে বলেন–

দেখে যা গো নগরবাসী।
অঙ্গনে উদয় আমার উমা অকলঙ্ক শশী

কিন্তু এ অকলঙ্ক শশীকে বেশিক্ষণ ধরে রাখা যায় না, আগমনীর আনন্দ ক্ষণপ্রভার মতই মিলিয়ে যায়, নেমে আসে বিজয়ার বিষাদ। তিনদিন পরই বাঙালির চণ্ডীমণ্ডপ তথা ঘর-সংসার বিচ্ছেদের অন্ধকারে ডুবে যায়। 'নবমী নিশি যেয়ো না' বলে মা যতই আকুতি

প্রকাশ করুক, দশমীর আগমন তো অবশ্যম্ভাবীই। আর দশমীর প্রভাতেই জামাই সদলবলে চলে আসে, মা বুঝতে পারেন– 'ঐ দ্বারে বাজে ডম্বরু হর বুঝি নিতে এলো'। মায়ের নাড়িছেঁড়া ধন কন্যাকে নিয়ে জামাই চলে যায়, শূন্যঘরে মায়ের অন্তর হাহাকার করে ওঠে। এই হাহাকারই ভাষারূপ পায় বিজয়ার গানে। আগমনী গানের ক্ষণিক প্রসন্নতা বিজয়ার গানের দীর্ঘস্থায়ী বিষণ্নতার। মধ্যে মিশে যায়। এ প্রসন্নতা বিষণ্নতা তো কেবল মেনকা কিংবা বাঙালি জননীর নয়, সমস্ত বাঙালির আনন্দ-বেদনারই ধারক দুর্গোৎসব কেন্দ্রিক আগমনী বিজয়ার গান। বিজয়া বাঙালি প্রাকৃতজনের জন্য বিজয়ের স্মারক নয়, নিত্যকার জীবনযুদ্ধে পৌনঃপুনিক পরাজয়ের কথাই তা স্মরণ করিয়ে দেয়। তবু বাঙালি পরাজয়কেই চূড়ান্ত বলে মেনে নেয় না, বিজয়ায় প্রিয়জনের মিলনমেলায় কোলাকুলি করে আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা নেয়, সারা বছরের জীবনযুদ্ধের আত্মিক আয়ুধ সংগ্রহ করে। দুর্গোৎসব এমন করেই ধর্মীয় প্রচ্ছদের আধারে সেক্যুলার মর্মবস্তুর ধারক হয়ে ওঠে। সমাজের ওপরতলার মানুষের জন্য দুর্গোৎসব যতই হোক না কেন 'প্রতিপত্তি, ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য দেখাবার উপায়, বৃহত্তর সমাজে-এর তাৎপর্য অন্যরকম। মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত বা বিত্তহীন মানুষ এ উৎসবের মধ্য দিয়ে মানবীয় স্বাদে চিত্তকে প্রসন্ন করে তুলতে চায়, সকল বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ককে সত্য ও জীবন্ত করে তোলার প্রয়াস পায়। তথাকথিত বড়লোকদের অহমিকা যেমন তৃপ্তি পায় রাজসিক দুর্গোৎসবে, তেমনি এর সাত্ত্বিক রূপের অভিব্যক্তি এ-উৎসবকে ঘিরে একান্ত সাধারণ মানুষদের ভাবনায় ও আচরণে। বাংলার অনার্য অধিবাসীদের মাতৃ পূজার বিবর্তন ঘটেছে নানা দিক থেকে নানা মাত্রায়। কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভাষ্যমতে রামচন্দ্রের অকালবোধনই বাঙালির শারদীয়া দুর্গাপূজার পৌরাণিক উৎস। আবার নানান ধরনের শাক্ত-পুরাণে বর্ণিত হয়েছে দক্ষ প্রজাপতির কন্যা সতীর সঙ্গে মহাদেবের বিবাহের কথা, সতীর দেহত্যাগ ও হিমালয়ের ঘরে তাঁর উমা পার্বতীরূপে পুনর্জন্মের কথা, শিবের সঙ্গে তাঁর বিবাহ ও দুজনের দাম্পত্য জীবনের নানা কথা। এ-সব কথাই বাংলার লোককবিদের কল্পনাকে নানাভাবে উদ্রিক্ত করেছে, এবং সেসব কবিকল্পনার অনেক কিছুই বাঙালির দুর্গোৎসবের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে এটিকে লোকোৎসবে পরিণত করে ফেলেছে। অন্যদিকে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতরা এর ধ্রুপদী ও শাস্ত্রীয় ঠাট বজায় রাখার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীমাহাত্মের সঙ্গে যদিও বাঙালির দুর্গা কল্পনার প্রায় কোনওই মিল নেই, তবু দুর্গাপূজায় চণ্ডীপাঠকে অপরিহার্য করে তোলা হয়েছে। পুত্রকন্যার সঙ্গে অসুরনাশিনী দুর্গামূর্তির পাশে যে কলাবৌটির অবস্থান, তার উপাদানগুলোকে বিশ্লেষণ করলে তো স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে, দুর্গাপূজা আসলে কৃষি উৎসব ছাড়া আর কিছুই নয়। এ-রকমই বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্য-সমন্বিত বহুমাত্রিকতাকে ধারণ করে আছে বাঙালির দুর্গোৎসব।

তিন.

দুর্গোৎসবে আধুনিক মাত্রা ও তাৎপর্যও যুক্ত হয়েছে অনেক। সে-সবের স্বরূপ। সন্ধানের জন্য উদ্যোগী পর্যবেক্ষকদের এগিয়ে আসা উচিত। বিশেষ করে বিগত পঞ্চাশ বছরে বাঙালির সমাজজীবনের ভাঙ্গা-গড়ার সঙ্গে তাল রেখে দুর্গোৎসবের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে ও এর বহিরঙ্গীয় বিন্যাসে কত যে চমকপ্রদ পরিবর্তন ঘটেছে, এবং এ-সবের সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য যে কত গভীর– তা নিয়ে তেমন কোনও পর্যালোচনাই এ-পর্যন্ত হয়নি। অথচ, সে রকম পর্যালোচনার প্রয়োজনকে কোনওমতেই অস্বীকার করা যায় না।

আমরা অবশ্যি এখানে সে-পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি না, শুধু বিষয়টির প্রতি এ-যুগের মেধাবী তরুণদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তবে দুর্গোৎসবের প্রসঙ্গ সূত্রে আমরা মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল– বাংলার এই তিন দিক্‌পাল কবির ভাবনার কথা স্মরণ করতে চাই। ধর্মসাম্প্রদায়িক বিচারে এঁরা কেউই 'হিন্দু' নন। একজন খ্রিস্টান, একজন ব্রাহ্ম ও আরেকজন মুসলমান। এঁদের এই 'অহিন্দু' পরিচয়ে অনেক সাম্প্রদায়িকতাবাদী সাহিত্য-সমালোচক খুবই আনন্দিত হয়েছেন। যেমন– প্রয়াত কবি গোলাম মোস্তফা। ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির 'হিন্দু ও 'অহিন্দু' রূপসন্ধানের অপপ্রয়াসে তার মধ্যে এক ধরনের মানস প্রতিবন্ধের সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। সেই প্রতিবন্ধ থেকেই তিনি প্রমাণ করার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন যে, বাংলাভাষার সৃষ্টিতে 'হিন্দু'দের কোনও অবদান তো নেই-ই, আর আধুনিক বাংলা সাহিত্যও তৈরি হয়েছে 'খ্রিস্টান' মাইকেল, 'ব্রাহ্ম' রবীন্দ্রনাথ ও 'মুসলমান' নজরুলের হাতে। এ-রকম সাম্প্রদায়িক মানস প্রতিবন্ধ এখনো অনেকের মধ্য থেকে দূর হয়নি। এখন তো বরং ভারত ও বাংলাদেশে ধর্মীয় মৌলবাদের প্রাদুর্ভাবে সংস্কৃতির সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা অনেক বেশি জোরদার হয়ে উঠছে। এ-রকম এক কালো পটভূমিতে আমরা যখন বাঙালি সংস্কৃতির অঙ্গরূপে দুর্গোৎসবের বহুমুখী তাৎপর্য সন্ধানে নিরত হয়েছি, তখন গোলাম মোস্তফা কথিত তিন 'অহিন্দু কবির দুর্গোৎসববিষয়ক ভাবনার পরিচয় নিলে অবশ্যই লাভবান হব।

প্রথমেই ধরা যাক 'খ্রিস্টান' মাইকেল মধুসূদনের কথা। হিন্দুদের কূপমণ্ডুকতা থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্যই যে তিনি খ্রিস্টান হয়েছিলেন, এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু সেজন্যে কি তিনি বাঙালির সংস্কৃতি সম্পদকে 'হিন্দু' আখ্যা দিয়ে পরিত্যাগ করেছিলেন? করেননি যে তার প্রমাণ তো তার সমগ্র সাহিত্যকর্মেই বিধৃত হয়ে আছে। বিদেশে গিয়ে তিনি বাঙালি সংস্কৃতির ধর্মীয় উপাদানের ধর্মনিরপেক্ষ তাৎপর্য বেশি করে উপলব্ধি করেছেন, এবং তাঁর সে-উপলব্ধি রূপ পেয়েছে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্যে। অন্তত দুটি সনেট– 'আশ্বিন মাস' ও বিজয়াদশমী' তো মাইকেল মধুসূদনের দুর্গোৎসব-স্মৃতি নিয়ে রচিত। সে-স্মৃতি কোনও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে ধারণ করেনি, সাংস্কৃতিক সর্বজনীনতাকেই উর্ধ্বে তুলে ধরেছে।

'খ্রিস্টান' মাইকেলের মত ব্রাহ্ম' রবীন্দ্রনাথও একই পথের পথিক। কট্টর পৌত্তলিকতা-বিরোধী কবি সার্বভৌমের পক্ষেও পৌত্তলিক দুর্গোৎসবের সাংস্কৃতিক আনন্দ উপভোগে কিছুমাত্র অসুবিধার সৃষ্টি হয়নি। শরৎকালের বাংলায় তিনি ঠিকই অনুভব করেন যে, 'আনন্দময়ীর আগমনে, আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দেখেন, 'ওই ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।' পূজার দিনের ভোরবেলায় উৎসবের হাসি কোলাহল শুনতে পেয়ে নিজের নিরানন্দ ঘর ছেড়ে কাঙালিনী মেয়েটি ছিন্নমলিন বসন পরে ধনীর দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে। চারদিকে ঐশ্বর্যরাশির মধ্যে এই অনাথা কাঙালিনী মেয়েটি তো মূর্তিমতী অসঙ্গতি। এই অসঙ্গতি দূর না-করে যে দুর্গোৎসব প্রকৃত আনন্দময় ও তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে না, রবীন্দ্রনাথ আমাদের এ-কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন,

অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি

জননীরা আয় তোরা সব,
মাতৃহারা মা যদি না পায়
তবে আজ কিসের উৎসব!
দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লানমুখ বিষাদে বিরস,
তবে মিছে সহকার-শাখা
তবে মিছে মঙ্গল কলস।

মাতৃপূজার অনুষ্ঠান যদি মায়ের সন্তানদের প্রতি সক্রিয় স্নেহমমতারই উদ্বোধন না-ঘটাতে পারে, তবে সে তো নিতান্তই জড় আনুষ্ঠানিকতা। এ-রকম আনুষ্ঠানিকতায় উৎসবের উত্তুঙ্গ মহিমার প্রকাশ ঘটে না, উৎসব নামটিই তার ব্যর্থ হয়ে যায়। মাতৃপূজার উৎসবকে সার্থক করে তোলার জন্যই তো কবি ডাক দেন,

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রিস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার–
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে-পবিত্র করা তীর্থনীরে–

এখানে যে 'মা'র অভিষেকের কথা কবি বলেছেন সেই 'মা' অবশ্যই দেশমাতৃকা। বাঙালির মাতৃপূজাও তো আসলে দেশমাতৃকার পূজা থেকে আলাদা নয়। বিদেশি শাসন-বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনের যুগে মাতৃপূজায় এই বিশেষ মাত্রাটি যুক্ত হয়। এতকাল মাতৃপূজার মণ্ডপে ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল একত্রে মিলিত হতে পারত না, বারোয়ারি পূজাতেও 'সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্থনীরে' মঙ্গলঘট ভরা হত না। বিশ শতকের গেড়ার দিক থেকেই এ-অবস্থার পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে। সবাই যখন দেশ মায়ের ডাকে একত্রে মিলিত হয়, তখন দুর্গা মায়ের পূজারীদের মধ্যেও রূপান্তরের ছোঁয়া লাগে, দুর্গোৎসবও অধিক পরিমাণে সর্বজনীন হয়ে ওঠে।

এই সর্বজনীনতারই আরও সম্প্রসারণ ঘটে মুসলমান' নজরুলের কবিতায়। মুসলমানত্বের কোনও রূপ ব্যত্যয় না ঘটিয়েই নজরুল বাঙালিত্বকে সমগ্র সত্তায় ধারণ করতে পেরেছিলেন। তাই, বাঙালির দুর্গোৎসবে দেশের সংকটকালে দুর্গা দেবীকে কবি অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে অনুযোগ জানান–

আর কতকাল থাকবি, বেটি মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল।
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।

'আনন্দময়ীর আগমনে' নামক কবিতার প্রথম দুই পঙ্‌ক্তিতে যে স্বর্গের কথা কবি বলেছেন, সে-স্বর্গ যে তাঁর মাতৃভূমি আর অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল' যে সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী– এ কথা তো সহজেই বোঝা যায়, এবং শাসকরাও তা ঠিকই বুঝেছিল। আর এরই জন্য রাজদ্রোহের অভিযোগে কবিকে দেয়া হয় কারাদণ্ড। নজরুলের এই কবিতা ও কবিতার জন্য দণ্ডলাভ– বাঙালির দুর্গোৎসবে আরও একটি নতুন মাত্রা যোগ করল। দুর্গোৎসব শুধু গতানুগতিক ধর্মীয় উৎসব যে নয়, এর মধ্যে যে আছে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ও বিদ্রোহেরও উপাদান, নজরুল সে-সত্যেরও উন্মোচন ঘটালেন। সে-সত্যের প্রতি সকল বাঙালির সক্রিয় দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই তিনি লিখলেন আরেকটি অসাধারণ কবিতা– 'পূজা-অভিনয়'। প্রতিবছরের নিষ্প্রাণ ও গতানুগতিক দুর্গাপূজাকে তিনি নিতান্ত অভিনয় ছাড়া আর কিছুই বলতে পারেননি। তিনি এর পৌরাণিক উৎসটির কথা স্মরণ করেই বললেন,

এমনি শরৎ সৌরাশ্বিনে অকাল বোধনে মহামায়ার
যে পূজা করিল বধিতে রাবণে ত্রেতায় স্বয়ং রামাবতার,
আজিও আমরা সে দেবী-পূজার অভিনয় করে চলিয়াছি।

পৌরাণিক কাহিনির রাম রাবণের যুদ্ধের এক নতুন তাৎপর্যও তিনি নিষ্কাশন করেন। তাঁর মতে 'সীতা' হচ্ছে শস্য, 'রাবণ' হচ্ছে সেই লোভী ধনিক যে কৃষকের উৎপাদিত শস্য হরণ করে নিয়ে যায়, আর 'রাম' হচ্ছেন সেই কৃষক-নেতা যিনি অত্যাচারী ও শোষক রাবণকে উৎখাত করার শক্তিলাভের বাসনাতেই অকাল বোধনে মহাশক্তি দুর্গা দেবীর পূজা করেন। অথচ, এ-কালে আমরা শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গাপূজার আসল উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে পূজার অভিনয় নিয়েই মেতে রয়েছি। তাই, কবির ক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা–

কে ঘুচাবে এই পূজা-অভিনয়, কোথায় দুর্বাদল-শ্যাম
ধরনী-কন্যা শস্য-সীতারে উদ্ধারিবে যে নবীন রাম!

কবি অবশ্যি প্রচণ্ড আশাবাদী। এই বাংলার বুকেই সেই নবীন রামের অভ্যুদয় সম্ভাবনা ব্যক্ত করেন তিনি–

দশমুখো ঐ ধনিক রাবণ, দশদিকে আছে মেলিয়া মুখ,
বিশহাতে করে লুণ্ঠন তবু ভরে না ক ওর ক্ষুধিত বুক।
হয়ত গোকুলে বাড়িছে সে আজ, উহারে কল্য বধিবে যে,
গোয়ালার ঘরে খেটে-লাঠি করে হলধর-রূপী রাম সেজে!

অন্য সব কথা বাদ দিলাম। বাঙালি হিন্দুর ধর্মীয় অনুষ্ঠান দুর্গোৎসবের বিচিত্র মাত্রাগুলোর প্রতিই যদি শুধু দৃষ্টি দিই তাহলেও দেখব যে: বাঙালির ধর্মকেন্দ্রিক সংস্কৃতিরও মর্মমূলে নিহিত আছে ধর্মনিরপেক্ষ অন্তঃসার, তার ধর্মীয় উৎসবও সর্বজনীনতার সম্পদে সমৃদ্ধ এবং সদা গতিশীল ও অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদী। তাই কোনও উৎসব যদি বাহ্যত হিন্দুর ধর্মীয় উৎসবও হয় তবু তার সঙ্গে একাত্মবোধ করতে খ্রিস্টান, ব্রাহ্ম বা মুসলমান কবির বাধে না। সাম্প্রদায়িক মানস প্রতিবন্ধে আক্রান্ত সমালোচকরা যাই বলুন, সুস্থ বাঙালি সংস্কৃতির সাধকদের কেউই সাম্প্রদায়িক হিন্দু, খ্রিস্টান, ব্রাহ্ম বা মুসলমান নন– তাঁরা কেবলই মানুষ।

কিন্তু কোটি কোটি সন্তানকে 'মুগ্ধ জননী' এখনো যে কেবলই 'বাঙালি' করে রেখেছেন, 'মানুষ' করেননি,– কবির ব্যথাদীর্ণ অন্তরের এই অভিযোগ আজও মিথ্যা হয়ে যায়নি। এখন তো আবার 'মানুষ' দূরে থাক বাঙালি' হওয়াটাও অপরাধ বলে বিবেচিত হচ্ছে, সাম্প্রদায়িক পরিচয়কেই সর্বার্থসার করে তোলা হচ্ছে, দায়িত্বশীল ব্যক্তিরাও সংস্কৃতির সাম্প্রদায়িক ভাষ্য প্রচারে আদাজল খেয়ে লেগে গেছেন। পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পরাজয়ে উল্লসিত হয়ে বাঙালি হিন্দুরা মহাধুমধামের সঙ্গে দুর্গাপূজার প্রবর্তন করেছিল– এমন অভিনব তথ্যও আমাদের শুনতে হয় গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত কর্তৃত্ববান ব্যক্তির মুখ থেকে।

হায় মা তারা, দাঁড়াই কোথা?

যতীন সরকার
শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

প্রবন্ধ

সনাতনধর্মে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বিশ্বশান্তি

ড. অসীম সরকার

সংস্কৃত ধৃ-ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয়যোগে ধর্ম শব্দটি গঠিত হয়েছে। 'ধৃ' ধাতুর অর্থ ধারণ করা। যা মানুষকে ধারণ করে রাখে তাই ধর্ম অর্থাৎ যা ধারণ করে মানুষ সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও পবিত্র জীবন যাপন করতে পারে এবং যা মানুষের সকল কল্যাণ সাধন করে তাকেই বলে ধর্ম। সহজভাবে বললে যা আমাদের কল্যাণের পথে ধরে রাখে তাই ধর্ম।

স্বাভাবিক গুণ বা নৈতিক চরিত্র অর্থে ধর্ম শব্দটি বেশি ব্যবহৃত হয়। আধ্যাত্মিক শক্তির সঙ্গে বাস্তব জীবনের সম্পর্কের অনুভূতিই ধর্ম। মূল কথা হচ্ছে, মিলন ও একাত্মতার নীতি এবং নৈতিক শিক্ষার উপায়ই ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন– 'শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম, দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ। সত্যই সকল ধর্মের ভিত্তি। পরোপকারই ধর্ম, পরপীড়নই পাপ। সৎ হওয়া আর সৎ কর্ম করা ধর্মের অঙ্গ।' প্রতিটি বস্তুর একটি নিজস্ব ধর্ম আছে; অর্থাৎ কোনও বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কিত গুণাবলিই তার ধর্ম। যা না থাকলে বা যার অভাবে কোনও বস্তু আর সেই বস্তু থাকে না, সেটাই তার ধর্ম।

যেমন অগ্নির স্বভাব হচ্ছে দগ্ধ করা। যে মুহূর্তে অগ্নির এই দাহিকাশক্তি থাকবে না, সে মুহূর্তে অগ্নিরও আর অস্তিত্ব থাকবে না। অতএব, অগ্নির ধর্ম হচ্ছে দাহিকাশক্তি বা দগ্ধ করা। মানুষেরও নিজস্ব একটি ধর্ম রয়েছে। যেসব গুণ থাকলে মানুষকে মানুষ বলা হয় এবং না থাকলে মানুষ বলা চলে না; যা চলে গেলে মানুষ আর মানুষ থাকে না সেটাই মানুষের ধর্ম। এর নাম মনুষ্যত্ব। এই মনুষ্যত্বই মানুষকে মানুষ নামে পরিচিতি দান করে। অতএব মানুষের ধর্ম হচ্ছে মনুষ্যত্ব। যার মনুষ্যত্ব নেই, সে পশুর সমান (মনুষ্যত্বহীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ)। মনুষ্যত্বহীন মানুষের মধ্যে পাশবিক প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। ধর্ম পালন

করলে সেই পাশবিক প্রবৃত্তির বিনাশ ঘটে। জেগে ওঠে মানবিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ এবং পবিত্রতায় পরিস্নাত এক শুদ্ধ কল্যাণ-অনুভব। এই কল্যাণবোধই ধর্ম। ধর্মের লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচং সংযমমেব চ
এতৎ সামাসিকং প্রোক্তং ধর্মস্য পঞ্চলক্ষণম্ ॥

অর্থাৎ হিংসা না করা, চুরি না করা, সংযমী হওয়া, শুচি থাকা এবং সত্যাশ্রয়ী হওয়া– এই পাঁচটি হচ্ছে ধর্মের লক্ষণ। মনুসংহিতায় ধর্মের লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ
স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ
সাক্ষাৎ ধর্মস্য লক্ষণম্ ॥ (মনুসংহিতা, ২/১২)

অর্থাৎ বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও বিবেকের বাণী এই চারটিকে বলা হয়েছে সনাতন হিন্দুধর্মের সাক্ষাৎ লক্ষণ। বেদে বিশ্বাস রেখে, স্মৃতির অনুশাসন মেনে এবং মহাপুরুষদের সদাচার থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে জীবনপথে চলতে হয়। এতেও যদি জীবনের সমস্যা সমাধান না হয় তখন সিদ্ধান্ত নিতে হয় নিজেকেই। শুনতে হয় বিবেকের বাণী। কাজে লাগাতে হয় নিজের অভিজ্ঞতাপ্রসূত কর্তব্য-অকর্তব্যের জ্ঞানকে। মনুসংহিতার মতে ধর্ম হচ্ছে কতগুলো গুণের সমষ্টি। উক্ত হয়েছে–

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং
শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো
দশকং ধর্মলক্ষণম্ ॥ (মনুসংহিতা, ৬/৯২)

অর্থাৎ সহিষ্ণুতা (ধৈর্য), ক্ষমা (ক্ষমাশীলতা), আত্ম-সংযম, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয়সংযম, শুদ্ধবুদ্ধি (প্রজ্ঞা), বিদ্যা (জ্ঞান), সত্য এবং অক্রোধ (ক্রোধহীনতা) এই দশটি হচ্ছে ধর্মের লক্ষণ। এই দশটি লক্ষণের মধ্যে ধর্মের স্বরূপ প্রকাশ পায়।

এই দশটি গুণ যিনি যথাযথভাবে অনুশীলন করতে পারেন তাঁর মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে। অতএব এরূপ গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি হচ্ছেন ধার্মিক। এ গুণগুলো যে-কোনও ব্যক্তির পক্ষেই অনুসরণযোগ্য। কাজেই বলা যায় যে, হিন্দুধর্ম কোনও বিশেষ স্থান, কাল, জনগোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করে ধর্মাচরণের বিধান দেয়নি। সকল দেশের, সকল কালের, সকল মানুষের পক্ষে যা কল্যাণকর সেটিই হচ্ছে হিন্দুধর্মের নির্দেশনা। হিন্দুধর্ম বহু মত ও পথের সমন্বয়ে সৃষ্টি। হিন্দুধর্মমতে প্রকৃতির অন্তবিহীন বৈচিত্রের মধ্যে যেমন এক বিস্ময়কর ঐক্য স্বীকৃত, তেমনি স্বীকৃত মানুষের চিন্তা-চেতনার বহুধা বিস্তারিত মত ও পথের সমন্বয়। অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী, একেশ্বরবাদী, আস্তিক, নাস্তিক, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন ধারার বিশ্বাস, মত ও পথ এর ধর্মদেহে লীন হয়েছে একান্তভাবে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন– 'যত মত তত পথ'। 'বিবিধের মাঝে মিলন মহান'– এটাই হিন্দুধর্মের মূল চেতনা। মুক্ত বুদ্ধি ও মুক্ত চিন্তা এখানে স্বীকার্য। মানবিক মূল্যবোধে, মানবিক কল্যাণে যা কিছু তা এখানে গ্রহণীয়। চিন্তা-চেতনায় একটা গণতান্ত্রিক পন্থা এখানে লক্ষণীয়। 'যত মত তত পথ'– এই দর্শন হিন্দুধর্মে স্বীকৃত যথার্থভাবে। এটা কেবল সম্ভব মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা, বিভিন্ন মত ও পথের প্রতি সীমাহীন সহিষ্ণুতা এবং প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবোধ থেকে। হিন্দুধর্মের এই যে ঔদার্য, বিশালতা, মানবিক বিকাশের ধারা এবং তার অন্তরের সঞ্জীবনী শক্তি তা নিঃসন্দেহে নন্দিত।

প্রত্যেক ধর্মেরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেই বৈশিষ্ট্যগুলো তাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। হিন্দুধর্মেরও বিশেষ তত্ত্ব, কতগুলো ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মকৃত্য রয়েছে, যেগুলো হিন্দুধর্মের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। যেমন– ঈশ্বরতত্ত্ব, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি, কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদ, অবতারবাদ, দেব-দেবীর পূজা, মোক্ষলাভ, জীব ও জগতের কল্যাণ, নারীর প্রতি মর্যাদাবোধ, পরমতসহিষ্ণুতা এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সমদর্শী ইত্যাদি।

সনাতনধর্মবিশ্বাসে কেবল সর্বজনীন সহনশীলতাই নয় বরং এখানে একটা দৃঢ় প্রতীতি আছে যে যদি কোনও একটি ধর্ম সত্য হয় তাহলে অন্য ধর্মগুলোও সত্য। হিন্দুধর্মের মতে তার স্বচেতনায় যেমন এক পরম সত্য দীপ্র, তেমনি অন্যের আবিষ্কৃত উপলব্ধ সত্যের প্রতিও সে শ্রদ্ধাবনত। এ ধর্ম বিশ্বাস করে, কোনও ভাল কথা যে কেবল একটি বিশেষ ধর্মে, কিংবা দেশে উচ্চারিত হবে এবং কোনও মহাপুরুষও যে কেবল একটি বিশেষ ধর্মে বা দেশে আবির্ভূত হবেন তা নয়। সকল ধর্মে, সর্বকালে এবং সব দেশেই হতে পারে অবিনাশী বাণীর উচ্চারণ ও মহিমান্বিত পুরুষের আবির্ভাব। হিন্দুধর্মের মানবিক ঔদার্য্য, চিন্তার প্রসারতা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি বিচার বিশ্লেষণ করে একে যদি কেউ 'মানবধর্ম' বলে তাহলে অত্যুক্তি হবে না।

সনাতনধর্মে কেবল মানুষ নয়, মনুষ্যেতর জীব এবং সকল জড় ও অজড়ের প্রতিও সুগভীর অনুভূতি, প্রগাঢ় ভালবাসা প্রোজ্জ্বল। জীব ও জগতের কল্যাণে আত্মনিবেদন করাই হিন্দুধর্মের প্রধান দিক। সকল জীবের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন, সকলকে ভালবাসাই ধর্ম। রামকৃষ্ণ পরমহংস বলেছেন– 'যত্র জীব, তত্র শিব।' এই চেতনাটি স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় প্রতিফলিত হয়েছে অনুপমভাবে–

ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মনপ্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবের পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন ও সাম্যের বাণী প্রচারই হিন্দুধর্মে মূল লক্ষ্য। বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীশ্রীচণ্ডীসহ প্রতিটি ধর্মগ্রন্থেই জীবের প্রতি ভালবাসার কথা, মানবকল্যাণের কথা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সাম্যের (শান্তির) বাণী প্রচারিত হয়েছে। উক্ত হয়েছে–

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥
(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪/১১)

– হে পার্থ, যে (ভক্ত) আমাকে যেভাবে উপাসনা করে (আমার প্রতি আত্মসমর্পণ করে), আমি তাকে সেভাবেই তুষ্ট করি। মনুষ্যগণ সর্বতোভাবে আমার পথেরই অনুসরণ করে।

ধর্মগ্রন্থসমূহে কেবল মানুষ ও জীবের কল্যাণই কামনা করা হয়নি, কামনা করা হয়েছে সমস্ত প্রকৃতি এবং জগতেরও শান্তি।

শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, হরিচাঁদ ঠাকুর, ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র প্রভৃতি মহাপুরুষগণের ধর্মচিন্তার প্রধানভিত্তি মানবতাবাদ। তাঁরা সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করেছেন এবং জীবের সেবা করেছেন। প্রচার করেছেন শান্তির বাণী। সাম্প্রদায়িকতাকে দূরীভূত করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে এক পতাকা তলে আনার চেষ্টা

করেছেন এবং অন্যকে একাজে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন।

জীবন-যাপন পদ্ধতি ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে পার্থক্য থাকলেও সকল ধর্ম, গোত্র ও বর্ণের মানুষ সমান। মানুষে-মানুষে কোনও ভেদাভেদ নেই। মহাপুরুষগণও মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে, গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে কোনও প্রকার ভেদাভেদ কল্পনা করেন নি। সবাইকে একই সত্তা মনে করতেন, সকল মানুষকে মানুষ হিসেবে কল্পনা করতেন। তাঁরা কখনো ভাবেন নি কে কোন জাতের, কোন গোষ্ঠীর, কোন গোত্রের, কোন বর্ণের, কোন ধর্মের বা কোন অঞ্চলের। তাঁরা মানেন নি ধর্মে-ধর্মে বিভেদ, বিশ্বাস করেন নি জাতিভেদ প্রথা। বর্ণপ্রথাকে তাঁরা প্রবলভাবে ঘৃণা করতেন। তাঁরা ঘৃণা করতেন হিংসাকে, কূপমণ্ডূকতাকে, গোড়ামিকে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে সমদৃষ্টিতে দেখতেন এবং সকল ধর্মের মানুষকে সমানভাবে ভালবাসতেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন–

যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত হীন ছাড়।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার।
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরাভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥

লোকনাথ ব্রহ্মচারী বলেছেন–

ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য এসবই
জগতের ব্যবহারিক সত্য, মনের
সৃষ্টি। আমি যে জগতের লোক
সেখানে নেই কোনও ভেদ, সেখানে
সবই সমান-সবই সুন্দর।

হরিচাঁদ ঠাকুর বলেছেন– 'নারীকে মাতৃজ্ঞান করবে, জগৎকে ভালবাসবে, সকল ধর্মে উদার থাকবে, জাতিভেদ করবে না।' ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলেছেন– 'তোমরা যে সম্প্রদায়েরই হও না কেন, মনে রেখ, ঈশ্বর এক, ধর্মও এক।' স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন– 'প্রত্যেককে আমি কেন ভালবাসব? কারণ তারা সকলে এবং আমি এক।' তিনি আরও বলেছেন, 'জগতে যত প্রাণী আছে সবাই তোমার আত্মার বহুরূপ মাত্র।' সারদা দেবী বলেছেন– 'যদি শান্তি চাও, কারও দোষ দেখ না, দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপন করে নিতে শেখ, কেউ পর নয়, জগৎ তোমার।' হিতোপদেশে বলা হয়েছে– 'উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্'– উদার ব্যক্তিদের কাছে সমগ্র পৃথিবী তথা পৃথিবীর সকল মানুষই আত্মীয়। চাণক্য বলেছেন– 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ'– সকল জীবকে যিনি নিজের মত করে দেখেন, তিনি পণ্ডিত (অর্থাৎ সমদর্শী)। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ (৬/৩২)

– হে অর্জুন, যিনি সমস্ত জীবের সুখ ও দুঃখকে নিজের সুখ ও দুঃখ বলে অনুভব করেন (নিজের সুখ ও দুঃখের মত মনে করেন অর্থাৎ সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখেন), আমার মতে (পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতে) তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী অর্থাৎ মহাপুরুষ। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেছেন–

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ। (৫/১৮)

–পণ্ডিতগণ (ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষগণ) বিদ্যাবিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গো, হস্তী ও কুকুর সকলের প্রতি সমদর্শী হন অর্থাৎ সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখেন।

কোনও ধর্মই হিংসার কথা বলে না, বিভেদের কথা বলে না, বলে শান্তির কথা। ধর্ম মানুষকে ঘৃণা বা হিংসা করতে শেখায় না, শেখায় ভালবাসতে এবং সভ্য হতে। কিন্তু স্বার্থান্বেষী কুচক্রীমহলই ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মানুষে মানুষে, ধর্মে ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করে থাকে। এ থেকে পরিত্রাণের একমাত্র সমাধান হচ্ছে ধর্মের সাম্যবাণী এবং মহাপুরুষদের শাশ্বত আদর্শ মনে-প্রাণে ধারণ করে ব্যক্তিজীবনে তার প্রতিফলন ঘটানো, প্রয়োজন মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা। মানবকল্যাণমূলক চেতনাকে মনে-প্রাণে ধারণ করে মানবসেবায় আত্মনিয়োগ করা। তবেই মনুষ্যত্বের বিকাশ সম্প্রসারিত হবে। আর মনুষ্যত্বের বিকাশের মাধ্যমেই সাধিত হবে মানুষের তথা সমাজের কল্যাণ। এর ফলে মানুষের মধ্যে প্রকাশিত হবে মানবিক মূল্যবোধ।

সনাতনধর্মবিশ্বাসে বর্জন নয় গ্রহণের কথা বলা হয়েছে, ধ্বংস নয় শান্তির কথাই উচ্চারিত হয়েছে এবং বিভেদ নয় সমন্বয়ের আহ্বানই জানানো হয়েছে। ঋগ্বেদের শেষ সূক্তে (১০/১৯১) ঐক্যের আহ্বান উচ্চারিত হয়েছে–

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
... ...
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥

– তোমরা সংযুক্ত হও, একবিধ বাক্য প্রয়োগ কর, তোমাদের মনসমূহ জ্ঞাত হোক সমানরূপে। ... তোমাদের সংকল্প সমান, তোমদের হৃদয়সমূহ সমান এবং সমান হোক তোমাদের অন্তঃকরণসমূহ। যাতে তোমাদের পরম ঐক্য হয়, তাই হোক।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন– 'যুদ্ধ নয়, সহমর্মিতা; ধ্বংস নয়, সৃষ্টি; সংঘাত নয়, শান্তি ও সম্প্রীতি।' তিনি আরও বলেছেন– 'বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।' বিশ্বশান্তির জন্য প্রয়োজন মহান ঐক্য ও সম্প্রীতির বাণী মনেপ্রাণে ধারণ করে কাজ করা।

সনাতনধর্মে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব– সর্বজনীন শারদীয় দুর্গোৎসব। ধর্ম যার যার, উৎসব সবার– এই চেতনাকে মনেপ্রাণে ধারণ করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে। সকলের অংশগ্রহণ ও উপস্থিতিতে দুর্গাপূজা হয়ে উঠে এক সর্বজনীন মহোৎসবে।

শারদীয় দুর্গাপূজার সর্বজনীনতা, হিন্দুধর্মের মানবকল্যাণমূলক মহান আদর্শ এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের দর্শন ও মানবতাবাদের চেতনা সমাজের প্রতিটি স্তরে প্রতিভাত হোক। বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যকার সকল প্রকার বৈষম্য দূর হোক, দূর হোক মানুষের সঙ্গে মানুষের সকল প্রকার ভেদাভেদ। দৃঢ় হোক মানুষের সঙ্গে মানুষের সেতুবন্ধন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপিত হোক এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠুক। সাম্প্রদায়িকতা, সংকীর্ণতা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, হানাহানি, বোমাবাজিসহ সকল প্রকার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অবসান হোক, জাগরিত হোক মানবিক মূল্যবোধ, বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে প্রতিষ্ঠিত হোক বিশ্বশান্তি।

ড. অসীম সরকার
শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

উপন্যাস

শাম্ব

কালকূট

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, কথাটা আজ অন্য একটি কথার খেই ধরিয়ে দিল। ধরিয়ে দেওয়া খেই কথাটা অবিশ্যি বিপরীত। না-তে আছে হ্যাঁ। ভ্রমিতে চাহি আমি সুন্দর ভুবনে। অনেকবার শোনা, আর অনেকবার বলা সেই কলিটাই তাই ফিরে আসে বারে বারে, মন চল যাই ভ্রমণে। কিন্তু কোন্ ভুবনে?

এরকম একটা ধন্দ কখনো কখনো আমাকে পেয়ে বসে। তবে সচরাচর না। ভুবনের কথা এলো যে! না, লোটা কম্বল নিয়ে, আর কপনি এঁটে–যাকে বলে 'আপনি আর কপনি' সেইরকম, সংসারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে, 'ব্যোম্ ভোলানাথ!' হেঁকে আমি কদাপি দৌড় মারিনি। কেননা, ওটা আমার কাছে দৌড় মারার মতই। বুলি হল, আপনি বাঁচলে বাপের নাম!

না, পিতা পিতৃপুরুষের নাম, আমি আমার বাঁচার থেকে ছোট করে ভাবি না। ভাবিওনি। ক্ষয় লয় মৃত্যু, অনিবার্য বলে তাকে জেনেছি। এই জানাটা যে কেবল নিজের এই জীবনকালের মধ্যে, তা যেমন সত্যি, তার থেকেও গভীরতর সত্যের কথাটা না বলে থাকতে পারছি না।

ক্ষয় লয় মৃত্যুর সে এক মহিমময় বর্ণনা, বিষ্ণুপুরাণের ধরণীগীতায় উক্তি করেছেন পরাশর। বলছেন:

তপ্তং তপো যৈঃ পুরুষপ্রবীরৈ–
রুদ্বাহুভির্ব্বর্ষগণাননেকান্।
ইষ্টাচ যজ্ঞা বলিনোহ্‌তিবীর্য্যাঃ
কৃতাস্তু কালেন কথাবশেষাঃ॥

আহ্, ওহে জীবন, তুমি আবার আমাকে দিয়ে পুরাণের শ্লোক আউড়িয়ে নিচ্ছ কেন। এ ভাষা আমার অর্জিত না। চলে যাই পণ্ডিতের পদতলে, যিনি ভাষার সিংহদ্বার ভেঙে, গম্য স্রোতে ভাসিয়েছেন পরাশরের সেই মহিমময় বেদনাভিভূত বাণী, বাঙলা কথায় ধরণীগীতার সেই সব উক্তি:

'যে-পুরুষপ্রধানগণ ঊর্ধ্ববাহু হয়ে অনেক বর্ষ যাবৎ তপ আচরণ করেছিলেন, অতি বীর্যশালী যে বলবান ব্যক্তিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন, কাল তাঁদের সকলকেই কথাবশেষ করেছেন। যে-পৃথু অব্যাহত পরাক্রমে সমস্ত লোকে বিরাজ করতেন, যাঁর চক্র শত্রুদের বিদারিত করত, তিনি কালবাতহত হয়ে, অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত শিমূল তুলার মত বিনষ্ট হয়েছেন। যে-কার্তবীর্য সমস্ত দ্বীপ আক্রমণ করে, শত্রুমণ্ডল বিনাশ করে রাজ্য ভোগ করেছিলেন, এখন কথাপ্রসঙ্গে তাঁর নাম উত্থাপিত হলে, সন্দেহ হয়, তিনি বাস্তবিক ছিলেন কী না। ধিক! দশানন অবিক্ষিত রাঘব প্রভৃতি দিঙ্মুখ উদ্ভাসিতকারী রাজগণের ঐশ্বর্যও কি কালের ভ্রূভঙ্গপাতে ক্ষণমাত্রেই ভস্মসাৎ হয়নি! মান্ধাতা নামে যে-ভূমণ্ডলের চক্রবর্তীরাজ কথাশরীর প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁর কাহিনী শুনে, কে এমন সাধু ব্যক্তি আছেন, যে মন্দচেতা হয়ে নিজের প্রতি মমত্ব করবেন। ভগীরথাদি নৃপতি, সগর, ককুৎস্থ, দশানন, রাঘব, লক্ষ্মণ, যুধিষ্ঠির ইত্যাদি সকলেই ছিলেন, এ কথা সত্য। মিথ্যা না। কিন্তু এখন তাঁরা যে কোথায়, (হায়!) আমরা জানি না।'...জানি না, কিন্তু ছিলেন– এই সত্যের বিনাশ নেই। পরাশরের লোটা কম্বল কপনি ছিল কি না, ওতে আমারও বেজায় ধন্দ। কারণ, জানি না। তথাপি দেখছি, সেই প্রাচীন পুরুষপ্রধানদের তিনি ভুলতে পারছেন না। আপনি বাঁচো, বাপের নাম ভোল, আর আপনি কপনি করে দৌড় মারো, আর ধুনি জ্বালিয়ে বেল-কাঠ বেক্ষাচারীর মত গায়ে মাখো ছাই, তিনি যে তা ছিলেন না, তার প্রমাণ তাঁরই উক্তি। যাঁদের অস্তিত্বের নশ্বরতা বিষয়ে তিনি উক্তি করেন, তাঁদের স্মরণের, তাঁরা ছিলেন, এ দায় থেকে মুক্তি পান না।

মুক্ত আমিও না। যদিও জানি, আমার বাঁচার থেকে পিতৃ পুরুষগণকে ছোট করে ভাবতে পারি না, কিন্তু অবিমিশ্র সুখ কেউ রেখে যাননি এই বংশধরটির জন্য। সংসারকে নিরঙ্কুশ দুঃখের আগার ভাবি না। আর সুখ? প্রয়াগের সেই ঘর-ছাড়া পাগলাবাবার কথা মনে পড়ে যায়। যে-কথা এমন স্পষ্ট করে কোনও গীতায় উচ্চারিত হয়নি। তার আগে একটা কথা কবুল না করলে, নিজেকে যেন কমন ছলনাকারী লাগছে। সংসারের বাইরের পথে যাঁরাই কপ্‌নি এঁটে বেরিয়েছেন, মাথায় জটা উঁচিয়ে গায়ে ছাই মেখে ক্ষ্যাপা হয়ে ফিরছেন, তাঁদের সবাইকে আমি কখনো দৌড় মারার রঙিলা ব্রহ্মচারী বলিনি। তা হলে আমার জীবনে অনেক দর্শন, অনেক বচনবাচন দেখা আর শোনা হতো না।

প্রয়াগের সেই জটা খোলা, উদলা গা, হাসকুটে মানুষটি আমাকে শুনিয়েছিলেন, 'সুখ দুঃখটা কেমন জানিস? প্রয়াগে তীর্থ করলে, আর পকেট ভরে পুণ্যি নিয়ে গেলেই সব শেষ না। সুখ দুঃখের মাপ জ্ঞানটা থাকা দরকার। পৃথিবীটাকে দেখে নিয়েছিস্। আহ্, সেই দেখার কথা হচ্ছে না, ঘরে বসে ভূগোল ম্যাপ নিয়ে নাড়াচাড়া করেছ তো। তার তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল। কেমন কী না। ওটাই হল সুখ দুঃখের ভাগ। তিন ভাগ জলের মত দুঃখ, স্থলের এক ভাগ সুখ।'

কতকাল আগের কথা? তেইশ-চব্বিশ বছর তো হল প্রায়। তখন পশ্চিমের 'মিথ্ অফ সিসিফাস' জানা ছিল না। কথাটা এমন করে মরমে বিঁধেছিল, জীবনের কত জায়গায়, কত ভাবে যে কথাটা বলেছি, নিজেরই কোনও হিসাব নেই। কথাটা এই কারণে মরমে বেঁধেনি, জীবনটা একান্তই দুঃখের অকূল সমুদ্র। বড় অসহায় বোধ করেছিলাম। জীবনকে দেখার সেই দৃষ্টিভঙ্গি, নিদারুণ মনে হয়েছিল। তখনও সুখ বিষয়ে মনের মাত্রাজ্ঞানে আকাঙ্ক্ষার ভাগটা ছিল অনেক বড়। কথাটা শুনে মনে হয়েছিল, জীবন হল দুঃখের দ্বারা বেষ্টিত। তাকে পাশ কাটিয়ে যাই, এমন কোনও পথ ছিল না। ব্রহ্মাণ্ডের অনিবার্যতার প্রমাণটা একটা প্রতীক। তিন ভাগ জলের ধারা প্রবাহিত স্থলের অভ্যন্তরে নানা নদ ও নদী। তার ওপরে, পন্থ বড় বন্ধুর হে, পন্থ বড় বন্ধুর। তিন ভাগ জল ছিল এক গভীর অর্থবহ সংবাদ। দুঃখ জীবনের সমগ্রতায় অনতিক্রমনীয়। সুখ থাকে দুঃখের কুণ্ডলীতে। নাম তার ঝলকিত দ্যুতি। সামান্য জীবনকালের কয়েকটি স্বপ্নময় মুহূর্ত মাত্র।

পরবর্তীকালে পশ্চিমের 'মিথ্ অফ্ সিসিফাস' পড়ে, তিন ভাগ জলের প্রতীকটাকে সমার্থক মনে হয়েছিল। আরও পরে বুঝেছিলাম, দুটো ধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন। দুটো বিশ্বাস আলাদা, অভিজ্ঞতা ভিন্নতর। অভিশাপ আর বিশ্বের নিয়মের অনিবার্যতায় বেবাক ফারাক।

প্রয়াগের সাধু আমাকে শুনিয়েছিলেন, বিশ্ব নিয়মের একটি অনিবার্যতার কথা! পৃথিবীর তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল। জীবনের তিন ভাগ দুঃখ, এক ভাগ সুখ। এর নাম মন্ত্র তন্ত্র না। দার্শনিকতা? কেউ দাবি করেনি। ভারতের ঘাটে মাঠে গাছতলায়, এক শ্রেণীর সর্বত্যাগীর (সর্বহারা বলা যায় কী?) মুখে মুখে জন্ম নেয়। এখন বোঝ হে কথা, যে জান সন্ধান। কারোর মাথার দিব্যি নেই।

কিন্তু তথাপি মনে একটা খটকা, প্রাণে লাগে একটা ধন্দের দোলা। এই যে কেবল ভারত ভারত করি, কেবল কি ভারতের মাঠে ঘাটে গাছতলাতেই এমন কথার জন্ম হয়! জগতের আর কোথাও না? ঘাড় ঝাঁকাতে পারি না। শিরে টান ধরে। প্রয়াগের গাছতলা কি প্রাগে নেই? প্রাগের ঘাট সাইবেরিয়ায়? সাইবেরিয়ার মাঠ সাংহাইয়ে? কাসপিয়ানের কূলে কিংবা অতলান্তিকের বেলাভূমে?

সত্যি মিথ্যা জানি না। অবুঝ মন বলে, আছে। বোঝদার বললে কেউ 'অংখারি' ভাবে, তাই। তবে নিতান্ত অবুঝ মনের কথা না। সেই মহান মেষপালক, গায়ে ছেঁড়া আলখাল্লা, আর এক মুখ দাঁড়ি নিয়ে মাঠে ঘাটেই তাঁর কথার জন্ম দিয়েছিলেন।

খেই হারালাম নাকি? না। কথা হচ্ছিল, 'মরিতে চাহি না...।' বলতে চাইছিলাম, না-তে আছে হ্যাঁ, অন্য কথায়। ভ্রমিতে চাহি আমি সুন্দর ভুবনে! কিন্তু কোন্ ভুবনে? ভুবনের কথাটা এলো, আমার ধন্দটাও, অতএব। সেই কারণেই লোটা কম্বল কপ্‌নির প্রসঙ্গ। কথাটা অনেকবার অনেকভাবে বলেছি, ভ্রমণে যাব। কিন্তু সংসারটাকে ছাড়িয়ে যাবার কথা কখনো মনে হয়নি। তিন ভাগ জলের সত্যকে জেনেছি বটে, উপলব্ধি অন্য কথা। সেই জানা থেকেই, আমার এক কথা, আমি লোটা কলম্বধারী না। পরিব্রাজক যাঁদের বলে, প্রব্রজ্যা যাঁদের পরিভ্রমণ, আমার মন চল যাই ভ্রমণের সঙ্গে তার মিল নেই কোথাও। বৈরাগ্য যে কখনো অন্তরকে গ্রাস করে না, সে-কথা বলা

কঠিন। বৈরাগী হতে গেলেই, সংসারের ধিক্কারটা বড় কঠিন হয়ে বাজে।

তাই কি? আসলে বৈরাগী যে হতেই চাইনি কখনো। সন্ন্যাস আমার জন্য না। লোটা কম্বল নিয়ে যদি দৌড় দিতে পারতাম, তবে আমার থেকে কার বিবেক আর বেশি সাফ্ সুরত্ থাকতো? মনের কথা তো গোড়াতেই বলেছি। ভ্রমিতে চাহি আমি সুন্দর ভুবনে। কথাটা আরশিতে ফেলে দেখতে গিয়ে তাজ্জব! দেখি, লেখা রয়েছে 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।' এই চাওয়া আর না চাওয়ার মধ্যে, যদি আনন্দের ধ্বনি বেজে থাকে, বাজুক না কেন। আরও কি বাজে কোনও আর্তস্বর? অথবা এরই মধ্যে জীবনের অলঙ্ঘিত বিধি, সম্যক জ্ঞানের ধারায় নিয়ে চলে?

না না না, এ বড় পয়জার হে। মনের নানা ব্যাজ। উসব থাকুক গা মনের রাঙচিতের বেড়ায় ঢাকা। আমার এক কথা, ভ্রমি অনুরাগে। আমার হল অনুরাগের ভ্রমণ। কিন্তু ওই ভুবনে এবার আমার ঠেক লেগেছে। মন নিয়ে কথা। ঠেক ধন্দ যে কতো, আজতক বলে বলে তার ইতি করতে পারলাম না।

একটা মজার কথা বলি। ছেলেবেলার কৃষ্ণযাত্রার কথা, মন তখনো কুসুমকলি। বিরহিণী রাধার কাছ থেকে কৃষ্ণ বিদায় নেবেন। কিন্তু বিদায় নেবার ইচ্ছা নেই। মানভঞ্জনটা হয়েছে। রাধার দুই সখী দু পাশে। কৃষ্ণ বললেন, 'এবার তা হলে যাই।' বলে পা বাড়ালেন।

সখী বললেন, 'যাই নয়, আসি।'

কৃষ্ণ ফিরে এসে দাঁড়ালেন। রাধা এবং সখীরা অবাক! কী হল? কৃষ্ণ বললেন, 'বললে যে যাই না আসি। তাই এলাম।'

সখী হেসে বললেন, 'যাই বলতে নেই, যাবার বেলায় আসি বলতে হয়।'

কৃষ্ণ বললেন, 'তাই বুঝি? এবার তা হলে আসি।' যাবার জন্য পা বাড়ালেন।

সখী বললেন, 'এসো।'

কৃষ্ণ আবার ফিরে এলেন। রাধা এবং সখীরা আবার অবাক! কৃষ্ণ বললেন, 'এসো বললে, তাই এলাম।'

রাধার অনুরাগ আর বিরহ কাতরতা যুগপৎ বাড়ে। সখীরা হাসেন। কৃষ্ণযাত্রার কেষ্টঠাকুরটি বরাবরই চতুর রসিকলাল। আমাদের ক্ষেত্রে বিটলেমি। বুঝতে পারছি না, আমাকে সেই বিটলেমিতে পেলো কী না। ভুবনের ঠেক লাগলো এই কারণে, ভ্রমণে যাবো কোন ভুবনে। হিসাবে দেখছি, ভুবন তিনটি। ত্রিভুবন যাকে বলে।

অনুরাগের ভ্রমণের একটা বৈশিষ্ট্য, ডানায় কাঁপন লেগে যায়। নিষ্পত্র গাছপালা আর বরফের দেশ ছেড়ে পাখিরা যেমন পাখা ঝাপটিয়ে উড়ে যায় চিরবসন্তের দেশে। তা বলে কি আমার ভ্রমণ কাসপিয়ানের কূল থেকে কুরু পাঞ্চালে? ইস! টিকিটবাবুরা হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে নেই? মনের পাখায় কাঁপন যতোই লাগুক, আকাশযান জলযান স্থলযান, ব্যতিরেকে উড়বো কিসে? আর সেইসব যানবাহী হলে ফুঁকো ট্যাঁকে মনের পাখনায় মরণ ধরে। সবাইয়ের এক বুলি, ফ্যালো কড়ি মাখো তেল, তুমি যে আমার বড় আপন গো!

না, অমন দূর দুরান্তরের ভ্রমণ আমার কপালে নেই। আমার হল ,দশজনকে নিয়ে ঘর করতে, হঠাৎ গুনগুনিয়ে ওঠা 'মন চলো যাই ভ্রমণে/কৃষ্ণ অনুরাগীর বাগানে।' কৃষ্ণ হেথায় প্রতীক, এক অরূপ রূপের ঠাঁই। তার কোনও ব্যাখ্যা নেই, নগর পুরী জনপদের কোনও ঠিক ঠিকানা নেই। ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে ঘরের হাতায় মাঠ থেকেই মোটর বাসে চেপে বসে, ঘরেরই আর এক পিঠে গিয়ে নামো। কোনও এক গাঁয়ের পথে, নয় তো কোনও এক খোয়াইয়ের ঢালুতে। কুন্তী নামেও তো এক নদী আছে, অথবা ক্ষীণধারা সরস্বতীর কূলে বাঁশঝাড়ের ছায়ায় ভ্রমণে চলে যাও। নানুরের পুকুর ধারে, নয় তো ছাতনার ঝোপ ঝাড়ের জঙ্গলে। সোনামুখীতে না গিয়ে, পাঁচমুড়ার গাঁয়ে গিয়ে বসো। খেলো হুঁকোয় ভুড়ুক ভুড়ুক করে, পোড়ামাটির শিল্পী কারিগরদের উঠোনে বসলে কেউ তোমাকে ঠ্যাঙা নিয়ে তাড়া করবে না। গুলবাজি? না। কসম? কসম! এমন অনেক জায়গার নাম করতে পারি। সবই মনে হবে কৃষ্ণ অনুরাগীর বাগান।

যে যার এমন ভ্রমণে
কৃষ্ণ থাকেন তার সনে।

আবার কৃষ্ণ? আবার কেন, বারে বারে। বললাম না, ওই নাম হল প্রতীক। পাবার আশায় সেখানে কেউ যায় না। নিজেকে একটু ধোয়া মোছা সাফসুরৎ করতে যাওয়া। এত কথা কিসের। বলছি, প্রাণের লক্ষ কক্ষে বায়ুর ভারি চাপ। প্রাণে বায়ু চালাচালির নামই ভ্রমণ।

'তা যেন হল।' তিনি বলেছিলেন, 'ভ্রমণে তোর সঙ্গে না যেতে পারলেও মনটা হালকা হল। কিন্তু খাস কি?'

'খাই কি?'

'হ্যাঁ, খাস কি?'

একে বলে জিজ্ঞাসা! প্রাণের লক্ষ কক্ষে বায়ু চালাচালি তো করছো বাপু, মহাপ্রাণীটির ব্যবস্থা কী? দাঁতকপাটি? যে তাঁর বচন শোনেনি, সে বুঝবে না, জিজ্ঞাসায় ঝাঁজ কেমন। তারপরেই আবার পাল্টা জিজ্ঞাসা, 'গেরস্তের বাড়িতে পাত পাতিস?'

'আজ্ঞে সে কখনো সখনো। সব জায়গার সব গেরস্ত তো সমান না। আশেপাশের দোকান থেকে চিড়ে মুড়ি মুড়কি কেনা যায়। ময়রার দোকান থাকলে তো কথা নেই। দই মণ্ডা মেঠাইও কিছু মেলে।'

'তুই একটা আস্ত গাধা।'

'আজ্ঞে?'

'হ্যাঁ, বইলছি, তুই একটা কুড়ের বাদশা। ওতে না আছে মজা, না ভরে পেট। খেটে খেতে পারিস না?'

'সেটা কী রকম? জিজ্ঞাসা করিনি, চোখে জিজ্ঞাসা নিয়েই তাকিয়েছিলাম।

'রেঁধে খেতে পারিস না?'

'রেঁধে?'

'হ্যাঁ রে বাঁদর, রেঁধে। তোর বয়সে আমি ওরকম অনেক, ঘর করতে উঠ্বন্দী প্রজার মতন বেরিয়ে পড়তাম। সেইজন্যই তোর বেরিয়ে পড়ার খবরে আমি খুশি। কিন্তু আমি তোর মতন ওরকম চিড়ে মুড়ি মণ্ডা মেঠাইতে ছিলুম না, বুঝলি?'

'কিসে থাকতেন?'

'ক্যানে, দোকানে চাল ডাল মেলে না? নুন লঙ্কা তেল? হাঁড়ি মালসা, গেরস্তের বাগানে কলাপাতা?'

'তা তো মেলে।'

'মেলে মানে? মিলবেই। তাকে তো আর কেউ শিল নোড়ায় বাটনা বাটতে বলেনি। বলেছে কি? ত? যা, সব কিনে কেটে যোগাড়জাত্ করে, গাঁয়ের বাইরে গাছতলায় যেয়ে বস্। গাছের শুকনো পাতা ডাল কুড়িয়ে আন্। কিছু না পাস মাটির ঢ্যালা বসিয়েই উনোন সাজা। জল নিয়ে টিপটিপিনি আছে নাকি?'

'আজ্ঞে?'

'বইলছি পেট রুগীদের মতন, এ জল খাব না, সে-জল খাব, ওসব হ্যাপা নাই ত?'

'না।'

'ওইটেই বাঁচোয়া। তবে যা, কাছেপিঠে যেখানে পুকুর টিউবকল যা পাবি, হাঁড়িতে করে জল নিয়ে আয়। চালে ডালে বসিয়ে দেয়। মালসায় তেলের ছিটা দিয়ে, লঙ্কা ভেজে নে, হাঁড়িতে ঢেলে দে। গাছের ডাল দিয়ে হাঁড়িতে নাড়। ঠিক মতন ফুট খেয়েছে? তাহলে এবার গরম গরম কলাপাতায় ঢাল, আর খা। কেমন লাইগছে?'

'আঁজ্ঞে জিভে জল এসে যাচ্ছে।'

'তব্যা? তা না চিড়া মুড়ি মেঠাই মণ্ডা। এখন তোর আশেপাশে কারা আছে বল্ দিকিনি?'

'আঁজ্ঞে, কই? কেউ নেই তো।'

'গাধা! নিদেনপক্ষে চার-পাঁচটা গাঁয়ের অনাহারী কুকুর তোকে ঘিরে বসে নেই? কাক শালিকের কথা বাদই দিলাম।'

'ইস! সত্যিই তো, মনেই ছিল না দাদা।'

'মনে না রাখলে লিখবি কেমন করে? এবার নিজে খা, ওদের দে। তারপর কী করবি?'

'গাছতলায় শোব?'

'তা শুবি না আরামখোর! শোবার জন্যে তখন একটা জাজিমের কথা মনে পড়বে, তারপরে একটি দাসী।' মনে আছে, হেসে জিভ কেটেছিলাম। কিন্তু তিনি তাঁর মনে 'ঢ্যালা মেরে উনোন ভেঙে হাঁড়ি মালসা ভেঙেচুরে, আর পেছনে তাকানো নয়, চলে যা, নিজের পথে। তোর বয়সে আমি যখন বেরিয়ে পড়তাম, এইরকম করতাম। বেরিয়ে পড়লেই, গায়ে গতরে খাটবি না, পোকা পড়বে যে! তবে ওই দিনান্তে একবার। হাত পুড়িয়ে খাবি, মুখে অমৃতের স্বাদ পাবি। চড়ুইভাতি কি কেবল দঙ্গলে হয়? জঙ্গলে একলা হয় না?'

হয় না আবার? হাতে কলমে পরখ করে দেখেছি। কেবল কি অমৃতের স্বাদই পেয়েছি? আর কিছু না? আরও কিছু। একলা সেই অনুষ্ঠান, এক যজ্ঞের মত। সেই যজ্ঞের মধ্যে নিজেকে যেন অনেকখানি চিনে নেওয়া যায়। আহা, জানি তোমরা কি ভাবছো। আর তা জেনে আমার এমনি করে বলতে ইচ্ছা করছে, 'পাঠক! তোমাদিগের মনের অবস্থা আমি অনুমান করিতে পারিতেছি। যে-ব্যক্তির সঙ্গে আমার উক্ত প্রকার আলাপাদি হইয়াছিল, তাঁহার পরিচয় জানিবার জন্য, তোমাদিগের কৌতূহল অতি তীব্র হইয়াছে।' বচনদারের বচনেও যদি না বোঝা গিয়ে থাকে, তবে বলি, তিনি কথাশরীর প্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি দিঙ্‌উদ্ভাসিত সাহিত্য রচয়িতা তারাশঙ্কর–তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। কথাশরীর প্রাপ্ত হওয়া মানে কী? পণ্ডিতমশাইয়ের কাছ থেকে যথার্থরূপে জেনে নেওয়া হয়নি। কথা-শরীর প্রাপ্ত কি কেবল মৃত্যু? সম্ভবত না। যিনি এখন ইতিহাস তিনি কথা-শরীর প্রাপ্ত হন। দাদা (এই নামেই তাঁকে ডাকতাম। দাদার আগে নাম ধরবার, অন্ততঃ তাঁর ক্ষেত্রে, জিভ আড়ষ্ট হয়ে যেতো। সেটা তাঁর বয়স এবং ব্যক্তিত্ব।) এখন সৃষ্টি জগতের ইতিহাস।

কিন্তু 'আমার সাধ না মিটিল/আশা না পুরিল।' বড় ইচ্ছা ছিল, তাঁর সঙ্গে একবার ভ্রমণে যাই। গ্রামের বাইরে গাছতলায় চাল ডাল হাঁড়ি মসলা নুন তেল যোগাড়জাত করে গিয়ে বসি, মাটির ঢ্যালায় উনোন সাজিয়ে, হাঁড়ি চাপিয়ে দিই। আমি শুকনো কাঠ পাতায় আগুন উস্‌কে তুলবো, তিন গাছের ডাল দিয়ে হাঁড়িতে নাড়বেন। আর তখন কি গুনগুন করবেন, 'জীবন এত ছোট ক্যানে?'

এই দেখ, আমার প্রাণের বায়ুর ঘরে কেমন হাহাকার করে উঠেছে। ঘনিয়ে আসছে অন্ধকার। কারণ, সে-উপায় যে আর ছিল না। সাধ মেটাতে পারিনি। কালের স্রোত তখন তাঁকে অন্যদিকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। একলা চড়ুইভাতির দিন শেষ অভিজ্ঞতাগুলোকে হৃদয়ের জারিত রসে রূপায়ণের একনিষ্ঠ শিল্পী। কর্তব্য আর বয়সের দায় তাঁকে ঘরবন্দি করেছে।

তা-ও বা কতোটা? ঘরে বন্দী হবার লোক কি তিনি ছিলেন। আর একটা ঘটনা বলে নেবো নাকি? এই দেখ, অতি লোভে তাঁতী নষ্ট, কথায় বলে। আমার সেই অবস্থা। আমি খেই হারাতে বসেছি। তবু মন বলছে, খেদ রেখো না বাপু, যা বলবার ঝপপট বলে ফ্যালো।

হ্যাঁ, তাই বলি। একবার দাদার সঙ্গে গিয়েছি সাঁওতাল পরগণার শিমুলতলায়। আরও অনেকে ছিলেন। কেন, কী বৃত্তান্ত, সে-সব কথা থাক। আবহাওয়াটা দঙ্গলের চড়ুইভাতির মতই। দুপুরবেলা খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করে, ঠিক হল তিন মাইল দূরে তিলুয়াবাজারের হাটে যাওয়া হবে বাজার করবার জন্য। আসলে সেও এক ভ্রমণ।

হাটে একটি সাঁওতাল মেয়ে, খাঁচায় পুরে এসেছিল কয়েকটি পায়রা। নতুন পাখনা গজানো নধর পায়রা। সচকিত ভীরু পায়রাগুলো, খাঁচার মধ্যে হাটের ভিড় দেখে ছটফট করছিল। হঠাৎ আমার মনে হয়েছিল, অনেককাল পায়রার মাংস খাওয়া হয়নি। দাদাকে বললাম, 'পায়রা ক'টা কেনা যা, মাংস খাবো।'

দাদা তাঁর মোটা লেন্সের চশমায়, খয়েরি উজ্জ্বল চোখে অবাক হয়ে তাকিয়ে বললেন, 'পায়রার মাংস খাবি?' তারপরে পায়রাগুলোর দিকে তাকালেন। পায়রাদের থেকে চোখ তুলে সাঁওতাল মেয়েটির দিকে। আমাকে বললেন, 'তা হলে কিনে ফ্যাল।'

কিনে ফেলেছিলাম। দাম শুনে তো নিজেকে মনে হয়েছিল, 'ড্যানচিবাবু'। দাদা হাত বাড়িয়ে বলেছিলেন, 'দেখি।'

খাঁচাটা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম তাঁর দিকে। তিনি খাঁচার দরজাটি খুলতে খুলতে বলেছিলেন, 'পায়রার মাংস খাবি? খা! বলে একটি একটি করে পায়রাকে ধরে বাইরে, আকাশের দিকে ছুড়ে দিয়েছিলেন।

আমি হাহাকার করতে গিয়ে দেখেছিলাম, সাঁওতাল পরগণার হেমন্তের আকাশে পড়ন্ত বেলার রোদে, চিত্রগ্রীবের দল কেমন রঙ বাহারে উড়ে গিয়েছিল। দাদা তাকিয়েছিলেন আমার মুখের দিকে। না, অনুশোচনার কিছুমাত্র অভিব্যক্তি ছিল না তাঁর চোখে-মুখে। বরং মিটিমিটি হাসি। বলেছিলেন, 'আরও পায়রা কিনবি নাকি? চল্ দেখি, হাটে নিশ্চয় আরও পায়রা এসেছে।'

বিক্রয়িত্রী সাঁওতাল কন্যাটি, আর তার আশেপাশে, ইস্তক আমাদের অন্যান্য সঙ্গীরাও তখন হাসতে আরম্ভ করেছে। ভ্রমণে এলাম আমি। আকাশ বিহারে গেল কবুতরেরা! কিন্তু হাসিটা তখন আমার ভিতরেও সঞ্চারিত হয়েছে। সেই হল আর এক রকমের কৃষ্ণ অনুরাগীর বাগানে ভ্রমণে!

সত্যি খেই হারালাম নাকি? কথা হচ্ছিল, ভ্রমিতে চাহি আমি সুন্দর ভুবনে। ভুবনের কথা এসে গেল, গোলমালাটা সেখানে। ত্রিভুবনের কোন্ ভুবনে যাবো? ঝোলা কাঁধে নিয়ে, রেলগাড়িতে বা মোটর বাসে চাপলেই কি ত্রিভুবনের কোনও এক ভুবনে যাওয়া যায়? এবারে আমার ঠেক লেগেছে সেইখানে। এই ত্রিভুবনের সংজ্ঞাটা একটু ভিন্ন রকমের। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল, ভ্রমণের এই ত্রিভুবন এবার আমাকে

ডাক দিয়েছে। আর এই ত্রিভুবনে যেতে হলে, ঝোলা কাঁধে নিয়ে কোনও যানবাহনে চেপে যাওয়া একেবারে অসম্ভব।

বুঝতে পারছি, স্বর্গ মর্ত্য পাতাল নামেই অনেক বাংরেজ বাবাজীর মাথায় লগুড়াঘাত লাগলো। অথবা কালকূটের মস্তিষ্কের সুস্থতা বিষয়ে অনেকে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে। নয়তো হাসি পাচ্ছে। পেতে পারে। তাতেও, হাসতে গেলে কপালে ব্যথার আশংকা, আছে, নিবেদন করে রাখছি।

ভেবেছিলাম সরাসরি যাত্রা করবো দ্বারাবতী, যে-স্থানকে লোকে জানে দ্বারকা নামে। স্থান যদি দ্বারাবতী, কাল তবে কলি-সন্ধ্যা, অর্থাৎ দ্বাপরান্তর। কিন্তু কাল এবং যুগের এই বিচারটা বোধহয় অনেকেরই হাতে পানি পাবে না। আধুনিক ইতিহাসের কাল গণনার বিচারটা, আমার অনেক আগের পুরুষ থেকেই ভিন্ন পথগামী। যদি বলি পৌরাণিক মতে অষ্টাবিংশ যুগ, তবে এই নিশ্চিত ও অমোঘ কাল গণনা অনেকের কাছে ধাঁধার মত লাগবে। কারণ দোষ কারো নয় গো মা/আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা। সাহেবরা যে আমাদের শিখিয়ে গিয়েছেন, পুরাণ মানে মাইথলজি, ইতিহাস না। অতএব সে-কাল গণনা অনেকটা রূপকথার মত। হ্যাঁ, মিথ্যার স্বর্গবাসেও সুখ আছে বই কি! সুখ এই, মেনে নিলে আর পরিশ্রম করতে হয় না।

কিন্তু এ তো হল তর্কের কথা। ইতিহাস প্রমাণ চায়। তাই প্রমাণ দিই। কাঁধ থেকে ঝোলাটা রেখে, এবার মন চল যাই দ্বারাবতী। সেখানে কে আছেন? বাসুদেব। যাদবশ্রেষ্ঠ, তিনি কেবল নরপতি নন, কালান্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। কালের হিসাবটা কী? তাঁর জন্মকালের হিসাবে সময়টা এক হাজার চারশো আটান্ন খ্রিস্ট পূর্বাব্দ। এই হিসাবটা আধুনিক ঐতিহাসিক কাল গণনা। পুরাণের অষ্টাবিংশ যুগ, কলির সন্ধ্যা। কেউ বলেছেন দ্বাপরান্তর। যিশুখ্রিস্টের মত যদি কৃষ্ণ জন্মাব্দ বা কৃষ্ণাব্দ গণনা হতো, তা হলে এই যিশুজন্মের উনিশশো সাতাত্তর সালকে বলা যেতো তিন হাজার চারশো পঁয়ত্রিশ সাল।

বিশেষ কাল নির্দেশে আরও কিছু অতীতে যাবো নাকি? কিন্তু পণ্ডিত মশাইদের ভ্রূকুটি আর তর্ককে যে বড় ভয় লাগে! এই সেদিনই তো রাম-রামায়ণ নিয়ে তর্ক বিতর্কের ধুন্ধুমার লেগে গিয়েছিল। ধুন্ধুমার! কথাটা কতো সহজেই না আমরা কাজে লাগিয়ে ফেলেছি। আসলে ধুন্ধু নামক দৈত্যের যিনি নিধনকারী, তাঁরই নাম ধুন্ধুমার। ধ্বনির গুণ বটে। বিশেষণকে লাগিয়ে দিলাম ক্রিয়াবাচক শব্দে। তবে আমার প্রণাম সদ্য স্বর্গত আচার্য সুনীতিকুমারকে। প্রণাম রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক মহাজনকে এবং আরও সকলকে। কিন্তু আমি তর্কে নেই। বিদগ্ধজনের রচনার পথ ধরে আমার এবারের যাত্রা।

দেখছি, শ্রীরাম ছিলেন দুই হাজার একশো চব্বিশ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে। তা হলে রামাব্দ ধরতে হয় চার হাজার একশো এক সাল। আর রামের থেকে কৃষ্ণ ছিলেন ছশো ছেষট্টি বছরের ছোট। কিন্তু কী লাভ আমার এই গণনায়? আমি অযোধ্যায় যাবো না। আমার যাত্রা দ্বারাবতীর পথে।

এই যাত্রার আগে, আমাকে আর একবার সেই বাউলের গানে ফিরে যেতে হবে। গানে দেখছি, কৃষ্ণ অনুরাগীর বাগানে, 'বাগানে পাঁচজনা মালী/যে যাঁর ঠাঁইয়ে বস্যে আছেন/পাঁচ মাথার মোড় আগুলি।'...এখন এই বুঝহ রসিকজন, এই পাঁচজনা মালী কারা, পাঁচ মাথার মোড় আগলিয়ে বসে আছেন? কথায় ধন্দ আছে বটে, কিন্তু দ্বন্দ্ব নাই, এযাঁরা হলেন বাউলের প্রতীক পঞ্চেন্দ্রিয়। দেহতত্ত্বে এমন প্রতীক বিস্তর। আমার এক কলসীতে নয়টি ছিদ্রি/কেমনে জল ধরি ভরা কলসীর ভিত্রি।...এও বোধ হয় সেই নবম দলের নয়টি নাড়ির প্রতীক। এমন প্রতীক কথায় কথায়। ষোল ঘর থেকে চৌষট্টি ঘরও মেলে। আবার ত্রিবেণীতে ডুব দিয়ে মীন ধরবার জালও বাঁধে।

আসলে, এসব হল, মূলে যাবার প্রস্তুতি। সিদ্ধির প্রমাণ-পথের দ্বারের যথাযথ খেলা বন্ধ। বলবো নাকি, সাধনার মুখবন্ধ? তা হলে আমার গীত গাইবার সুবিধা হয়। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দ্বারাবতী যাবার আগে, পুরাণ যে ইতিহাস, তার যুক্তির ধন্দ কিঞ্চিৎ কাটানো দরকার। কাটান করবার আমি কেউ না, স্বয়ং পুরাণকাররাই তার কাটানদার। পুরাতনস্য কল্পস্য পুরাণানি বিদুর্বুধাঃ। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ পুরাণকে প্রাচীনকালের বিবরণ জ্ঞানেই অবগত আছেন।

জ্ঞানীর সঙ্গে আমার মত অর্বাচীনের ফারাক হল, আমি সংশয়ী। আমার যুক্তি চাই। প্রমাণটা চাই আগে নিজের। খুঁজতে গিয়ে দেখছি, খ্রিস্টজন্মকালকে যাঁরা কালবিন্দু হিসাবে ধরেছেন, কৃষ্ণজন্মকালকে তাঁরা খ্রিস্ট পূর্বাব্দে ভাবতে আপত্তি করছেন। এ আপত্তিটা কুসংস্কার, কারণ পুরাণকার দেখছি যুগমানের দ্বারা কাল নির্ণয় করেছেন। ফলে তাঁদের বিসি এডি নেই। একজন বলেন এক হাজার ছেষট্টি খ্রিস্টাব্দে রাজা উইলিয়ম ছিলেন। আর একজন বললেন কৃষ্ণ অষ্টাবিংশ যুগে ছিলেন।

সৃষ্টি, প্রলয়, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিত পুরাণের কাছে এই পাঁচ বিষয় ইতিহাসের মূল উপাদান। তার বিশ্বাস, যে দেশ প্রথম সৃষ্ট হল, তখন থেকেই তার হিস্টরি (পুরাণ) বা ইতিবৃত্ত লেখা হওয়া উচিত। ইংল্যান্ডের ইতিবৃত্ত কেউ কেউ নিওলিথিক ও পোলিওলিথিক অধিবাসীদের দিয়ে শুরু করেছেন। তারও আদিমকালের অতীতে যেতে হলে, ভূতত্ত্বের কথা আসে। ওয়েলস্ তাঁর ইতিবৃত্ত সেখান থেকেই শুরু করেছিলেন। অনেকটা পুরাণের মতই। কিন্তু হিসাবের কালবিন্দু যিশু জন্মকাল। পুরাণের কি কোনও কালবিন্দু নেই? নেই। তার আদিবিন্দু আছে, তাকে বলা হয়েছে মানবকল্পের আদিবিন্দু। স্বয়ম্ভূব মনুকাল, পাঁচ হাজার নশো আটান্ন খ্রিস্টপূর্বাব্দ। এই আদিবিন্দুর অতীতে আর কিছু নেই। থাকলেও তা ইতিবৃত্তে আসেনি।

মুশকিল! বলে তো যাচ্ছি ইতিবৃত্ত। বিষয়টা কী? পণ্ডিত বলছেন, ইতিবৃত্ত শব্দের অভিধা ইতিহাস শব্দের অনুরূপ হওয়ায়, তা হিস্টরি অর্থে অচল। হিস্টরির সংস্কৃত অর্থ ইতিবৃত্ত। ইতিহাস শব্দের অর্থ, সংস্কৃতে আর বাংলায় ভিন্ন। পুরাণের বিচারে ভুলের সম্ভাবনায় ভরা। ইত অর্থে যা গত হয়েছে, বৃত্ত অর্থে বর্ণনা। ইতবৃত্ত, এই পারিভাষিক প্রয়োগে ভুলের সম্ভাবনা নেই।

দ্বারাবতী ভ্রমণে যাবার দেখেছি বিস্তর ঝকমারি। পথঘাটের নিশানা পাওয়া ভারি দুষ্কর। পথ চিনে যাওয়ার হাজার হাজার বছরের কাঁটা। কাঁটা না, কালের স্তর। অথচ ঠিক ঠিক পথে যাচ্ছি কি না, সে-সংশয়ে হোঁচট খাচ্ছি বারে বারে। কিন্তু সংশয় না ঘুচিয়ে উপায় নেই। দিঙ নির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে অতএব পথ বন্ধন করো। যার নাম যুক্তিতে হদিস।

আমি নৈয়ায়িক না, ন্যায়শাস্ত্রের কূট চালেও নেই। পুরাণের ইতিবৃত্তের পথই আমাকে খুঁজে নিয়ে যেতে হবে। পুরাণকারের কথা আগেই বলেছি, তাঁদের ইতিবৃত্তের লক্ষণ বা উপাদান সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিত। সর্গ বোঝায় বিশ্বের সৃষ্টি, প্রতিসর্গ প্রলয়। রাজা ঋষি প্রধান ব্যক্তিগণ দেবতা দৈত্যগণের বংশের উৎপত্তি স্থিতি বিলোপ আর বংশানুক্রম। বংশ শব্দের অর্থ ইংরেজিতে কি ডাইনাস্টি? হ্যাঁ একেবারে, সম্যক বংশ বর্ণনা। মন্বন্তর এখানে 'দুটো ভাত দাও মা' দুর্ভিক্ষের অর্থে না। মন্বন্তর মনুকাল। কাল

গণনার জন্যই যুগকাল আর মনুকাল পুরাণকারেরা ধরে নিয়েছেন।

এই ইতিবৃত্তকারগণ কারা? দেখছি, পুরাকালে প্রত্যেক রাজার নিজের ইতিবৃত্তকার থাকতেন। এঁদের বলা হতো মাগধ। এঁদের কাছ থেকে বিভিন্ন রাজবংশের বিবরণ সংগ্রহ করতেন সূতগণ। এই সূতেরাই হলেন খাঁটি লোক, কোনও বিশেষ বংশের পোঁ ধরা ছিলেন না। মিথ্যাকে কাট-ছাঁট করতে জানতেন। তাঁদের বিবরণ পুরাণের মূল ভিত্তি। তাঁরা এক একজন ছিলেন স্যার যদুনাথ সরকার। সূত ঋষিগণকে বলছেন, আপনাদের দ্বারা পুরাণ কথনে প্রণোদিত হয়ে আমি নিজেকে পবিত্র আর অনুগৃহীত বোধ করছি। আমার স্বধর্ম, দেবতা আর ঋষিগণের, অমিততেজসম্পন্ন রাজাদের, খ্যাতনামা মহাত্মাদের বংশবৃত্তান্ত জানা এবং ধারণ করে রাখা। কিন্তু বেদে আমার কোনও অধিকার নেই। অথচ পুরাণ বেদসম্মিতম্।

বেদের আগে পুরাণ। আমি আদি পুরাণে যা শুনেছি, মহাত্মা ঋষিগণ যা বলেছেন, পরাশরপুত্র গুরু দ্বৈপায়ন অতি কষ্টে যা নির্ণয় করে গিয়েছেন, ঠিক যেমনটি শুনেছি, তেমনটি আপনাদের শোনাই। আমাকে (আমাদের) বলা হয়েছে, অতিশয় বিশ্বাসভাজন বিদ্বান লোমহর্ষণ সূত। আমি যে-কথা যেমনভাবে শুনেছি ঠিক সেইভাবেই বলি। আমার স্বধর্মের সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য সত্যব্রতপরায়ণতা, বিশ্বস্ততা। আমি নির্ভীক, ক্ষমতাবানদের ভয় করি না। রাজনৈতিক কারণে, কোনও নেতা রাজা বা বংশের কাছ থেকে ঘুষ খাই না।

আমি সাধারণের উপযোগী আর লোকহিতার্থে, ভাষাকে যথাসম্ভব সরল করি।

আহা, বুঝেছি হে। পুরাণের অতিরঞ্জন আর অত্যুক্তির কথা বলবে তো? ভ্রূকুটি সন্দেহ দেখেই তা বুঝতে পেরেছি। দেখ, পক্ষপাতবশে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে 'ইতিহাস' লেখকগণ যে-সব অতিরঞ্জন কথা বলেন, এঁদের বলার গুণে মিথ্যা সহজে ধরা পড়ে না। আমাদের অতিরঞ্জন একেবারে জ্বলজ্বল করে, ধরিয়ে দিতে হয় না। সেইজন্যই এত সন্দেহ। কিন্তু আমাদের বৈশিষ্ট্যগুলো মানবে তো? আমাকে তুমি চসার সাহেব বলে ধরে নিলে সব গোলে হরিবোল্ হয়ে যাবে। ধরো, আমি বললাম, রাম পনরো বছর বয়সে সীতাকে বিয়ে করলেন, সাতাশ বছর বয়সে বনে গেলেন, বিয়াল্লিশ বছর বয়সে অযোধ্যায় ফিরে রাজ্যে অভিষিক্ত হলেন। তারপর? তারপরেই বললাম, রাম একাদশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করে স্বর্গারোহণ করলেন।

তোমার যতো সন্দেহ আর অবিশ্বাস, এই শেষের কথায়, কেমন না কি? বিয়াল্লিশ বছর পর্যন্ত সবই ঠিক ছিল। তারপরেই একেবারে এগারো হাজার বছর! কেন, তোমরা কি কীর্তিমানকে আশীর্বাদ বা গৌরব করে বলো না, 'হাজার বছর পরমায়ু হোক!' পশ্চিমের লঙ্‌লিভ-কে তোমরা তোমাদের প্রিয়জন অমুক গান্ধী আর তমুক বসুকে, খুশির উত্তেজনায় বলো, যুগ যুগ জীও। ভালই জানো হাজার বছরের পরমায়ু নিয়ে কেউ জন্মায় না, যুগ যুগ জীইয়েও কারোকে রাখা যায় না। তবু তো বলা। আর বলাটা শিখিয়েছি আমরাই। মহত্ত্ব বীরত্ব সুকৃতি অতুলনীয় কীর্তির গৌরব করতে হলে, আমরা এমনই অতিশয়োক্তি করি। তাহলে রামের মত একজন রাজার এগারো বছরের রাজত্বের আশ্চর্য ঘটনাবহুল কীর্তিকে এগারো হাজার বলতে দোষ কী?

'পুরাণের অতিরঞ্জনের এটি একটি চাবিকাঠি বলে জানবে। এই 'হাজার' হল উপলক্ষণ প্রয়োগ। যেমন আরও দু-একজনের কথা বলি। কার্তবীর্যার্জুন পঁচাশি হাজার বছর বেঁচেছিলেন। অলর্ক ছেষট্টি হাজার বছর রাজত্ব করেছিলেন। হাজারের উপলক্ষণ সরিয়ে দেখবে, কার্তবীর্যার্জুন পঁচাশি বছর বেঁচেছিলেন। অলর্ক ছেষট্টি বছর রাজত্ব করেছিলেন। এও কীর্তিরই গৌরব। যে-দেশে, যাদের যেমন। পৃথি বীর আর কোন দেশে তুমি এমন আশীর্বাদ শুনেছো, হাজার বছর বাঁচো। শত পুত্রের জননী হও।

'আর একটা কথা তোমাদের শোনাই। 'দিবি আরোহণ' বলে একটা কথা আছে। এসব শুনলে, তোমার কুসংস্কার ঘুচবে, সত্যকে জানতে পারবে, পুরাণকে বিস্মিত শ্রদ্ধায় প্রণাম জানাতে শিখবে। এর নাম জ্ঞান। দিবি আরোহণ, মানুষেরই দেবত্বলাভের কথা। উত্তম মানুষ প্রতিলোম ক্রিয়ায় দেবতা হন। প্রতিলোম ক্রিয়ার আশ্চর্য সূত্র হল, উত্তম মানুষ প্রথমে মানুষ রূপেই পূজিত হন, তারপরে তিনি দেবতা হন, তারপরে তাঁকে জ্যোতিষ্ক রূপে কল্পনা করা হয়।

'যেমন ইন্দ্র একাধিক এবং সকল ইন্দ্রই প্রথমে মানুষ ছিলেন, পরে দেবতা তাপরপরে সূর্য। দিবি আরোহণের এই সূত্র না মানলে ঋক্‌বেদের ইন্দ্র বিষয়ক সমস্ত সুক্তগুলোর সরল অর্থ পাওয়া যাবে না। মানুষ দেবতা আর সূর্য এই তিনরকমেই ইন্দ্রের কীর্তিকলাপ ঋক্‌বেদে বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণ মানুষ, কৃষ্ণ নারায়ণ, কৃষ্ণ সূর্য। ধ্রুব মানুষ, ধ্রুবই আবার জ্যোতিষ্ক। সুক্তগুলোকে যিনি জ্ঞান আর বুদ্ধির দ্বারা সূক্ষ্মভাবে পাঠ করেন, তিনিই দেবতার মনুষ্যত্ব নির্ণয় করতে সক্ষম।

'তোমার যাত্রা দ্বারাবতী। তোমাকে আমি কয়েক হাজার শ্লোক শোনাবো না। দেবতা কারা, স্বর্গ কোথায়, এই পথ বন্ধন করে নিতে পারলে তোমার যাত্রা যথার্থ হবে। আগে দেবতার পরিচয় হোক। আমি প্রাকৃতিক শক্তির অভিমানিনী দেবতার কথা বলেছি। এখন যে-দেবতার কথা বলছি তাঁরাই দেব দৈত্য ইত্যাদি নামে পরিচিত। তোমরা এখন সকল জাতিকেই মানুষ বলো। আমি মনুবংশীয়দের প্রতি একমাত্র মানুষ শব্দ প্রয়োগ করেছি। অন্যান্য জাতি হলেন, দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, সর্প নাগ সিদ্ধ যক্ষ রক্ষ ইত্যাদি। অসুরেরা ছিলেন দেবতাদের জ্ঞাতি ও বন্ধু। 'সিসৃক্ষোর্জঘানাৎ পূর্বমসূরা জাজ্ঞিরে ততঃ, ততঃ পুরা।' স্বয়ম্ভুব মনুর আদিবিন্দু থেকে আমরা ব্রহ্মাকেই সৃষ্টিকর্তা বলে জেনেছি। তিনি প্রথমে অসুরদের সৃষ্টি করেছিলেন, শ্লোকটা তাই শোনালাম। তারপরে দেবতা, পরে পরে পিতৃগণ, মানুষ, যক্ষ রক্ষ সর্প গন্ধর্ব। ঋক্‌বেদে কোনও কোনও জায়গায় ইন্দ্রকে অসুর বলা হয়েছে। অনেকটা, তোমরা যখন কারোকে বলো, লোকটা অসুর সেইরকম ভাবে। অসুরেরা ছিলেন অতি শক্তিশালী জাতি। দেবতাদের কোনও কোনও জ্ঞাতিবর্গ পরিবর্তীকালে নিজেদের অসুর বলেই পরিচয় দিতে পছন্দ করতেন। কিন্তু দেবতাদের দায়াদ বন্ধু বললেও অসুরদের সঙ্গে দেবতাদের ইন্দ্রত্ব নিয়ে বিবাদ বিসম্বাদ প্রায়ই লেগে থাকতো।

'আমি কী বলি জানো? পুরাণের সাহায্য ছাড়া বেদের অর্থ কখনো সুগম হয় না। আমি সূত, আমি যদ্দৃষ্টং বর্ণনা করি, যথাশ্রুতি বলি, ঋষি লেখেন। আমি বলি, যে পুরাণ জানে না, বেদ তার কাছে প্রহৃত হবার আশংকা করেন।

'আমি তোমাকে একজন ইন্দ্রের কাহিনী বলবো। বিভিন্ন ইন্দ্রের কীর্তি এঁর ওঁর ঘাড়ে চেপে অনেক সময়েই গোল বাধিয়েছে। আমি যাঁর কথা বলছি এঁকে বলা হতো, বৃত্রহন্তা বজ্রধারী, পুরন্দর ইন্দ্র। বিরাট যোদ্ধা ছিলেন। পুরন্দর অর্থে যিনি পুরী ধ্বংসকারী। অসুরদের অনেক নগর ইনি ধ্বংস করেছিলেন।

'ঝটিতি তোমাকে একটা কথা বলে রাখি। তোমাদের কালে

কোনও কোনও পণ্ডিত মহেন-জ-দরো সভ্যতাকে প্রাক্ আর্য দ্রাবিড় সভ্যতা বলে দাবী করেছেন। না জেনে করেছেন, আসলে ভিত্তিহীন অনুমান এবং আন্দাজ। অনুমানে প্রমাণসিদ্ধি হয় না। মহেন-জ-দরো আবিষ্কার পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভাল। তখন স্বর্গ এবং ইন্দ্রদের ইতিবৃত্ত আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে। আরও বলে রাখি, দেবতারা মানুষ ছিলেন। কথাটা আগেও বলেছি। পুরন্দর ইন্দ্রও একজন বীর মানব। জাতিতে দেবতা।

'তোমাদের একজন সুবিখ্যাত পণ্ডিত, ঋকবেদসংহিতার অনুবাদক রমেশচন্দ্র দত্ত, মানুষ ইন্দ্রের দেবত্ব বিষয়ে অনেকগুলো ঋকের অনুবাদ করেছেন। আমি কয়েকটি তোমার সামনে তুলে ধরছি:

'হে অশ্বযুক্ত ইন্দ্র, ত্বরান্বিত হয়ে স্তোত্র গ্রহণ করতে এস। এই সোম অভিষবযুক্ত যজ্ঞে আমাদের অন্ন ধারণ কর।'

'হে সোমপায়ী ইন্দ্র, আমাদের অভিষবের নিকট এস, সোম পান কর। তুমি ধনবান, তুমি হৃষ্ট হলে গাভী দান কর।'

'হে শতক্রতু, এই সোম পান করে তুমি বৃত্র প্রভৃতি শত্রুদের বিনাশ করেছিলে। যুদ্ধে (তোমাদের ভক্ত) যোদ্ধাদের রক্ষা করেছিলে।

'হে ইন্দ্র, দৃঢ় স্থাপনে ভেদকারী এবং বহনশীল খরুৎদের সঙ্গে তুমি গুহায় লুকিয়ে রাখা গাভী সমুদয় খুঁজে উদ্ধার করেছিল।'

'যুবা মেধাবী প্রভূতবলসম্পন্ন সকল কর্মের ধর্তা ব্রজযুক্ত বহুস্তুতিভাজন ইন্দ্র (অসুরদের) নগরবিদারকরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।'

'বজ্রধারী ইন্দ্র প্রথমে যে পরাক্রমের কাজ করেছিলেন, তাঁর সেই সব কাজের বর্ণনা করি। তিনি অহিকে (মেঘকে) হনন করেছিলেন, পরে বৃষ্টিবর্ষণ করেছিলেন, বহনশীল পার্বতীয় নদীসমূহের (পথ) ভেদ করে দিয়েছিলেন।'

'সব সূক্তগুলো শোনাতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে। দ্বারাবতী যাত্রার জন্য তুমি অতি ব্যস্ত হয়েছ। এবার আমি আর কয়েকটি সূক্ত শোনাবো, তারপরে ব্যাখ্যা করব, এসব সূক্তের অর্থগুলো। এবার শোনো, ইন্দ্রও নিজের বজ্র নিজে হেনে, কেমন ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।'

'হে ইন্দ্র, অহিকে হনন করার সময় যখন তোমার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল, তখন তুমি অহির কোন হন্তার জন্য অপেক্ষা করছিলে, যে ভয় পেয়ে শ্যেন পাখির মত নবনবতি নদী ও জল পার হয়ে গিয়েছিল।'

'তুমি শুষ্ণ (অসুরের) সঙ্গে যুদ্ধে কুৎস ঋষিকে রক্ষা করেছিলে, তুমি অতিথিবৎসল (দিবোদাসের রক্ষার্থে) শম্বর (নামক অসুরকে) হনন করেছিলে। তুমি মহান অর্বুদ (নামক অসুরকে) পদদ্বারা আক্রমণ করেছিলে, অতএব তুমি দস্যুহত্যার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছ।'

'ত্বষ্টা তোমার যোগ্য বল বৃদ্ধি করেছেন, এবং তাঁর পরাভবকারী বল দ্বারা বজ্র তীক্ষ্ণ করেছেন।'

'ইন্দ্র পৃথিবীর ওপরে স্থাপিত মধুর উদকপূর্ণ যে-চারটি নদী জলপূর্ণ করেছেন, তা সেই দর্শনীয় ইন্দ্রের অতিশয় পূজ্য ও সুন্দর কর্ম।'

'তিনি বৃত্রকে বধ করে তন্নিরুদ্ধ বারি নির্গত করেছিলেন।'

'তিনি সুদর্শন, সুন্দর নাসিকাযুক্ত ও হরি নামক অশ্বযুক্ত, তিনি আমাদের সম্পদের জন্য দৃঢ়বদ্ধ হাতে লৌহময় বজ্র স্থাপন করলেন।'

'অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দ্র দধীচির (মূলে ঋষি নামের উল্লেখ নেই) অস্থি দ্বারা বৃত্রগণকে নবগুণ নবতিবার বধ করেছিলেন।'

'নদীসমূহ যার নিয়মানুসারে বহে যায়।'

'যিনি মহতি সেনার নায়ক তিনিই ইন্দ্র।'

'তিনি বজ্রের দ্বারা নদীর নির্গমদ্বার সকল খুলে দিয়েছিলেন।'

'ইন্দ্র নিজ মহিমায় সিন্ধুকে উত্তরবাহিনী করেছেন।'

'তুমি বদ্ধ সিন্ধুগণকে উন্মুক্ত করেছ।'

'আমি সূত, পুরাণকারের একমাত্র বাহন। আমি বলি, এই যে আশ্চর্য বলবীর্যশালী পুরুষ, স্বাভাবিক দিবি আরোহণের ফলে, ইনিই আন্তরীক্ষ দেবতা কল্পিত হন। যেমন তাঁদের অনেকের পরে রাম বা কৃষ্ণ ভগবান হয়েছিলেন। যেমন পরে তোমরা দেখেছে, নবদ্বীপের নিমাই মিশ্র নিজ মহিমায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয়েছিলেন। এখন রামকৃষ্ণ পরমংসদেব ভগবান। আমি তো দেখি, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী উৎসবের তুলনায় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ সুভাষ বসুর জন্মদিনের উৎসব আয়োজন পূজা কিছুমাত্র কম নয়।

'এখন এই পুরন্দর ইন্দ্রের বিষয় বুঝতে পারলে? তাকে বিশেষভাবে বৃত্রহন্তা বলা হয়। এই বৃত্রকে বলা হয়, হিরণ্যকশিপুর কন্যা রমা ও মহর্ষি ত্বষ্টার ছেলে। আমি জানি, ত্বষ্টা নামে একাধিক গুণী ব্যক্তি ছিলেন। যদিও ঋক্‌বেদে বলা হয়েছে, ত্বষ্টাপুত্র বৃত্রকে ইন্দ্র নিহত করেছিলেন। কিন্তু তার আগে বৃত্র তদানীন্তন ইন্দ্রকে আঠারোবার পরাজিত করেছিলেন। স্বর্গের সম্রাটদের 'ইন্দ্র' বলা হয়, অতএব তাঁর কাছে এই পরাজয় ছিল অত্যন্ত অসম্মানজনক ও হৃদয়বিদারক।

'আমার মনে হয়, পুরন্দর ইন্দ্রের বিশেষ কীর্তিসমূহ শোনাবার আগে তোমাকে স্বর্গের অবস্থানটা জানানো দরকার। আমি সূত, স্বর্গের ঠিকানা আমার জানা আছে। ভারতের উত্তরে হিমালয়। হিমালয়ের উত্তরে হেমকুট, তার দক্ষিণে কিম্পুরুষবর্ষ। হেমকূটের উত্তরে হরিবর্ষ। হরিবর্ষের উত্তর সীমা নিষধ পর্বত। নিষদের উত্তরে 'ইলাবৃতবর্ষ'। ইলাবৃতের উত্তরসীমা নীলাচল।

'এই ইলাবৃতবর্ষ, তোমাদের এখনকার মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত। আধুনিক পামির পূর্বতুর্কীস্থান ইলাবৃতবর্ষের অন্তর্গত। এই ইলাবৃতবর্ষেরই অপর নাম 'স্বর্গ'। তোমাদের কে একজন কবি যেন লিখেছেন, 'কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর/ মানুষেরই মাঝে স্বর্গ নরক, মানুষেতেই সুরাসুর।' আসলে এই কবিও স্বর্গ নরকের একটা কল্পনা করেছিলেন, কিন্তু ভৌম স্বর্গের ভৌগোলিক অবস্থান জানতেন না।

'পুরাকালে এই ইলাবৃতবর্ষ অতি সমৃদ্ধ স্থান ছিল। পরে নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে, নদনদী শুকিয়ে তথাকার সভ্যতার লুপ্ত হয়। আরও একটা কারণ, জনাকীর্ণ অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল। অতএব ভারতবর্ষে আগমন।

'আমি জানি যেখানে বলি যজ্ঞ করেছিলেন, সেই সুবিস্তৃত প্রদেশের নাম ইলাবৃতবর্ষ। এই স্থান দেবগণের জন্মস্থান। তাঁদের বিবাহ, যজ্ঞ, জ্ঞাতকর্ম, কন্যাদান প্রভৃতি যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ এই প্রদেশেই অনুষ্ঠিত হয়। দেবগণ আধুনিক তুর্কীস্থান থেকে কাশ্মীরের পথে পাঞ্জাব, পাঞ্জাব থেকে বিন্ধ্যাচলের উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত অধিকার করেন। তারপরে বিন্ধ্যের দক্ষিণেও অগ্রসর হন। বলতে গেলে, আস্তে আস্তে তাঁরা সারা ভারতবর্ষেই ছড়িয়ে পড়েছিলেন। আমি এইভাবে ভাগ করি, ইলাবৃতবর্ষ কাশ্মীর বিন্ধ্যোত্তর ভারত এবং দক্ষিণাপথ পর্যায়ক্রমে স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, মর্ত্য, পাতাল নামে পরিচিত।

ভারতীয়দের পূর্বপুরুষেরা প্রথমে কাশ্মীর বা অন্তরীক্ষে এসে বাস করেন তাই তার অপর নাম পিতৃলোক।

'দেবগণ যখন প্রথমে ভারতে এলেন, তখন তাঁরা ইন্দ্রের অধীন ছিলেন। ভারতে তখন কেউ রাজা ছিলেন না। দেবগণ ভারতে এসে মানব জাতি হলেন, কারণ ইন্দ্রের প্রতিভূর নাম হল মনু বা প্রজাপতি। পরে ভারতে রাজা হয়ে, বেণরাজা প্রথম ইন্দ্রের বশ্যতা অস্বীকার করেন। ইলাবৃতবর্ষই যেহেতু আদি বাসস্থান, অতএব পবিত্র তীর্থভূমি বিবেচিত। যুধিষ্ঠিরের সময়েও স্বর্গে তীর্থযাত্রার প্রচলন ছিল। স্বর্গের পথ ক্রমেই দুর্গম হয়ে পড়ে। আর দিবি আরোহণের ফলে, স্বর্গ মৃত পুণ্যাত্মাদের বাসস্থান কল্পিত হয়েছে, দেবযান পরিণত হয়েছে নক্ষত্রবীথিতে। এখন স্বর্গপ্রাপ্তি মৃত্যুর নামান্তর। আমি মৎস্যপুরাণে একজন ইন্দ্রকে 'হীনচেতা' বলেছি, কারণ সে সামরিক কারণে, যখন থেকে বজ্র দ্বারা স্বর্গপথ রোধ করেন, তখন থেকে লোক সকলের স্বর্গমার্গ নিবারিত হয়। তার মানে পাহাড় ধসিয়ে পথরোধ করা হয়। এই পথ ছিল মধ্য এশিয়া আর ভারতে যাতায়াতের বণিকপথ। কিন্তু স্বর্গ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা অমর, অতএব দেবযান পথ বন্ধ হয়ে গেলেও বদরীনারায়ণ আর মানস সরোবরের পথে অনেকে স্বর্গে যেতো। যুধিষ্ঠিরকে এই পথেই যেতে হয়েছিল। এই সেই কৈলাসপতি রুদ্র– অর্থাৎ শিবের রাজত্ব। তিব্বতে চিরকালই ভূত প্রেতের নাচ প্রসিদ্ধ। এরা শিবের অনুচর। ইন্দ্রের অনেক পরে শিবও ঋষিদের যজ্ঞভাগী হন।

'মনে রেখো স্বর্গেরও উত্তর কুরুতে ছিল ব্রহ্মলোক আর বিষ্ণুলোক। আর ভারতীয়দের মতই, স্বর্গের দেবতাদের আকাঙ্ক্ষণীয় তীর্থ ছিল ব্রহ্ম ও বিষ্ণুলোক। দেবতারা নিজেদের সেই লোকেরই অধীন মনে করতেন। এখন তুমি এই দুই লোকের সন্ধানে কাসপিয়ান সাগরের কূলে কিংবা সাইবেরিয়ায় যেতে পারো, সন্ধান মিললেও মিলতে পারে। স্বর্গের নেতা অধিপতি ইন্দ্রগণ বিপদে পড়লে বিষ্ণুর পরামর্শ নিতেন। একাধিক ইন্দ্রের মত, বিষ্ণু বরুণ মিত্রও একাধিক।

'ভারতের বিন্ধ্যাচলের উত্তর ভাগের নাম পৃথিবী বা মর্ত্য। পৃথু রাজার রাজ্যই পৃথিবী। বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণভাগ পাতাল। পাতালকে আমি ভূবিবর বলেছি, দক্ষিণদেশও বলেছি। পাতালেরও সাত ভাগ আছে। আমি পাতালের সাত ভাগে দেখেছি বহু সুন্দর নদ নদী উপবন আর নগর। নারদ বলেছেন, পাতাল স্বর্গাপেক্ষাও মনোরম।

'দ্বারাবতীর কোন উপাখ্যান তুমি বলবে, জানি না, কিন্তু পাতালের বর্ণনা শুনে রাখো। অতল– ময়পুত্র মহামায়ার রাজত্ব। বিতল– হাটকেশ্বর হর। সুতল– বৈরোচন বলি। তলাতল– ময় ত্রিপুরাধিপতি। মহাতল– সর্পজাতি। রসাতল– দানবজাতি। পাতাল– নাগজাতি। অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ– সুতল। আমি পাতালের অধস্তন প্রদেশে সংকর্ষাগ্নি দেখেছি। যবদ্বীপের আগ্নেয়গিরির কথা মনে রেখো। একটা হিসাব দিয়ে রাখি, বলির রাজ্যকাল, তিন হাজার চারশো সাতান্ন খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ। কপিল পাতালবাসী ছিলেন।

'পুরাণের ইতিবৃত্ত প্রমাণের একটি আশ্চর্য ঘটনা এখানে শোনাই। সগরের বংশধর ছেলে অসমঞ্জ এবং আরও ষাট হাজার ছেলে পাতালে কপিল শাপে বিনষ্ট হয়, এ আমারই কথা। ষাট হাজার অশ্ববাহিনীকে আমি যজ্ঞীয় অশ্ব বলি। সগর অশ্বচোরের সন্ধানে যাদের পাঠালেন, তারা ঘোড়ার খুরের চিহ্ন দেখে দেখে, কপিলের কাছে উপস্থিত হয়ে, তাকেই চোর ভেবে ধরতে গিয়ে কপিলের অগ্নিপিঙ্গল বর্ণের দিকে তাকিয়েই অভিশপ্ত হয়ে মারা গেল। তখন সগর পৌত্র অংশুমানকে অশ্বের সন্ধানে পাঠালেন। অংশুমান সাবধানী, তিন কপিলকে খুশি করে যজ্ঞীয় অশ্বসকল নিয়ে পিতামহকে ফিরিয়ে দিলেন। অংশুমানের ছেলের নাম দিলীপ। দিলীপের ছেলের নাম ভগীরথ।

'জানো তো ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন করেছিলেন। আসলে, তোমাদের ভঙ্গিতে বললে, বলতে হয়, ভগীরথ একজন ইরিগেশনের বীর এঞ্জিনীয়র যিনি গঙ্গাকে খাল কেটে সুদীর্ঘ পথে সাগরে মিশিয়েছিলেন। সগর বংশের এইটি একটি মহান কীর্তি। সগর খাল কাটিয়ে গঙ্গাকে ভিন্ন পথে প্রবাহিত করতে চেয়েছিলেন। সেই জন্য প্রথমে বংশধর পুত্র অসমঞ্জ এবং আরও ষাট হাজার অশ্বারোহী পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন। লক্ষ্য রেখো, অসমঞ্জ 'বংশধর পুত্র', বাকিরা কেবলই 'পুত্র'। এটাই আমাদের–সূতদের বৈশিষ্ট্য। ষাট হাজার খননকারী কর্মীকেও আমরা সগর পুত্র বলে উল্লেখ করলাম, কিন্তু বংশধর পুত্র বললাম না।

'তা হলে দেখা যাচ্ছে, অসমঞ্জ, তারপরে অংশুমান। তারও পরে অংশুমানের পৌত্র ভগীরথ আবার সেই খাল খননের কাজে লাগলেন। কিন্তু কে কপিল। কিসে এত বিস্তর লোক মারা গেল?

'কৃষ্ণ একবার বলরাম আর প্রদ্যুম্নকে সঙ্গে করে বাণরাজ্য থেকে অনিরুদ্ধকে উদ্ধার করতে গিয়ে মাহেশ্বর জ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। বাণরাজ্য আধুনিক আসাম। মহেশ্বর জ্বর শুনলেই ব্যাধির নাম মনে আসে আর সেই ব্যাধি অতি ভয়াবহ দৈত্যের থেকেও ভয়ঙ্কর।

'বাঙালিরা দক্ষিণের ম্যালেরিয়ার কথা কখনো ভুলবে না। যকৃতের দোষ, চোখ হলদে আর বিভীষিকাময় জ্বর। পিঙ্গলবর্ণ কপিলের ইঙ্গিত সেখানেই। ঘোড়াগুলো চরে বেড়াচ্ছিল, ষাট হাজার খননকারী মরে পড়েছিল। অতএব কপিলকে সাধনা করেই সাধ্যায়ত্ত করতে হয়। অসমঞ্জ থেকে ভগীরথ তিন পর্যায়কাল ব্যবধান–আমার হিসাবে পঁচাশি বছর সময় লেগেছিল। তাই আমি গঙ্গাকে একটি নতুন নাম দিলাম ভাগীরথী। সগরের নামানুসারে, সমুদ্রকে সাগর। এই বিশাল আর পুণ্য কর্মের জন্য গঙ্গাসাগর বিন্দুকে তীর্থ বোধ করলাম, আনন্দে অবগাহন করলাম। কিন্তু কপিলের স্থান তাই দুরন্ত শীতে পৌষ সংক্রান্তির দিন ধার্য। অন্য কোনও ঋতুতে নয়, কপিল ক্ষুব্ধ হতে পারেন।

'মনে রেখো, এই কপিল, সাংখ্যকার কপিল মুনি নন। ব্রহ্মা তাঁকে জন্মাতে দেখেছিলেন সৃষ্টির আদিতে। ইনি মানুষ নন। সৃষ্টির আদিতে যে হিরণ্ময় অন্ড জন্মেছিলেন আমরা তাঁকে তারই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলেছি। এক এক অস্বাস্থ্যকর সংক্রামক রোগের স্থানে, সগর সন্তানদের মত অনেক মৃত্যুর খবর তোমরাও জানো। মীরজুমলার দুই লক্ষেরও বেশি সৈন্য আসামে গিয়ে জ্বরে মারা গিয়েছিল।

'আমি জানি, পুরাকালে অনেক ব্যক্তি খাল খনন পূর্তাদি কাজে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। জানি, গঙ্গাকে খনিত খাল ভাবতে তোমার বিশ্বাসে আঘাত লাগছে। কিন্তু মানুষের কীর্তিই পুণ্য, তাঁর দিবি আরোহণ সেখানেই। এই বিশাল কর্মকে প্রণাশ করি, পুণ্যাবগাহন করি।

'তোমার দ্বারাবতী যাত্রা আর সবুর সইছে না। অথচ এসব না জেনে, যাত্রাটাও ঠিক হবে না। আসলে তোমার বাইরে ত্বরা, অন্তরে তুমি তন্ময়। এবার তোমাকে পুরন্দর ইন্দ্রের কয়েকটি কথা বলি। বৃত্রের সঙ্গে ইন্দ্র যুদ্ধে বারবার পরাজিত হয়ে খুবই অশান্তি বোধ করেছিলেন। বৃত্র যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন। তিনি ইন্দ্র আর তাঁর প্রজাবর্গকে উৎপীড়ন করার জন্য, পাহাড় ধসিয়ে চারটি নদীপথ

বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ইন্দ্র বৃত্রকে হনন করে বজ্রাঘাতে পর্বতকে বিদীর্ণ করে রুদ্ধ নদীপথ খুলে দিয়েছিলেন। তাই তিনি পর্জন্যদেব, জলমোচনকারী। সুক্তগুলোর কথা মনে করো।

'কিন্তু মানুষ কেমন করে বজ্রকে ধারণ করবেন? না, প্রাকৃতিক বজ্রকে কেউ ধারণ করতে পারেন না। তথাপি আমি দেখছি, বজ্র ইন্দ্রের আয়ুধ। এই বজ্র তোমাদের বন্দুকের মতই এক অস্ত্র ছিল। এই বজ্র সুদূরপাতী। এই অস্ত্রটির জন্য ইদ্র হতাশ হয়ে বিষ্ণুর কাছে গিয়েছিলেন। বিষ্ণু বললেন, 'এই বৃত্র অস্থিময় বজ্রের নিহত হবে।' ইন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন জীবের অস্থি দিয়ে এই বজ্র তৈরি হবে? গজ, শরভ বা অন্য কোনও জন্তুর অস্থি আবশ্যক আমাকে তা বলুন।'

'বিষ্ণু বললেন, 'সুরাধিপ, সেই জীবন শত হস্ত প্রমাণ, মধ্যে ক্ষীণ দুই পার্শ্বে স্থূল ছয় কোণ অর্থাৎ পলযুক্ত ভীষণকৃতি হওয়া চাই।' ইন্দ্র হতাশ হয়ে বললেন, 'আমার পরিচিত ত্রৈলোক্য মধ্যে এমন কোনও প্রাণীই যে দেখি না।'

'আমি তোমাকে এখন আর রূপকের কথা বলবো না। সরাসরি বলবো। বিষ্ণু বললেন, 'সরস্বতী তীরে যে বিশাল দধীচি আছেন তিনি এর দ্বিগুণ। ইন্দ্র সরস্বতী তীরে গিয়ে দধীচির দেখা পেলেন। আমি অবিশ্যি এখানে দধীচিকে বিপ্র বলেছি, এটাই আমার বৈশিষ্ট্য। ইন্দ্র গিয়ে তাঁকে বললেন, 'হে বিপ্র, আপনি ভিন্ন এত বিশাল প্রাণী আর দেখি না।' অতএব ইন্দ্র দধীচির অস্থি গ্রহণ করলেন। তাঁর করোটি অশ্বমস্তকের ন্যায় দেখতে ছিল। অস্থির অন্য অংশ না মস্তকটি চাই, আর তার জন্য ইন্দ্রকে, পাহাড়ে লুকানো শরণাবতে সরোবরে তা খুঁজে পেতে হয়েছিল।

'তোমার চোখের সামনে কি প্রাচীন প্রাণী ডাইনোসোরাসের ঘোটক জাতীয় করোটি ভেসে উঠছে? উঠলেও আমি কোনও মন্তব্য করবো না। কিন্তু অস্থি পেলেই তো হবে না। বারুদ চাই, নির্মাণ করা চাই সেই ভয়ঙ্কর আয়ুধ। তখন ইন্দ্র গেলেন আর একজন ত্বষ্টা নামক জ্ঞানীর কাছে। ইনি বৃত্রের পিতা ত্বষ্টা নন। এই ত্বষ্টার বারুদ বিষয়ে জ্ঞান ছিল। আর বারুদ তৈরি করতে জানতেন, ইলাবৃতবর্ষের সংলগ্ন ভদ্রাশ্ববর্ষে, তোমরা এখন যাকে চীন বল, সেই দেশের বিশিষ্ট গুণধরগণ।

'তোমাদের আধুনিক ভূবিজ্ঞানীরা, পূর্বতুর্কীস্থান আর তার নিকটবর্তী প্রদেশসমূহে, প্রাগৈতিহাসিক জীবের কঙ্কাল, কিছুকাল আগেও আবিষ্কার করেছেন। প্রাগৈতিহাসিক কাল বলতে, আমি সর্বদাই স্বয়ম্ভূ মনুকালের পূর্বের কথা বলি। বিলিতি বিসি এডি ইত্যাদির কথা বলি না। যে-প্রাণীর দ্বারা দেব ও মানবজাতির ইষ্ট হয়, আমরা সেই প্রাণীকেও ঋষিতুল্য জ্ঞান করি। আধুনিককালের ইতিহাস লেখকগণের সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির মূলত তফাৎ এইখানে।

'যাই হোক, বজ্রায়ুধ সৃষ্টিকারী ত্বষ্টা ভদ্রাশ্ববর্ষ থেকেই বারুদ তৈরি করতে শিখেছিলেন। তিনি দধীচীর অশ্ব করোটির ন্যায় সুবিশাল মস্তক দিয়ে যে বজ্রাস্ত্র তৈরি করে দিয়েছিলেন, তা ছিল দীর্ঘ নালিক অস্থির সঙ্গে যুক্ত। বারুদ ধাতুখণ্ড প্রস্তরাদি ঠাসা সেই বিশাল অস্ত্রের বর্ণনায় বেদ বলেছেন, বজ্রটি প্রকাণ্ড, শতপর্ব, চারপলযুক্ত।

'তোমার নিশ্চয়ই খুব কৌতূহল হচ্ছে, বৃত্র কোন্ কোন্ নদীপথ, কোথায় অবরোধ করে, ইন্দ্রকে এবং তেত্রিশ কোটি দেবতাগণকে কষ্ট দিচ্ছিল? স্বাভাবিক। আমি সে কথাও বলেছি। মানস সরোবরের কাছে বৃত্র দুটি নদীপথ অবরুদ্ধ করেছিল। বিপাশা আর শুতুদ্রী। আমি নদীদ্বয়ের মুখ দিয়েই বলিয়েছি, 'নদীগণের পরিবেষ্টক বৃত্রকে হনন করে বজ্রবাহু ইন্দ্র আমাদের খনন করেছেন। জগৎপ্রেরক, সুহস্ত, দ্যুতিমান ইন্দ্র আমাদের প্রেরণ করেছেন, তাঁর আজ্ঞায় আমরা প্রভূত হয়ে গমন করছি।' এই নদী দুটির তোমরা আধুনিক নাম দিয়েছ, বিয়াস আর সট্‌লেজ।

'অবিশ্যি পরবর্তীকালে অর্বাচীন সূতগণের দ্বারা এই নদীই চারটি হয়েছে, তারপরে সাতটি। এ সবই গৌরবে বহুবচন। অর্বাচীনেরা চিরকালই ছিল, এখনো আছে, আর জ্ঞানী তার ভিতর থেকেই সত্যকে অনুসন্ধান করে আত্মসাৎ করেন।

'এইবার সেই সূক্ত মনে কর, যখন বজ্রবাহু সেই বজ্র বৃত্রের প্রতি নিক্ষেপ করলেন, তার শব্দ এমনই বিশ্বপ্রকম্পিত, অগ্নি ও ধূম্রজাল সৃষ্টি করেছিল, পর্বত ধসিয়ে দিয়েছিল, অবরুদ্ধ নদীদ্বয় আকাশের মত উঁচু হয়ে প্রবাহিত হয়েছিল, স্বয়ং ইন্দ্র ভয়ে বহুদূর পালিয়ে গিয়েছিলেন। আমরাও ভেবেছিলাম, স্বর্গ লয় পেতে বসেছে। কিন্তু নদী দুটির প্রবল বহমানতা, বৃত্রের অনুচরগণসহ মৃত্যুর সকলই যখন প্রত্যক্ষ হল, সবাই গিয়ে ইন্দ্রকে খবর দিলেন। এই জন্যই ইন্দ্রকে আমরা বলি, জলমোচনকারী। এই কারণেই তাঁর দিবি আরোহণের পরে তিনি জলবর্ষণকারী আন্তরীক্ষ দেব হয়েছেন। বৈদিক দেবতাই হলেন শত্রুবিমর্দক পরাক্রান্ত যোদ্ধা।

'আমরা সকলেই সেই স্বর্গের অধিবাসী, কোনওকালেই সেখানকার দেবদেবীদের, সেই সুন্দর স্থানের কথা ভুলতে পারি না। তোমাদের এখন যেমন বিশিষ্ট ব্যক্তির সংবর্ধনা সভা হয়, আমরাও সেইরকম সভা উৎসব করতাম। আমরা তাকে বলতাম যজ্ঞ। সেই যজ্ঞে ইন্দ্রকে আহ্বান করা হতো। তাকেই প্রথম পাদ্য অর্ঘ্য সোম ও অন্ন নিবেদন করা হতো, এবং সকলেই সেই যজ্ঞে সামিল হয়ে, তাঁর স্তুতি করতাম। এক সময়ে গৃৎসমদ বলছেন, 'লোকে এখন ইন্দ্রকে অবিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে।' অতএব জনগণের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য তিনি বলছেন, 'যিনি মহতী সেনার নায়ক তিনিই ইন্দ্র। যিনি অহিকে (বৃত্রকে) বিনাশ করে সপ্তসংখ্যক (দুই) নদী প্রবাহিত করেছিলেন, যিনি গো উদ্ধার করেছিলেন, যিনি শত্রু বিনাশ করেন, যিনি বিশ্ব নির্মাণ করেছেন, তিনিই ইন্দ্র।' এ কথাগুলো থেকে বুঝতে পারবে, ইন্দ্রগণ লুপ্ত হবার পরে তাঁদের নরত্ব কি করে আস্তে আস্তে অদৃশ্য দেবত্বে পরিণত হয়েছে। অতএব আমরা এখনো যজ্ঞভূমিতে তাঁকেই আহ্বান করি, তাঁর উদ্দেশেই সোম ও অর্ঘ্য নিবেদন করি।

'জানি, তোমার দ্বারাবতী যাত্রার ভূমিকা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হল। কিন্তু তোমার যাত্রা এত দীর্ঘতর, তুলনায় এ ভূমিকাকে দীর্ঘ বলা যাবে না। পুরাণের ইতিবৃত্তীয় সংকেত ও ইঙ্গিতগুলো পেলে, মানুষ ও তার দিবি আরোহণের ফলে দেবত্বের সংবাদ পেলে।

'তোমার যাত্রার আগে, আর একটু সহজ কথা বলি। 'পৃথিবীতে সব দেশের, সব জাতির নিজেদের কতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। আন্তর্জাতিকতা সেখানেই মহিমময় যখন সকলের সব বৈশিষ্ট্যগুলো পরস্পরের যোগসূত্রে বিশাল ও বর্ণাঢ্য হয়ে ওঠে। প্রাচীন ভারতীয়দেরও নানান বৈশিষ্ট্য ছিল, এখনো আছে। আমি একজন সূত হিসাবে দেখলাম, ভারতীয়রা যা প্রাণ ধরে রক্ষা করে, তার সঙ্গে ধর্মের একটা সম্পর্ক থাকে। পুরাণ তাদেরই জাতীয় ইতিবৃত্ত, কিন্তু আমি যদি কেবলমাত্র 'ইতিবৃত্ত' বলি, তা হলে তারা তা রক্ষা করবে না। অতএব আমি বললাম, পুরাণ ধর্মপুস্তক। এই পুস্তক প্রতিদিন পাঠ করা, লিখে দান করা, পাঠ করে অপরকে শোনানোর মত পুণ্য আর কিছু নেই। সেইজন্যই পুরাণ এখনো বর্তমানে আছে।

'কিন্তু কালের প্রবাহকে আমি অস্বীকার করতে পারি না। গৃৎসমদ ঋষি কতকাল আগেই বলেছিলেন, 'লোকে এখন ইন্দ্রকে অবিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে।' ভারতীয়রাও সেইরকম বহু বহিরাগতদের শাসনে, শিক্ষায়, প্রলোভনে, আপন জাতীয় ইতিবৃত্তকে ভুলতে বসেছে। হাম্পটিডাম্পটির ড্যাডরা তো পুরাণকে জানেই না, বিশ্বাসও করে না। তোমার এই দ্বারাবতী যাত্রার উদ্যমে আমি হৃষ্ট, কারণ তুমি জাতীয় ইতিবৃত্তেরই একটি অধ্যায় তুলে ধরতে যাচ্ছো। প্রকৃত ইতিবৃত্ত, নর ও দেবের ইঙ্গিত, তোমার দরকার ছিল। এখন তোমার দৃষ্টি স্বচ্ছ ও সহজগম্য হবে। আমার মনে হয়, পরেও আমাকে তোমার দরকার হবে। ডেকো, আসবো। তোমার যাত্রা শুভ হোক।'

এবার মন চল চাই ভ্রমণে, বাসুদেবের অঙ্গনে। ঠিকানা কী? দ্বারকানগরী। ইতিবৃত্তে বাসুদেব একজন থাকারই কথা। যিনি যেখানেই গমন করতেন, গমনের আগে তাঁর রীতি ছিল, শঙ্খ নিনাদের দ্বারা জ্ঞাতি বান্ধব আর নগরবাসীদের জানানো। যুদবংশের কয়েক শরিকের মধ্যে যিনি বৃষ্ণি গোষ্ঠীর নেতা বার্ষ্ণেয় সেই বাসুদেব তাঁর যাত্রার ঘোষণা এভাবেই করতেন। তার আগেই তাঁর রথের যিনি সারথি, তিনি দুর্মদ অরি নিধনকারী কৃষ্ণের আয়ুধাগার থেকে, রথে তুলে রাখতেন তাঁর ব্যবহারের বিশেষ অস্ত্র গদা শার্ঙ্গপানি এবং চক্র।

বংশপরম্পরার তালিকা, সে-ভারি জটিল জালের বিষয়। তবু একটা ধরতাই থাকা ভাল। যে-পথে ভ্রমণ করছি, এ-যাত্রায় এ-সবের কিছু কিঞ্চিৎ দরকার। যদুকে পেলে, যদুবংশের একটা হিল্লে হয়। মন খোলসা করে, ব্যক্তিকে নির্ণয় করা যায়। অতএব এবারে খোঁজ করি, যদু কে? যাত্রা পথের ধূলা উড়িয়ে দেখছি, যযাতি শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর গর্ভে যদু আর তুর্বসুর জন্ম দিয়েছিলেন। শর্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রহ্যু, অনু আর পুরুকে। এঁদের নিয়ে আপাতত আমার দরকার নেই। দেখছি, ইতিবৃত্তের ধূলার নীচে লেখা রয়েছে, যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু। তারপরের জটিল বংশমালা দেখে আমার মাথা ভিরমি যাচ্ছে। যাত্রার আগে যদুকে নিয়েই দু-এক কথায় বংশপরিচয় সাঙ্গ করি।

দেখছি, এই যদুরই বংশধরেরা কালে কালে সাত্বত, বৃষ্ণি যাঁদের বলে, অন্ধক, ভোজ নানা শাখায় ছড়িয়ে গিয়েছিলেন। একে বোধ হয় শরিকানার ভাগাভাগিও বলা যায়। এঁরা নিজেদের মধ্যে বিস্তর ঝগড়া বিবাদ করেছেন। সে-কথা আপাতত যাক। বরং তার চেয়ে বলা ভাল বিভিন্ন শাখার এই যদুবংশ দীর্ঘকাল নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে পেরেছিলেন। নিশ্চয়ই আমাদের কালের প্রবাদ কাহিনীর সেইরকম জ্ঞানী বৃদ্ধরা যদুবংশে ছিলেন যাঁরা উপদেশ দিয়েছিলেন, এক গাছি কঞ্চিকে অনায়াসে একজন ভাঙতে পারে; একগুচ্ছ কঞ্চিকে পারে না। অতএব ওহে যদুগণ এককাট্টা হয়ে থাকো। এক্ষেত্রে বয়সে বৃদ্ধ না হয়েও যদুবংশের রাজসিংহাসনে আরোহণ না করেও যিনি সমগ্র গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ সংহত করে রাখতে পেরেছিলেন, তৎকালের লোকেরা তাঁকে বিশেষণ দিয়েছিলেন বৃষ্ণিসিংহ। যিনি আমার কাছে শ্রীকৃষ্ণ নামে পরিচিত।

নাম তাঁর বহুতর। ছেলেবেলায় আসন্ন ভোরের বিছানায় শুয়ে মায়ের মুখেই তার শতাধিক নাম উচ্চারিত হতে শুনেছি। ইনি অগাধ কীর্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। পুরনো ঐতিহ্যের কথা কে ভোলে? আমরা ভুলি না। আমি ভুলি না। ইলাবৃতবর্ষে দেবতা জাতির যে-সব কীর্তিশালী ব্যক্তিরা বীর যোদ্ধা মেধাবী শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাঁদের যেমন দিবি আরোহণ ঘটতো, রূপান্তরিত হতেন ভগবানে, কৃষ্ণেরও সেই দিবি আরোহণ ঘটেছিল। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

কিন্তু তাঁর এই অগাধ কীর্তির একটা পশ্চাদপট ছিল। সাত্বতদের–অর্থাৎ বৃষ্ণিকুল সম্পর্কে ইতিবৃত্ত দেখছি অতি মুখর। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কীর্তন করছেন, সাত্বতগণকে কেউ পরাজিত করতে সমর্থ না। বৃষ্ণি বংশীয়রা যুদ্ধে লব্ধলক্ষ্য হয়ে অসাধারণ যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন করেন।...এঁদের তুল্য বলবান ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। এঁরা জ্ঞাতিদের অবজ্ঞা করেন না, বৃদ্ধগণের আজ্ঞা পালন করেন।... সত্যবাদী ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠানরত, মহাত্মা, প্রচুর বিত্তশালী হয়েও অহংকার করেন না।...বিপদের সময়ে সমর্থ ব্যক্তিদেরও উদ্ধার করে থাকেন। এঁরা দেবপরায়ণ, দাতা...এই সব গুণের জন্যই তাঁদের সঙ্গে কেউ যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেন না।'

কীর্তিমানদের গুণের কথা এখানেই ইতি করা যেত। আর একটু যোগ করলে, একটি বিশেষ সংবাদের সঙ্গে আশ্চর্য একটি চিত্রও ভেসে ওঠে চোখের সামনে। শুরসেনদের মধুরাবাসী বলা হয়। জ্ঞানী বৃদ্ধরা বলেছেন, 'এঁরা দীর্ঘদেহী। ক্ষিপ্রকারী আর নৌচালনাপটু। এঁদের সর্বদা যুদ্ধের অগ্রভাগে স্থাপন করবে।'...

আমার চমকটা লাগলো 'নৌচালানাপটু' শব্দটিতে। নৌচালনা? তা হলে মহেন-জ-দরো-র 'অনার্য-কীর্তি' যুক্তিগুলো টেকে কেমন করে? না, আমি এসব পণ্ডিতি তর্কে নেই। ওতে বিস্তর ফাঁদ পাতা। কে কোথা দিয়ে ঠেলে ঢুকিয়ে দেবেন, কে জানে। আন্ কথায় কী কাজ? কাজের কাজ করো। তবে তোমাদিগের নিকট যাচঞা করি, এই নৌচালনাপটু সংবাদটির কথা মনে রেখো। দ্বারাবতী গমনেরর সময় সংবাদটির গুরুত্ব বোঝা যাবে।

কিন্তু যে-কথা বলতে গিয়ে এত কথার উৎপত্তি, সে-এক ঝকমারি। কারণ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের অনুমতি দিতে গিয়ে কৃষ্ণের মুখ থেকেই উচ্চারিত হচ্ছে, বঙ্গ পুণ্ড্র কিরাতদেশের অধিপতি, জরাসন্ধের অনুগত, তার নাম আর আমার নাম এক। কিন্তু সে নিজেকে কেবল বাসুদেব বলেই ক্ষান্ত নেই। যে বিশেষণের দ্বারা তোমরা আমাকে ভূষিত করেছ, সে নিজেকে সেই পুরুষোত্তম বিশেষণে ভূষিত করে থাকে। এমন কি মোহবশত সে আমার চিহ্নসমূহও সর্বদা ধারণ করে থাকে। আসলে ভূমণ্ডলে তার প্রকৃত পরিচয়, মহাবলপরাক্রান্ত পৌণ্ড্রক।

এই বিষয়টিকেই আমি ঝকমারি বলছিলাম। ঘটনাটা ইতিবৃত্তীয় সত্য। এখন দেখছি, কীর্তিমানদের অনুকরণ করার ইচ্ছা আর অভ্যাসটা নিতান্ত একালের না। রূপোলী পর্দার অমুক কুমারকে আপাদমস্তক নকল করার মত স্পৃহা হাজার হাজার বছর আগেও ছিল। রকমফেরটা অবিশ্যিই মানতে হবে। আমাদের কালে, রূপোলী পর্দার নায়ক নকলবাজরা নিজেদের সাচ্চা বলে চালাবার চেষ্টা করে না। পৌণ্ড্রক বাসুদেবের সেই রোগটি ছিল, কারণ সে কৃষ্ণের বীরত্ব বুদ্ধি আর কৌশলকে ঈর্ষা করতো। অতএব শঙ্খ গদা চক্র তারও থাকতে হবে। কৃষ্ণের মত মণিকুণ্ডল তারও চাই। উপরন্তু প্রচার করা চাই, সে নিজেই পুরুষোত্তম বাসুদেব।

ঈর্ষা নামক ইন্দ্রিয়টি একবার মস্তিষ্কে বিঁধে গেলে, তখন রক্তক্ষণের পালা শুরু হয়। পৌণ্ড্রক বাসুদেবের সেই অবস্থা হয়েছিল। কারণ সে ছিল প্রাগজ্যোতিষপুরের অসুররাজ নরকের বন্ধু। কৃষ্ণের অপরাধ, তিনি সেই দর্পী প্রাগজ্যোতিষপুরের অধিপতি নরককে হত্যা করেছিলেন। নরকের লালসালয় থেকে মুক্ত করে এনেছিলেন ষোল

হাজার রমণীকে। পুরাণকাররা হিসাবটাকে কেউ কেউ ষোল হাজার একশো বলেছেন। প্রাচীন ইতিবৃত্তে প্রক্ষিপ্ত কিছু থাকাটা আশ্চর্যের না, ইতিপূর্বেই স্বয়ং সূত আমাকে একথা শুনিয়েছেন। তবে ষোল হাজারের সঙ্গে একশো জোড়া আর না জোড়াটা, যাহা বাহান্ন তাহা তেপান্নর মতই মনে হয়। তেমন একটা ইতর বিশেষ নহে। কিন্তু নরকের ভোগগুহা থেকে মুক্ত ষোল হাজার রমণীকে সহসা ব্রজরমণীদের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলাটা ঠিক হবে না। ওখানে হিসাবের একটু খটোমটো আছে। বৃষ্ণিসিংহ বাসুদেবের সঙ্গে গোপরমণী রাধার কথায় আমি আদৌ নেই। সেই তো আমার কথা, 'কথা কইতে জানলে হয়, কথা ষোল ধারায় বয়।' কৃষ্ণ বলে কথা! বহু ধারায় তাঁর যাতায়াত।

একটা কথা এ সময়েই কবুল করে রাখি। দ্বারাবতী আমার যাত্রা বটে। বাসুদেবেরই সান্নিধ্যে। কিন্তু যে-উদ্দেশ্যে আমার যাত্রা, সেই উদ্দেশ্যের তিনি একটি পার্শ্বচরিত্র মাত্র। কিন্তু তিনিই দ্বারকানগরীর প্রতিষ্ঠাতা স্রষ্টা, তাঁর জীবিতকালের মধ্যে তিনিই প্রধান পুরুষ, সেই জন্য তাঁকে ছেড়ে আমার উদ্দেশ্যকেই প্রতিষ্ঠা করতে পারি না যে। অতএব বাসুদেবায়ঃ শরণং। রাধা অন্য ধারায় আছেন, আমি অন্য ধারায়।

আমি যে-ধারায় চলেছি, সেখানে বাসুদেব শ্রী ও কীর্তিসম্পন্ন অতিমাত্র শত্রু সংহারক, বন্ধুদের ইষ্টাকাঙ্ক্ষী, ঐক্যবদ্ধকারী সংগঠক। পৌণ্ড্রক বাসুদেবের কথা শেষ করি। নরককে কৃষ্ণ হত্যা করেছিলেন বলে পৌণ্ড্রক ক্ষেপে উঠেছিল। বলতে গেলে, তখন থেকেই যদুবংশের যশস্বী বার্ষ্ণেয়কে নিয়ে তার মোহের সঞ্চার, নামের অনুকরণ, আয়ুধ আর চিহ্নসমূহ ধারণের পাগলামি। অথচ রাজাকে যে-সম্মান দেওয়ার রীতি ছিল, সব ক্ষেত্রেই তা তার প্রাপ্য ছিল। আর সেগুলোকে সে কাজে লাগাতো একমাত্র বাসুদেবের বিরুদ্ধাচরণে। কৃষ্ণ দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় পাঞ্চালে আসছেন। পৌণ্ড্রকও গেল। ধূলা উড়িয়ে পরতে পরতে লেখা দেখছি, উদ্দেশ্য একমাত্র, কোনও রকমে একটা গোলমাল লাগাতে পারলে কৃষ্ণের সঙ্গে লেগে যাওয়া। কিন্তু দ্রৌপদীর ক্ষেত্রে দরিদ্র ব্রাহ্মণবেশী তৃতীয় পাণ্ডব, সব ভেস্তে দিয়েছিলেন। মাঝখান থেকে লাভ, হায়! সেই কৃষ্ণের। জীবনে যাঁদের কখনো চোখে দেখেননি, অথচ কানাঘুষা শুনছিলেন, পাণ্ডবেরা জতুগৃহে দগ্ধ হয়ে মারা যান যাননি, আর মনেপ্রাণে প্রার্থনা করছিলেন, যেন কোনওরকমে তাঁদের দেখা পান, সেই বৈপ্লবিক মুহূর্তটি এসে গেল দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভাতেই। পৌণ্ড্রকের জানা উচিত ছিল, 'গোলেমালে গোলেমালে পীরিত করো না।' অর্থাৎ কার্যসিদ্ধি করতে যেও না। কৃষ্ণ গোলমাল থেকে দূরে ছিলেন, আর তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিই তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ করিয়ে দিল।

কিন্তু সে-কথার জালবিস্তার আপাতত না। পৌণ্ড্রক জরাসন্ধের অনুগত হওয়া সত্ত্বেও যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিল, উপস্থিত হয়েছিল। ইতিবৃত্তকার ঘটনা লেখেন, সূত বলেন, তুমি তোমার ধারণা মত ইঙ্গিত ও সংকেতগুলো চিনে নাও। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের প্রধান অন্তরায় কে ছিলেন? জরাসন্ধ। আর এই জরাসন্ধের প্রবল পরাক্রমের ভয়েই তো স্বয়ং কৃষ্ণের মথুরা ছেড়ে সমুদ্রোপকূলে আশ্রয়ের সন্ধান। অতএব জরাসন্ধের মত যারা কৃষ্ণ বিদ্বেষী ছিলেন তাঁরাও যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে আসতে পারেন একটি মাত্র উদ্দেশ্যেই। কৃষ্ণ বিরোধী প্রচার, কৃষ্ণের নিন্দা, কৃষকে অবজ্ঞা দেখানো এবং সুযোগ পেলে কৃষ্ণ নিধনেও আপত্তির কোনও কারণ ছিল না।

রাজসূয় যজ্ঞে যাঁরা এসেছিলেন, জরাসন্ধ হত্যাকাহিনী তাঁদের অজানা ছিল না। জরাসন্ধ জীবিত থাকতে, যুধিষ্ঠিরের পক্ষে রাজসূয় যজ্ঞ করা কি সম্ভব ছিল? কৃষ্ণের অভিমত, কখনোই না। আগে জরাসন্ধ বধ, তারপরে রাজসূয় যজ্ঞ।

কেন কৃষ্ণ এ পরামর্শ যুধিষ্ঠিরকে দিয়েছিলেন? সূত্র বলেন, ঋষি লেখেন, তুমি ইঙ্গিত আর সংকেতগুলো চিনে নাও। কেবল শ্রবণ আর পাঠে পুণ্য নেই, পুণ্য অনুভবে। পুণ্য-ভাবনা, আমার কাছে জীবন-জিজ্ঞাসা। মহাবল জরাসন্ধ কৃষ্ণবধে কৃতসংকল্প ছিলেন। এইরূপ প্রচার ছিল, তিনি ছিয়াশিজন রাজাকে কারাগারে বন্দী করেছেন। একশো পূরণের জন্য আর চৌদ্দজন বাকি। যদুবংশে কৃষ্ণ কখনোই রাজসিংহাসনের অধিকারী ছিলেন না। যদুর বংশপরম্পরায় ভোজক শাখার উগ্রসেনই রাজা হয়েছিলেন। তাঁর ছেলে কংস, তাঁকে বন্দী করে রাজা হয়েছিলেন, আর জরাসন্ধের দুই মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন।

না, বরং বলা যায় জরাসন্ধই যদুবংশকে আপন শক্তির সীমায় রাখার জন্য, কংসের সঙ্গে অস্তি আর প্রাপ্তি নামে দুই মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর বুদ্ধিটা কাজে লেগেছিল। জরাসন্ধের মত মহাবল শ্বশুর পেয়ে কংসের মাথা বিগড়ে গিয়েছিল। তিনি পিতা উগ্রসেনকে সিংহাসনচ্যুত করে কারারুদ্ধ করেছিলেন। আর যদুবংশের রথী মহারথীদেরও পীড়ন করে পায়ের তলায় রেখেছিলেন।

উগ্রসেনের ভাই দেবকের মেয়ে দেবকীর সঙ্গে বসুদেবের বিয়ে হয়েছিল। বসুদেবের ছেলে, বাসুদেব। তাঁর কংসবধের ঘটনায় আমি যাবো না। যদিও যাবো না যাবো না করে দ্বারাবতীর পথের অলিগলি ঘাঁটতে বিস্তর ধূলাবৃত কাহিনী এসে পড়ছে। বলতে চেয়েছিলাম, জরাসন্ধের বাকি চৌদ্দজন শত্রুর মধ্যে, একজন অন্তত রাজা ছিলেন না। তিনি ছিলেন মুকুটবিহীন সাম্রাজ্যের অধিপতি বৃষ্ণিসিংহ। জরাসন্ধ জামাই হত্যার প্রতিশোধ নেবেন, অতি দুরন্ত শক্তিশালী, দুর্ধর্ষ বুদ্ধিমান কৃষ্ণকে বাঁচিয়ে রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

কৃষ্ণ তা জানতেন, অতএব যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ করার ইচ্ছাকে সমর্থন করেছিলেন। কেবল সমর্থনই করেছিলেন? পাণ্ডবদের ক্রমে বলিয়ান হয়ে ওঠার মূলে তাঁর অবদান অনেকখানি। অর্জুন যে-মুহূর্তে পাঞ্চালীকে লাভ করে, ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে কামারশালায় গিয়ে উঠেছিলেন, কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ বলরামকে সঙ্গে করে সেখানে গিয়েছিলেন। প্রথমেই পরিচয় কুন্তীকে– তুমি আমার পিসীমা। যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন আমার পিসতুতো ভাই।

যদুবংশের জ্ঞানী ও বীর, বন্ধু ও কর্মী বাসুদেবের আত্মীয়তাও কম নয়। সেই থেকে শুরু। ক্রমবর্ধমান বলশালী বিত্ত ও ক্ষমতাশালী পাণ্ডবদের অন্তরের ভাষা তিনি পড়তে পেরেছিলেন। সেই কারণেই তিনি মহান। ইতিবৃত্তের প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে আমি দেখছি, লিখিত ভাষার গভীরে প্রচ্ছন্ন রয়েছে বাসুদেবের মহিমময় ভবিষ্যৎকীর্তির ইঙ্গিত। মুখ ফুটে না বললেও, যুধিষ্ঠিরের অন্তরে রাজসূয় যজ্ঞের বাসনা তিনিই জাগিয়েছিলেন। অতএব অনুমতি প্রার্থনা মাত্রই, যজ্ঞের সম্মতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তার আগে জরাসন্ধ বধ নিশ্চিত হতে হবে।

দুর্মদ শত্রুনিধনকারী কৃষ্ণ কি আগে থেকেই ভেবে রাখেননি, জরাসন্ধকে মহাসমরের সুবিশাল প্রাঙ্গণে ডেকে নিয়ে এসে নিধন করা, সসাগরা ধরণীর সকলের পক্ষেই অসম্ভব ছিল? ভেবেছিলেন। ইতিবৃত্তের লেখায় তা প্রচ্ছন্নরূপে রয়েছে। কিন্তু জরাসন্ধ বধ কাহিনীতে কী দরকার?

দরকার একটি সংশয়িত জিজ্ঞাসার জন্য। মহাসমরের বদলে, কৃষ্ণ জরাসন্ধকে, ভীমের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করেছিলেরন? না কি তিনি, ভীম এবং অর্জুনসহ নিতান্ত স্নাতকের বেশে, মগধ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন? এবং তারপরে গুপ্তহত্যা?

না, প্রাচীন ইতিবৃত্তকে আমি এতটা অপরিচ্ছন্ন বিক্ষিপ্ত ভাবতে পারি না। সংশয়টা এই কারণে জাগে, যে-ধুরন্ধর মহাবল জরাসন্ধের ভয়ে স্বয়ং কৃষ্ণকে সকল যদুবংশের প্রধানগণকে নিয়ে মথুরা থেকে সুদূর পশ্চিমের দ্বীপান্তরে চলে যেতে হয়েছিল, তাঁকে হাতের কাছে পেয়েও জরাসন্ধ ছেড়ে দিলেন কেমন করে? স্পষ্টতই তিনি জরাসন্ধের রাজপুরে প্রবেশের জন্য ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি ভীম অর্জুনকে নিয়ে স্নাতকের ছদ্মবেশে জরাসন্ধপুরীতে প্রবেশ করেছিলেন। কাছে গিয়ে পরিচয় দিয়ে, তিনজনের যে-কোনো একজনের সঙ্গে জরাসন্ধকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন।

দেখছি, দ্বন্দ্বযুদ্ধের রীতিটা প্রাচীন ভারতেও ছিল। সাহেবরাই কেবল দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতেন না। কৃষ্ণের সকল মহানুভবতাকে মেনে নিয়েও এই মুহূর্তে জরাসন্ধকে আমার সত্যবদ্ধ রাজা বলে মনে হচ্ছে। তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে স্বীকৃত হয়েছিলেন। বীরের যা ধর্ম। ভীমকেই তিনি প্রথমে বেছে নিয়েছিলেন। অবিশ্যি ভীমই প্রথম এবং শেষ। জরাসন্ধ অর্জুন আর কৃষ্ণের সঙ্গে লড়বার অবকাশ পাননি, নিহত হয়েছিলেন ভীমের হাতেই। কৃষ্ণ কি একথাও জানতেন, জরাসন্ধ ভীমকেই প্রথমে বেছে নেবেন?

তবে হে বাসুদেব, তোমার তুলনা তুমিই! অন্যথায় যে-কোনও ছদ্মবেশেই হোক কোন্ সাহসে তুমি জরাসন্ধপুরীতে প্রবেশ করেছিলে? যাঁর ভয়ে তুমি সুদূর পশ্চিমে চলে গিয়েছিলে? সবই দেখছি, দৌপদীর স্বয়ংবর সভা, পাণ্ডবগণের পরিচয় লাভ, তোমার দূরদৃষ্টি, তোমার মাহাত্ম্যকেই বৃদ্ধি করেছিল। শত্রুকে তো নিধন করাই শ্রেয়ঃ!

দ্বারাবতীর পথ ক্রমে দুর্গম হয়ে উঠছে। পৌণ্ড্রক বাসুদেবের আখ্যানটুকু শেষ করি। সে জানতো কৃষ্ণবিদ্বেষী রাজা মহারাজা বলবান ব্যক্তিরাও যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যাবেন। শৃঙ্গ দিয়ে তৈরি ধনুক, যার নাম শার্ঙ্গ সেই শার্ঙ্গপানি, গদা-চক্রধারী কৃষ্ণই নিশ্চয় যজ্ঞস্থল রক্ষা করবেন। যুধিষ্ঠির পূজা ও পাদ্য-অর্ঘ্যও নিশ্চয় কৃষকে দেবেন। তখন একটা গোলমালের সম্ভাবনা নিশ্চিত!

আবার সেই গোলেমালে গোলেমালে...। ঘটেছিল সেইরকমই। যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসার জবাবে ভীষ্ম বলেছিলেন, পূজা পাবার ক্ষেত্রে কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ। তিনি নিখিল বেদ বেদাঙ্গ পারদর্শী, নিরহংকারী, জ্যোতিষ্ক মধ্যে উজ্জ্বলতম।... অনেকের সঙ্গে সব থেকে বেশি বাদ সাধলেন চেদিরাজ শিশুপাল। তাঁর মত মহীপতি থাকতে, কৃষ্ণ কেন পূজা পাবেন? তিনি কৃষ্ণের নামে অতিমাত্রায় কুৎসা গীত করলেন, বাসুদেবকে নীচাশয় থেকে শুরু করে, কোনওরকম খারাপ কথা বলতেই বাদ রাখলেন না। যজ্ঞস্থলে গোলমাল লেগে যাবার দাখিল।

কিন্তু যজ্ঞস্থল কি হত্যার প্রচলন ছিল? ছিল। অন্যথায় কৃষ্ণ তাঁর আয়ুধ-সকল নিয়ে যজ্ঞস্থলে যেতেন না। শিশুপাল যখন যজ্ঞে এবং কৃষ্ণপূজায় বাধা দিয়ে সব ভেস্তে দেবার তাল করলেন, তখন কৃষ্ণ রুখে রেগে ওঠেননি। বরং উপস্থিত সকলের সামনে শিশুপালের পূর্ব অপরাধের কাহিনীগুলো বলেছিলেন। তার মধ্যে সব থেকে বড় অপরাধ যাদবগণের অশেষ অনিষ্টসাধন। বিচিত্র এই, শিশুপালও ছিলেন সম্পর্কে কৃষ্ণের পিসতুতো ভাই। কৃষ্ণ যখন প্রাগজ্যোতিষপুরে নরককে হনন করতে গিয়েছিলেন শিশুপাল সেই অবকাশে দ্বারকা আক্রমণ করেছিলেন। দ্বারকাপুরী পুড়িয়ে দিয়েছিলেন।

'শিশুপালের অপরাধ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। মৃত্যু তাঁকে চারদিকে থেকে ঘিরে এসেছিল। তিনি অন্যান্য মহীপালদের প্ররোচনায় নিজের ক্ষমতার প্রতি অতি বিশ্বাসে, রাগে অহংকারে এতই অন্ধ হয়েছিলেন, প্রকৃত সংগ্রামের ক্ষমতা তিনি হারিয়েছিলেন। কৃষ্ণ অবিশ্যি বলেছিলেন, শিশুপালের মা তাঁকে তাঁর পুত্রের শত অপরাধ ক্ষমা করতে বলেছিলেন। যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞস্থলে সেই শত অপরাধ অতিক্রান্ত হয়েছিল, অতএব কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে তীক্ষ্ণ চক্র দ্বারা শিশুপালের মস্তকটি উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

কথা হচ্ছিল মেকি বাসুদেবকে নিয়ে। পৌণ্ড্রক বাসুদেব, কৃষ্ণবিদ্বেষী। নামের ফের নিয়েই বিষয়টার সূত্রপাত হয়েছিল। শিশুপাল হত্যা দেখেই সে বুঝে নিয়েছিল, গোলেমালে গোলমাল। কৃষ্ণের ক্ষতি করা গেল না। কিন্তু সে নিজেকে বিশ্বের কাছে প্রমাণ করতে চায়, পুরুষোত্তম বাসুদেব বলে। কৃষ্ণের চিহ্ন এবং আয়ুধ সেও ধারণ করে বেড়াতো।

কৃষ্ণ এ ব্যাপারে রূপোলী পর্দার কুমারদের মতই নির্বিকার ছিলেন। কাকেরা ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করলে কী করা যায়? কিছু করা যায়? পৌণ্ড্রক বাসুদেব নিষাদরাজ একলব্যকে এবং আরো কিছু কৃষ্ণবিদ্বেষীকে নিয়ে দ্বারকার আশেপাশে তক্‌কে তক্‌কে রইল, কৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে দ্বারাবতী ধ্বংস করবে। এই নকল বাসুদেব দেখছি সব বিষয়েই নকল করতে চায়। কৃষ্ণ যখন নরককে হত্যা করতে গিয়েছিলেন, শিশুপাল সেই অবসরে দ্বারকা পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। নকল বাসুদেবও তাই করেছিল। কৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে সে গভীর রাত্রে দ্বারকা আক্রমণ করেছিল। দ্বারকার যাদবেরা সারা রাত্রি লড়াই করেছিলেন। যুদ্ধটা খুব ছোটখাটো হয়নি। কিন্তু কৃষ্ণ এসে পড়েছিলেন রাত পোহাতেই। নকল বাসুদেব এবার আর রেহাই পেল না। সে কৃষ্ণের হাতেই নিহত হয়েছিল। একলব্য পালিয়ে বেঁচেছিল, অবিশ্যি পরে একলব্যও কৃষ্ণের হাতেই নিহত হয়েছিল।

কিন্তু নামের ফেরে মানুষ ফেরে, এও কোথা দেখি নাই। নকল বাসুদেব থাক। এখন আসল বাসুদেবের দ্বারাবতী যাত্রা ত্বরা করো হো। যাত্রা ত্বরা করো। ঠিকানা খোঁজ। ধূলা উড়িয়ে চলো।

চলবো, কিন্তু পথ বড় গহন। এ যাত্রা কাঁধে ঝোলা চাপিয়ে ঠেলাঠেলি করে রেলগাড়িতে যাওয়া না। যদিও এ যাত্রায়ও দেখছি বাঁশি বাজে, নিশান ওড়ে, তবে সেটা এই আমলের ভেক পাতলুন পরা গার্ড সাহেবের নিশান বাঁশি কিছু না। এ বাঁশি প্রাণের কোথায় যেন বাজে, সুরে ডাক দিয়ে ঘরের বাহির করে নিয়ে যায়। নিশানটা চোখের সামনে চিত্রের মত ভাসে। রৈবতক পর্বতের কৃষ্ণনীল মহীরুহের মাথা ছাড়িয়ে যেন সেই নিশান পত্‌পত্ করে ওড়ে।

না, রেলগাড়ির ঝুকঝুক শব্দে কিংবা মোটর গাড়িতে এমন কি হাওয়াই জাহাজেও আমার গন্তব্য দ্বারাবতী যাওয়া যাবে না। আমাকে পথ পরিক্রমা করতে হবে স্বয়ম্ভূব মনুকাল থেকে রচিত ইতিবৃত্তের বর্ণনা থেকে। কারণ আগেই সূতের মুখে শুনে এসেছি স্বয়ম্ভূব মনুকালই আদি কালবিন্দু গণ্য করা হয়েছে। বিলেতের ঐতিহাসিকরা যেমন যিশু জন্মের তারিখকে আদি কালবিন্দু ধরে বিসি আর এডি-র হিসাব কষেছেন।

আমাদের প্রাচীন ইতিবৃত্তের ব্যাখ্যাকার পণ্ডিতগণ স্বয়ম্ভূব মনুকাল থেকে অনায়াসেই যিশুর জন্ম সালকে হিসাবে আনতে পেরেছেন।

সন্দেহ আর তর্ক? শ্রম করে করে এসো গিয়ে। দ্বন্দ্বে আহ্বান করতে এলে ক্ষমতা থাকার দরকার। কোনও কোনও সাহেবিয়ানার হিসাব যথার্থ, বাকিরা সব ধূলায় যাবে তা হয় না।

কৃষ্ণের জন্মকাল আমাদের সুবিধাজনক প্রচলিত মানের হিসাবে এক হাজার চারশো আটান্ন খ্রিস্ট পূর্বাব্দ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকাল এক হাজার চারশো ষোল খ্রিস্ট পূর্বাব্দ। এই হিসাবে দেখছি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় কৃষ্ণের বয়স বিয়াল্লিশ বৎসর। আদি কালবিন্দু থেকে একে একটি যুগকাল বলা হয়েছে। যুগকাল মানেই, এক একটি যুগের সংক্রান্তি। যাওয়া আর আসার মধ্যবর্তী সময়।

এইখানটিতে এসে আমার মনে একটা খটকা লাগছে। আমি যে-সূতগণের ইতিবৃত্তকে অনুসরণ করছি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য মহাশয় আমার অপেক্ষা অনেকগুণ অধিক তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন, ইতিহাসের বিচারক। তাঁর সূক্ষ্ম বিচারের দ্বারা তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন, এই উনিশশো আটাত্তর খ্রিস্টাব্দ থেকে ধরলে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল, ৫০৭৮ বছর আগে। এ ক্ষেত্রে মনে করি, সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়, সূতগণের ইতিবৃত্তীয় সংকেতকে আমার থেকে অনেক বেশি সম্যক অনুমান করেছিলেন। তাঁর মতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে যুধিষ্ঠিরের বয়স ৭২, ভীম ৭১, অর্জুন ৭০, নকুল সহদেব ৬৯। কৃষ্ণকে যদি অর্জুনের সমবয়সী ভাবা যায়, বা অন্য মতে এক বছরের কনিষ্ঠ, তা হলে সেই সময়ে তাঁর বয়স হয়েছিল সত্তর অথবা ঊনসত্তর।

ইতিবৃত্ত রচনা আমার লক্ষ না। কিন্তু ইতিবৃত্তীয় লক্ষণগুলো আবশ্যক। অতএব উভয় মতই বলে রাখলাম। পাঠকদের বিশ্লেষণী ক্ষমতাকে আমি শ্রদ্ধা করি।

কৃষ্ণের জন্মকালে পুরাণকাররা দেখছেন দ্বাপরের অংশে ক্ষয় ধরেছে। এই সময়টিকে বলা হয়েছে কলির সন্ধ্যাকাল। তবে তখনো সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশমধ্যবর্তী কলিযুগ পড়েনি। কৃষ্ণের জীবিতকালের মধ্যেই কলিযুগ এসেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু যদুগণের কীর্তিবর্ধনকারী বাসুদেবের জীবিতকাল পর্যন্ত কলির প্রাদুর্ভাব স্পষ্টত ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। এ কথায় কি একটু বেশি গৌরব প্রকাশিত হয়নি? সূতেরা এবং ঋষিরা মানুষ ছিলেন। ইতিবৃত্তের ক্ষেত্রে তাঁরা যতোটা সম্ভব নিরপেক্ষ থাকবারই চেষ্টা করেছেন। সেইজন্যই ইতিবৃত্তের বর্ণনার গভীরে প্রচ্ছন্ন সংকেত আর ইঙ্গিতগুলোর কথা আমি বারে বারে বলেছি।

কৃষ্ণ যে কলির যাবতীয় লক্ষণগুলোকে প্রকটিত হতে দেখেছিলেন, ইতিবৃত্তে নানাভাবে তা প্রকাশ পেয়েছে। বেদব্যাস কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অনেক আগেই তাঁর মা সত্যবতীকে ঘোষণা করেছিলেন, যুগক্ষয়ের সমস্ত লক্ষণগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, অমঙ্গলের ছায়া সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ঘোর দুর্দিন আসন্ন। যে-সব পশুপক্ষীরা দিনের আলোয় নিজেদের স্বর ও আকৃতি গোপন রাখতো তার ব্যতিক্রম ঘটছে। লোকক্ষয় অনিবার্য। মানুষের বিশেষত সদ্বংশীয় রাজপুরুষদের চরিত্র নষ্ট হতে বসেছে। জ্ঞাতিগণ পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। এ-সবই ধ্বংসের লক্ষণ।'

একদিকে যখন বৃষ্ণিসিংহের অশেষ গুণকীর্তন হচ্ছে, তখনই যুগক্ষয়ের কথাও বলা হচ্ছে। কিন্তু আপাতত আমি ইতিবৃত্তের সে-পথে যাত্রা করতে চাই না। যদি মনে করি দ্বাপরের অংশক্ষয়ের কালে, কৃষ্ণই দ্বাপরের শেষ পুরুষ, তবে তাঁর আলোর বৃত্তেই যাত্রা করি। সেই আলোর বৃত্তের ঠিকানা দ্বারাবতী।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় যদি কৃষ্ণের বয়স বিয়াল্লিশ হয়, তাঁর বয়সের হিসাবে বয়সটাকে যুবকাল বলা যায়। তা হলে মথুরা থেকে রাজ্যপাট গুটিয়ে নিয়ে পশ্চিম উপকূলে চলে যাওয়ার ঘটনা তার মধ্যেই ঘটেছিল। এ ক্ষেত্রে আমি কৃষ্ণের বয়স হিসাব করতে যাবো না। কারণ অন্য মতের কথা আগেই বলেছি। বিয়াল্লিশ না হয়ে ঊনসত্তর হলেও আমার সার বক্তব্যের ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। আমি ইতিবৃত্তের আশ্রয় নিয়েছি মাত্র। নির্ঘাৎ ইতিবৃত্ত লিখতে বসিনি। একে কি ইতিবৃত্তাশ্রয়ী কাহিনী বলে? যা বলার তোমরা বলো, আমি পথ চলি। দেখছি, মথুরা থেকে কৃষ্ণ সহজে নড়েননি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বাহিনীর মিলিত সৈন্যসংখ্যা ছিল আঠারো অক্ষৌহিণী। সম্রাট জরাসন্ধের একলারই ছিল কুড়ি অক্ষৌহিণী সেনাবাহিনী। আর যদুকূলে তখন ছিল আঠারো হাজার বীরপুরুষ। কৃষ্ণসহ কিছু রথীবৃন্দ। জরাসন্ধ বেশ কয়েকবার মথুরা অবরোধ করে যাদবদের ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। কৃষ্ণের সেনাপতিত্বে প্রত্যেকবারেই জরাসন্ধ প্রতিহত হয়ে ফিরে গিয়েছেন। কৃষ্ণের হাতে তাঁর পরাক্রমশালী যোদ্ধা হংস, ডিম্বক, এমন কি কালযবনের মত বীরও মারা পড়েছিলেন।

কিন্তু এভাবে কতোকাল কাটানো যায়? প্রতি মুহূর্তে শত্রুসৈন্যের অবরোধ আর আক্রমণে, সকল যাদবেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা গোটা যদুবংশের ক্ষয়ের আশঙ্কা করেছিলেন। অতএব, তাঁদের একটি মন্ত্রণাসভা নিশ্চয় বসেছিল, সেখানে স্থির হয় যাদবরা তাঁদের বিপুল সম্পত্তি ভাগাভাগি করে যা পারেন, সব নিয়ে পশ্চিম উপকূলে চলে যাবেন। সন্দেহ নেই, এর নেতৃত্ব নিয়েছিলেন বাসুদের স্বয়ং।

তিনি কি আগেই পশ্চিমের সমুদ্রোপকূলে রৈবতক পর্বতের সেই দেশটি দেখে এসেছিলেন? নির্বাচন করেছিলেন সেই স্থান? কোথায় সে দ্বারকা? কাথিয়াবাড় উপদ্বীপের জুনাগড় রাজ্যের যে শহরকে এখন জুনাগড় বলা হয়, সেখানেই কী? গির্নারের পবর্তমালাই কি রৈবতক? রৈবতক পাহাড়ের ওপরে কুশস্থলী নামক যে সুদৃঢ় পুরী তৈরি করেছিলেন সে স্থান কি আজকের গুজরাটের দ্বারকা?

সন্দেহ আছে। এই সন্দেহটি খণ্ডনের সংকেত পুরাণেই আছে। পুরাণকারেরা প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প, নদীসমূহের গতি পরিবর্তন ইত্যাদি সবই প্রত্যক্ষ করেছেন। এ কূল ভাঙে, ও কূল গড়ে, এ তো আমরা একালেও কম দেখলাম না। তা প্রলয়ঙ্কর না হতে পারে, কালে কালে, অতি ধীরে ভৌগোলিক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। এ অভিজ্ঞতা প্রাচীন ইতিবৃত্তের সঙ্গে আজকের ভৌগোলিক স্থানগুলোর প্রভেদেই আমরা পেয়েছি।

পুরাণ বা ইতিবৃত্তের মতামতগুলো তাঁদের নিজস্ব ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। দধীচির কথা আমি ইতিপূবেই শুনেছি। জলাশয়ের বিশাল প্রাণীটি মুনি নামে আখ্যাত হয়েছিলেন। ধংস বা সৃষ্টি সব কিছুর কারণকেই একটি রূপ দান করা হয়েছে। চোখের সামনে যে-রূপে দেখা গিয়েছে, সেই রূপের ওপরেই তাকে একটি বিশেষ মূর্তির পরিকল্পনায় তুলে ধরা হয়েছে। পাতালসমূহের শেষভাগে বিষ্ণুর শেষনামা তামসী মূর্তিকে অনন্ত বলা হয়েছে। এই অনন্ত-র শক্তি ও বীর্যের বর্ণনা দেবতারাও দিতে সমর্থ ছিলেন না।

কেমন দেখতে সেই অনন্ত? তিনি সদাঘূর্ণিত লোচনী, অগ্নিযুক্ত শ্বেত পর্বতের ন্যায় শোভা পান। তিনি (যেন) মদনোন্মত্ত। পরিধানে নীলবাস (সমুদ্র?)। তাঁর এক হাতে লাঙ্গল, আর এক হাতে মুষলের কল্পনা করা হয়েছে। তাঁর মুখসমূহ থেকে উজ্জ্বল বিষানলশিখাযুক্ত সঙ্কর্ষণনামা রুদ্র নির্গত হয়ে ত্রিভুবন ভক্ষণ করেন। তিনি যখন সদাঘূর্ণিতলোচনে জৃম্ভা পরিত্যাগ করেন, তখন সমুদ্রসলিলে

কাননসমূহের সঙ্গে এই ভূমি কম্পিত হয়। এঁর অগ্নিময়ী সহস্র ফণা আছে।

তা হলে ইনি ভূগর্ভস্থ অগ্নি? ঋষিগণ ভূগর্ভস্থ অগ্ন্যুৎপাত দেখেই এই কল্পনা করেছিলেন। তাঁদের মতে, এই অগ্নিজাত শক্তিই পৃথিবীর উপরিভাগস্থ কঠিন স্তর ধারণ করে আছে। অভ্যন্তর অগ্নিময়। সেই আগুনের হাজার জিহ্বার সঙ্কোচন প্রসারণেই ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরির উৎপাত ঘটে। বাসুকী নাগের কল্পনার সঙ্গে এর কোনো অমিল নেই। আগ্নেয়গিরি। থেকে যে ভস্মরাশি ছড়িয়ে যায়, তাকেই স্তবের গৌরবে বলা হয়েছে, সুবাসিত হরিদ্রা বা কপিলবর্ণের হরিচন্দনের রেণু। এসব তুলনা। ভূকম্প আর অগ্ন্যুৎপাতের আনুষঙ্গিক বজ্রধ্বনি সঙ্কর্ষণের স্বস্তিক চিহ্নের দ্বারা উপলক্ষিত হয়েছে। মাটি ফেটে চৌচির হওয়া ধ্বংসকে, লাঙল আর মুষলের ইঙ্গিতে বোঝানোর চেষ্টা।

দেখছি 'যাঁহাকে আরাধনা করিয়া পুরাণর্ষি গর্গ জ্যোতিঃতত্ত্ব আর সকল নিমিত্ততত্ত্ব অবগত হয়েছিলেন', সেই গর্গই ছিলেন ভূকম্পবিৎ। কিন্তু পুরাণের ব্যক্ত করার ভঙ্গি ও ভাষা এইরকম, তিনি সেই অনন্তের আরাধনা করেই, সঙ্কর্ষণের আরাধনা করেই জ্যোতিঃতত্ত্ব আর নিমিত্ততত্ত্ব লাভ করেছিলেন।

আমাদের আধুনিক ভাষায় কী বলা যায়! বিজ্ঞানী প্রকৃতিকে জয় করলেন। পুরাণে অবতার কল্পনা একটি অনিবার্য বৈশিষ্ট্য। কৃষ্ণভ্রাতা বলরামকে তেমনই একজন অবতার রূপে কল্পনা করা হয়েছে। কেন? এই প্রকৃতির সঙ্গে কি তাঁর প্রকৃতির কোনো মিল ছিল? ছিল। বলরামও সর্বদাই সদাঘূর্ণিতলোচন মদন্মোত্ত থাকতেন। লাঙল মুষলও তাঁর হাতে থাকতো, হয়তো তাঁর আয়ুধ ছিল সেইরকম। তিনি যে প্রায় সময়েই মদিরাপানে লিপ্ত থাকতেন, তা তো দেখাই গিয়েছে। ক্রোধে হুংকারপ্রবণতা ছিল। তাঁর বিক্রমকে সবাই ভয় করতেন।

এখন বন্দাবনের ধারেই যমুনা। বতর্মান মথুরা থেকে বন্দাবনে যেতে মোটরযানে সময় লাগে এক ঘণ্টারও কম। কিন্তু কংস-দূত অক্রূরের সঙ্গে কৃষ্ণ আর বলরাম যে বৃন্দাবনে ও মথুরায় গিয়েছিলেন, তার ইতিবৃত্তীয় বর্ণনা অন্য এক ভৌগোলিক চিত্রের পরিচয় দেয়। বিমল প্রভাতে, অক্রূরের সঙ্গে কৃষ্ণ আর বলরাম অতি বেগবান অশ্বসমূহযুক্ত রথারোহণে যাত্রা করলেন। মধ্যাহ্নে এসে উপস্থিত হলেন যমুনার ধারে। সেখানে স্নানাদি সেরে আবার রথে উঠলেন। অক্রূর বায়ুবেগবান অশ্বগণকে অতি দ্রুত চালিয়ে, অতি সায়াহ্নে অর্থাৎ সায়াহ্ন অতীত হলে, তাঁরা মথুরায় পৌঁছলেন।

বেগবান অশ্বযুক্ত রথ ঘণ্টায় সাত আট মাইল যেতে পারে। এটা আমার হিসাব না, ব্যাখ্যাকারের। তা হলে বিমল প্রভাতে বেরিয়ে মধ্যাহ্নে যমুনার ধারে পৌঁছতেই চল্লিশ মাইল ছুটতে হয়েছিল! তারপরে অতি সায়াহ্নে মথুরা মানে আরো চল্লিশ মাইল। একুনে আশী মাইল দূরত্ব! আরো একটা কথা এখানে অনিবার্য ভাবেই অনুমান করা যাচ্ছে, অশ্বযুক্ত রথসমূহ নিশ্চয়ই নৌকাযোগে পারাপার করার ব্যবস্থা ছিল। নৌচালনাপটু কথাটা আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। মনে রেখো।

তা হলে যমুনা তীরে বৃন্দাবন এলো কী করে? নাকি যমুনাই বৃন্দাবনের তটে এসে ঝাঁপ দিয়েছিল? কারণ কী? ভূমিকম্প?

হ্যাঁ, ভূমিকম্প। পুরাণকারেরা তা দেখেছিলেন, আর এইভাবে তা ব্যক্ত করেছেন। একদা বলরাম বৃন্দাবনে মদিরাপানে বিহ্বল আর ঘর্মাক্ত হয়ে স্নান করতে চাইলেন। তিনি যমুনাকে ডেকে বলেন, হে যমুনে, তুমি এইখানে এসো। বলভদ্রের মাতলামিতে কান না দিয়ে যমুনা আপন মনে নিজের প্রবাহেই চললেন। তখন লাঙ্গলী বলদেব রেগে আগুন হয়ে, লাঙল দিয়ে যমুনাকে আকর্ষণ করে বললেন, রে পাপে, আসবে না? এবার যাও দেখি, কেমন যেতে পারো? যমুনা আসতে বাধ্য হলেন।

বলভদ্রের বর্ণনাটা কীরকম? তিনিও সঙ্কর্ষণের মতো নীলবাসযুক্ত, এক কুণ্ডল, মালা, মুষল ও হলধারী। বলরামকে সঙ্কর্ষণের অবতার রূপে কল্পনাটা পরবর্তীকালে। ভূমিকম্পটা ঘটেছিল আগেই। পুরাণকার পরবর্তীকালে বলরামের প্রকৃতি, আচরণ আর বীরত্বের সঙ্গে একটি তুলনা দিয়েছিলেন। ওটাই তাঁদের বৈশিষ্ট্য।

বিষয়টি উল্লেখ করলাম এই কারণে, জানা গেল, এ-বৃন্দাবন সে-বৃন্দাবন নয়। যমুনার গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সেই বৃন্দাবন যমুনাগর্ভে গিয়েছিল। এ বৃন্দাবন পরবর্তীকালে মথুরার কাছে প্রতিষ্ঠিত। এ সবেরই উদ্দেশ্য অবিশ্যি দ্বারাবতী যাত্রাপথের হদিস করে নেওয়া। তা হলে, এই মুষল ও হলধারী প্রমত্ত বলরামকে নিয়ে আর একটি ঘটনাও বলে নিই।

কৃষ্ণের ছেলে জাম্ববতীতনয় বীর শাম্ব দুর্যোধন-কন্যা লক্ষ্মণাকে বলপূর্বক হরণ করেন। ফলে যুদ্ধ লেগে গিয়েছিল। কর্ণ, দুর্যোধন আরো অনেক কুরুবীরেরা শাম্বকে যুদ্ধে পর্যুদস্ত করে পরাজিত করে বন্দী করেছিলেন। যদু বংশের সন্তান শাম্ব। বলভদ্র নিজে শাম্বকে ফিরিয়ে দেবার জন্য দুর্যোধনকে অনুরোধ করেছিলেন। জবাবে, দুর্যোধন তাঁকে নানা কটু কথা শুনিয়ে অপমান করেছিলেন। তখন হলায়ুধ ক্রোধে মত্ত ও আঘূর্ণিত হয়ে পায়ের গোড়ালি দিয়ে বসুধা বিদারিত করেন। তিনি মদলোলাকুলকণ্ঠে বললেন, কুরুকুলাধীনা হস্তিনানগরীকে, কুরুগণসহ উৎপাটিত করে ভাগীরথী মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেবো। বলে মুষলায়ুধ বলরাম কর্ষণার্বোমুখ লাঙ্গল হস্তিনাপুরীর প্রাকারে বিঁধিয়ে টান দিলেন।

নগরী সহসা আঘূর্ণিত হতে দেখে কৌরবগণ, 'হে রাম, রক্ষা করো' বলে চিৎকার জুড়ে দিলেন। তাড়াতাড়ি শাম্বকে ফিরিয়ে দিয়ে তবে নিস্তার। কেবল শাম্বকে না, তাঁর বলপূর্বক হরণ করা গিন্নি লক্ষ্মণাসহ মুক্তি দিলেন। সেই থেকে হস্তিনা নগরীকে যাঁরাই দেখেছেন, দেখেছেন গোটা নগরীটি যেন মোচড়ানো। ইঙ্গিত একটাই, সেই ভূমিকম্প! যদুবীর বলরামকে সেই কাহিনীর সঙ্গে গ্রথিত করা।

কিন্তু আমি ভাবছি শাম্বর কথা। বন্দী অবস্থায় হঠাৎ ভূমিকম্প! বোধহয় ভাবতেই পারেননি, লক্ষ্মণাকে লুঠ করে আনতে গিয়ে, কুরুদের সঙ্গে এরকম একটা লড়াই লেগে যাবে, আর তারপরেই সেই ভূমিকম্প! তখন কি তিনিও ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছেড়েছিলেন? লক্ষ্মণা থাক, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি! না, আসলে বোধ হয় শাপে বরই হয়েছিল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে একটি নগরী বেঁকে-চুরে মোচড় খেয়ে গেল, লোকেরা হা রাম! করে দিকে দিকে দৌড়। চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা। এদিকে যদুবংশের বীরেরাও এসে পড়েছিলেন। অতএব শাম্বর মুক্তি পেতে আর বাধা কোথায়?

হিন্দু চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এমনও হতে পারে, কুরুরা ভেবেছিলেন শাম্বকে বন্দী করার মধ্যে কোনও অশুভ ইঙ্গিত ছিল। এইক্ষণেই একটি কথা বলবার অবকাশ এলো। বলেছিলাম, যাত্রা আমার দ্বারাবতী, কিন্তু কৃষ্ণ আমার পার্শ্বচরিত্র। আমি শাম্বকে দর্শনেই বেশি ব্যাকুল। পিতা পুত্রকে এক সঙ্গেই দেখতে চাই। বেশি চাই, অপরূপকান্তি এবং বীর শাম্বকেই। কৃষ্ণছাড়া নাম নেই, কিন্তু

শাম্ব আমাকে আকর্ষণ করছেন বেশি।

ত্বরা করো হে; ত্বরায় চলো। চলবো তো, অনেক প্রস্থ ধূলা উড়িয়ে পথের সন্ধান নিতে হচ্ছে। তার আগে একটা নির্ঘাৎ বিষয় বলা দরকার। বলভদ্র যে হস্তিনানগরীকে ভাগীরথীতে ছুঁড়ে ফেলার ভয় দেখিয়েছিলেন, ঘটনাটা ঘটেছিল তা-ই। যুধিষ্ঠিরের সাত পুরুষ পরে, রাজা নিচস্থর রাজ্যকালে হস্তিনাপুরী গঙ্গাগর্ভেই চলে যায়।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত দ্বারকার, দ্বারকার কুশস্থলী সুদৃঢ় পুরী? সেই রমণীয় রৈবতক পর্বত, কাননাদি ও সুমিষ্ট মনোহর জলাশয়, কোথায় ছিল সে-সব? প্রভাসতীর্থও তো কাছাকাছিই ছিল মনে হয়। পাণ্ডবগণ তীর্থ করতে বেরিয়ে যখন প্রভাসতীর্থে গিয়েছিলেন, তখন যাদবেরা তাঁদের সঙ্গে সেখানে দেখা করেছিলেন। কৃষ্ণ তো বটেই!

ইতিবৃত্তের এক স্থানে দেখছি রৈবত ককুদ্মি নামে এক রাজা কুশস্থলী পুরীর স্রষ্টা ছিলেন। পরবর্তীকালে কৃষ্ণ সেখানেই দ্বারকাপুরী স্থাপন করেছিলেন। রৈবত রাজবংশ কোনও কারণে রাজ্যচ্যুত অথ বা বংশহীন হয়েছিল। বলা হয়েছে রাজ্যচ্যুত রৈবতগণ সংগীত ললিতকলা নিয়েই কালযাপন করতেন।

আমার এতে কোনও অসুবিধা নেই। আমার যাত্রা কৃষ্ণের দ্বারকায়।

আমি হালের ভারতীয় ম্যাপে, মথুরা থেকে, বর্তমান দ্বারকার একটা দূরত্বের হিসাব কষেছি। না, রেলপথ বা আধুনিক রাস্তা ধরে না। মথুরা থেকে একেবারে সোজা দক্ষিণ পশ্চিমে নেমে যাওয়া। তার মধ্যে পাহাড় পর্বত নদনদী আছে। রেখাটা টেনেছি সরল রেখায়, তার ওপর দিয়েই। হিসাবে পাচ্ছি সাড়ে ছশো মাইলের মত। কিন্তু এ দ্বারকাকে সেই দ্বারকা বলে জানি না। প্রাচীন বৃন্দাবনের মতই সেই নগরীকে খুঁজে নিতে হবে পশ্চিম সাগরের জলের তলায়। মাউন্ট আবু বলো, গির্নারের পর্বত বলো, আসল রৈবতক এখন কচ্ছের কাছাকাছি কোথাও হেথা হোথা কিঞ্চিৎ মাথা তুলে থাকতে পারে। সিন্ধুদেশে অনেকবার প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়েছে। পুরাণকাররা সে-কথা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। মহর্ষি উতংক বলেছিলেন, 'সংবৎসরান্তে ধুন্ধু অত্যাচার করে।' এই ধুন্ধু ছিলেন বলরামেরও আগে অনন্তের অবতার। উতংকের আশ্রম সিন্ধুদেশেই ছিল, এবং তিনি একটি বিশাল তপ্ত বালুকারাশিপূর্ণ অগ্নিময় স্থল দেখেছিলেন আর সেখান থেকেই আগুন বালি ভস্ম পাথর ধোঁয়া নির্গত হয়ে, মহীতল আঘূর্ণিত করতো। উতংকের কথায়, তৎকালীন রাজা কুবলয়াশ্ব (৩৬০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ) একুশ হাজার লোক দিয়ে, সেই ভূমিকম্পনপীড়িত কেন্দ্রটিকে উৎখাত করবার চেষ্টা করেছিলেন। ফলে, প্রচণ্ড ভূমিকম্পে সকলেই মারা যায়।

আধুনিক কালের আঠারোশো উনিশ খ্রিস্টাব্দে দেখছি, কচ্ছপ্রদেশের দু হাজার বর্গমাইল সমুদ্রের গর্ভে চলে গিয়েছিল, আর প্রায় পঞ্চাশ মাইল লম্বা, দশ মাইল চওড়া ভূমি নতুন করে জেগে উঠেছিল। কচ্ছের রান্ বা রন্ বলে বিশাল এক জলাভূমি রয়েছে। রান না রন গুজরাতী ভাষায় একটি শব্দ। যার অর্থাৎ নোনা জলময় অস্বাস্থ্যকর স্থান।

এই ভৌগোলিক পরিবর্তনটি আধুনিক হলেও, আমাকে একবার স্মরণ করতেই হল। কেন না, আমার যাত্রাটা একেবারেই অত্যাধুনিক কালে। কৃষ্ণ এবং যাদবগণের প্রতিষ্ঠিত দ্বারকাপুরীর সঠিক স্থান নির্ণয়ে এই ঘটনাটি আমার যাত্রাপথকে সুদৃঢ় করছে। কিন্তু আধুনিক কালের এই দু হাজার বর্গমাইল সমুদ্রের গর্ভে চলে যাওয়ার অনেক আগেই নিশ্চয় দ্বারকা সমুদ্রগর্ভে ডুবেছিল। সিন্ধু এবং কচ্ছ প্রদেশের এই সব অঞ্চল প্রায়ই প্রলয়ে ওঠা-নামা করেছে, এটা বোঝা যায়। তবে কৃষ্ণ জীবিত থাকতে তাঁর দ্বারকা এবং রৈবতক পর্বতের ওপর সুদৃঢ় কুশস্থলীপুরী সমুদ্রগর্ভে যায়নি। গেলে পুরাণকারের লেখনিতে তা নিশ্চয়ই পাওয়া যেতো।

কতো বৎসর কৃষ্ণ দেহধারণ করেছিলেন? এখানে একটা ধন্দ রয়েছে। এক মতে, তিনি বেঁচেছিলেন একশো পাঁচ বছর। আর এক মতে একশো এক বছর। চার বছরের সমস্যা। সমস্যাটা তেমন একটা বড় না। কোন্‌টা বিক্ষিপ্ত কোন্‌টা বিক্ষিপ্ত না, এইটি ভাববার বিষয়। যে-হিসাব থেকে কৃষ্ণের জন্মকাল, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল পেয়েছি, সেই হিসাব বলছে, বাসুদেব একশো পাঁচ বছর বেঁচেছিলেন। পুরাণের এই মতটিই আমি গ্রহণ করছি।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকাল থেকে এই উনিশশো সাতাত্তরে দাঁড়াচ্ছে, তিন হাজার তিনশো তিরানব্বুই বছর। সিন্ধুদেশে কুবলয়াশ্বের ভূমিকম্পজনিত সংবৎসরের প্রলয় কাল তিন হাজার ছয়শো খ্রিস্টপূর্বাব্দ। এই বর্তমান বছর ধরলে পাঁচ হাজার পাঁচশো সাতাত্তর বছর। কৃষ্ণের দ্বারকার অনেক আগে। পুরাণকার বলছেন, কৃষ্ণের দেহাবসানের পরে অবশিষ্ট অক্ষম যাদবগণ, রমণীগণ, বালকগণ এবং মূল্যবান অলঙ্কারাদিসহ সম্পত্ত্যাদি নিয়ে অর্জুন দ্বারকা ত্যাগ করেছিলেন। কৃষ্ণের দেহে যখন অস্তগামী আসন্ন ছায়াপাত ঘটেছে, তখন তিনি নারদকে এক সময়ে বলেছিলেন, জ্ঞাতিদের অর্ধেক ঐশ্বর্য দান করে, তাঁদের কটুবাক্য শুনে তাদেরই দাসের ন্যায় রয়েছি। যাদবদের আত্মকলহ পরস্পরের সংঘর্ষ তিনি দেখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে অর্জুন ভোজকুলের কামিনীগণ ও তনয়দের মার্তিকাবতনগরে পাঠিয়েছিলেন। অন্যান্য বালক বৃদ্ধ আর স্ত্রীগণকে, সাত্যকিপুত্রসহ সরস্বতী নগরীতে পাঠিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্যভার কৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তার মানে, একদা কৃষ্ণের নেতৃত্বে যাদবেরা যে-ভাবে মথুরা ত্যাগ করে দ্বারকায় চলে গিয়েছিলেন, সেটা ছিল নিরাপদ সুদৃঢ় আশ্রয়ের সন্ধান। তারপরে সম্ভবত সত্তর পঁচাত্তর বছরের মধ্যেই আত্মকলহে ধ্বংসপ্রাপ্ত, অবশিষ্ট যাদবেরা দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। দ্বারকা পরিত্যক্ত হয়েছিল।

শুধুই এক পরিত্যক্ত নগরী? না, সিন্ধুদেশের ভূমিকম্পপ্রবণতাই কৃষ্ণের দ্বারকাকে গ্রাস করেছিল? তা না হলে সম্ভবত কৃষ্ণের কুশস্থলী পুরীর কোনও না কোনও নির্দশন, কাথিয়াবাড়ে, গিরিনগরে (নির্গারে) বা জুনাগড়ে খুঁজে পাওয় যেতো। অনুমতি হয়, জরাসন্ধের পক্ষে অগম্য কিংবা আক্রমণের পক্ষে প্রায় অসম্ভব কৃষ্ণের দ্বারকা ছিল, মূল ভূমিকণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন সমুদ্রের কোনও রমণীয় দ্বীপে। নৌচালনাপটুত্বের কথাটা এ সময়েই বিশেষ করে মনে আসে। অশ্বসমূহযুক্ত রথসমূহ নিয়ে, যে কোনও সময়েই মূল ভূখণ্ডে পৌঁছে দেবার জন্য নৌবাহিনী তৈরি থাকতো।

আঠারোশো উনিশ খ্রিস্টাব্দে কচ্ছপ্রদেশের দু হাজার মাইল সমুদ্রগর্ভে যাবার আগের কোনও সাক্ষীর বিবরণ আমার গোচরে নেই। তা হলে হয়তো কৃষ্ণের দ্বারকার কোনও সংবাদ পেলেও পাওয়া যেতে পারতো। তবে যাদবগণ যে ভারতের কোনও কোনও অঞ্চলে এখনো যদুবংশের পরিচয়েই ছড়িয়ে আছেন, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

এখন কেবল দ্বারকাবৃত্তান্ত। নারদ মুনি দ্বারকায় চলেছেন। পশ্চিম সমুদ্রের উপকূলে, প্রভাসতীর্থেই ভ্রমণে এসেছিলেন। এত কাছে

এসে, দ্বারকায় গিয়ে একবার যাদবদের সঙ্গে দেখা না করে ফিরে যাওয়াটা তাঁর যথার্থ মনে হল না। না, তিনি আদৌ ঢেঁকিতে চেপে ভ্রমণ করছিলেন না। নিজের রথেই তিনি ভ্রমণ করছিলেন।

নারদ নামে কি একজন মুনিই ছিলেন? অথবা একাধিক ব্যক্তি? নারদ নামে কি কোনও বিশেষ সম্প্রদায় আছে? নারদীয়গণ যাঁদের বলা হয়, তাঁরাই হয়তো সেই সম্প্রদায়ের। তাঁদের মধ্যে যাঁরা জ্ঞানে গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, বিভিন্ন রাজা এবং গোষ্ঠীপতিদের দ্বারা তাঁরা পূজিত হতেন। এই মন্তব্য ইতিবৃত্তের একটি সংকেত। তবে পুরু বংশীয় কৌরবদের ও যাদবদের, উত্থান পতনের কালের মধ্যে নারদ মুনি একজনই। ইনিই সেই নারদ। ইনিই যুধিষ্ঠিরকে রাজনীতি, অর্থনীতি, ভেদনীতি, সমাজনীতি, গার্হস্থ্যনীতিসমূহ বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন। ইনিই বিধান দিয়েছিলেন কুরুবংশীয়, পাণ্ডুতনয় পাণ্ডবদের, পাঞ্চালীর সঙ্গে পাঁচ ভাই কোন্ প্রথায় দাম্পত্য জীবন কাটাবেন। ইনি অশেষ গুণশালী, চিন্তাশীল অভিজ্ঞ ব্যক্তি। ইনি সমগ্র বর্ষগুলো পরিভ্রমণ করেছেন। কিম্পুরুষবর্ষ, ইলাবৃতবর্ষ, মধ্যস্থল, অন্তরীক্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ, কৈলাশ কোনও জায়গা বাদ নেই। দেবতা, অসুর, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, সর্প, মানুষ সকলের সঙ্গে মিশেছেন, জীবনযাত্রা ও ধারণপ্রণালী দেখেছেন। এই সবই তাঁকে অশেষ জ্ঞানী ও গুণী করেছিল। যে-কোনও বিষয়েই তাঁর প্রীতিভাজন রাজা ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে উপদেশ দিতে সক্ষম, কেবল যুদ্ধবিদ্যা ছাড়া। তিনি নিজে ক্ষত্রিয় নন, অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ নন, কিন্তু শত্রুদমনের কৌশল, নগরক্ষা, গুপ্তচরাদি বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সীমান্তরক্ষা, পাত্রমিত্রে ভেদাভেদ, প্রয়োজনে ছলনা ও চাতুরি, রাজকোষে অর্থাগমের বিধি, ব্যয়ের নিয়ম, নগরের বেশ্যা ও অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে আচরণের সঙ্গতি অসঙ্গতি, এমন কি গৃহে ও অন্তঃপুরে পরিচারক পরিচারিকাদের সম্বন্ধে যথার্থ খবর রাখা, যাবতীয় বিষয়েই সম্যক উপদেশ দানের জ্ঞান ছিল তাঁর।

পরবর্তীকালে মগধের নন্দবংশ ধ্বংসের যিনি নেতৃত্ব করেছিলেন, সেই কৌটিল্যের মধ্যেই নারদের গুণাবলী প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে। সেই অর্থে মহর্ষি নারদও কুটিল। কুটিলতা এ ক্ষেত্রে নীচতা না। ন্যায় এবং অন্যায় বিষয়ে দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা। যার পক্ষে যা অনাচরণীয়, তার প্রতিই নারদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে এবং সে-সব তাঁর কাছে অন্যায় প্রতীয়মান হলে, তিনি ক্ষুব্ধ হতেন।

এরকম ব্যক্তিকে কি রগচটা বলা চলে? বোধ হয় না। রগচটা বলতে গোঁয়ার বোঝায়। মহর্ষি আদৌ তা নন। কিন্তু তাঁর কাছে যা অন্যায় বলে বোধ হয়, তার বিহিত না করে ছাড়েন না। এ কথাটা সর্বজনে বিদিত ছিল বলেই, নারদ বা নারদ ঋষিদের সম্পর্কে সকলেরই মনে একটা ভয়ের ভাব ছিল। কেবল সাধারণ মানুষের না, সমস্ত রাজা এবং অমাত্যগণেরও। আর কুটিল হলেই ভেদবুদ্ধি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

মহর্ষি প্রভাসতীর্থ ভ্রমণের মধ্যেই যাদবদের গূঢ়পুরুষদের সম্যক চিনে নিতে পারছিলেন। গুপ্তচরদের আচার আচরণ, চলাফেরা ভঙ্গি দেখলেই তিনি বুঝতে পারেন। এখন অবিশ্যি যাদবদের বাইরে শত্রুর ভয় আর নেই। তথাপি রাজ্য পরিচালনায় সর্বদাই সাবধানতা অবলম্বন দরকার। যাদব গুপ্তচরদের দেখে, তিনি মনে মনে তাঁদের প্রশংসাই করলেন। খুশি হলেন, বিনা পরিচয়েই তারা সকলে অতি ব্যাকুল ব্যস্ততায় মহর্ষির পদধূলি গ্রহণ করে, নিজেদের ধন্য ঘোষণা করলো। মহর্ষির পরিচয় অতি ব্যাপক, অতএব প্রভাসতীর্থে তিনি ভক্তদের কাছ থেকে সহজে নিস্তার পেলেন না।

মহর্ষি মনে মনে সুখীবোধ করলেন। সবাইকে যথাবিহিত আশীর্বাদ জানিয়ে দ্বারকায় যাত্রা করলেন। সময় মত পৌঁছুলেন দ্বারাবতীতে। যে-নৌকারোহণে তিনি ও তাঁর শকট দ্বারাবতী পৌঁছুলেন সেই নৌচালকেরা চিৎকার করে তীরবর্তী যাদবগণকে তার আগমনবার্তা জানিয়ে দিল। মহর্ষি তীরে পা দিতে না দিতেই, ভোজক, অন্ধক ও বৃষ্ণি শাখার যাদবদের গৃহে গৃহে সাড়া পড়ে গেল। কুশস্থলীপুরী আর রৈবতক পর্বতের বিভিন্ন হর্ম্যতলে, কাননে কাননে, ক্রীড়াভূমিসমূহে সর্বত্র তাঁর আগমবার্তা পৌঁছে গেল। তাঁর আসা মানেই, নানা দেশের নানা সংবাদ জানা, বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা। অন্তরে বাহিরে কোনও সংকট থাকলে তাঁর উপদেশ লাভে তার নিরসন করা। সেইজন্য তিনি সর্বত্র পূজিত নিমন্ত্রিত।

পার্বত্য নগর প্রাকারের এবং প্রবেশদ্বারের রক্ষীরা সকলেই তাঁকে আভূমি নত হয়ে অভিবাদন করলো। মহর্ষি দু হাত তুলে সবাইকে আশীর্বাদ করলেন। অন্ধক ভোজক বৃষ্ণি গোষ্ঠীর অনেকেই নানাদিক থেকে প্রণাম ও সমাদর করতে ছুটে এলেন। মহর্ষি খুশি আর আনন্দিত চিত্তে সকলের মস্তক আঘ্রাণ করে আশীর্বাদাদি জানিয়ে নানা কুশল জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যে এগিয়ে চললেন।

কালের একটা হিসাব দরকার। মহর্ষির এই আগমন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কতো বছর পরে? যুদ্ধের পরেও তিনি ইতোমধ্যে কয়েকবার দ্বারাবতী ভ্রমণ করে গিয়েছেন। এই ক্ষণের কালটি ঠিক কখন? কৃষ্ণের বয়স আচরণ ইত্যাদি দিয়েই হিসাব করে বলা যায়, ভারত যুদ্ধের দশ বছরের বেশি বোধহয় না। তা হলে কৃষ্ণের বয়স এখন প্রায় বাহান্ন কিংবা সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের বিচারে উনআশি। তবু এখনো তাঁর নীলোৎপল দেহে জরা বা বার্ধক্যের কোনও লক্ষণ নেই। তাঁর জীবনসায়াহ্নের অস্তরাগে, এখনো সেই বিষর্ষ ম্লানতার কোনও ছায় পড়েনি। যে-সময়ে তিনি নারদকে দুঃখ করে বলেছিলেন, 'জ্ঞাতিবর্গকে ঐশ্বর্যের অর্ধেক দান করে, 'সর্বদা তাঁদের কটুবাক্য শুনে তাঁদের দাসের মত বেঁচে রয়েছি।'...

আমার বলতে ইচ্ছা করছে, জীবন এইরকম। আমাদের 'জীবিতকালের মধ্যেই তো বিশ্বের কতো রথী মহারথীর অতি ভয়ংকর আর বিষাদজনক পরিণতি দেখলাম! তুলনা আমি কারো সঙ্গেই কারোর করবো না। কারণ, আমি মনে করি, এই সব অতিমানুষ ব্যক্তিগণ সকলেই আপনিই আপনার একমাত্র তুলনা। একজনের চরিত্রের আলোকে আর একজনকে বিচার করা যায় না।

কিন্তু এখন এসব কথা থাক। মহর্ষিকেই অনুসরণ করি। যদুবংশে যদিও ভোজক কুলের উগ্রসেন বংশধরেরাই রাজসিংহাসনে আরোহণের অধিকারী তথাপি ন্যায়াধীশ বীর এবং কুশলী, সব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ হলেন, বৃষ্ণিবংশাবতংসাবতার বাসুদেব। অতএব মহর্ষি কুশস্থলীপুরীতে, আগে কৃষ্ণ সমীপে যাওয়াই স্থির করলেন। অতি রমণীয় পর্বতের ওপর কুশস্থলীপুরীর যে-অংশে কৃষ্ণ বাস করেন, সেই অংশের কাছাকাছি হতেই বৃষ্ণিবংশীয় সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সন্তানসন্ততিরা মহর্ষিকে অভ্যর্থনা করতে ছুটে এলেন। অবিশ্যি একটা কথা সব সময়েই মনে রাখা দরকার, মহর্ষি সচরাচর একলা কোথাও তেমন যেতেন না। তাঁর সঙ্গে সর্বদাই কিছু জ্ঞানী ঋষিগণ থাকতেন। তাঁরা মহর্ষির শিষ্য এবং জ্ঞানমুগ্ধ। মহর্ষির সঙ্গে নানাস্থানে ঘুরে বেড়ানো, একটি অতি আনন্দজনক বিষয়।

মহর্ষি কি তা বলে কখনো একলা কোথাও যেতেন না? নিশ্চয়ই যেতেন। সেরকম বিশেষ প্রয়োজন হলে তিনি ঋষিগণসহ বিহার করতেন না। মহর্ষি কৃষ্ণ-অঙ্গনে আসা মাত্র, প্রদ্যুম্ন এবং আর আর

যুবক বৃষ্ণি যাদবেরা তাঁদের নানা বিলাস, আলাপন, ক্রীড়া, অন্তঃপুরে ও বাইরের কানন মায়ায় নারীগণের সঙ্গে নানা হাসিমুখর চতুর বাক্যালাপাদি ত্যাগ করে দ্রুত মহর্ষি সমীপে এসে তাঁকে যথাযোগ্য সমাদরসহ প্রণাম করলেন। কৃষ্ণও অন্তঃপুরে সংবাদ পাওয়া মাত্র, ত্বরিত গতি উত্তাল জলস্রোতের ন্যায় নানা সম্ভাষণ করতে করতে ছুটে এলেন। তাঁকে যথাযোগ্য সমাদর ও পূজা করার জন্য নতশিরে হাত বাড়িয়ে আহ্বান করে বললেন, 'মহর্ষি, আমার অশেষ সৌভাগ্য বিশ্ববিহারী আপনি আমাকে দয়া করে দর্শন দিয়েছেন। আসুন, উপযুক্ত আসন গ্রহণ করুন।

মহর্ষি এবং তাঁর সঙ্গীরা বাসুদেবের এবং অন্যান্য বংশধরগণের আচরণে সত্যি খুব খুশি হলেন। কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটি চোখে একটি জিজ্ঞাসা জেগে উঠলো। বাঁ দিকে, কিছু দূরেই একটি ছায়াঘন, বিবিধ বর্ণাঢ্য ফুলের কেয়ারি ও লতাপাতায় কিছুটা আচ্ছন্ন, কানন মধ্যে অপরূপ রূপবান কৃষ্ণপুত্র শাম্বকে দেখলেন, তিনি একবারের অধিক মহর্ষির দিকে ফিরে তাকাবার অবকাশ পেলেন না। কেন, এত ব্যস্ততা কিসের?

শাম্ব সত্যি আর দ্বিতীয়বার ফিরে তাকাবার অবকাশ পেলেন না, কারণ তখন তাঁর কাননবিহারিণী সহচরীদের মধ্যে একজনের মদির চোখের দিকে তাকিয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। দেহ সম্ভোগ বিষয়েই আমোদজনক নানা কূট তর্ক হচ্ছিল, যে-তর্কের মধ্যে মনে স্ফূর্তি জাগে, প্রাণ হিল্লোলিত হয়। বিশেষতঃ কৃষ্ণপুত্রদের মধ্যে শাম্ব সর্বাপেক্ষা অধিক রূপবান পুরুষ। কাঞ্চনের অধিক উজ্জ্বল বর্ণে, তাঁর দেহে যেন, পারিপার্শ্বিক সকলেই প্রতিবিম্বিত হয়। তা সে কানন কুঞ্জ জলাশয় আকাশ পর্বত নারী যাই হোক। তাঁর অতি আয়ত চোখে সর্বদা কামনার বহ্নি অনল প্রজ্জ্বলিত হয় না, কিন্তু তাঁর মুগ্ধ দৃষ্টিতে এমন একটি চিত্তজয়ী দুর্বার আকর্ষণ আছে, রমণী মাত্রেই তাঁর দর্শনে মিলন আকাঙ্ক্ষায় কাতর হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে, পুরুষ হিসাবে তাঁর রূপ এমনই অসামান্য, তিনি নগরের পথে বের হলে, মাতা ও মাতৃপ্রতিম দুই চারি মাহিলা ছাড়া সকল যাদবরমণীগণই, প্রচ্ছন্ন বা অপ্রচ্ছন্ন যে-কোনও অলিন্দে গবাক্ষে বা সোপানে তাঁকে একবারটি দেখবার জন্য ছুটে আসেন।

দ্বারকার রমণীকুলে শাম্ব সম্পর্কে বহুতর কৌতূহল, নানা আকাঙ্ক্ষা। সকলেই জানেন, প্রণয়োদ্দীপ্ত ভাষণে ও আলাপে তিনি তুলনাহীন। অথচ কোনও ইতর ভাষা তিনি উচ্চারণ করেন না। তাঁর রতিকলাকুশলতা বিষয়ে রমণীগণ নানা কাহিনী নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে, অতি কামনায় অবশাঙ্গ ও মূর্ছিত হয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি সকল রমণীগণের সঙ্গে সম্পর্ক বিষয়ে অবহিত আছেন। যথাস্থানে, যথাযোগ্য সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকেন। ভ্রাতৃবধূদের প্রতি প্রীতি, কনিষ্ঠ কুলরমণীগণকে স্নেহের দ্বারা সুখী করেন। পুরুষরাও সকলেই প্রীত, কারণ শাম্বর আচরণ, আলাপাদি শ্রদ্ধা প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ। কিন্তু মানুষের মন! শাম্বর পুরুষোচিত রূপ যৌবনে অনেক যাদবগণের অবচেতনেই ঈর্ষা প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

শাম্ব এখন যে সহচরীটির মদির চোখের দিকে অভিভূত হয়ে তাকিয়ে আছেন, সম্ভবত সে একজন গোপবালা। সর্বজনবিদিত, যাযাবর গোপরমণীরা অন্যান্যদের তুলনায় স্বাধীনচেতা। তাদের স্ব-ইচ্ছাগমন বিষয়ে সকলেই অবগত আছে। প্রণয়সহচরীরূপে তাদের ভূমিকা অদ্বিতীয়। শাম্ব কুঞ্জ মধ্যে সেই রমণীটির দিকে কেবল অভিভূত হয়ে তাকিয়ে নেই, যেন হতবাক বিস্ময়ে, অথচ কামনাবিহ্বলতায় স্তব্ধ হয়ে আছেন। তাঁকে ঘিরে রয়েছে আরও কয়েক যুবতী, যারা পীনবক্ষ, ক্ষীণকটি, গুরুনিতম্ব এবং সুগৌরী। সকলেই অবিন্যস্ত, বস্ত্রাদি স্খলিত, সকলেই অপরূপদেহধারী শাম্বের অঙ্গ স্পর্শে ব্যাকুল হয়ে তাঁরা নানা অঙ্গ নিজেদের হাতে ধারণ করে আছে। শাম্বের সঙ্গে সকলেই সুরাসব পান করেছে। এখনো করছে।

শাম্ব খালি গা। তাঁর অতি উজ্জ্বল দেহ বক্ষভাগ রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। গলায় কবচযুক্ত মুক্তহার, কানে কুণ্ডল, দুই নিবিড় আয়ত চোখ সুরাসবের গুণে রক্তিম। সকলের সঙ্গেই তিনি নানা প্রণয়সম্ভাষণে লিপ্ত ছিলেন। তার মধ্যে দেহ সম্ভোগের নানা গুঢ় রহস্য ও চাতুর্যপূর্ণ প্রশ্নোত্তরের খেলা চলছিল। বেণীবন্ধনহীন আলুলায়িতকেশ পীনোদ্ধত বুকের ওপর লুটিয়ে যে-রমণী এখন নাসারন্ধ্র কাঁপিয়ে ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে মদির চোখে শাম্বকে দেখছে সে সহসা একটি কূট প্রশ্ন করেছে। বাসনাতাড়িতা রমণী যদি উড়ন্ত মরালীর মত চক্রাকারে উড়তে উড়তে পূর্ণ বৃত্তাকারে অবস্থান করে শাম্ব-সঙ্গলাভে অতিপ্রার্থিনী হয়, তা হলে শাম্ব কীরূপ আসন গ্রহণ করবেন?

এক গন্ধর্বী সুন্দরী মাথার ওপর হাত তুলে দেহকে অর্ধচক্রাকারে রেখে ভূমিতে হাত রেখেছিল। উদ্দেশ্য শাম্বকে দেহের বৃত্তাকার কৌশল দেখাবে। প্রশ্নকর্ত্রী বাধা দিয়েছে। অন্যান্য সহচারীরাও বাধা দিয়েছে। রমণীর সেই বৃত্তাকার দেহকে কল্পনা করুন এবং আপন আসনের কল্পনা ব্যাখ্যা করুন।

সহচরীদের সুরাসব পানে ও হাস্যে কুঞ্জ মুখরিত। তারাও যেন অতিপ্রার্থিনী হয়ে সকলেই নিজেদের বৃত্তাকারে কল্পনা করে শাম্বসঙ্গলাভে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। শাম্ব কয়েক মুহূর্ত ভেবেই, সহসা প্রণয়াকুল হয়ে প্রশ্নকর্ত্রী সহচরীকে দু'হাতে বুকে টেনে নিলেন, চুম্বন সোহাগে স্পর্শের দ্বারা তাকে আহ্লাদিত করে বললেন, তুমি প্রকৃতই চতুরা। শুনলে মনে হয়, তোমাদের প্রশ্ন অতিশয় কঠিন ও কূট। আসলে সহজ। ঘুরিয়ে বলেছো।

সকল সহচরীরাই শাম্বর জবাবের প্রত্যাশায় তাঁকে সর্বাঙ্গে ঘিরে ব্যূহ রচনা করলো। তাঁর পত্নী লক্ষ্মণাও সহচরীদের মধ্যেই রয়েছে। শাম্ব বললেন, রমণীর বৃত্তাকার দেহধারণ আগে নয়, পরে। বলো ঠিক বলেছি কী না?

প্রশ্নকর্ত্রী আলুলায়িতকেশিনী পীনোদ্ধত সুগৌরীবালা ভুরু কুঁচকে তাকালো। কিন্তু তার ঠোঁটের তটে নিটুট হাসি তরঙ্গে ঢেউ তুললো। চোখের কালো তারা দ্রুতসঞ্চারণশীল ভ্রমরের মত ঝিলিক দিল। কিন্তু কোনও জবাব দিল না। শাম্বর মুখ থেকেই সে এবং সকলেই জবাব শুনতে চায়।

শাম্ব বললেন, আমি যে-রমণীকে ধারণ করি, একমাত্র সে-ই তখন সেই অবস্থায় নিজের কোমল অঙ্গে বৃত্তাকার রূপ ধারণ করতে পারে।

প্রশ্নকর্ত্রী তৎক্ষণাৎ নত হয়ে, শাম্বর জানুদেশে মাথা রাখলো। অন্যান্য রমণীরা সোল্লাসে হেসে উঠলো। কিন্তু এই সব প্রণয়োদ্দীপ্ত রঙ্গ খেলায়, শাম্ব এই মুহূর্তে কার কোপে পড়লেন, তা জানতে পারলেন না। দূরান্তের সমুদ্রমধ্যে পর্বতবেষ্টিত এই রমণীয় নগরে যাদবেরা এখন নিশ্চিন্তে জীবনধারণ করছেন। শত্রুর আক্রমণ বা যুদ্ধবিগ্রহের কোনও সম্ভাবনা নেই। বলতে গেলে পাঞ্চালরাজ, পাণ্ডব, যাদবরাই এখন ভূভারত শাসন করছেন। তাঁদের মধ্যে ঐক্যের কোনও অভাব নেই। পরাজিত রাজন্যবর্গ সকলেই আত্মসমর্পণ করে স্ব স্ব রাজ্যে এঁদেরই নেতৃত্বে বাস করছেন। কোথাও কোনওরকম ষড়যন্ত্র বা বিদ্রোহের সংবাদ নেই। বড়রকমের কোনও প্রাকৃতিক

দুর্যোগ ঘটেনি। সারা দেশে এখনো আকাশে বাতাসে শোকের যেটুকু চিহ্ন ভেসে বেড়াছে, তা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিশাল ক্ষয় ও ক্ষতি। এখন চারদিকে শান্তি ও স্বস্তি। একা শাম্ব না, সকল যাদব সন্তানেরাই এখন নানা ক্রীড়াকৌতুকে সময় অতিবাহিত করেন।

কিন্তু প্রদ্যুম্নের মত, শাম্বর দৃষ্টি ও চিন্তা যদি জাগ্রত হতো তা হলে তিনি মহর্ষির আগমনকে কখনো ভুলে থাকতে পারতেন না। সকল যাদব শ্রেষ্ঠগণের মতই ছুটে আসতেন। শাম্ব আচরণবিধি জানেন না, এমন না। তবু ভুলে গেলেন। প্রেম প্রণয়লীলা এমন ভুরের সৃষ্টিও করে। মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়। আর মানুষ মাত্রকেই তার মূল্য দিতে হয়।

শাম্ব প্রণয়-লীলা করুন। মহর্ষিকে দেখি।

মহর্ষি, কৃষ্ণ, পুত্র প্রদ্যুম্ন ইত্যাদি সকলের দ্বারা আপ্যায়িত ও পূজিত হয়ে নানা কুশল জিজ্ঞাসা ও আশীর্বাদ করলেন। কৃষ্ণ নানাস্থানের সংবাদ জিজ্ঞেস করলেন। মহর্ষি সবই তাঁকে বললেন। কিন্তু শাম্বর আচরণে তাঁর অন্তরে আগুন জ্বলছে। তাঁর প্রতিটি নিশ্বাস যেন বিষানলশিখাযুক্ত হয়ে শাম্বকে আঘাত করতে চাইছে। সেই মুহূর্তেই তা প্রকাশ না করে নানা দেশ জনপদ আশ্রম তপোবন রাজা ও ঋষিদের বহুতর সংবাদ বললেন। কিন্তু নিজেকে তিনি অপমানিত বোধ করে ভাবতে লাগলেন, বৃষ্ণিকুলের এই রূপবান বংশধরটিকে কীভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়।

মহর্ষি নারদ কৃষ্ণের আতিথেয়তায় যৎপরোনাস্তি সন্তোষ প্রকাশ করে অন্যান্য যদুবংশীয়দের গৃহে গমন কলেন। ভোজ এবং অন্ধকবংশীয়দের কাছে শাম্ব সম্পর্কে দু-একটি প্রশ্নও করলেন। শাম্বর নিন্দা কেউ করেননি। কিন্তু মহর্ষির ক্ষুব্ধচিত্ত তাতে বিন্দুমাত্র শান্ত হল না। দ্বারকাত্যাগ করার আগেই শাম্বকে একটা কোনও শিক্ষা দিতে না পারলে, তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হচ্ছিল না। তিনি বিচক্ষণ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং তাৎক্ষণিক উপায় উদ্ভাবনে বিশেষ পটু। ভেবে দেখলেন, একমাত্র কৃষ্ণকে বিচলিত করতে পারলেই শাম্বকে যথোচিত শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। পুত্রের বিরুদ্ধে পিতাকে কুপিত ক্রুদ্ধ করে তুলতে পারলেই এক্ষেত্রে মহর্ষির মনস্কামনা সিদ্ধ হতে পারে। সমগ্র দ্বারকায় যাদবগণের মধ্যে শাম্ব স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত। শাম্বর বিরুদ্ধে যদুবংশকে বিবাদে প্রবৃত্ত করা সম্ভব না। বিরোধ সৃষ্টি করতে হবে পিতা পুত্রের মধ্যেই। আর তার হেতু স্বরূপ, শাম্বর অসামান্য রূপই যথেষ্ট।

মহর্ষি কি কৃষ্ণচরিত্র জানতেন না? খুব ভালই জানতেন। পাণ্ডবদের সংগঠিত করে সমগ্র দেশে শত্রুদের বিনাশসাধনে গভীর ভেদবুদ্ধির প্রয়োগ, বিশেষ করে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আত্মীয়ক্ষয়ে বিমুখ, আচ্ছন্ন ম্রিয়মাণ অর্জুনকে শত্রুরূপী জ্ঞাতিহত্যায় উদ্বুদ্ধ করে তোলার অসামান্য কীর্তি এই সব কিছু সত্ত্বেও কৃষ্ণ কি পরিপূর্ণ অসূয়াহীন? অতি কীর্তিমান মহামানবও মানুষ! জীবধর্মের এইটি একটি বিশেষ লক্ষণ। তাঁরও কতকগুলো সুপ্ত বোধ থাকে, অসূয়া অহংকার সম্ভোগেচ্ছা, আপনশক্তিতে বিশ্বাসী নিশ্চিন্ত কালাতিপাত। আঘাত সেখানেই হানতে হবে।

মহর্ষি দ্বারকাত্যাগের আগে, কৃষ্ণের সঙ্গে একান্তে একবার সাক্ষাৎ করলেন। বললেন, 'বাসুদেব, আপনার বংশে একটি গ্লানিময় পাপের ছায়া দেখে আমি বড় বিচলিত বোধ করছি।'

প্রশান্ত কৃষ্ণ উদ্বিগ্ন বিস্ময়ে বললেন, 'আমার বংশে গ্লানিময় পাপের ছায়া? আমার চোখে পড়েনি?'

মহর্ষি হেসে বললেন, 'চোখে পড়লে তো আপনি জানতেই পারতেন। ওপরে শান্ত জলরাশি, অথচ তলের গভীরে খরস্রোতের মত সেই পাপের ধারা বহে চলেছে। তির্যগযোনিসম্ভূত অনার্যরাজের কন্যা, জাম্ববতী তনয় শাম্ব তার কারণ।'

কৃষ্ণ অধিকতর বিস্ময়ে বললেন, 'শাম্ব? তার বিষয়ে যদুবংশে কোনও মালিন্য নেই। আমার এই রূপবান সন্তানটি সকলের প্রিয়।'

মহর্ষি বিদ্রূপে কুটিল হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, শাম্ব সকলের প্রিয়, কিন্তু সে প্রিয়তম পুরুষ আপনার ষোল হাজার রমণীর! যে-ষোল হাজার রমণীকে উদ্ধার করে, আপনি ভর্তাস্বরূপ তাদের গ্রহণ করেছেন, 'যাদের প্রতি প্রেমবশতঃ স্যমন্তক মণি আপনি ধারণ করতে পারেননি, সেই ষোল হাজার রমণী শাম্ব সঙ্গলাভে ব্যাকুল। শাম্বই তাদের ধ্যানজ্ঞান। এ কি পাপ নয়?'

কৃষ্ণ এক মুহূর্ত দ্বিধাগ্রস্ত হলেও পর মুহূর্তেই দৃঢ়স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, পাপ, কিন্তু আপনার অভিযোগ সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। মহর্ষি, আপনি ত্রিভুবনখ্যাত, সীমাহীন আপনার অভিজ্ঞতা। তবু বলি, আমার পুত্র ও প্রেয়সীদের বিষয়ে এই অভিযোগ আমি বিশ্বাস করি না। শাম্বর সদাচার বিশ্বস্ততা পিতৃভক্তি প্রশ্নের অতীত। আমার ষোল সহস্র স্ত্রী সহচরী রমণীদের বিষয়েও আমার মনে কোনও দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব নেই।'

মহর্ষি গম্ভীর হয়ে উঠলেন, তাঁর অন্তরের কোপানল বর্ধিত হল। বললেন, 'আমি ত্রিভুবনখ্যাত, আমার অভিজ্ঞতা সীমাহীন। কিন্তু বাসুদেব, আপনার অন্তর্দৃষ্টি গভীর ও ব্যাপক, অতুলনীয়। যে-কোনও বিষয়ে আপনার অভিজ্ঞতা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকলের সাধনার বস্তু। রমণীর চরিত্র আর মন সম্পর্কে আপনি এমন দ্বিধাহীন হচ্ছেন কেমন করে?'

'কারণ আমি সত্যাশ্রয়ী।' কৃষ্ণ বললেন, 'মহর্ষি, আপনি জানেন, এই ষোল হাজার রমণী দ্বারকার যদৃচ্ছ বিচরণকারিণী। আমাদের বংশের পুত্রগণ ব্যতীত, যাদবশ্রেষ্ঠগণের অনেকেই এই রকমণীদের প্রার্থনা করে থাকেন, যথোচিত সমাদরের দ্বারা সঙ্গলাভও করে থাকেন। তা কোনও দূষণীয় বিষয় না। এদের মধ্যে আপনি বাদ দেবেন, রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, গান্ধারী (ধৃতরাষ্ট্রপত্নী নন), হৈমবতী, শৈবা, প্রস্বাসিনী, ব্রতিনী এই আটজনকে। এই রমণীরত্নগণ আমার মহিষী। ষোল হাজার রমণীরত্নও স্বর্গের অপ্সরাতুল্য একান্ত আমার দ্বারাই রক্ষিত। তাদের রক্ষণাবেক্ষণের সকল দায়-দায়িত্ব আমার। আমি তাদের গতিবিধি আচরণ সবই জানি।'

মহর্ষি বিমর্ষ মুখে বললেন, 'আপনি যা বললেন, সবই আমারও জানা আছে। আপনি পুত্রগণ ব্যতীত বললেন। কিন্তু শাম্ব আপনার পুত্রই।'

কৃষ্ণ বললেন, 'অবশ্যই। সেই জবাব তো আপনাকে আগেই দিয়েছি। শাম্ব এই ষোল হাজার রমণী বিষয়ে আপনার অভিযোগ আমি বিশ্বাস করি না।'

মহর্ষির মুখ শক্ত হয়ে উঠলো, বললেন, 'প্রমাণ পেলে কি আপনি বিশ্বাস করবেন?'

কৃষ্ণ হেসে বললেন, 'প্রমাণ পেলে, আর বিশ্বাস অবিশ্বাসের কী আছে? চাক্ষুষ ঘটনাই তো বিশ্বাস।'

মহর্ষি কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে বললেন, 'তবে তাই হবে। প্রমাণের সুযোগ এলে, আবার আপনার কাছে আসবো। আজ বিদায় নিচ্ছি।'

কৃষ্ণ মহর্ষিকে প্রণাম করলেন। মহর্ষি কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে, মস্তক আঘ্রাণ করে বিদায় নিলেন।

কৃষ্ণের চিত্তে কোথাও সন্দেহের কোনও ছায়া ছিল না।

অবিশ্বাসও তাঁর হৃদয়কে কিছুমাত্র বিচলিত করেনি। মহর্ষি নারদের অভিযোগ তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। তবু মন যে বিচলিত না হল, তা না। কারণ মহর্ষি সহসা কোনও কথা বলবার পাত্র নন। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপেই বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য থাকে। কেন তিনি শাম্ব এবং ষোলসহস্র প্রিয়দর্শিনী প্রণয়শীলা রমণীগণকে কেন্দ্র করে এমন একটি অমূলক অভিযোগ করলেন? শাম্ব কি কোনও কারণে তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেজাজী মহর্ষির বিরক্তি উৎপাদন করেছে? অথবা রমণীগণ কেউ তাঁকে দেখে কোনওরকম হাস্যপরিহাসাদি করেনি তো?

কিন্তু কৃষ্ণ কারোকেই মহর্ষির অভিযোগের বিষয়ে কিছু বললেন না। কৌতূহলবশত শাম্বকে কয়েকদিন লক্ষ করে দেখলেন। ব্যতিক্রম বা বৈশিষ্ট্য কিছুই চোখে পড়লো না। শাম্ব একজন যুদ্ধবিশারদ দৃঢ়কলেবর মহাবীর। এক্ষণে নারী সঙ্গে, প্রণয়লীলা ও নানা রঙ্গরস ক্রীড়াকৌতুকে শাম্বর আসক্তি কিঞ্চিত বেশি। সে তার স্ত্রী ও রমণীদের সঙ্গে যেমন ক্রীড়াকৌতুকে কাল কাটিয়ে থাকে, তার অতিরিক্ত কিছু চোখে পড়লো না।

কৃষ্ণ কি ষোল সহস্র রমণীর অন্তরের কথা জানবার প্রয়াসে, তাদের মধ্যে উৎকর্ণ ও সজাগ দৃষ্টি নিয়ে বিচরণ করেছিলেন? করলেও, তিনি কি কিছুই অনুমান করতে পেরেছিলেন? তিনি দুরন্ত মহাবল অরিনিধনকারী বাসুদেব। নরককে বধ করে তিনি এই রমণীদের কেবল উদ্ধার করেননি। জাম্ববানের কাছ থেকে স্যমন্তক মণি উদ্ধার করেছিলেন। সত্রাজিৎকন্যা সত্যভামাকে বিবাহ করেছিলেন। স্যমন্তক মণি যে-কোনও পুরুষের ধারণের অতি আকাঙ্ক্ষণীয়। কিন্তু ষোল হাজার রমণীকে নররে পীড়ন থেকে উদ্ধার করে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছিলেন বলেই স্যমন্তক মণি ধারণ করতে পারেননি। ইচ্ছা ছিল সত্যভামা করুন। কিন্তু তিনি কৃষ্ণের বিবাহিতা স্ত্রী। যা কৃষ্ণ পারেন না, তা তিনিও পারেন না। সেই ষোল সহস্র রমণী কি কখনো কৃষ্ণপুত্র শাম্বের প্রতি আসক্তিবোধ করতে পারে?

কৃষ্ণের একমাত্র সিদ্ধান্ত, এমন ঘটনা কদাচ ঘটতে পারে না। সংগীতাচার্য মহর্ষি নারদের অভিযোগ তিনি কোনওরকমেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। বিশ্বাস করলেন না, এবং তিনি স্থিরনিশ্চিত ছিলেন, মহর্ষি কখনোই তাঁর অভিযোগ প্রমাণ করতে পারবেন না। অতএব জনার্দন অল্পকালের মধ্যেই মহর্ষির অভিযোগের কথা বিস্মৃত হলেন। যথাবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক জীবনযাপনে কাল কাটাতে লাগলেন। যদিচ তাঁর এই কাল ক্রমশ বার্ধক্যের দিকে ঢলে পড়ছিল, আর সেই সঙ্গে যদুবংশের মধ্যে নানারকম বিবাদ বিরোধ দেখা দিচ্ছিল।

কৃষ্ণ নিজে বিশ্বাস করতেন, জীবনকালের মধ্যে দুইটি ভাগ সর্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর। বনবাসে জীবনধারণ, অথবা রাজ্য ও সমৃদ্ধিলাভে পরাক্রান্ত সৌভাগ্যশালী হওয়া। এর মধ্যবর্তী ইন্দ্রিয়ভোগে কাল যাপন মানুষকে অধঃপতিত করে। বনবাসে নিরিবিলি সামান্য ধনে জীবনযাপনে শান্তি থাকে। রাজ্য-সমৃদ্ধি ইত্যাদি লাভের মধ্যে মানুষের বলবিক্রম নানা নীতি ও কূটকৌশল যুদ্ধকর্মাদিতে ব্যাপৃত থাকা, ক্রিয়াশীল জীবনের লক্ষণ। এই দুই জীবন প্রবাহের মধ্যে, মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে। মধ্যপন্থা মানুষকে কিছুই দেয় না। অলস বিলাস ব্যসন এবং নিশ্চিন্ত জীবনযাপনের ক্ষেত্রে, ইন্দ্রিয়ভোগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। তখন আর নতুন করে বিকাশের কিছু অবলম্বন থাকে না। মানুষের বলবিক্রম বা তপশ্চর্যা সবকিছুই সৃষ্টিশীল। নব নবরূপে তা উদ্ভাসিত হয়।

কৃষ্ণ কি যদুবংশের মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষদের মধ্যে সেই মধ্যপন্থা অবস্থা লক্ষ করছিলেন? যখন সকলেই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে পরিণত হচ্ছিল, নিজেদের মধ্যে তুচ্ছ দলাদলি পরাক্রম বিষয়ে প্রতিযোগিতা ও আস্ফালন করছিলেন? গৌরব বর্ধিত হচ্ছিল না। অতএব সম্পদও বর্ধিত হচ্ছিল না। কৃষ্ণই সর্বাপেক্ষা ভাল জানতেন, ক্ষয় ও লয় অবশ্যম্ভাবী। তিনি কি তারই অশুভ ছায়া, যদুবংশে দেখতে পেয়েছিলেন?

কিন্তু সে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এখনো ভবিষ্যতের গর্ভে।

নারদ দ্বারকা ত্যাগ করলেও শাম্বের অবহেলা ভুলতে পারেননি। কৃষ্ণের অবিশ্বাস তাঁর মর্মমূলে গাঁথা ছিল। কিন্তু কেন? তিনি কি সত্যি বিশ্বাস করতেন তাঁর অভিযোগ সত্য? অসামান্য রূপবান পুরুষ শাম্বর মনে হয়তো নিজের সম্পর্কে কিছু অহংকার থাকতে পারে। সে-অহংকার কিছু কিঞ্চিৎ প্রদ্যুম্ন বা চারুদেষ্ণ, কার মধ্যেই বা না ছিল? এবং মহর্ষির এ-অনুমানও হয় তো আদৌ মিথ্যা না, বাসুদেব একান্তরূপে অসূয়াহীন ছিলেন না। মহামানবের গৌরবও চিরকাল তাঁকে আঁকড়িয়ে থাকে না।

প্রকৃতপক্ষে শাম্ব প্রণয়লীলায় কখনোই অতি আসক্ত নন। কিন্তু তাঁর প্রণয়সম্ভাষণ, কৌতূহলোদ্দীপক প্রেমলীলা, প্রণয়িনীগণের সঙ্গে তাঁর প্রণয়োদ্দীপক নানা ক্রীড়াকৌশল যা একান্ত অনায়াসসাধ্য নয়, বিবিধ আচার অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াদির অপেক্ষা রাখে তা যাদব রমণীগণের মধ্যে সুখকল্পনায় গুঞ্জরিত হতো। সেটা তাঁর কোনও অপরাধ না। কিন্তু মহর্ষি ক্রুদ্ধ হয়ে, এত বড় একটা গুরুতর অভিযোগ তুললেন কেমন করে? তাও পিতার রমণীগণ বিষয়ে পুত্রকে অভিযুক্ত এবং সে অভিযোগ পিতাকেই! মহর্ষির কি কোনও বাস্তব ভিত্তি ছিল এই অভিযোগের?

সম্ভবত ছিল। দ্বারকায় ইতিপূর্বে তিনি অনেকবার এসেছেন। যাদবদের বিভিন্ন গৃহে গমন করেছেন। এবং এমন একটি ধারণা করবার মত সঙ্গত কারণ তাঁর ছিল, রূপবান শাম্ব যাদবরমণীগণের অতি প্রিয় পুরুষ। তিনি কি কখনো কারোর মুখে শুনেছেন, কৃষ্ণের ষোল সহস্র রমণীগণ শাম্বকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে অভিলাষপূর্ণ প্রণয়ালাপ করছে?

মহর্ষি নিশ্চয়ই কিছু জ্ঞাত ছিলেন। অথবা কেবলমাত্র রমণীর মন বিষয়ে, নানা দেশের অভিজ্ঞতাই তাঁকে এমন একটি দৃঢ় সিদ্ধান্ত দান করেছিল, কৃষ্ণকে সেই গুরুত্বর অভিযোগ করতে তিনি দ্বিধা করেননি। তিনি দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, সর্প, মানব সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকগণের আচরণের নানা রীতি ও বৈপরীত্য বিষয়ে অবগত আছেন সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

মহর্ষি আবার দ্বারকায় ফিরে এলেন। দ্বারকা ত্যাগ করে গেলেও আদৌ কি তিনি দুরান্তরে কোথাও গমন করেছিলেন? মনে হয় না। সম্ভবতঃ নিকটে থেকেই তিনি একটি বিশেষ মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিলেন। নানা শ্রেণীর ঋষিগণের মধ্যে তাঁর কোনও সংবাদদাতা ছিলেন না, এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। তিনি এ যাত্রায় দ্বারকায় এসেই আগে গেলেন রৈবতকের পর্বতের গহনে কৃষ্ণের প্রমোদকাননে। রৈবতকের সেই প্রমোদকাননে নানা বৃক্ষে বর্ণাঢ্য ফুলের সমারোহ। ভূমিসকল নানা পুষ্পপল্লবিত বীথি ও মনোহর সবুজ ঘাসে আস্তীর্ণ। প্রমোদকাননে বিশাল সুমিষ্ট স্বচ্ছ জলাশয়।

নারদ দূর থেকে দেখলেন, কৃষ্ণ তাঁর মহিষী ও ষোলসহস্র রমণীগণসহ জলকেলিতে সুখে মগ্ন। বাসুদেবকে ঘিরে জল মধ্যে নানা রমণী নানা ক্রীড়াকৌতুকে, মরালীর মত ভেসে বেড়াচ্ছে। কেউ

কৃষ্ণকে স্পর্শের জন্য ব্যাকুল, কেউ জল মধ্যে বিহার আকাঙ্ক্ষায় মীনসমূহ যেমন জলমধ্যে নিমগ্ন বৃক্ষের চারপাশে খেলা করে সেইরূপ করছিল। কেউ কেউ সুরাসব পানে অতি প্রমত্তা হয়ে নানারূপ প্রণয় কথা উচ্চারণ করছে। অন্যান্য বান্ধবীদের পৈষ্ঠী ও সুরাসবের পাত্র এগিয়ে দিচ্ছে। কেউ কেউ নিজেদের মধ্যেই আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে বাসুদেবকে অনুভব করছে। স্বভাবতই প্রমোদকানন ও জলাশয়ে রমণীরা উচ্চহাস্যে প্রগলভ কথাবার্তায় প্রমত্তা। জলাশয়ও তাদের কেলি উদ্দামে অতি উচ্ছ্বাসে তরঙ্গায়িত।

কৃষ্ণ স্বয়ং অতি উদার ও প্রদত্ত বাঞ্ছায় প্রিয় রমণীগণের সহবাসে সকলের ইচ্ছাপূরণ ও আহ্লাদিত করছেন। এই অতি প্রেমোচ্ছল জলকেলিতে বৃক্ষের পাখীরা নানা স্বরে রব করছে। বিচিত্র বর্ণের পতঙ্গসমূহ কাননের শোভ বর্ধন করছে। রমণীগণের সঙ্গে মরালীরাও জলাশয়ের অন্যপ্রান্তে নিজেদের মধ্যে কেলি করছে।

নারদ দেখলেন, সুরাসব পানে অতি প্রমত্তা রমণীগণের অঙ্গের বসনভূষণ সকলই শিথিল ও স্খলিতপ্রায়। নিজেদের নগ্নতা বিষয়ে তাদের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। থাকবার কথাও না। কারণ রৈবতকের এই প্রমোদ কাননে ও জলাশয়ে একমাত্র পুরুষ কৃষ্ণ ছাড়া কারোরই উপস্থিতির কোনও উপায় নেই। কৃষ্ণের প্রমোদকানন ও জলকেলি স্থান কৃষ্ণ ছাড়া সকলের অগম্য এ-কথা দ্বারকায় সর্বজনবিদিত। কিন্তু তার অর্থ এই না, কৃষ্ণ কোনও প্রয়োজনে সেখানে কারোকে ডেকে আনতে পারবেন না। বিলাস অবকাশেও অনেক সময় কর্মজীবনের জরুরী প্রয়োজন ঘটতে পারে।

নারদ দেখলেন, এই তাঁর সেই প্রকৃষ্ট সুযোগ উপস্থিত। রমণীরা সুরাসব পানে ও যৌবন সম্ভোগেচ্ছায় অতি প্রমত্তা, হাস্যে লাস্যে কৌতুকে কেলিতে প্রমোদকানন মুখরিত। তিনি নগরের প্রাসাদে ফিরে গেলেন। প্রাসাদের কাছাকাছি কুঞ্জমধ্যে শাম্বকে তাঁর সহচরী পরিবেষ্টিত অবস্থায় খুঁজে পেলেন। রূপবান শাম্বকে রমণীর সোহাগে অধিকতর রূপবান দেখাচ্ছিল। নারদ কিছুটা দ্বিধা ও সংকোচ করে বললেন, 'শাম্ব, তোমাকে সুখে বাধা দিতে চাই না। বাসুদেব এখনও তাঁর রৈবতকের প্রমোদকাননে রয়েছেন। সেখানে তিনি তোমাকে স্মরণ করেছেন।'

শাম্ব তৎক্ষণাৎ সম্বিৎ ফিরে পেলেন। মহর্ষি বাক্য কখনো মিথ্যা হবার না। পিতা স্মরণ করেছেন শোনা মাত্র তিনি দ্রুতগতি হয়ে, প্রমোদকাননে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণ এমন অসময়ে, তাঁর প্রমোদকাননে কেলিস্থলে শাম্বকে দেখে অবাক হলেন। কিন্তু তাঁর ষোলসহস্র রমণীগণ, রূপবান শাম্বকে দেখে উল্লাসে মেতে উঠলো। তাদের সকলের আরক্ত সিক্ত চোখ-মুখ কামনায় উদ্বেল হয়ে উঠলো। কামোচ্ছ্বাসে তারা সকলে নির্বাক হয়ে থাকতে পারলো না। কৃষ্ণের উপস্থিতি সত্ত্বেও শাম্বের রূপ নিয়ে তারা প্রগলভ গুঞ্জন মেতে উঠলো।

নারদ বুঝলেন, এটা প্রথম ধাপ। রমণীরা এখনো তাদের যৌবনপ্রস্ফুটিত দেহ দলের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছে। অবিশ্যি সকল রমণীর মধ্যে তিনজন কৃষ্ণের নিকটবর্তী হয়ে অধোবদন ছিলেন। তাঁরা জাম্ববতী, রুক্মিণী, সত্যভামা। তাঁরা অবাক ও গম্ভীর হয়েছিলেন। মত্ততা দূরের কথা, কোনও প্রকারের বিকার তাঁদের ছিল না। নারদ এতক্ষণ অন্তরালে ছিলেন। এবার কৃষ্ণের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন।

মহর্ষিকে দেখা মাত্র তাঁকে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য সকল নারী জল থেকে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু ফল হল বিপরীত। নারদকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে গিয়ে রমণীগণ শাম্বকে তাদের প্রস্ফুটিত যৌবন দেখাতেই অত্যুৎসাহী হয়ে উঠলো। তাদের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ বিবিধ ভঙ্গিসহকারে শাম্বর সামনে এমনভাবে উচ্ছ্রিত হল যে, সকলের কামোচ্ছ্বাস অত্যন্ত প্রকটিত হল। অতিমাত্রায় সুরাসবপানে, মত্ততাপ্রসূত, তারা শাম্বর প্রতি অতিপ্রার্থিনী হয়ে তাদের উজ্জ্বল রূপলাবণ্যরাশি অনাবৃত করলো।

নারদের সঙ্গে কৃষ্ণের একবার দৃষ্টিবিনিময় হল। পরমুহূর্তে মর্মাহত বাসুদেব ক্রোধে ও গ্লানিতে জ্বলন্ত চোখে রমণীদের দিকে তাকালেন। নারদকে তাঁর আর কিছুই জিজ্ঞেস করার ছিল না। বলবারও ছিল না। মহর্ষি যা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, তা তিনি অতি নির্মমভাবেই করেছেন। এখন তিনি পরিণতি দেখবার জন্যই দাঁড়িয়েছিলেন। কৃষ্ণ রমণীদের প্রতি কঠিন দৃষ্টিপাত করে ধিক্কার দিয়ে অভিশাপবাণী উচ্চারণ কলেন, 'তোমরা আমার রক্ষিত হয়েও অতি নিকৃষ্ট আচরণ করেছো। অতি প্রমত্তা হয়ে তোমরা যেমন পণ্যাঙ্গনাদের ন্যায় ব্যবহার করেছো, আমার মৃত্যুর পরে, তোমরা তস্করদের দ্বারা লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত হবে।'

কৃষ্ণের অভিশাপ যাঁদের ওপর বর্ষিত হল না তাঁরা জাম্ববতী, রুক্মিণী এবং সত্যভামা। অন্য সমস্ত রমণীগণ মুহূর্তে তাদের অপরাধ অনুভব করে আর্তস্বরে বাসুদেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো। প্রমোদকাননের জলকেলি, হাস্য মুখরিত লীলাক্ষেত্র সকলই বিষাদে ডুবে গেল। কৃষ্ণ রমণীদের বললেন, ভবিষ্যতে দালভ্য ঋষির কাছে তোমাদের সম্যক জীবনধারণের উপায় জানতে পারবে।

কৃষ্ণ অতঃপর তাকালেন বজ্রাহত বিস্মিত ভীত অধোমুখ শাম্বর দিকে। শাম্বর অসামান্য রূপের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তাঁর ক্রোধানল প্রজ্বলিত হল। পুত্রকে তিনি অভিসপ্তাত করলেন, 'তোমার এই রমণীমোহন রূপ নিপাত যাক। কুষ্ঠরোগের কুশ্রীতা তোমাকে গ্রাস করুক।'

শাম্বর সর্বাঙ্গ আতঙ্কে শিহরিত হল। তিনি করজোড়ে নতজানু হয়ে বাসুদেবের পায়ের কাছে ভেঙে পড়ে, কাতর স্বরে বললেন, 'পিতা, আমি স্বইচ্ছায় কখনোই আপনার প্রমোদকাননে আসিনি। আমি আমার জন্মমুহূর্ত থেকে আপনার আজ্ঞাবাহী সেবক। পিতা, আপনি জগদ্বিখ্যাত বাসুদেব। হে পুরুষোত্তম জনার্দন, হে বৃষ্ণিসিংহাবতার, এই জগতীতলে, কী বা প্রকৃতি কী বা মানুষ, আপনি সকলের অন্তর্যামী। বিশ্বচরাচরের যা কিছু অমোঘ পরিবর্তনশীলতা অথবা মানুষের অন্তরের কথা কিছুই আপনার অগোচরে থাকে না। আপনাকে কোনও কারণে অসুখী দর্শনের চিয়ে আমার পক্ষে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ। কিন্তু আপনি জানেন আমি নিষ্পাপ। আমি আপনার ঔরসজাত সন্তান, সংসারে এর তুল্য সুখ ও অহংকার আমার আর কিছুই নেই। আপনার অন্যান্য পুত্রদের ন্যায় আমার দ্বারা কখনো কোনও নীতিবিগর্হিত কাজ সম্ভব না। আপনার সন্তাপ হতে পারে, এমন কোনও কুরুচিপূর্ণ আচরণের সাহস আমার কদাপি মনে ছায়াপাতও করেনি। হে সর্বজ্ঞ পিতা, আপনি আমাকে কেন এই নিদারুণ অভিসম্পাত করলেন?'

কৃষ্ণ সেই মুহূর্তে কোনও জবাব দিতে পারলেন না। বজ্রপাতের পরমুহূর্তে যেমন স্তব্ধতা নেমে আসে, তিনি সেইরূপ মৌনতা অবলম্বন করলেন। মহর্ষি, পুত্র, রমণীগণ, প্রমোদকানন কোনও কিছুর প্রতি কারো প্রতিই যেন তাঁর দৃষ্টি নেই। অথচ তাঁর বিশাল চক্ষুদ্বয়ের দৃষ্টি শূন্য না। তিনি যেন স্থাণুর গভীর ধ্যানমগ্নতায় ডুবে আছেন।

মহর্ষি মনে মনে হাসছিলেন আর মনে মনেই উচ্চারণ করছিলেন, অসূয়া অসূয়া! হে বাসুদেব আপনার জ্ঞানই আপনাকে

সর্বজ্ঞ করেছে। জ্ঞানী হয়েও রমণীর চরিত্র ও মন আপনি এই বয়সে আর একবার অনুধাবন করলেন। অতি নির্মমরূপে অনুভব করলেন রূপবান আত্মজের সামনে নিজের রমণীগণ কামনায় ব্যাকুল হয়ে উঠলে কী দুঃসহ ঈর্ষায় অন্তর বিদীর্ণ হয়। হে পুরুষোত্তম, আপনিও তখন আপন প্রিয় পুত্রকে নির্মম অভিশাপ না দিয়ে পারেন না। আপনি প্রমাণ চেয়েছিলেন, আমি প্রমাণ দিয়েছি। আমি মিথ্যা বলে শাম্বকে এখানে ডেকে নিয়ে এসেছি, তা ছাড়া চাক্ষুষ প্রমাণের আর কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু শাম্ব নিরপরাধ আপনি জানেন। জেনেও এই অভিশাপ। অমোঘ এই অন্তরের বিকার, হে বাসুদেব। আমি আর ক্ষণকাল এখানে অপেক্ষা করবো। শুধু সেই পরিণাম দেখে যাবো, পুত্রের কাতর প্রার্থনায় আপনার অভিশাপ থেকে মুক্তিদান করেন কী না। যদি করেন তা হলে আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। শাম্বকে আমি যে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলাম, তা ঘটবে না।

শাম্ব তখন কৃষ্ণের পদতলে পড়ে কাতর প্রার্থনা করে চলেছেন, পিতা, আপনার কোনও পুত্রই কখনো আপনার অবাধ্যতা করেনি, আমিও করিনি। শৈশব থেকে আপনার ও আমাদের বংশের অন্যান্য অস্ত্রবিদদের কাছে অস্ত্রশিক্ষা লাভ করেছি। যুদ্ধবিশারদ রূপে আমার যদি কোনও খ্যাতি থেকে থাকে, তবে তা আপনারই দান। আপনার নির্দেশ ও নেতৃত্বে, জরাসন্ধের মহাবল সেনাপতিদের সঙ্গে সংগ্রাম করেছি। বলার অপেক্ষা রাখে না, আপনার অনুপস্থিতিতে এই দ্বারকানগরী যতোবর শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, যদুবংশের সকল বীরদের সঙ্গে আমিও প্রাণপণ যুদ্ধ করেছি। প্রদ্যুম্ন আর আমি অতিবলশালী শাল্বর সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে দ্বারকার দূরপ্রান্তে তাড়িয়ে এসেছি। আপনার মহিমময় কীর্তি, সৌভনগরে গিয়ে সেই শাল্বকে আপনি নিজের হাতে হত্যা করেছিলেন। রাষ্ট্র সমাজ পরিবার বিষয়ে যাবতীয় শিক্ষা আপনার কাছেই পেয়েছি। রমণীদের কার প্রতি কী আচরণ করতে হয়, সেই সুনীতিজ্ঞান আপনার কাছ থেকেই পেয়েছি। পৃথিবীতে আপনি সেই পুরুষ, যিনি বিশাল রমণীকুলের ভর্তা ও ত্রাতা। আমাকে ক্ষমা করুন পিতা, আমাকে অভিশাপ দেবেন না।

কৃষ্ণের স্তব্ধ মৌনতা ভাঙলো, তিনি তথাপি কয়েক মুহূর্ত তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে রইলেন। তারপর বললেন, শাম্ব, আর তা সম্ভব না।

শাম্বর অতি উজ্জ্বল কান্তি স্বেদসিক্ত হয়ে বারে বারে প্রকল্পিত হল। নারদ তৎক্ষণাৎ সে-স্থান পরিত্যাগ করলেন। শেষ কথা যা শোনার, তা তাঁর শোনা হয়ে গেল। তিনি প্রমোদকানন ছেড়ে, নগরীর দিকে চলে গেলেন। কৃষ্ণ একবার সেদিকে দেখলেন। বিষাদের ছায়া তাঁর মুখে। জাম্ববতী রুক্মিণী ও সত্যভামার চোখে জল। অন্যান্য রমণীগণ দ্বারকানগরীর অনন্ত বিলাস ব্যসন ও সুখের পরিবর্তে, অভিশাপ ভয়ে কাতর হয়ে তখন কেবল সেই ভয়াবহ অনাগত ভবিষ্যতের চিন্তায় মগ্ন। আর মনে মনে দালভ্য ঋষির নাম জপ করছে।

কৃষ্ণের চোখে, মুখে, বক্ষে, বর্ণের উজ্জ্বলতায় কোথাও কোনওরকম ক্রোধের অভিব্যক্তি নেই। তিনি বললেন, শাম্ব, একমাত্র অভিশাপ দিয়ে যদি সকল সংকটের মুক্তি হতো তা হলে আমাকে গদা আর চক্র ধারণ করে শত্রু নিধন করতে হতো না। অভিশাপ কেবলমাত্র মনস্তাপ থেকে স্ফুরিত হয় না। সাধারণ মানুষ পরস্পরকে যে-রকম অভিশাপ দিয়ে থাকে, আমার অভিশাপ তদ্রূপ না। যা ঘটে যায়, যা ভবিতব্য তা-ই অভিশাপরূপে উচ্চারিত হয়। তোমার জন্মলগ্নেই এই কুৎসিত ব্যাধি তোমার ভাগ্যে লেখা হয়ে গেছে। আমি অতি ক্রোধে তা উচ্চারণ করেছি মাত্র। তোমার কোষ্ঠির কাল অনুযায়ী, তোমার ব্যাধির প্রকটরূপ প্রকাশের সময় আসন্ন। বিম্ব ফলের ন্যায় তোমার দেহের এই রক্তাভ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে স্ফীতি, কিছুই আর স্বাভাবিক নেই। শরীরের এই লক্ষণগুলো তোমার চোখে পড়েনি। তথাপি আমি স্বীকার করি, তোমাকে দেখে রমণীদের যৌবনোচ্ছ্বাসে ক্রুব্ধ হয়েই তোমাকে অভিসম্পাত দিয়েছি।

শাম্বের স্বেদসিক্ত কলেবরের কম্পন কিছু স্থির হল। তিনি তাঁর নিজ দেহের প্রতি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিপাত করে জিজ্ঞেস করলেন, পিতা, তাই যদি সত্য হবে বলুন আমার আরোগ্যের উপায় কী?

কৃষ্ণ এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন, এখন আমি বুঝতে পারছি, মহর্ষি নারদকে তুমি রুষ্ট করেছো। তুমি তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান দেখাওনি। আমার মনে হয়, তোমার ব্যাধি প্রকটিত হলে তাঁর কাছেই তোমার যাওয়া উচিত। তিনি দেবভূমি থেকে সর্বত্র ভ্রমণ করেছেন। বহু বিচিত্র স্থান ও সম্প্রদায়কে তিনি চাক্ষুষ করেছেন। একদিক থেকে তাঁর অভিজ্ঞতা আমাদের থেকে অনেক ব্যাপক। সম্ভবত তিনিও চান, তুমি তাঁরই দ্বারস্থ হবে। আমিও তোমাকে সেই উপদেশই দিচ্ছি, তুমি যথাসময়ে মহর্ষির সন্ধানেই যেও।

শাম্ব এখন অকম্পিত স্বরে ঘোষণা করলেন, পিতা, যা অমোঘ এবং অনিবার্য হয়ে জীবনে নেমে আসে, তাকে আমরা ভাগ্য বলে মানি। এই অভিশাপ আমার অদৃষ্ট। এই বয়সের মধ্যেই আমি ভাগ্যের উত্থানপতন কম দেখিনি। এককালে যদুবংশকে মহাবল সম্রাট জরাসন্ধ সংখ্যাল্প করেছিলেন, ভীত ও সন্ত্রস্ত করেছিলেন। আজ কোথায় জরাসন্ধ। যদুবংশ সগৌরবে অবস্থান করছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অতি যুদ্ধার্থী কৌরবগণ প্রায় নিশ্চিহ্ন। পাণ্ডবেরাও লোকবলে ক্ষীণপ্রাপ্ত হয়েছেন। তথাপি কেউ নিশ্চেষ্ট বসে থাকেননি। আমার ভাগ্যের এই অমোঘ অনিবার্য পরিণতি জেনেও, আমিও নিশ্চেষ্ট থাকবো না। প্রয়োজন হলে, মুক্তির জন্য আমি এই সসাগরা পৃথিবী, দেবলোকে, অন্তরীক্ষে সর্বত্র যাবো। আমাকে আপনি বিদায় দিন।

শাম্ব পিতার পদধূলি নিয়ে মাথায় ঠেকালেন। কৃষ্ণ শাম্বর মস্তক আঘ্রাণ করে মুখ ফিরিয়ে জাম্ববতীর দিকে তাকালেন। জাম্ববতী তখন অশ্রুজলে ভাসছিলেন। শাম্ব নিজে কাছে গিয়ে, মা জাম্ববতীকে প্রণাম করলেন। রুক্মিণী এবং সত্যভামাকেও প্রণাম করলেন। জাম্ববতী শাম্বর মস্তক আঘ্রাণ করে তাঁকে শিশুর ন্যায় বক্ষে গ্রহণ করলেন। পুত্রস্পর্শে মায়ের স্তনধারা যেন সন্তানের জন্য অজস্র ধারায় বিগলিত হল। তিনি অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বললেন, বৎস, আশীর্বাদ করি, তুমি শাপমুক্ত হও। তোমার সেই জনচিত্তবিমোহিতকারী রূপ আবার লাভ কর।

অভিশাপ ভয়ে ভীতা ষোল সহস্র রমণীগণও এই দৃশ্য দেখে অশ্রুমোচন করলো। যে-কারণে তারা বাসুদেবের দ্বারা অভিশপ্ত, তাদের সেই রমণীচিত্ত শাম্বদর্শনে এখনো বিমোহিত। রূপবান পুরুষের প্রতি রমণীর চির আকাঙ্ক্ষা, এই অভিশাপের দ্বারাই চিরস্থায়ী হল। শাম্ব প্রমোদকানন থেকে বিদায় নিলেন।

শাম্ব ফিরে এলেন নগরীতে। এখন তাঁর অঙ্গ স্বেদকম্পিত না। অভিশপ্ত পুরুষ এখন আত্মমগ্ন হয়ে, মুক্তির কথা ভাবছেন। গৃহ সন্নিকটে অদূরে রমণীয় কুঞ্জমধ্যে সহচরীরা তাঁর জন্য ব্যাকুল হয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন। তিনি সেইদিকে ভগ্নহৃদয় বিষাদ দৃষ্টিতে দেখলেন। কিন্তু সেদিকে গেলেন না। যুদ্ধবিশারদ শাম্ব, রতিবিশারদ শাম্ব, আপন বাহু তুলে নিরীক্ষণ করলেন। সত্যি, তার যে অঙ্গে

চতুষ্পার্শ্বস্থ সকলই প্রতিবিম্বিত হয়, তা এখন অধিকতর রক্তাভ দেখাচ্ছে। তিনি গৃহমধ্যে গমন করলেন।

গৃহমধ্যে বহু দাসদাসী বিচরণ করছে। শাম্ব কারো প্রতি দৃষ্টিপাত না করে, অন্তঃপুরে গমন করলেন। সেখানে নানা সুবর্ণের আভরণ নানা সময়ে প্রাপ্ত বিবিধ মণি, কক্ষে কক্ষান্তরে, রমণীয় শয্যা ও বিবিধ গৃহসামগ্রী নানাদেশীয় মহার্ঘ বসন, কোনও কিছুর প্রতিই দৃষ্টিপাত করলেন না। অথচ এ সকলই ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়।

শাম্বকে অন্তঃপুরে গমন করতে দেখে রমণীগণ পাথর স্খলিত প্রস্রবণের ন্যায় সেদিকে ধাবিত হলেন। শাম্ব কপাট বন্ধ করে অতিকায় সুবর্ণদর্পণ হাতে তুলে নিলেন। নিরীক্ষণ করলেন আপনি প্রতিম্বিকে। আশ্চর্য, পিতা মিথ্যা কিছু বলেননি। লক্ষ করে দেখলেন, তাঁর নাসা, কর্ণ, ভ্রূ ইত্যাদির স্থানে স্থানে স্ফীতিলাভ করেছে। এ কি বাসুদেবের অভিশাপমাত্রই ঘটলো? নাকি তাঁর কথায় এখন চোখে পড়ছে! তিনি কোষ্ঠীর ভবিতব্যের কথা উল্লেখ করেছেন। হয় তো অভিশাপের বাস্তব ভিত্তি তাই। কিন্তু শাম্ব এই ঘটনাকে পিতার অভিশাপ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছেন না।

শাম্ব সুবর্ণদর্পণ রেখে দিয়ে কপাট খুলে দিলেন। রমণীগণ মধ্যে কেবল লক্ষ্মণাকেই প্রবেশ করতে বললেন। এই সেই দুর্যোধন আত্মজা লক্ষ্মণা, যাঁকে শাম্ব হরণ করে বিবাহ করেছিলেন। লক্ষ্মণা সর্বাঙ্গসুন্দরী, সর্বালঙ্কারশোভিতা। কিন্তু শাম্ব কর্তৃক সখী ও সহচরীদের কক্ষ প্রবেশে বাধাদানে অবাক হলেন। অবাক হল প্রণয়সঙ্গিনীরা। ম্লান মুখে তারা ফিরে গেল। লক্ষ্মণার হৃদয় অশুভ আশংকায় কেঁপে উঠলো। তিনি শংকিত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে তোমার। তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?'

শাম্ব ব্যস্ত কৌতূহলিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন দেখাচ্ছে আমাকে লক্ষ্মণা?'

লক্ষ্মণা প্রশ্ন আশা করেননি। শাম্বর জিজ্ঞাসায় এক মুহূর্ত দ্বিধাগ্রস্ত হলেন, তারপর বললেন, 'তোমার চোখ মুখ শুষ্ক। পীড়িত, বিষণ্ন, দুঃখিত দেখাচ্ছে তোমাকে। মহর্ষি নারদ তোমাকে কোথায় ডেকে নিয়ে গেছলেন? কিছুক্ষণ আগেও তুমি সুখী ছিলে। এখন এত করুণ আর বিমর্ষ কেন?'

শাম্ব লক্ষ্মণাকে সব কথাই বললেন। লক্ষ্মণা অস্ফুট ক্রন্দনে আর্তনাদ করে উঠলেন, 'অভিশাপ! কেন? তুমি যে রমণীমোহন, এ কথা দ্বারকার সর্বজনবিদিত। তবে কেন অভিশাপ?'

শাম্ব বললেন, 'লক্ষ্মণা, অভিশাপ জিজ্ঞাসার অতীত। এ অমোঘ এবং অনিবার্য। এ ভাগ্যের পরিহাস না, নির্দেশ। একে অমান্য করা চলে না। আমি এখন থেকে তোমাদের কাছ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবো। নগর প্রাকারের বাইরে কিছুকাল অপেক্ষা করে মহর্ষির সঙ্গে সাক্ষৎ করে তাঁর নির্দেশ নেবো। তিনি যা বলবেন তাই করবো।'

লক্ষ্মণা আসন্ন বিচ্ছেদ ব্যথায় কাতর হয়ে উঠলেন, বললেন, 'না না, আমি তোমাকে কোথাও যেতে দেবো না। তুমি যেখানেই যাও আমি তোমার সঙ্গে যাবো।'

শাম্ব শান্ত স্বরে বললেন, 'লক্ষ্মণা, মহর্ষির সঙ্গে সাক্ষাতের পরেই একমাত্র এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। তিনি যদি নির্দেশ দেন, তা হলে তুমি আমার সঙ্গে যাবে। তবে, খুব দ্রুতই ব্যাধি আমাকে গ্রাস করবে, আমি অনুভব করছি। পূর্ণ গ্রাসের পূর্ব পর্যন্ত আমি নগরের বাইরে থাকবো। তারপরে মহর্ষির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো।'

লক্ষ্মণার কান্না হৃদয়বিদারক হল। তিনি শাম্বকে আলিঙ্গন করে তাঁর প্রতিটি অঙ্গ নিরীক্ষণ করে সন্দিগ্ধ অবিশ্বাসের স্বরে বললেন, 'প্রিয়তম, সুবর্ণদর্পণের ন্যায় উজ্জ্বল তোমার অঙ্গে, আমি কিছুমাত্র পরিবর্তন বা ব্যতিক্রম দেখি না। এ সকলই তোমার পিতার অভিশাপগ্রস্ত মনের ও চোখের বিকার। আমি এখনো তোমার বুকে আমার প্রতিবিম্বকে দেখতে পাচ্ছি। তুমি এখনো বিশ্বের সকল পুরুষের ঈর্ষণীয় সেই বলিষ্ঠ রূপবান পুরুষই আছো। পিতার অভিশাপ পুত্রের প্রতি স্নেহেরই এক বিপরীত সম্ভাষণ। ব্যাধির আশংকা, গৃহত্যাগের বাসনা তুমি মন থেকে ত্যাগ করো।'

শাম্ব মনে মনে হাসলেন, করুণ আর মর্মান্তিক সেই হাসি। বললেন, 'লক্ষ্মণা, পিতার অভিশাপ না, বৃষ্ণিসিংহাবতার পুরুষের অপমানিত মর্মাহত অন্তরের অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে আর এক পুরুষের প্রতি। এ ক্ষেত্রে পিতা পুত্রের সম্পর্কজনিত কপট উষ্মা বা ক্রোধের বিষয় কিছু নেই। তোমাকে তো সব ঘটনাই বললাম। বাসুদেবের মত ব্যক্তির পৌরুষে যদি আঘাত লাগে, তবে তাঁর সংহারমূর্তি কী ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে, তুমি কল্পনা করতে পারো! অন্য পুরুষের তো কোনও কথাই নেই। তা ছাড়া, তুমি আমার মনের ও চোখের যে-বিকারের কথা ভাবছো, তা সত্যি না। পিতা কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না। আমি কখনোই নিজেকে দেখতে ভুল করিনি। বিকার বা মায়া, কিছুই আমাকে গ্রাস করেনি। পিতার ষোল সহস্র রমণীর প্রমত্ত উৎকট কামতাড়িত আচরণ আমি নিজেই লক্ষ করেছি। বৃষ্ণিসিংহের ক্রোধবহ্নির সম্যক কারণ আমি অনুভব করেছি।'

লক্ষ্মণার আসন্ন স্বামী-বিচ্ছেদ-কাতর প্রাণ কোনও যুক্তি মানতে পারছে না। অশ্রুসজল চোখে, ব্যথায়, অভিমান স্ফুরিত স্বরে বললেন, 'রতিকোশাস্ত্রবিদ হে দ্বারকামোহন, সেই রমণীদের কামোচ্ছ্বসিত আচরণের অপরাধই বা কী? আমি জানি তুমি কদাচ সেই রমণীদের নিজের রূপের দ্বারা কামোদ্রেক করোনি। কিন্তু সর্বজ্ঞ বৃষ্ণিসিংহ কি জানতেন না, মাতৃগণ ব্যতীত দ্বারকার সকল রমণীকুলের তুমি অতি আকাঙ্ক্ষিত পুরুষ? এই ষোল হাজার রমণীকে নির্বিচারে গ্রহণের জন্য তিনি নিজেকে অনাচারীজ্ঞানে অতি পুণ্যের স্যমন্তক মণি ধারণ করতে পারেননি। মুষল ও লাঙ্গলধারী দুর্দান্ত যদুবীর বলভদ্রকেও তিনি সেই স্যমন্তক মণি ধারণ করতে দেননি, কারণ বলভদ্রও সর্বদাই সুরাসবপানে প্রমত্ত থাকেন। তবে তোমাকে কেন তিনি কামোচ্ছ্বসিত রমণীদের কারণে অভিশাপ দিলেন?'

শাম্ব গম্ভীর হলেন, বললেন, 'লক্ষ্মণা, সুলক্ষণে প্রিয়তমে, তোমাকে আগেই বলেছি মহাপুরুষের অভিসম্পাত প্রশ্নের অতীত। তা ছাড়া যদুকুলের কুমারগণ তাঁদের পিতার সমালোচনা শুনতে অভ্যস্ত না। পিতার অভিশাপ অলঙ্ঘনীয়। তিনি আমাকে মুক্তির ইঙ্গিত দিয়েছেন। এখন সেই পথেই আমার যাত্রা।'

লক্ষ্মণা ক্রন্দনোচ্ছ্বসিত স্বরে বললেন, 'আহ্, হায় কী দুর্ভাগ্য আমার যে-পুরুষের মুহূর্তের দর্শন ছাড়া থাকতে পারি না, যিনি আমাকে হরণ করার সময়ে পিতার বাধা দানের ফলে হস্তিনানগরী ভূমিকম্পে আকুঞ্চিত হয়েছিল, যাঁর কণ্ঠলগ্ন হয়ে ছাড়া দিনযাপন করিনি। তিনি পিতার দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে আজ আমাকে পরিত্যাগ করে যাচ্ছেন।'

শাম্ব লক্ষ্মণাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন 'লক্ষ্মণা, অভিশাপমুক্ত হয়ে আমি আবার ফিরে আসবো।'

রমণীর মন এই সব সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ মানে না। শাম্বর দেহলগ্ন হয়ে তিনি নানা রূপে নিজের ব্যথা প্রকাশ করতে লাগলেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি নগর প্রাকারের বাইরে কেন যাবে?'

শাম্বর বিশাল বক্ষ দীর্ঘশ্বাসে ভারি হয়ে উঠলো। কিন্তু কাতরতা প্রকাশ না করে বললেন, ' লক্ষ্মণা, ব্যাধি আমাকে পূর্ণরূপে গ্রাস করবার আগেই আমি আমার প্রিয়জনদের লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যেতে চাই।'

লক্ষ্মণা এই কথা শুনে অতি শোকাকুলা হলেন। কারণ তিনি এই বলীয়ান রূপবান পুরুষের অন্তরের বেদনা অনুভব করলেন। যিনি নগরের পথে বের হলে রমণীগণ ব্যাকুল হয়ে তাঁকে দেখতে ছুটে আসেন, তিনি কুৎসিত বিকলাঙ্গ দেহ নিয়ে কেমন করে সেই নগরী মধ্যে বাস করবেন? তখন লক্ষ্মণা স্বামী সান্নিধ্যে বসনভূষণ পরিত্যাগ করে, যুগপৎ কান্না ও আবেগকম্পিত স্বরে বললেন, 'হে পরম সুন্দর মহাভুজ রমণীবিশারদ, এই দারুণ দুখেও আমি অতিপ্রার্থিনী হয়ে তোমাকে কামনা করছি। তোমার দুই বিশাল বাহু ও বক্ষ ও তেজ দ্বারা আমাকে মর্দিত করো।'

শাম্ব শান্ত ও অবিকৃতভাবে লক্ষ্মণাকে আপন অঙ্গে গ্রহণ করলেন। কিন্তু মনে মনে বললেন, 'হায় অভিশাপ! কুরুকুলের এই অবিস্মরণীয়া রমণীরত্নের সঙ্গে সঙ্গম প্রমোদেও কোনও সুখানুভূতির লেশ নেই। জীবনপ্রবাহ কি আশ্চর্য স্বপ্নবৎ! যে-আত্মা অতি দুর্জ্ঞেয়, সেই আত্মানুসন্ধানেই জীবনকে আহরণ করতে হয়। আমার সমগ্র ধারণা এখন এই ধারণার বশবর্তী।...'

শাম্বর নগর প্রাকারের বাইরে সকলের চোখের অন্তরালে সমুদ্রোপকূলবর্তী বালুবেলায়, বৎসরান্ত বাসের আগেই, পিতার অভিশাপে এবং ভবিতব্য সমগ্র দেহে অতি উৎকটরূপে প্রকটিত হল। তিনি দিনের আলোয় সচরাচর বালুবেলায় আত্মপ্রকাশ করতেন না। উপকূলবর্তী পর্বতের গুহাকন্দরে দিনযাপন করতেন। পর্বতের বুকে, আশেপাশের বৃক্ষে ও ভগ্নপ্রস্তর মৃত্তিকায় যে সমস্ত ফলমূলাদি সংগ্রহ করতে পারতেন তা দিয়েই ক্ষুণ্নিবৃত্তি করতেন। পর্বতের ক্ষীণ প্রস্রবণধারায় যে মিষ্ট জল পেতেন, তা দিয়ে তৃষ্ণা মেটাতেন।

নগররক্ষীরা যখন অশ্বচালনা করে, নগরের বাইরে টহল দিতে বেরোতো, শাম্ব কখনোই তাদের সামনে যেতেন না। সূর্যাস্তের পর তিনি যখন বালুবেলায় বেরিয়ে আসতেন তখন নগরের দ্বারপালদের ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেতেন। তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠতো, রৈবতক পর্বত নগরীর আলোকমালা। নাগরীদের গুঞ্জন ও হাসি, নাগর পুরুষদের দেখে, চোখের ঝিলিক হানা নানা প্রকারের অঙ্গভঙ্গি। সুরাসবপানে সুখী ও প্রমত্ত রাজপুরুষগণের নাগরী পণ্যাঙ্গনাদের অতি রুচিশীল সংগীত ও নৃত্য মুখরিত অঙ্গনে গমন। প্রবাসী ইন্দ্রপ্রস্থবাসী বা পাঞ্চালের অধিবাসীরা বা অন্যান্য দেশের নাগরিকগণ, দ্বারকানগরীর নৈশ প্রমোদ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। গৃহে গৃহে মন্দিরে মন্দিরে, মঙ্গল শঙ্খ ও ঘণ্টা বাজছে। শাম্ব শুনতে পেতেন সবই। দূরের অন্ধকার বালুবেলা থেকে দেখতে পেতেন না কিছুই। কিন্তু সবই তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠতো।

শাম্বর নিজের গৃহাঙ্গনে ও অন্তঃপুরের কী অবস্থা? তিনি নির্বিকার থাকবার চেষ্টা করলেও সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটার মতই সে-সব বিষয় তাঁর অন্তর মধ্যে তরঙ্গায়িত হত। তাঁর গৃহাঙ্গনে ও অন্তঃপুরে আলো জ্বলছে তো? রমণীরা প্রতি রাত্রের মতই সুখে বিচরণ করছে তো? লক্ষ্মণা অন্ধকারে মুখ ঢেকে বসে নেই তো? মাতৃগণ মনোকষ্টে নেই তো? পিতা বিচলিত ও বিমর্ষ হয়ে নেই তো? ভ্রাতা ও বন্ধুগণ তাঁর অদর্শনে ভগ্নমনোরথ হয়ে নেই তো?

এই ভাবে বৎসর পূর্তির পূর্বেই শাম্বর দেহ কুষ্ঠরোগের গ্রাসে অতি কুৎসিত ও বিকলাঙ্গ রূপ ধারণ করলো। পিতার নির্দেশ তাঁর মনে পড়লো। মহর্ষি নারদের কাছে তাঁকে যেতে হবে। তাঁর কাছে যাবার সময় হয়েছে। তিনিই ব্যাধিমুক্তির উপায় বলে দেবেন। কিন্তু তিনি এখন কোথায়? শাম্ব তাঁকে কোথায় পাবেন? মহর্ষি সর্বব্যাপী। ঋষিগণসহ নানা বর্ষগুলোতে পরিভ্রমণ করে বেড়ান। অথচ তাঁকে না পেলে চলবে না। তাঁর প্রতি অঙ্গত আচরণের মূলেই নিহিত রয়েছে এই অভিশাপের কারণ। সেইজন্য হয়তো পিতা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মুক্তির উপায় জানতে বলেছেন।

শাম্বর সহসা মনে হল, পিতার কাছে যাওয়া উচিত। একমাত্র তিনিই হয়তো বলতে পারেন মহর্ষি এখন কোথায় অবস্থান করছেন। রাত্রে তিনি এই কথা ভাবলেন এবং পরের দিন প্রভাতেই নগরদ্বার উন্মুক্ত হবার পরে নগরের উদ্দেশে গমন করলেন। না, এখন আর শাম্বকে দেখে কেউ যদুবংশের সেই রূপবান যুদ্ধবিশারদ পুরুষকে চিনতে পারবে না। নগর ও দ্বাররক্ষীরা সহজেই অনুমান করে নেবে, তিনিও একজন ব্যাধিগ্রস্ত অসহায় ভিক্ষার্থী। ভিক্ষা শেষে যথাসময়ে নগরের বাইরে নিজের আশ্রয়ে চলে যাবেন।

শাম্ব ভুল ভাবেননি। দ্বাররক্ষীরা তাঁর দিকে কৃপাদৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজেদের বিশাল গুম্ফে মোচড় দিল। কেউ তাঁকে বাধা দিল না। নানা কার্যব্যপদেশে, নগরের অধিবাসীরা পথে ভিড় করে, নানা কথায় মুখরিত করে চলেছেন। কেউ শাম্বর কুষ্ঠ কুৎসিত চেহারার দিকে ফিরেও তাকালেন না। বরং কেউ কেউ যুগপৎ ঘৃণা ও কৃপাবশে, তাঁর প্রতি দূর থেকে মুদ্রাদি নিক্ষেপ করলেন এবং শাম্বকে তা সাগ্রহে সংগ্রহ না করতে দেখে তাঁর মস্তিষ্কের সুস্থতা বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেন।

শাম্ব দ্রুতগতিতে পথ অতিক্রম করে রৈবতকে কুশস্থলীতে গমন করলেন। বিভিন্ন স্থানে চারুদেষ্ণ, প্রদ্যুম্ন, সাত্যকি ইত্যাদি ইত্যাদি যাদবশ্রেষ্ঠগণকে দেখতে পেলেন। তাঁরা কেউ তাঁকে চিনতে পারলেন না, তাঁর প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টিপাতও করলেন না। সৌভাগ্যবশতঃ তিনি অনায়াসেই বাসুদেবের সাক্ষাৎ পেলেন, এবং অধিকতর সৌভাগ্যের বিষয়, তিনি দৃষ্টিপাতমাত্র পুত্রকে চিনতে পারলেন। তাঁর অভিশাপের জাজ্বল্যমান প্রমাণ স্বরূপ শাম্বর কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত মূর্তি দেখে কৃষ্ণ মুহূর্ত মধ্যে অত্যন্ত বিচলিত ও বিষণ্ন হলেন। সেই মুহূর্তে গান্ধারীর অভিশাপের কথা তাঁর মনে পড়লো। গান্ধারী শোকে ও মনস্তাপে অতীত বিস্মৃত হয়েছিলেন। যুদ্ধের পূর্বে তাঁর পুত্রের আস্ফালন, যুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলা, কৃষ্ণের বহু অনুরোধ, যুদ্ধজনিত জ্ঞাতি ও লোকক্ষয় বিষয়ে কৃষ্ণের সাবধানবাণী, শান্তি ও সম্প্রীতি বিষয়ে কৃষ্ণের দৌত্য সে-সবই তখন শোকাকুলা গান্ধারী বিস্মৃত হয়ে কৃষ্ণকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। কৃষ্ণ জানতেন, কালের অমোঘ নিয়মে যা অনিবার্য গান্ধারী অভিশাপ দিতে গিয়ে সে-কথাই উচ্চারণ করেছিলেন। কৃষ্ণের প্রতি তা কখনোই অভিশাপরূপে বর্ষিত হয়নি।

কিন্তু এখন কৃষ্ণ নিজ মুখে উচ্চারিত অভিশাপেরই পরিণতি, কৃষ্ঠ জর্জরিত আত্মজকে দেখে মর্মান্তিক বেদনা অনুভব করলেন। তিনি শাম্বকে নিয়ে কুশস্থলীর এক কক্ষে দ্রুত গমন করলেন। শাম্ব পিতাকে যথাবিহিত প্রণাম ও পাদ্যার্ঘ প্রদান করে বললেন, 'পিতা, আপনার মনে কোনও প্রকার দুঃখ সঞ্চার করতে বা আপনাকে বিচলিত করতে আমি আসিনি। আপনার অভিশাপে আমার সর্বাঙ্গে ব্যাধি। আপনি বলেছিলেন, আরোগ্যলাভের উপায় একমাত্র মহর্ষি নারদ আমাকে বলতে পারবেন। কিন্তু তিনি এখন কোথায় আছেন,

আমি জানি না। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।'

কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ আশ্চর্য ও চমৎকৃত হয়ে বললেন, 'শাম্ব, এ বিচিত্র যোগাযোগ! মহর্ষি আজই দ্বারকায় এসে আমার আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। তাঁকে আমি এখনই তোমার সংবাদ দিচ্ছি, তুমি অপেক্ষা করো।'

শাম্বও মনে মনে বিস্ময় ও স্বস্তি বোধ করলেন। বললেন, 'এ আমার এক পরম সৌভাগ্য!'

কৃষ্ণ কক্ষত্যাগ করে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হলেন এবং ক্ষণপরেই মহর্ষি নারসসহ, সেখানে আবার উপস্থিত হলেন। মহর্ষি নারদকে দেখে শাম্ব এগিয়ে এসে কষ্টের সঙ্গে নতজানু হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। মহর্ষি আশীর্বাণী ও স্বস্তিবচন উচ্চারণ করে, কৃষ্ণের দিকে ফিরে বললেন, 'আমি শাম্বর ব্যাধিমুক্তি বিষয়ে আলোচনা করবো।'

কৃষ্ণ মহর্ষির ইঙ্গিত উপলব্ধি করে সে-স্থান ত্যাগ করলেন। মহর্ষি শাম্বকে বললেন, 'বসো, আমি তোমাকে এক স্থানের কথা বলবো।'

মহর্ষি অগ্রে আসন গ্রহণ করলেন। শাম্ব অদূরে উপবেশন করলেন। বললেন, 'হে পরমপূজনীয় মহর্ষি, আমার বিষয়ে আপনার অজ্ঞাত কিছুই নেই। নিতান্ত চপলতাবশত আমি আপনার প্রতি অবহেলা প্রকাশ করেছিলাম, কিন্তু আপনি অনুমান করতে পারেন, যদুবংশের পুত্র হয়ে আমি কখনোই ইচ্ছাকৃতভাবে তা করিনি। এখন যা অনিবার্য তাই ঘটেছে। পিতার দ্বারা আমি অভিশপ্ত হয়ে কুৎসিত ব্যাধিতে আক্রান্ত। আপনি তুষ্ট হোন, আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। আপনি সুরলোক, অসুরলোক, গন্ধর্বলোক অন্তরীক্ষ যাবতীয় লোকে গমনাগমন করে থাকেন। আপনার অভিজ্ঞতা সীমাহীন। আপনি আমাকে অনুগ্রহ করে উপদেশ দিন এখন আমার কী কর্তব্য? পিতা বললেন, আপনি আমার আরোগ্যলাভের উপায় বলে দিতে পারেন।'

মহর্ষি শাম্বর কথা শুনলেন, তারপরে সম্বোধন করলেন, 'হে বৃষ্ণিব্যাঘ্র! তোমার প্রতি আমার পরম সন্তোষ জ্ঞাপন করছি।'

মহর্ষির মুখে 'বৃষ্ণিব্যাঘ্র' সম্বোধন শুনে, শাম্বর প্রাণের মধ্যে অতি ব্যথাতুর একটি আনন্দানুভূতি হল। মনে হল, এখনই তাঁর পুচ্ছহীন রক্তগর্ভ চোখ জলপূর্ণ হয়ে উঠবে। তিনি হৃদয়ের আবেগকে দমন করে মহর্ষির উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন।

মহর্ষি আবার বললেন, 'আমি জানি, তোমাকে অতি কষ্টের মধ্যে দিয়ে কাল যাপন করতে হবে। কিন্তু তার কিছুই বৃথা যাবে না। এবার মনে দিয়ে শোন। আমি একদা একবার সূর্যালোকে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখেছি, সূর্যদেবকে দেবতারা বেষ্টন করে আছেন। দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব এবং অপ্সরাবৃন্দ তাঁর চারপাশে অবস্থান করছেন। ঋষিগণ সেখানে বেদপাঠ করছেন এবং সূর্যের স্তব করছেন, পূজিত হচ্ছেন ত্রিসন্ধ্যা দ্বারা। সেখানে সূর্যকে ঘিরে রয়েছে আদিত্যগণ, বসুগণ, মারুতগণ, অশ্বিনীগণ। তাঁর পার্শ্বেই রয়েছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র তাঁর দুই পত্নী রজনী ও নিক্ষুভা। রয়েছেন পিঙ্গলা, যিনি সদাসর্বদা মঙ্গল-অমঙ্গল বিষয়ে লিখে চলেছেন। দ্বারপাল রূপে রয়েছেন দণ্ডনায়ক, রজনা, স্তোশা, কালমাস এবং পক্ষী। কথুশৃঙ্গে রয়েছেন ভিওমন এবং নগ্নদিণ্ডি।'

শাম্ব স্তব্ধ বিস্ময়ে মহর্ষির মুখ থেকে এই বর্ণনা শুনলেন। মহর্ষি আবার বললেন, 'ইনি একমাত্র অনাবৃত দর্শিত ঈশ্বর, যিনি সকল দেবতা ও পিতৃগণেরও ঊর্ধ্বে। ইনিই সকল শক্তির উৎস। ইনি বিশ্বের রক্ষাকর্তা ও নিয়ন্তা, ইনিই স্রষ্টা ও সময়ে ধ্বংসকারী। তোমার একমাত্র পূজ্য দেবতা এই সূর্য। ইনি সমস্ত অমঙ্গল ও ব্যাধিকে ধ্বংস করেন, সেই জন্য সকল দেবতাগণ তাঁকে মান্য করেন। তুমি সেই সূর্যলোকে যাও।'

শাম্ব বিনীত নম্রস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কখনো এই সূর্যালোকের কথা শুনিনি। আপনার অশেষ করুণা, আপনি আমাকে শোনালেন। কিন্তু কোথায় এই সূর্যলোকের অবস্থান, আমি তাও জানি না। আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে পথের সন্ধান দিন, আমি যে-কোনও প্রকার নিগ্রহ সহ্য করে তাঁর করুণাভিক্ষা করতে সেখানে যাবো।'

মহর্ষি বললেন, 'যথার্থ বলেছ। তুমি এখান থেকে উত্তর সমুদ্রতীরে গিয়ে, উত্তর পূর্বে গমন কর। তুমি যাবে মহানদী চন্দ্রভাগা তীরে, সেখানে মিত্রবনে সূর্যক্ষেত্র বর্তমান। সেখানে তিনি পরমাত্মা রূপে অত্যুজ্জ্বল পুরুষ রূপ নিয়ে রয়েছেন। তুমি সেইখানে গমন করো।' এই কথা বলে, মহর্ষি গাত্রোত্থান করে আবার বললেন, 'কোনও কারণে কোনও সংকট পড়লে, তুমি আমার সন্ধান করো, আমি তোমার সংকটমোচনের উপায় বলবো।'

শাম্ব করজোড়ে নতজানু হয়ে আবার মহর্ষির পদধূলি গ্রহণ করলেন। মহর্ষি চলে যাবার কিছু পরেই কৃষ্ণ এলেন। মহর্ষি শাম্বকে কোনও কথা পিতাকে বলতেই নিষেধ করেননি। অতএব তিনি মহর্ষি বর্ণিত মহানদী চন্দ্রভাগা তীরে সূর্যক্ষেত্র মিত্রবনের কথা পিতাকে বললেন, এবং তখনই যাত্রা করার জন্য পিতার অনুমতি চাইলেন।

কৃষ্ণ বললেন, 'একমাত্র মহর্ষিই এ বিষয়ে অবগত আছেন। চন্দ্রভাগা মহানদী দেবলোক থেকে অতি বেগে প্রবাহিত হচ্ছে, আমি জানি। কিন্তু সূর্যক্ষেত্র মিত্রবনের সন্ধান আমার জানা নেই।'

শাম্ব বললেন, 'মহর্ষি আমাকে পথের নির্দেশ দিয়েছেন। যথাস্থানে পৌঁছুতে আমার কতোদিন লাগবে, তা আমি জানি না। অতএব যতো শীঘ্র সম্ভব, আমি যাত্রা করতে ইচ্ছুক। আপনি আমাকে বিদায় দিন।' এই বলে তিনি নতজানু হয়ে পিতার পদযুগল স্পর্শ করে মাথায় ঠেকালেন।

পুরুষোত্তমের অন্তর বিচলিত হল। তিনি তাঁর ঔরসজাত সেই অত্যুজ্জ্বল রূপবান বংশধরের দিকে করুণ চোখে তাকালেন। দেখলেন, তাঁর নাসিকা মধ্যস্থল দুই গিরিশৃঙ্গের ন্যায় ভগ্ন। তাঁর ভ্রূযুগল কেশহীন, সমস্ত মুখমণ্ডল মলিন কালিমালিপ্ত এবং তাম্রাভ, কোথাও রক্তাভ শুষ্ক ঘা এবং অতি পলিত। বিশাল চক্ষুদ্বয়ের কৃষ্ণপুচ্ছ সকল পতিত হয়েছে, ফলে চোখ অতি রক্তাভ দগদগে দেখাচ্ছে। তাঁর সমগ্র দেহের চর্ম স্ফীত, বিবর্ণ, হাত পা বিকলাঙ্গের ন্যায়। কেবলমাত্র চোখের দৃষ্টি অতি করুণ অসহায়। কৃষ্ণ বললেন, 'এই দূর পথের যাত্রায় তুমি কী কী গ্রহণযোগ্য মনে করো।'

শাম্ব বললেন, 'কিছুই না। আমি অভিশপ্ত, মুক্তির সন্ধান ছাড়া কিছুই আমার গ্রহণীয় না।'

কৃষ্ণ বললেন, 'এত দূরবর্তী পথ তুমি অশ্বচালিত রথ অথবা অশ্বারোহণ ব্যতিরেকে কেমন করে যাবে? ক্ষুধা তৃষ্ণা ছাড়াও পথ চলতে আরও নানা রকমের প্রয়োজন থাকে।'

শাম্ব বিষণ্ণ হেসে বললেন, 'এখন আর আমার সে-সবে কোনও প্রয়োজন নেই। কবচ কুণ্ডল অঙ্গুরীয়াদি সবই আমি খুলে রেখেছি। সর্বাঙ্গে জড়াবার বস্ত্র আমার আছে। এমন কি পাদুকাও আমি ত্যাগ করেছি, কারণ পাদুকা পায়ে চলতে পারি না। আমার এই বিকট মূর্তি নিয়ে এখন রথারোহণ, গ্রাম জনপদে বিস্ময় ও অবিশ্বাস উৎপাদন করবে। অশ্বারোহণে গেলে, লোকে আমাকে নানা প্রকার ব্যঙ্গবিদ্রূপ করবে। এখন আমাকে ওসবে খুব বেমানান লাগবে। সপারিষদ

অথবা সৈন্যসামন্তসহ আমি যেতে পারি না। আমার এ যাত্রা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ব্যাধিগ্রস্ত হতদরিদ্র লোকেরা যেমন অন্যান্যদের সাহায্যে বা কৃপায় গ্রাম-জনপদে গমনাগমন করে থাকে, আমাকেও সেইভাবে যেতে হবে। ক্ষুধা তৃষ্ণা? ভাববেন না। গাছে ও মাটিতে ফলমূলের অভাব হবে না। তৃষ্ণার জলও নদনদী জলাশয় প্রস্রবণ থেকে সংগ্রহ করতে পারবো। আপনি কোনওরকম দুশ্চিন্তা করবেন না।' শাম্ব পিতার সামনে আর উচ্চারণ করবেন না: তিনি একজন অভিশপ্ত মানুষ। পূর্ব জীবনের সঙ্গে এখন তাঁর কোনও সম্পর্কে নেই। তিনি আর এখন যদুবংশের রূপবান কুমার নেই। গ্রামজনপদের ভিক্ষান্নে তিনি দিন যাপন করতে পারবেন।

কৃষ্ণ নিজেও যে সে-কথা বোঝেন না, এমন নয়। তবু আত্মজর কথা শুনে, কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে রইলেন। তার পরে বললেন, 'তোমার গর্ভধারিণীর সঙ্গে দেখা করবে না?'

শাম্বর চোখের সামনে মাতৃমূর্তি জাম্ববতী ভেসে উঠলেন। পুত্র দর্শনে তাঁর খুশি মুখের আকস্মিক আহত আঘাতপ্রাপ্ত অভিব্যক্তি যেন শাম্ব দেখতে পেলেন। বললেন, 'আমি আপনার কাছ থেকেই অনুমতি নিয়ে যাত্রা করছি। মাতৃগণকে আপনিই সমস্ত বৃত্তান্ত বলবেন, আমার প্রণাম জানাবেন। আপনি আমাকে যাত্রার অনুমতি দিন।'

'কৃষ্ণ বললেন, 'এসো। তোমার যাত্রা সফল হোক।'

শাম্ব আর একবার পিতার পদধূলি নিয়ে যাত্রা করলেন। লক্ষ্মণার কথা কি তাঁর মনে পড়ছে না? তাঁর নিজের অন্তপুর, বিলাস সামগ্রীতে সাজানো গৃহের সৌন্দর্য, রমণীরত্নাদি, যাদের সঙ্গে নানা ক্রীড়া কৌতুকে, ভোগে বিলাসে দিনগুলো কেটে যেতো, সে-সব কিছুই কি তাঁর মনে পড়ছে না? কোনও মানুষের পক্ষেই সে-সব ভোলা সম্ভব না। কিন্তু অভিশাপমুক্ত না হয়ে শাম্ব আর সেখানে তাদের সামনে যাবেন না। শাম্বকে দেখলে এখন তাদের দৃষ্টি আহত, বিস্ময়ে ও ঘৃণায় কুঞ্চিত হবে। চিত্তবিকার ঘটবে। লক্ষ্মণারও কি একই অবস্থা হবে না?

শাম্ব কোনও দিকে দৃষ্টিপাত না করে দ্রুত নগরীর পথে বেরিয়ে পড়লেন। রৌদ্রকরোজ্জ্বল নগরীর পথে পথে নগরবাসীরা চলাচল করছে। যদুবংশের বালক এবং কুমারগণ অশ্বারোহণে নানা দিকে ভ্রমণ করছে। নগররক্ষীদের এই শান্তির সময়ে তেমন ব্যস্ততা নেই। নানা শ্রেণীর শ্রমজীবী ও অন্যান্যদের সঙ্গে ওরাও, পথিমধ্যে শুণ্ডিনীর ভাণ্ডারের সামনে মক্ষিকার ন্যায় জড়ো হয়েছে। সকলের দৃষ্টি যে কেবল শুণ্ডিনীর পৈষ্ঠী ও মাধবীপূর্ণ পাত্রের দিকে, এমন বলা যায় না। রসিকা যুবতী শুণ্ডিনীর প্রতিও অনেকের লক্ষ। তার অবিশ্যি কেউ পর না, সবাই আপন। সে সবাইকেই তার হাসির দ্বারা আপ্যায়ন করছে, সবাইকেই দৃষ্টির ঝলক হানছে, এবং সবাইকেই তার সুঠাম অঙ্গের নানা ভঙ্গি দ্বারা জানিয়ে দিচ্ছে, তার তৈরি সুরাপানে সকলেই কেমন উল্লাস বোধ করে থাকে।

শাম্ব নগরীর প্রাসাদসমূহের অলিন্দে ও গবাক্ষে রমণীদের কারোকে অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। যদুবংশের কুমারগণকে কেউ কেউ কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ করছে এবং একে অপরকে অঙ্গুলিদ্বারা বিশেষ কারোকে দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে হাস্যপরিহাস করছে। শাম্বকে তারা কেউ চিনতে পারছে না। একজন কুষ্ঠরোগীর প্রতি তাকিয়ে, কেউ তার দৃষ্টিকে অকারণ বিঘ্নিত করতে চায় না।

শাম্ব অকারণ অতীতের কথা ভেবে, মনস্তাপ ভোগ করতে চান না। কারণ সে-মনস্তাপের কোনও মূল্য নেই। তিনি দ্বারকার নানা পথ দিয়ে, পূর্ব দিকের প্রধান দ্বারের দিকে এগিয়ে চললেন। যদিও আগের মত স্বাভাবিক দ্রুতগতিতে চলতে যিনি আর সক্ষম নন। তাঁর সর্বাঙ্গের বহিরঙ্গ এখন প্রায় সম্পূর্ণ অসাড়। হাত ও পায়ের গ্রন্থিসমূহে রক্তাভ ক্ষত ও স্ফীতির জন্য পদক্ষেপ সহজ নেই। সহসা দ্রুতগতি অশ্বচালিত রথ অথবা কোনও অশ্বারোহী দ্রুতবেগে ছুটে এলে, তিনি অনায়াসে পথের পাশে ছিটকে চলে যেতে পারেন না। স্বভাবতই রথারোহী ও অশ্বারূঢ় ব্যক্তিগণ বিরক্ত হন। এই নগরীর পথও সর্বত্র মোটেই সমতল নয়। সমুদ্রমধ্যে পার্বত্যদ্বীপ বিশিষ্ট এই ভূমির অধিকাংশ রাজপথই চড়াই উৎরাইয়ে বন্ধুর।

শাম্ব মনে মনে পুণ্যভূমি মিত্রবনের কল্পনা করতে করতে, ব্যাধির দুঃখকষ্ট ভোলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। প্রায় দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত করে তিনি নগরীর পূর্ব দ্বারে পৌঁছুলেন। এই সময়ে যদুবংশের কূল-রমণীগণ সর্বালঙ্কার শোভিতা হয়ে সহচারীদের সঙ্গে কোনও পূজা সাঙ্গ করে ফিরছিলেন। উপবাসক্লিষ্ট হলেও পূজাশেষে তাঁদের মন প্রফুল্ল ছিল। তাঁরা দরিদ্র ও প্রার্থীদের পথে ফল ও মিষ্টান্ন বিতরণ করতে করতে যাচ্ছিলেন। শাম্বও ক্ষুধার্ত ছিলেন। তিনি হাত না পেতে পারলেন না। পূজারিণীরা তাঁকে বিমুখ করলেন না, কিন্তু তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাতে সকলেই আকুঞ্চিত মুখে শিহরিত হচ্ছিলেন। স্পর্শের আশংকায় দূর থেকে মিষ্টান্ন নিক্ষেপ করছিলেন।

শাম্ব দুঃখ ও মনস্তাপ থেকে নিজেকে নির্বিকার রাখলেন। মনে মনে কেবল উচ্চারণ করলেন, 'আমি অভিশপ্ত।' তিনি পূজারিণীদের আচরণে কোনও দোষ খুঁজে পেলেন না। এরকম না ঘটলেই তিনি বরং অবাক হতেন। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ আত্মজিজ্ঞাসার দ্বারা, জবাব পাচ্ছেন, তাঁর দৃষ্টি ও মন এই সব রমণীদের তুলনায় উদার ছিল না। অতীতে সুস্থাবস্থায় কুষ্ঠরোগীর বীভৎস চেহারা দেখে, তাঁর মনেও বিকার ঘটতো, দৃষ্টি আহত ঘৃণায় শিহরিত হতো এবং সংস্পর্শ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতেন।

শাম্ব ফল ও মিষ্টান্ত খেয়ে, পথের ধারে জলাশয়ে সকলের কাছ থেকে দূরে জলপান করলেন। সাধারণের জন্য নির্দিষ্ট নৌকায় আরোহণ করে, মূল ভূখণ্ডে পৌঁছুলেন। অবিশ্যি সাধারণের জন্য নির্দিষ্ট নৌকোয়ও তাঁকে যাত্রীদের কাছ থেকে দূরে থাকতে হল। স্বভাবতই তাঁর মত একজন ব্যাধিগ্রস্তের কাছ থেকে খেয়া-পারানির অর্থ কেউ দাবি করেনি।

মূল ভূখণ্ডে পৌঁছুতে অপরাহ্ন হয়ে গেল। যাত্রীরা দলবদ্ধ হয়ে যে-যার পথে চলে গেল। শাম্ব সমুদ্রের তীর ধরে উত্তর দিকে চলতে লাগলেন। কোন্ সীমানা থেকে পূর্ব-উত্তরে গমন করতে হবে, মহর্ষি নারদ স্থির করে তা বলে দেননি। অধিক উত্তরে সিন্ধুদেশ কুবলয়াশ্ব বংশধরদের রাজত্ব। ভূমিকম্পপ্রবণ সেই দেশে ঋষি উতংকের আশ্রম ছিল। শাম্ব অনুমান করলেন, সমুদ্রতীর ধরে ততোধিক উত্তরে তাঁকে যেতে হবে না!

আকাশ ক্রমে রক্তাভ হল, এবং অতি দ্রুত সেই রক্তাভায় কৃষ্ণছায়া ছড়িয়ে পড়ে, সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে লাগলো। বহু দূর দিগন্ত পর্যন্ত বালুকারাশি এখনো তপ্ত। শাম্বর অশক্ত পদযুগল প্রতি পদক্ষেপেই সেই তপ্ত বালুতে ডুবে যাচ্ছে। গতি হয়ে উঠছে মন্থরতর। সমুদ্র সর্বদাই গর্জমান, বহুদূর পর্যন্ত তরঙ্গরাশি উৎক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে আসছে, আবার বেগে নেমে যাচ্ছে। সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে নামতেই সমুদ্রের বুক থেকে অতিবেগে বায়ু উত্থিত হল। সমুদ্রের গর্জনের প্রচণ্ডতার সঙ্গে বালুকারাশি উড়তে লাগলো। চোখ খুলে রাখা দায় হল। সারা গায়ে অজস্র তীক্ষ্নমুখ সুঁচের মত বালুকা

বৃষ্টি হতে লাগলো। নাসারন্ধ্রের ভিতর দিয়ে, বালুকণা গলনালী ও মুখের মধ্যে ঢুকে গেল।

শাম্ব দেখলেন, পাহাড়ের মত বালুকারাশি ও সমুদ্রতীরে তিনি একলা। এতক্ষণ যাত্রীরা যারা তাঁর কাছাকাছি চলছিল, তারা ভিন্ন পথে নিকটবর্তী কোনও গ্রামে চলে গিয়েছে। তিনি দেখলেন, এক শ্রেণীর অনতিদীর্ঘ সাপ অনায়াসেই বালুরাশি ঠেলে চলে যাচ্ছে। তিনি জানেন, এই সাপ অতি বিষাক্ত, কিন্তু সর্বদাই উদ্যত আক্রমণশীল না। শাম্ব এই প্রথম অনুভব করলেন, তিনি নিরস্ত্র। কোনও মানুষ বা শ্বাপদের দ্বারা আক্রান্ত হলে, তিনি কিছুই করতে পারবেন না। একমাত্র আশা, মানুষ তাঁকে কিছু করবে না। তাঁর কাছে এমন কিছুই নেই, যা দস্যু বা তস্করেরা লুণ্ঠন করতে পারে। কিন্তু কোনও শ্বাপদ সরীসৃপ তাঁকে শত্রুজ্ঞানে আক্রমণ করলে তিনি নিরুপায়।

বাতাস যেন হাজার বেগবান অশ্বচালিত হয়ে ছুটে আসছে, বিশাল বালুবেলায় দাপাদাপি করছে। অথচ আকাশে মেঘ নেই। সূর্যাস্তের পরেই নক্ষত্ররাজি ঝিকিমিকি করে উঠেছে। এই বাতাসের বেগ দেখলে, মনে হয় পৃথিবীও যেন অতিবেগে ঘূর্ণিত হচ্ছে। বালুকারাশির স্তূপ আশ্চর্য শব্দে ফেটে যাচ্ছে, এবং সেই ফাটলের গহ্বর দিয়ে, বাতাস সাপের মত এঁকে বেঁকে, শোঁ শোঁ শব্দে ছুটে চলেছে। অন্ধকারে সমুদ্রের তরঙ্গে তীক্ষ্ণ ধারালো ঝকঝকে দাঁতের হাসি খলখলিয়ে বাজছে।

'হে অভিশপ্ত কোনও দিকে দৃকপাত করো না।' শাম্ব মনে মনে উচ্চারণ করলেন, এবং চলতে লাগলেন। সমুদ্র, বায়ুর তাণ্ডব, কোনও কিছুই তাঁর অধীন না। অতএব প্রাকৃতিক দুর্যোগকে অনিবার্য জেনে, নিজের কর্ম করাই শ্রেয়। এই সময়েই, পূর্ব দিগন্তে এক ফালি তাম্রাভ চাঁদ দেখা গেল। আর শাম্ব মাছের আঁশটে গন্ধ পেলেন। গন্ধ পাওয়ামাত্র তিনি দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে সমুদ্রতীরের চারদিকে লক্ষ করলেন। এবং যা আশা করেছিলেন, তা দেখতে পেলেন। তাম্রাভ চাঁদের ম্লান আলোয়, দীর্ঘ ঋজু ঝাড়ালো কতগুলো গাছ, খানিকটা অঞ্চল জুড়ে নারকেল বীথির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। সমুদ্র থেকে কিছুটা পূর্বে, সেই গাছপালার মধ্যে, কতিপয় কুটিরের অবয়ব ও দু-একটি আলোর বিন্দু দেখতে পেলেন। মাছের আঁশটে গন্ধের ইঙ্গিতে তিনি ঠিকই অনুমান করেছিলেন, কাছে-পিঠেই কোথাও নিশ্চয় ধীবরপল্লী আছে। শাম্ব স্বস্তি বোধ করলেন। এই মহাসমুদ্রের ঝটিকাপ্রবাহিত বিশাল বালুবেলায় তিনি অত্যন্ত একাকী বোধ করছিলেন। তাঁর অন্তরে কোনও ভয় উৎপাদিত হয়নি। অভিশপ্ত মানুষ তার অভিশাপের বোঝা একাই বহন করে। শাপমোচনের প্রয়াসে একাই সংগ্রাম করে। তবু জগৎ সংসারে তাঁর পরিচয়, তিনি মানুষ। মানব জীবধর্মের এই নিয়ম, সংসারের বাইরে একাকী থেকেও সংসারের সীমান্তে দাঁড়িয়ে জীবনের ঘ্রাণ গ্রহণ করে।

শাম্ব ধীবরপল্লীর সীমানায় গিয়ে দাঁড়ালেন। ঝড়ো বাতাসের ঝাপটায় গাছপালা যেন আভূমি নত হয়ে পড়ছে। কুটিরগুলো কাঁপছে। কিন্তু ধীবরপল্লীর কেউ ভয়ে ভীত না। শিশুরা কুটিরের ভিতরের ঘুমোচ্ছ। রমণী এবং পুরুষরা এখনো ঘরকন্না, জাল সেলাই, গোটানো এবং নানা ক্রীড়া-কৌতুক করছে। ঝড়ো বাতাসকে আড়াল করে কোনও কোনও ধীবর রমণী রান্না করছে। কিন্তু শাম্ব পল্লী মধ্যে প্রবেশ করতেই, তাদের কাজে ব্যাঘাত ঘটলো, শান্তি বিনষ্ট হল। তাঁর সেই অতি বিকট মূর্তি দেখে, অনেকেই ভয়ে ও অস্বস্তিতে উঠে দাঁড়ালো। রমণীরা কুটিরে ঘুমন্ত সন্তানদের আড়াল করার জন্য দরজায় দাঁড়ালো। গৃহপালিত কুকুরেরা শাম্বকে দূর থেকে চারদিকে ঘিরে প্রচণ্ড চিৎকার জুড়ে দিল।

কুকুরের চিৎকার, ঝড়ে গাছপালার শোঁ শোঁ এবং সমুদ্রের গর্জন, সব মিলিয়ে, একটা তাণ্ডবের মাঝখানে যেন ভূতসহ নরনারী দাঁড়িয়ে রয়েছে। পিঙ্গল আবছা জ্যোৎস্নায় গাছপালা নরনারীদের ছায়াগুলো কিম্ভূত দেখাচ্ছে। শাম্ব সহজেই অনুমান করতে পারেন, তাঁকে কী রকম দেখাচ্ছে। তিনি ঝড়ের এবং কুকুরের চিৎকার ছাপিয়ে উচ্চস্বরে বললেন, 'ভাই বন্ধুগণ, আমি সমুদ্র থেকে উত্থিত কোনও জলচর প্রাণী নই। আমি মানুষ, ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ। ব্যাধিই আমাকে এরকম কুরূপ কুৎসিত করেছে। তোমাদের নারী পুরুষ সবাইকেই বলছি, আমাকে ভয় পেও না। আমার দ্বারা তোমাদের কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা নেই।'

শাম্ব দেখলেন, তাঁর কথায় কাজ হল। ধীবর রমণী পুরুষদের চোখ মুখের ভীতির ভাব অনেকটা অপসারিত হল। তারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো এবং বারে বারে শাম্বর দিকে দেখলো। একজন পুরুষ তাদের নিজেদের লোককে সম্বোধন করে বললো, 'আসলে আমি এই প্রাণীটিকে কোনও নরখাদক রাক্ষস ভেবেছিলাম। কিন্তু এর কথা আমাদের থেকেও ভাল। যেন কোনও উচ্চবংশজাত ব্যক্তির ন্যায় শালীনতাপূর্ণ। রাজরাজড়া বা ঋষিগণ যেভাবে কথা বলেন, এর কথাবার্তা সেই রকম।'

একজন রমণী সন্দিগ্ধ ভয়ে বললো, 'কিন্তু নরখাদক রাক্ষসেরা অনেক রকম মায়া জানে। কে বলতে পারে এর এরকম কথা মায়া ছাড়া কিছুই না?'

শাম্ব নিজেই রমণীর কথার জবাব দিলেন, 'তুমি যথার্থ বলেছো, কিন্তু রাক্ষসদের আচার আচরণ বিভিন্ন রূপ হয়। তারা হুংকার ছাড়ে, আবির্ভূত হয়েই তাণ্ডব করে, বাক্যবিনিময়ের কোনও চেষ্টাই করে না। দ্বারকা এখান থেকে খুব বেশি দূরে না। এ অঞ্চলে যদি কোনও রাক্ষসের বাস থাকতো, তাহলে বাসুদেব অথবা যদুবংশের কোনও বীর নিশ্চয়ই তাকে হত্যা করতেন, তোমাদের জীবনকে নিরাপদ করতেন। আমি একজন নিতান্ত হতভাগ্য, দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ।'

শাম্বর কথা শুনে, সকলেই যেন অনেকখানি আশ্বস্ত এবং সহজ হল। কয়েক জন কুকুরগুলোকে হাত তুলে প্রহারের ভঙ্গিতে তাড়া করে দূরে সরিয়ে দিল। একজন বর্ষীয়ান রৌদ্রদগ্ধ তাম্রবর্ণ দীর্ঘদেহী পুরুষ জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কোথা থেকে আসছো, কোথায় যাবে?'

শাম্ব বললেন, 'আমি এখন দ্বারকা থেকে আসছি। পূর্বোত্তরের চন্দ্রভাগা নদীর ধারে মিত্রবনে আমি যাবো।'

শাম্ব জানেন, তাঁর পরিচয় দেওয়া বৃথা। তা অবিশ্বাস্য শোনাবে, তেমনি এদের কাছে তাঁর অভিশাপের বিষয় বলাও নিরর্থক। তিনি আবার বললেন, 'আমি আজ সারা দিনই চলছি। সহসা বাতাস ওঠায়, বালুর ঝড়ে, আমি অত্যন্ত ক্লান্ত আর পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছি। যেখানে আমাকে যেতে হবে, সেই পথ আমার জানা নেই। দিক ঠিক না করে, রাত্রের অন্ধকারে আমি চলতে পারছি না। শুকনো মাছের গন্ধে টের পেলাম, এখানে নিশ্চয়ই কোনও বসতি আছে।'

শাম্বর কথাবার্তার উচ্চারণে ও ভঙ্গিতে সকলেই সহজ হয়ে গেল। তাদের অবিশ্বাস ভয় সন্দেহ দূর হল। সেই ধীবর পুরুষটি বললে, 'কিন্তু চন্দ্রভাগা নদীই বা কোথায়, মিত্রবনই বা কোথায়?'

শাম্ব বললেন, 'শুনেছি, সিন্ধুনদের থেকে উৎপন্ন একটি বেগবতী শাখার নাম চন্দ্রভাগা। তারই তীরে কোথাও মিত্রবন আছে। সবই আমাকে খুঁজে নিতে হবে।' এই পর্যন্ত বলে শাম্ব প্রসঙ্গ পরিবর্তন

করে বললেন, 'আমি আজ তোমাদের পল্লীর উপান্তে কোথাও রাত্রিটা শুয়ে কাটিয়ে দেবো। এখন এই সমুদ্রকূলের অন্ধকারের কোথাও মিষ্ট জলের সন্ধান করা আমার পক্ষে দুরূহ; আমি তোমাদের কাছে কয়েক গণ্ডুষ পানীয় জল আর কয়েক গ্রাস খাদ্যের প্রত্যাশী।'

ইতোমধ্যে ধীবর রমণী পুরুষরা শাম্বকে দেখিয়ে দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল, তিনি যেরকম কুৎসিত ও বিকলাঙ্গ দেখতে, তার কথাবার্তা মোটেই সেরকম না। তাঁর কথা শুনলে, ধীমান ও শ্রীমান মনে হয়।

বর্ষীয়ান ধীবরটি বললো, 'তুমি খাদ্য পানীয় সবই পাবে। তুমি এখন বস। আমরা প্রথমে ভয় পেলেও, এখন আর তা নেই।'

শাম্ব নিশ্চিন্ত হয়ে একটি নারকেল গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসলেন।

শাম্ব ক্রমাগত এইভাবে দিনের পর দিন চলতে লাগলেন। উত্তর সমুদ্রের তীর ধরে চলতে চলতে এক সময়ে তাঁর মনে হয়েছিল, তিনি সিন্ধুদেশের অভ্যন্তরে গমন করছেন। একটা নদী অতিক্রম করতে গিয়ে, এক ঋষিতুল্য ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। শাম্ব তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল চন্দ্রভাগা নদীতীরে মিত্রবন কোথায়, তাঁর জানা আছে কী না।

সেই ঋষিতুল্য ব্যক্তি বস্তুতপক্ষে একজন তপস্বীই ছিলেন। তিনি শাম্বকে বলেছিলেন, 'এই নদী অতিক্রম করা তোমার ঠিক হয়নি। আমি শুনেছি, মিত্রবন নামে এক সূর্যক্ষেত্র পঞ্চনদীর দেশে আছে। আরও শুনেছি, অন্তরীক্ষের পাদদেশে কোথাও সেই স্থান বর্তমান। তোমার ন্যায় চর্মরোগীরা সেখানে যায় আরোগ্যলাভের জন্য। বস্তুতপক্ষে সেখানে কী আছে, কেমনভাবেই বা চর্মরোগীরা আরোগ্যলাভ করে, আমার কিছুই জানা নেই। তবে আমার মনে হয়, তোমাকে সেই পঞ্চনদীর দেশেই যেতে হবে। তুমি নদী পার না হয়ে, ফিরে যাও।'

তপস্বীর মুখে চর্মরোগের কথা শুনে, শাম্বর মনে আর কোনও সন্দেহ ছিল না, তাঁর গন্তব্য মিত্রবনের কথাই তিনি বলেছেন। শাম্ব অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়ে তপস্বীকে প্রণাম করেছিলেন। তপস্বী তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন, 'তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক।'

শাম্ব বহু নদনদী অতিক্রম করে, অরণ্যের ভিতর দিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে পূর্বোত্তর বরাবর চলেছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগকে তিনি সহনীয় করে তুলেছিলেন। ক্রমেই অশক্ত হয়ে পড়া শরীরকে চালিত করে নিয়ে যাচ্ছেন। অরণ্যমধ্যে শ্বাপদকে ভয় করেননি। কিন্তু গ্রাম ও জনপদের সর্বত্র প্রায়ই তাঁকে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। বয়স্ক নরনারীরা যতোখানি ঘৃণা প্রদর্শন করে ততোখানি বিতাড়নের দ্বারা নিগ্রহ করে না। কিন্তু গ্রাম জনপদের বালকগণ, সারমেয়কুল সর্বত্র একই রকম। বালকেরা তাঁর গতিভঙ্গির বিকৃতিকেই কেবল অনুকরণ করেনি, প্রস্তরাদি নিক্ষেপ করে তাড়া করেছে। তাদের সঙ্গে সারমেয়কুলও এক মুহূর্ত স্থির হতে দেয়নি।

শাম্ব অতি দুঃখের সময়ে কেবল মনে মনে উচ্চারণ করেছেন, 'তুমি অভিশপ্ত। শাপমোচনেই তোমার জীবনের মোক্ষলাভ। ভাগ্য অমোঘ। তাকে মেনে নিয়েই, দুর্ভাগ্য থেকে উত্তরণের সন্ধান করতে হয়। আমার কেন এমন দুর্ভাগ্য হল, অপরের কেন হল না, এইরূপ প্রশ্ন বাতুলতামাত্র। নিজের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে অপরের তুলনা করে, আত্মাকে ক্ষুব্ধ করা এবং কষ্ট দেওয়া ছাড়া কিছুই লাভ হয় না। নিজের কষ্টের জন্য কারোকে দোষারোপ করাও অবিমৃষ্যকারিতা ছাড়া আর কিছু না। কেন জরা আছে, ব্যাধি আছে, মৃত্যু ঘটে, এই সব নিয়ে মানুষ বিলাপ করে, শোকাকুল হয়। অথচ এসবের আক্রমণ থেকে কারোরই রেহাই নেই। বলবীর্যের দ্বারা শত্রু নিধন মানুষের নিরাপত্তা ও শান্তিস্থাপন যেমন ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম, তেমনি ব্যক্তির দুর্ভাগ্যের জন্য, তাকে একাকী সংগ্রাম করতে হয়।'

শাম্ব গ্রামে জনপদে যখনই নিগৃহীত লাঞ্ছিত হয়েছেন, তখনই সহ্য করবার শক্তি সংগ্রহ করেছেন। কখনো কখনো তাঁর চোখ ফেলে জল এসেছে, কিন্তু কদাপি ক্রুদ্ধ হননি। প্রতি-আক্রমণ কিংবা উন্মত্তের ন্যায় আচরণ করেননি। সুখ এবং দুঃখকে একত্রে গ্রথিত করে, সর্বদাই নির্বিকার থেকেছেন। অতীতের কথা বা বর্তমানের কথা ভাবেননি। শুধু ভবিষ্যতের কথাই ভেবেছেন। গন্তব্যের দিকেই এগিয়ে চলেছেন, এবং মহর্ষি কথিত সেই অত্যুজ্জ্বল পুরুষের মূর্তিই কেবল কল্পনা করেছেন।

এইভাবে সাতটি ঋতু অতিক্রমের পরে, তিনি এক আসন্ন সন্ধ্যায় চন্দ্রভাগা তীরে পৌঁছুলেন। নৌকায় যারা নদী পারাপার করছিল, তারা কেউ কেউ নদীটিকে মহানদী বলেও উল্লেখ করছিল। শাম্ব দেখলেন, অতি বেগে পূর্ব-দক্ষিণগামিনী নদীটির বুকে রক্তাভ শার্ঙ্গাস্ত্রের মত বঙ্কিম স্রোত ঝকঝক করছে এবং শৃঙ্গ দ্বারা প্রস্তুত ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত তীরের মতো এক-একটি তীক্ষ্ণ রেখা ছুটে চলে যাচ্ছে। নদীর তীর বালুকারাশি পূর্ণ না, বরং সবুজ ঘাসে শক্ত মৃত্তিকা আচ্ছাদিত। ঋজু বিশাল মহীরুহসমূহ ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে। যেন নদীকূলে এসে ক্লান্ত পথিকদের আশ্রয়দানের জন্য, আকাশবিদ্ধ বনস্পতিরাজিসমূহ দাঁড়িয়ে আছে। আসন্ন সন্ধ্যার রক্তাভা যেমন নদীর বুকে, তেমনি বনস্পতির শীর্ষে। কাছেপিঠে ঘন বসতি চোখে পড়ে না। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কিছু কুটির। নদী থেকে তীরভূমি বেশ উচ্চে। তথাপি, সম্ভবত বর্ষায় এ নদীতে বন্যা হয়, সেই জন্যই তীরে কোনও লোকায় নেই। অথচ কর্ষিত ক্ষেত্রে ফসল ফলানো হয়েছে।

শাম্ব এই নদী দর্শন মাত্র, তাঁর অন্তরে গভীর আনন্দের সঞ্চার হল। নদীর এপারে ওপারে গমনাগমনকারী প্রতিটি পুরুষকেই তিনি, মনের সামান্যতম সন্দেহও মোচনের জন্য বারে বারে ব্যগ্র স্বরে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, 'সিন্ধুনদ থেকে উৎপন্ন এই কি সেই চন্দ্রভাগা নদী?'

অনেকের কাছ থেকেই তিনি জবাব পেলেন না। অধিকাংশ লোকই তাঁকে এড়িয়ে গেল, যেন তাঁর প্রশ্নের অর্থ বুঝতেই পারেনি। আসলে তাদের বিরাগ ও বিতৃষ্ণা গোপন থাকছিল না। কেউ কেউ জবাব দিল, 'কোথা থেকে উৎপন্ন, সেসব জানি না। এই নদীর নাম চন্দ্রভাগা।'

চন্দ্রভাগা! শাম্ব যেন বারে বারেই নামটি শুনতে চাইছিলেন। কিন্তু মিত্রবন কোথায়? নদীর এপারে না ওপারে? এটিই পঞ্চনদীর দেশ তো? সন্ধ্যার ছায়া যতো ঘন হতে লাগলো, খেয়া যাত্রীদের সংখ্যাও দ্রুত স্বল্প হয়ে উঠলো। শাম্ব শেষ পর্যন্ত মাঝির শরণাপন্ন হলেন। স্থানীয় অধিবাসী পুরুষ ও স্বল্পসংখ্যক রমণীদের সকলেরই দেহের গঠন দীর্ঘ। আপাতদৃষ্টিতে তাদের চোখে মুখে রুক্ষতা থাকলেও নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় সকলেই বেশ রসিক ও আমুদে। অপরূপ নদীতীরে সুবিমল বাতাসে, তাদের সুখী দেখাচ্ছিল, এবং প্রায়ই প্রাণের স্ফূর্তিতে গান গেয়ে উঠছিল। তাদের গানের ভাষা অনেকটা পৈঠীপাত্রের গায়ে লেগে থাকা মক্ষিকার মত, অশ্লীল ও ইতরাপূর্ণ, কিন্তু নির্দোষ মনে হচ্ছিল। কারণ তারা কোনও ব্যক্তিবিশেষের নামে

কিছু বলছিল না, নিজেদের কামোচ্ছ্বাসকে ব্যক্ত করছিল, এবং গান শুনে সকলেই হৈ হৈ করে হসে উঠছিল।

শাম্বকে দেখেই মাঝির ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হল, চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠায়, দাড়ি কুঁকড়ে উঠলো। বললো, 'ওহে তোমাকে আমি শেষ খেয়ায় পার করবো, এখন নিতে পারবো না।'

শাম্ব বললো, 'ভাই, সেটা তোমার করুণা। আগে বা শেষে, যখনই তুমি আমাকে পার করো, পার হতে পারলেই আমি সার্থক জ্ঞান করবো।'

শাম্বর বিনীত বাক্যে মাঝি যেন একটু অবাক হল। আসলে শাম্বর ভাষায় বিন্দুমাত্র অর্বাচীনতার স্পর্শ নেই। ধীমান ও জ্ঞানীর মত তাঁর কথা শুনে, আরও কয়েকজন যাত্রী তাঁর দিকে থাকালো। কিন্তু প্রথম দর্শনেই সকলের মুখে বিমুখতা ফুটে ওঠে। শাম্ব আবার বললেন, 'এ দেশে আমি কখনো আসিনি। এই নদীর তীরে মিত্রবন নামক স্থানে আমি যেতে চাই। আমি শুনেছি, সে-স্থানকে সূর্যক্ষেত্র বলা হয়। সে-স্থান কি নদীর পরপারে?'

মাঝি চমৎকৃত হয়ে বললো, 'পরপারে বটে, কিন্তু এ ঘাটে পার হয়ে তোমাকে নদীর উত্তরদিকে সারা দিনের পথ যেতে হবে। তার চেয়ে রাত্রিটা তুমি এপারেই অতিবাহিত করে, নদীর উজানে তীর ধরে চারটি অতিকায় বাঁক পাবে। ভোরে রওনা হলে, সন্ধ্যাকালের মধ্যে তুমি সেখানে পৌঁছুতে পারবে, আর সেখানেই খেয়া পার হবে।'

শাম্ব কৃতার্থ হয়ে বললেন, 'ভাই, পঞ্চনদীর দেশের মাঝি, তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

মাঝি শাম্বর কথায় খুবই প্রসন্ন হল, এবং তার চোখে মুখে করুণার অভিব্যক্তিও ফুটলো। সে বললো, 'এ পারে কোনও গ্রাম নেই, ওপারে গেলে, ঘাটের অদূরেই তুমি একটি গ্রাম পাবে। আমার মনে হয়, এপারে রাত্রে থাকা তোমার ঠিক হবে না। গভীর রাত্রে এপারে যক্ষগণ বাতাসে ভেসে বেড়ায়, নানা রকম গান বাজনা করে। সে এক রকমের ইন্দ্রজালের মায়া। সেই মায়ায় তুমি ঘুমিয়ে পড়লে, হিংস্র জন্তু তোমাকে খেয়ে ফেলতে পারে। তারা মানুষের রোগ ব্যাধি মানে না। তুমি অপেক্ষা কর, শেষ খেয়ায় আমি তোমাকে ওপারে নিয়ে যাবো।'

শাম্ব কৃতজ্ঞতায় কোনও কথা উচ্চারণ করতে পারলেন না। মাঝির কথায় তাঁর চোখ সজল হয়ে উঠলো। নৌকা ছেড়ে যাবার পরে, শাম্ব সাবধানে নদীর জলে অবতরণ করলেন। অবগাহন স্নানে যেন তাঁর সর্বাঙ্গ জুড়িয়ে গেল।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা নদীতীরের এক স্থানে এসে তিনি উপস্থিত হয়ে দেখলেন, ছোট ছোট টিলার গায়ে একটি কিংবা দুটি মানুষ কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকতে পারে, এমনি ধরনের মানুষের তৈরি কতগুলো গুহা। তার আশেপাশে, ঝোপঝাড়ের মুণ্ডসকল লতাগুল্মের দ্বারা শক্ত করে বেঁধে, একটি প্রবেশমুখ রেখে, এক ধরনের কুটির তৈরি করা হয়েছে, যার ভিতরে হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করা ছাড়া উপায় নেই, এবং ভিতরে নিশ্চয়ই মাথা সোজা করে বসাও যায় না। আশপাশে কয়েক জায়গায় কাঠের আগুন জ্বলছে। তারই লেলিহান শিখার আলোয়, শাম্ব সেই সব গৃহা ও কুটিরের সামনে কিছু মানুষকে নড়েচড়ে বেড়াতে দেখলেন। পুরুষ এবং রমণীর কণ্ঠস্বরও তাঁর কানে এলো।

শাম্ব মনে মনে অবাক হয়ে ভাবলেন, এরা কারা? কোনও যাযাবর জাতির গোষ্ঠীভুক্ত, অথবা অরণ্যবাসী কিরাতগণ? ভাবতে ভাবতে তিনি সেই সব গুহা ও কুটিরের সামনে এগিয়ে গেলেন। কাঠের আগুনের আলোয় তাঁর মূর্তি স্পষ্ট হয়ে উঠতেই কয়েকজন তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো। শাম্বর বুকে যেন বিদ্যুতের ঝলক হেনে গেল। দেখলেন, তাঁর সামনে যে-কজন এসে দাঁড়িয়েছে, তারা সকলেই তাঁর মত কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত। শাম্ব এবং তাদের মধ্যে দৃষ্টিবিনিময় হল। কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখা গেল, কয়েকজন কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত রমণীও সামনে এসে দাঁড়ালো। যাদের দু-একজনের কোলে শিশু! আশ্চর্য, শিশুরা কেউ রোগগ্রস্ত না।

শাম্ব মুহূর্তেই অনুমান করতে পারলেন, এ অঞ্চলই মিত্রবন। যে-কথা তিনি মহর্ষি নারদের কাছে শুনেছিলেন, এরাও নিশ্চয় সেরকম ভাবেই কারো কাছ থেকে শুনে, এখানে আরোগ্যলাভের জন্য এসেছে। তিনি সন্দেহ মোচনের জন্য প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন,'এই স্থানের নাম কি মিত্রবন?'

একজন পুরুষ জবাব দিল, 'তাই তো শুনেছি।'

শাম্বর মনে পড়লো, মহর্ষি নারদের সূর্যক্ষেত্রের সেই বিস্ময়কর বর্ণনা, যেখানে গ্রহরাজ সূর্যকে ঘিরে অষ্টাদশ দেবতা, গন্ধর্ব যক্ষ, অপ্সরাগণ, দণ্ডনায়ক ও দিণ্ডি দণ্ডায়মান রয়েছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'সেই সূর্যক্ষেত্র কোথায়, যেখানে গ্রহরাজ পরমাত্মন্ অবস্থান করছেন?'

শাম্বর কথা শুনে সবাই হেসে উঠলো। কেউ বললো, 'এর কথাবার্তা বেশ রাজপুরুষদের মত চৌকস।'

কেউ বললো, 'ঋষির মতনও বলা যায়।'

শাম্ব অবাক হয়ে শুনলেন, এদের কথাবার্তা রীতিমত অর্বাচীন, ইতর শব্দে ভরা। এদের কি পুরুষ, কি রমণী, সকলেই এমনভাবে গ্রহরাজের কথা শুনে হাস্যপরিহাস করছে, যেন তারা ব্যাধিগ্রস্ত নয়। একজন এগিয়ে এসে বললো, 'তোমার মতন আমরাও অনেক কথা শুনে এখানে এসেছি। কিন্তু ওই যে সব গ্রহরাজ-টাজ কী সব বলছো, ওসব আমরা কিছুই দেখিনি। তবে মান্ধাতা আমলের একটা মন্দির আছে। ওটাকেই সবাই সূর্যক্ষেত্র বলে।'

শাম্বর অন্তর এক রকমের অশান্তি ও অস্বস্তিতে ভরে উঠলো, জিজ্ঞেস করলেন, 'সেই মন্দিরে কোন্ দেবতার বিগ্রহ আছে?'

সবাই আবার পরিহাস করে হেসে উঠলো, এবং একজন বললো, 'সেটা মন্দিরই কী না, আমরা জানি না। মাথার ওপরে ছাতা, আর রাজার মতন জুতো জামা পরা একটা মূর্তি আছে। ও-ই নাকি সূর্যমূর্তি। আমরা রোজ তাকে একবার করে গড় করি।'

অনেকে প্রতিধ্বনি করলো 'হ্যাঁ, আমরা চন্দ্রভাগার জলে রোজ চান করে, সেই মূর্তিকে একবার গড় করি। তার আশেপাশে আরও অনেক মূর্তি আছে, ওরাও নাকি সবাই দেবতা। এদেরও গড় করি।'

একজন পুরুষ বললো, 'অপ্সরা মূর্তি বেশ সুন্দর, আমি রোজ তার গায়ে গা ঘষি।'

আর একজন বললো, 'আমরা রোজ সকালে চন্দ্রভাগায় নেয়ে, মন্দিরে গড় করে ভিক্ষে করতে বেরোই। আর এ সময়ে এসে ভিক্ষার অন্ন ফুটিয়ে খাই।'

অন্য একজন বললো, 'আমরা সংসারও করি। এই সব মেয়েছেলেরা প্রতি বছরই পোয়াতি হয়, আর বাচ্চা বিয়োয়।'

ভগ্নকেশ, বিকলাঙ্গ, বিবর্ণ, পুচ্ছহীন রক্তচক্ষু, রমণীরা সবাই হেসে উঠলো, এবং একজন বললো, 'আমাদের বাচ্চাগুলো প্রথমে খুব ফুটফুটে হয়ে জন্মায়। চার পাঁচ বছর বয়স হলেই ওরা আস্তে আস্তে আমাদের মতন হয়ে যায়।'

একটি রমণী তার বুকের ফুটফুটে শিশুটিকে দেখিয়ে বললো, 'এই দ্যাখো, এখন কেমন সুন্দর দেখতে। ও আমার পেটেই জন্মেছে। ওর বাবারও কুষ্ঠ ছিল, দু'দিন হল মরে গেছে। আমার এই ছেলে যখন একটু বড় হবে, তখন ওরও কুষ্ঠ হবে। কিন্তু সে সব নিয়ে আমি ভাবি না। রাত হলেই পুরুষের সঙ্গে ছাড়া আমি থাকতে পারি না। তুমি নতুন এসেছো, এখন থেকে আমি তোমার সঙ্গেই থাকবো।'

সবাই হৈ হৈ করে সমর্থন করলো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন থেকে তুমিই ওর সঙ্গে থাকবে। মেয়েদের মধ্যে ও এখন সব থেকে বয়সে ছোট। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি আগে বেশ সুপুরুষ ছিলে।'

পুচ্ছহীন রক্তাভ চোখে, শিশু কোলে রমণীটি শাম্বর দিকে তাকিয়ে ইশারা করলো।

একজন চিৎকার করে বললো, 'এখানে সবাই রোগ সারাতে আসে, কিন্তু এমন কোনও দিব্য ব্যাপার নেই যে, রোগ সারে। চামড়া ভেদ করে আমাদের হাড়ে দুব্বো গজিয়ে যায়, আর আমরা মরে যাই। আমাদের ছেলেমেয়েরা থাকে, তার আগের জন্মিত ছেলে-মেয়েরা বড় হয়ে যায়, আর তোমার মতন নতুন নতুন লোক এখানে রোগ সারাতে আসে।'

শাম্বর মনে হল, কোনও মায়ার দ্বারা তিনি আবিষ্ট হয়েছেন। তাঁর কোন বাহ্যজ্ঞান নেই। অচৈতন্য অবস্থায় তিনি কোন নরকে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এ স্থান কখনোই মিত্রবন হতে পারে না। এদের সকলের পরিহাসের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে একটি অসহায় অবিশ্বাসই ধ্বনিত হচ্ছে। তিনি বুঝতে পারছেন, নানা স্থান থেকে এরা এখানে এসেছে, সংঘবদ্ধভাবে জীবনযাপনের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করেছে। এদের কারো সঙ্গেই কারোর কোনও সম্পর্ক নেই। বংশপরম্পরা বলেও কিছু নেই। সমাজ ও সংসার থেকে বহিষ্কৃত এক ব্যাধিগ্রস্ত বাহিনী, যারা আরোগ্যের আশা নিয়ে এসেছিল। কিন্তু আরোগ্যলাভ দূরের কথা, ব্যাধিতে ভুগে মৃত্যুকেই এরা অবধারিত জেনে কিছুদিনের জন্য যদৃচ্ছা জীবন ধারণ করে যাচ্ছে। এদের কোনও আশা নেই, অতএব, কোনও বিশ্বাসও নেই। অথচ এরা অবিশ্বাসী ছিল না। তা হলে এখানে আসতো না।

শাম্ব সহসা দেখলেন, তাঁর চার পাশে ছায়ার মত সবাই এসে দাঁড়িয়েছে। একজন চিৎকার করে বললো, 'ওহে, তুমি যে একেবারে মুনি-ঋষিদের মতন দেবতায় পাওয়া লোক হয়ে গেলে! জিজ্ঞেস করছি, কোথা থেকে আসছো?

শাম্ব সংবিৎ ফিরে পেয়ে, সকলের দিকে তাকালেন। দেখলেন সেই শিশুবুকে যুবতী কুষ্ঠ রোগিনীটি তাঁর গায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি জবাব দিলেন, 'কোথা থেকে এসেছি, সে কথায় আর কী কাজ? অতীতকে ভুলে যাওয়াই শ্রেয় নয় কী?'

অনেকে একসঙ্গে বলে উঠলো, 'ঠিক ঠিক! কিন্তু তোমার কথাবার্তার ধরন-ধারণাগুলো বড্ড জ্ঞানীগুণীদের মতন লাগছে। বলি, তোমার কি ক্ষুধা তেষ্টা বলে কিছু আছে? থাকলে আমরা দিতে পারি।'

শাম্ব প্রকৃতই ক্ষুধার্থ ছিলেন। সেই ভোরে, নদীতীরের নরম মৃত্তিকার জঙ্গল থেকে, কয়েকটি মূল তুলে জলে ধুয়ে চিবিয়েছিলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, আমি ক্ষুধার্ত। তোমাদের সংকুলান হলে, আমাকেও কিছু খেতে দাও।'

শাম্ব এই কথা বলা মাত্র, তাঁর পার্শ্ববর্তিনী সেই রমণী তার শিশুটিকে তাঁর বুকের ওপর প্রায় নিক্ষেপ করে বললো, 'তা হলে তুমি আমার ছেলেকে ধরো, আমি তোমার জন্য খাবার নিয়ে আসছি।'

সকলেই সমর্থন করে বলে উঠলো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নীলাক্ষিই আমাদের নতুন সঙ্গীকে খেতে দিক।'

শাম্ব মনে মনে উচ্চারণ করলেন, 'নীলাক্ষি!' নাম শুনে বোঝাই যায় না, এই রমণীও একদা নীলাক্ষি ছিল। অবিশ্যি, কাকেই বা বোঝা যায়? এ চিন্তা বাতুলতা। কিন্তু শিশুটিকে নিয়ে তিনি অস্বস্তিতে পড়লেন। নতুন মানুষের কোলে সে কিছুতেই থাকতে চাইছে না, চিৎকার কান্না জুড়ে হাত-পা ছুঁড়তে আরম্ভ করেছে। তিনি অসহায় চোখে, উদ্ধারের প্রত্যাশায় আশে-পাশের সকলের দিকে তাকালেন। কিন্তু বৃথা। তাঁর প্রত্যাশা পূর্ণ করার জন্য উপস্থিত পুরুষ বা রমণীগণের মধ্যে কেউ এগিয়ে এলো না, হাত বাড়িয়ে দিল না। বরং তাঁকে শিশুটি নিয়ে বিব্রত ও উদ্‌ব্যস্ত হতে দেখে, সকলেই যেন বিশেষ কৌতুক বোধ করে নিজেদের মধ্যে হাস্যপরিহাস করতে লাগলো। কেউ কেউ বললো, 'নীলাক্ষির ছেলে নতুন বাপকে এখনো চিনতে পারছে না। ওহে ছেলের বাপ, ছেলেকে একটু আদর করছো না কেন?'

কেউ বললো, 'তোমার ঘরে কি বউ ছিল না? তোমার কি ছেলেমেয়ে ছিল না? তুমি কি গৃহস্থ ছিলে না? তেমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি যেন মোটেই ঘরকন্না করা জানো না। কেন হে, তুমি কি রাজ-রাজড়ার ছেলে নাকি?'

শাম্ব মনে মনে বললেন, 'আমার একটাই মাত্র পরিচয়, আমি অভিশপ্ত।' তিনি শিশুটির অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করলেন, তাঁর মনে করুণা ও স্নেহের উদ্রেক হল। শিশুটিকে নানা ক্রীড়া কৌতুকের ভঙ্গি করে, শান্ত করতে চেষ্ট করলেন। বুকে চেপে, শূন্যে দুলিয়ে তাকে খুশি করবার বিবিধ কৌশল অবলম্বন করলেন। শিশুটি এখনো আশ্চর্য উজ্জ্বল, স্বাস্থ্যবান এবং নিষ্পাপ। সে শাম্বর আচরণে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হল। কান্না থামলো। জন্মাবধি সে কুষ্ঠরোগগ্রস্তদের দেখে অভ্যস্ত, অতএব শাম্বর মুখের প্রতি কৌতূহলবশে তাকিয়ে সে ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলো না। রোগাক্রান্ত কুৎসিত মুখের দিকে তাকিয়ে সে স্নেহ ও সোহাগ সন্ধান করে নিতে পারে। শিশুটির চোখের বর্ণ নীল। নীলাক্ষির চোখ দুটিও কি একদা এই রকম ছিল?

শাম্ব দেখলেন, তাঁর চারপাশে পুরুষ ও রমণীদের মধ্যে কিছু বালক-বালিকা রয়েছে, যারা ইতিমধ্যেই রোগে আক্রান্ত হয়েছে। এরা সকলেই সুস্থ দেহে জন্মগ্রহণ করেছিল। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, ব্যাধি এদের আক্রমণ করেছে। এরাও কি অভিশপ্ত? অন্যথায়, কী অপরাধ এইসব বালক-বালিকাদের, যাদের অসহায় চোখে মুখে হতাশা ও অবিশ্বাস? এদের যদি কোনও অপরাধ থেকে থাকে, তার একমাত্র কারণ, তারা এই সব পুরুষ ও রমণীদের ঔরস ও গর্ভজাত সন্তান। এ কি কোনও পূর্ব জন্মের পাপের ফল? অমোঘ ভবিতব্য?

শাম্ব নিজেও ব্যাধিগ্রস্ত কিন্তু তিনি পিতার দ্বারা অভিশপ্ত। অমোঘ তার পরিণতি। তাঁর অন্তর কাতর হল, ব্যথায় দ্রবীভূত হল, এই সব রমণী পুরুষ বালক-বালিকা আর শিশুদের দেখে। এদের মুক্তির কি কোনও উপায় নেই? তাঁর নিজের মুক্তিরই বা কী উপায়? মহর্ষি নারদোক্ত বৃত্তান্ত তো কখনো মিথ্যা হবার না। তিনি কি প্রকৃতই মহর্ষি কথিত সেই সূর্যক্ষেত্র মিত্রবনেই এসেছেন? অথচ এই স্থান, এই সব হতমান অবিশ্বাসী ব্যাধিগ্রস্তদের দেখে তা মনে হয় না।

শিশুটি আবার হাত-পা ছুঁড়ে কান্নাকাটি শুরু করলো। সৌভাগ্য, নীলাক্ষি নাম্নী রমণীটি খাদ্য নিয়ে এল। শাম্বর সামনে খাদ্যের মৃত্তিকাপাত্র রেখে, ছেলেটিকে নিজের কোলে নিয়ে বললো, 'বসো,

খাও।'

শিশুটি মায়ের কোল পেয়ে যেন ইন্দ্রজালের দ্বারা বশীভূত ও শান্ত হল। শাম্ব পার্শ্ববর্তী একজন পুরুষকে লক্ষ করে বললেন, 'হাত ধোয়া আর কুলকুচার জন্য জল পাওয়া যাবে?'

লোকটি হৈ হৈ করে উঠলো, 'দ্যাখ দ্যাখ, এ নিজেই বলছিল, অতীতের কথায় কাজ কী? কিন্তু এ নিজেই এখনো আগের জীবনের কথা ভুলতে পারেনি। খাবার আগে হাত ধুতে চায়, মুখ ধুতে চায়।'

আর একজন বললো, 'আমার তো এখন হাতে কোনও সাড়ই পাই না। জল দিয়ে ধুলেও টের পাই না, আগুনে পোড়ালেও টের পাই না। ভিক্ষের অন্ন ফুটিয়ে খাবো, তার আবার হাত ধোয়াধুয়ি কিসের?'

অন্য আর একজন বললো, 'এর কথাবার্তা ভাবভঙ্গি সবই যেন আমাদের থেকে আলাদা।'

এক কুষ্ঠরোগগ্রস্ত বৃদ্ধ গলিত দন্ত, রক্তাভ হাঁ-মুখে হাস্য করে বললো, 'কিছুদিন যেতে দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখবে ও আমাদের মতই হয়ে গেছে।'

এই সময়ে সদ্য রোগাক্রান্ত একটি বালিকা, জলপূর্ণ একটি মৃত্তিকার পাত্র শাম্বর খাদ্যের পাত্রের সামনে এনে রাখলো। শাম্ব কৃতজ্ঞ চোখে বালিকাটিকে দেখে, মৃদু হাসলেন। জলের পাত্র নিয়ে হাত মুখ ধুয়ে খাদ্যের পাত্রের সামনে বসলেন। সকলকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আমি একলাই খাবো? তোমরা?'

নীলাক্ষি বললো, 'আমরা ভিক্ষা শেষে ফিরে এসেই, ফুটিয়ে নিয়ে খেয়েছি। ওই দেখছো না, এখনো রান্নার আগুন জ্বলছে।'

একজন পুরুষ বললো 'আমরা সারাদিন দূরদূরান্তে ভিক্ষে করি, ফিরে এসেই আগে পেটের জ্বালা মেটাই। যা তণ্ডুল থাকে, কিছু খাই, বাকিটা কাল সকালের জন্য রেখে দিই। সকালে খেয়েই আবার বেরিয়ে পড়ি।'

শাম্ব নীলাক্ষির দিকে ফিরে বললেন, 'এই খাদ্য তুমি আগামী সকালের জন্য রেখে দিয়েছিলে? রাত পোহালে তুমি কি খাবে?'

নীলাক্ষি তার রক্তিম ক্ষতযুক্ত স্ফীত অধরোষ্ঠ বিস্ফারিত করে হেসে বললো, 'ওহে প্রাণ, তোমাকে যা দিয়েছি, তা খাও। আমার এখনো কিছু রাখা আছে, সকালে তাই খাবো। তোমার খিদে না মিটলে যেটুকু রেখে দিয়েছি, তাও তোমাকে দিয়ে দেবো।'

একজন রমণী বলে উঠলো, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুমি খাও। নীলাক্ষি তোমাকে পেয়ে খুশি, তোমাকে খাইয়ে ও আরও খুশি। তুমি তোমার দানটা রাত্রে ভাল করে দিও, নীলাক্ষিকে সুখী করো।'

সবাই হৈ হৈ করে উঠলো। আগুনের শিখার আলোয়, তাদের সবাইকেই অতি ভয়ংকর প্রেমমূর্তির ন্যায় দেখালো। নীলাক্ষি খিলখিল করে হেসে, শাম্বর হাঁটুতে একটা চাপড় মারলো, এবং তার পুচ্ছহীন রক্তাভ চোখে অতিপ্রার্থিনীর উল্লাসে ইশারা করলো। শাম্ব যেন অন্তরে শিহরিক হলেন। এই শিহরণে কোনও সুখ বা কামোচ্ছ্বাস নেই। এই শিহরণ তাঁর কাছে পূর্ব জীবনের স্মৃতিযুক্ত, অথচ ভয়জাত। তিনি অভিশপ্ত, কারণ তিনি রমণীমোহন ছিলেন। সেই অভিশাপের ফল তিনি বহন করছেন। গৃহ থেকে বিদায়ের পূর্বে, লক্ষ্মণার অতি কাতর প্রার্থনায়, পত্নীর ধর্মরক্ষার্থে, তিনি জীবনের শেষবারের জন্য রমণ করেছেন, অথচ তা কামোদ্দৃপ্ত ভোগের উচ্ছ্বাসে তৃপ্ত হবার জন্য না। এখানে নীলাক্ষির আশাও তিনি পূরণ করতে পারবেন না।

শাম্বর মনে স্বতঃই একটি বিরোধ সৃষ্টি হল। যার সারাদিনের আহরিত অন্ন তিনি গ্রহণ করবেন, সে একটি বিশেষ প্রত্যাশায় তা পরিবেশন করছে। অথচ তার প্রত্যাশা পূর্ণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব না। অতএব খাদ্যপাত্র স্পর্শ না করে তিনি নীলাক্ষিকে বললেন, 'আমি তোমার প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারবো না, তোমার সঙ্গে সহবাস আমার দ্বারা সম্ভব না। কিন্তু আমি ক্ষুধার্ত, আমি কি তবু এই অন্ন খেতে পারি?'

নীলাক্ষি হসে উঠলো, এবং শাম্বর কথা যারা শুনতে পেলো, সবাই হৈ হৈ করে হেসে উঠলো।

একজন বললো, 'ওহে নয়া মানুষ ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমাদের নীলাক্ষি ও বিষয়ে অনেক তুকতাক জানে। যা করবার সে-ই করে নেবে।'

সবাই উল্লাসে হেসে উঠলো। নীলাক্ষিও তাদের মত হেসে শাম্বকে বললো, 'আমি বলছি তোমাকে, এখন পেটের খিদে তো মেটাও। অন্য খিদের কী হয়, তা পরে দেখা যাবে।'

নীলাক্ষির কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত সকলেই বুঝতে পারলো, এবং সবাই একসঙ্গে নীলাক্ষিকে সমর্থন করলো। শাম্ব দেখলেন, বালক-বালিকারাও বয়োজ্যেষ্ঠদের কথা শুনে, নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে। তাদের চোখ মুখের অভিব্যক্তি দেখলেই বোঝা যায়, বয়স্কদের কথার অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাদের ক্রীড়া কৌশলের কোনও কিছুই তাদের অজ্ঞাত না। যখন মানুষের বিশ্বাস হারিয়ে যায় তখন তার জীবনে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। থাকে কেবল শিশ্নোদরপরায়ণতা। এদের দেখে, শাম্ব তাঁর জীবনে এই অভিজ্ঞতাই অর্জন করলেন। কিন্তু মুক্তির কী উপায়? ব্যাধি থেকে আরোগ্যই মুক্তি। মুক্তিই দেয় নতুন জীবনের সন্ধান।

শাম্ব এই সব হতমান অবিশ্বাসীদের সামনে বসেও, অন্তরের অটুট বিশ্বাসকে অনুভব করলেন। তিনি যদি ভুল স্থানে এসে থাকেন, তবে আবার মহর্ষি নারদের সন্ধানে যাবেন। এই কল্প গ্রহণ করে তিনি নীলাক্ষির দেওয়া খাদ্য খেলেন। বিভিন্ন প্রকারের তণ্ডুলের সহযোগে, নানা শাক ও মূল সিদ্ধ করা খাদ্য। শাম্ব অতি উপাদেয় জ্ঞানে এই খাদ্য খেলেন। জলপান করে তৃপ্ত হলেন। তারপরে, তাঁর চারপাশে যারা উপবিষ্ট ছিল, তাদের উদ্দেশ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা বললে এখানে একটি মন্দির আছে, সেই মন্দিরের মধ্যে এক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন।'

সবাই একসঙ্গে বলে উঠলো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে আছে। আমরা রোজ তাকে গড় করি।'

শাম্ব হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে বললেন, 'মন্দিরে বিগ্রহ থাকলেই তাঁর নিত্য পূজাদি হয়। এই মন্দিরের বিগ্রহের পূজার কী ব্যবস্থা আছে?'

সবাই সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো, যার ফলে শাম্ব কোনও কথাই উদ্ধার করতে পারলেন না। তিনি সবাইকে নিরস্ত করে একজন বৃদ্ধকে উদ্দেশ করে বললেন, 'তুমি বলো, তোমার কাছ থেকে শুনি।'

বৃদ্ধের অঙ্গ এখন গলিত-প্রায়। নাসিকার হাড় সম্পূর্ণ ক্ষয়প্রাপ্ত, দুইটি ছিদ্র ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই। সে সানুনাসিক স্বরে বললো, 'আমি ওই মন্দিরে কখনো পূজা হতে দেখিনি। তবে মন্দিরের পুব দিকে একজন মুনিপুরুষের আশ্রম আছে। সে কখনো মন্দিরের বিগ্রহের পূজা করে না।'

'কিন্তু আমাদের বেক্ষচয্যি পালন করতে বলে।' একজন ব্যঙ্গের স্বরে বলে উঠলো।

আর একজন বললো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই মুনি ব্যাটা আমাদের উপোস করতে বলে। বেক্ষচারি হতে বলে। রোজ ভোরবেলা চান

করে, সূর্যের দিকে মুখ করে বসে থাকতে বলে।'

'সে আরও অনেক কিছু বলে।' আর একজন বলে উঠলো। 'তার কথার মাথামুণ্ডু আমরা কিছুই বুঝি না। আমরা জানতাম এখানে এসে চন্দ্রভাগায় নাইলেই আমরা ভাল হয়ে যাবো। কিন্তু সবই ফক্কিকারি। আমরা যদি তপস্যাই করবো, তবে ভিক্ষে করবো কখন? আমাদের খেতে দেবে কে? মুনিটা বলে, তোমরা এই নদীর ধারে চাষ আবাদ করো। আমরা কি এখানে ঘর-সংসার করতে এসেছি? আমরা সবাই একদিন পচে-গলে মরে যাবো। রোজই একটু একটু করে আমাদের হাত-পা খসে যাচ্ছে।'

লোকটির কথা শুনে কেউ কেউ আর্তনাদ করে উঠলো। আহত পশুর ন্যায় সেই আর্তনাদে, নদীকূলের বিস্তৃত অন্ধকার ভূমি, ঝোপঝাড়, গাছপালা, এখনো অবশিষ্ট কয়েকটি আগুনের শিখায় যেন এক ভয়ংকর নরক সদৃশ হয়ে উঠলো। অচিরাৎ মৃত্যুভয়েই যেন কেউ কেউ নিজেদের আলিঙ্গন করে ক্রন্দন করতে লাগলো। অন্যদিকে অন্ধকারে চলে গেল কেউ। শাম্ব গম্ভীর আর চিন্তিত হয়ে পূর্বদিকে তাকালেন। কে মুনি ঋষি এখানে করে আছেন? অথচ তিনি মন্দিরের বিগ্রহের কোনও পূজা করেন না। কিন্তু এদের নানা প্রকার উপদেশ দান করেন? এদের কথাবার্তা থেকে সম্যক কিছুই বোঝার উপায় নেই। শাম্বর কাছে এ স্থান অপরিচিত। এই রাত্রের অন্ধকারে এখন মন্দির প্রাঙ্গণে বা মুনির আশ্রমে যাওয়া উচিত হবে না। যদিও সেই স্থানে যাবার জন্য তিনি ব্যাকুলতা বোধ করছেন, কাল এবং স্থান চিন্তা করে, চিত্তকে দমন করলেন।

শাম্ব দেখলেন, প্রায় সকলেই যে যার মৃত্তিকা গহ্বরে বা পাতা ঝোপের কুটিরে গমন করেছে। দু'একজন রমণী পুরুষ বালক-বালিকা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বসে আছে। প্রায় নিভন্ত দুএকটি ক্ষীণ আগুনের শিখা এখনো জ্বলছে। নীলাক্ষি এখনো ঘুমন্ত শিশু কোলে নিয়ে তাঁর পাশে বসে রয়েছে। শাম্ব স্মরণ করতে পারেন না, কতোক্ষণ পূর্বে শৃগাল প্রহর ঘোষণা করেছে। কিন্তু করেছে, তিনি শুনতে পেয়েছিলেন। এখন মাঝে মাঝে মাথার ওপর দিয়ে কালো পাখা বিস্তার করে রাত্রিচর পাখিরা উড়ে যাচ্ছে। নদীর কলকল শব্দের মধ্যেও পাখিদের পক্ষ সঞ্চালনের মৃদু শব্দ শোনা যাচ্ছে। তিনি আকাশের দিকে তাকালেন। সন্ধ্যাতারা পূর্ব দিগন্ত থেকে অনেকখানি উঠে এসেছে। সপ্তর্ষিমণ্ডল ও বিভিন্ন নক্ষত্ররাশি, কৃষ্ণ আকাশে অতি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

শাম্ব নীলাক্ষির দিকে তাকালেন। নীলাক্ষি তার পুচ্ছহীন রক্তাভ চোখে শাম্বর দিকেই তাকিয়েছিল। সহবাস কামনায় অতি ব্যাকুলতা তার চোখে নেই, কিন্তু গভীর প্রত্যাশা নিয়ে সে বসে আছে। শাম্ব কোমল স্বরে বললেন, 'সকলেই যে যার আশ্রয়ে চলে গেছে। তুমিও তোমার ছেলেটিকে নিয়ে ঘুমোতে যাও।'

নীলাক্ষি আশাহত বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আর তুমি? তুমি কী করবে, কোথায় থাকবে?'

শাম্ব বললেন, 'আমি যেখানে আছি, সেখানেই রাত্রিটা কাটিয়ে দেবো।'

নীলাক্ষির পুচ্ছহীন রক্তাভ চোখে আতংক ফুটে উঠলো। চার পাশে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললো, 'কী করে তুমি সারা রাত বাইরে থাকবে? এখনই নেকড়েরা ছুটে আসবে। তারা কুষ্ঠ রোগীদের রেহাই দেয় না। আমাদের মাটির গর্তের ঝাঁপে আর পাতার ঘরেও তারা হামলা করে, নখ দিয়ে আঁচড়ায়। তুমি বাইরে থাকলে, ওরা তোমাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে।'

শাম্ব মুহূর্তেই ভেবে নিয়ে বললেন, 'আমি এখনই অগ্নিকুণ্ডের আগুন উস্‌কে তুলবো, আগুনের পাশে বসে থাকবো। নেকড়ের দল এলে আমি আগুন নিয়ে তাদের তাড়া করবো।'

নীলাক্ষি শাম্বর কথায় বুঝতে পারলো, তিনি যা বলছেন, তা করবেন। সে বললো, 'কিন্তু আমি তোমার আশায় বসে আছি। আমি একলা থাকতে পারি না। একজন পুরুষ না থাকলে আমার সবই ফাঁকা লাগে।'

শাম্বর কাছে এই সরল স্বীকারোক্তি মর্মন্তুত বোধ হল। তিনি কৌতূহলিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'যে পুরুষ দুদিন আগেও তোমার সঙ্গে থাকতো, তার জন্য তোমার শোক-দুঃখ কিছু নেই? তাকে কি তুমি ভুলে গিয়েছ?'

নীলাক্ষি মাথা নেড়ে বললো, 'কেন ভুলে যাবো? তাকে আমার ভালই মনে আছে। আমি তার জন্য অনেক কেঁদেছি। কিন্তু আমাদের জীবনে ওসব শোক দুঃখের কী দাম আছে? তুমি শুনলে না, আমরা রোজই একটু একটু করে পচেগলে মরে যাচ্ছি? তোমার মতন নতুন যারা আসে তারা সবাই কয়েকদিন এই রকমই ভাবে। আলাদা আলাদা দূরে সরে থাকতে চায়। তারপরে যখন বুঝতে পারে, ওতে কোনও লাভ নেই, তখন সকলের সঙ্গে মিশে যায়। তুমিও যাবে। তবে মিছে কেন দেরি করছো? আমাদের ঘর সমাজ বলে এখন কিছুই নেই। মরতে মরতেও আমরা আমাদের নিয়েই থাকবো। আমাদের এখন কোনও পাপও নেই পুণ্যও নেই। পুড়ে-যাওয়া-পাখা মৌমাছি যেমন ফুলের গায়ে লেগে থেকে মরে যায়, আমরা সেইভাবেই মরতে চাই। যেটুকু সুখ মেটে তাই মিটিয়ে নিই। তুমি আমার সঙ্গে চলো। তোমাকে আমি সুখী করবো।'

শাম্ব অনুভব কলেন, 'নীলাক্ষির প্রতিটি কথাই অতি নিষ্ঠুর বাস্তব। ব্যাধি ও নিশ্চিত বীভৎস মৃত্যু আশাহীন জীবনের কথা। কিন্তু তিনি বিচলিত নন, এখনো মুক্তির অভিলাষী। তিনি কোনও যুক্তি দেখালেন না, বললেন, 'নীলাক্ষি, আমি তোমার কথা বুঝেছি। তুমি আমাকে মার্জনা করো, আমাকে ত্যাগ করে তুমি তোমার শিশুটিকে নিয়ে আশ্রয়ে যাও।'

নীলাক্ষি তথাপি বললো, 'আমার যদি রোগ না হতো, আমি যদি সমাজ সংসারে থাকতাম, তুমিও যদি সুস্থ থাকতে, তবে কখনোই আমাকে এভাবে এড়িয়ে যেতে পারতে না। তোমার কথা থেকেই বোঝা যায়, তুমি রাজরাজড়া ঋষিদের মত সবই জানো। কিন্তু তুমি কি বুঝতে পারো না, আমার এই যে শরীরটা, এর বাইরে কোনও সাড়ই এখন আর নেই। তুমি যদি আমার বুকেও হাত দাও, আমি টের পাবো না। এখন শুধু শরীরের ভেতরেই সাড় আছে। যেমন জিভ দিয়ে এখনো খাবারের স্বাদ পাই। হয়তো মরার আগ পর্যন্ত এই সাড়ই থাকবে। এই সুখটুকু তুমি কেন আমাকে দেবে না?'

শাম্ব বুঝলেন, নীলাক্ষির এই সব উক্তি অধিকতর বাস্তব ও মর্মন্তুদ। সে কোনও কথাই প্রছন্ন রাখেনি। কিন্তু কী করে বলবেন, তিনি পিতার দ্বারা অভিশাপগ্রস্ত। শাপমোচনের জন্যই তিনি গৃহত্যাগ করেছেন। তাঁর জীবনে সে-ই ধ্রুব ও মোক্ষ। তিনি করজোড়ে বললেন, 'নীলাক্ষি, আমাকে ক্ষমা করো। তোমাকে সামান্য সুখী করতে পারলেও আমি সুখী হতাম। আমাকে অক্ষম জ্ঞানে তুমি ক্ষমা করো।'

'নীলাক্ষির পুচ্ছহীন রক্তাভ চোখ হতাশায় ও ক্ষোভে জ্বলে উঠলো। তার ভগ্ন নাসা, ক্ষয়-ক্ষত ঠোঁট, স্ফীত পাংশু মুখ শক্ত হল। শিশু কোলে সে উঠে দাঁড়াল, 'তুমি অক্ষমই থাকো। তোমাকে ধিক।

আমি যখন সুস্থ ছিলাম, তখন ঋষি পুরুষরাও আমার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হতো। এখানে এখন যতো পুরুষ আছে, আমি যাকে ডাকবো, সে-ই আমার কাছে ছুটে আসবে। এর পরে তুমি আমাকে চাইলেও আর পাবে না।' এই বলে সে ঝোপ-ঝাড়ের অন্তরালে অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

শাম্ব নতমুখে বসে রইলেন। তিনি জানেন, নীলাক্ষির অভিশাপ তাঁকে স্পর্শ করবে না, কারণ তিনি অভিশপ্ত হয়ে এখন এক কল্প গ্রহণ করেছেন। কিন্তু নীলাক্ষির জন্য তাঁর অন্তর দুঃখে দ্রবীভূত হল। কিছুক্ষণ এইভাবে অধোবদনে বসে থাকবার পরেই তিনি ঘ্রাণে হিংস্র পশুর উপস্থিতি টের পেয়ে চকিত হলেন। দেখলেন, এখন আর কেউ বাইরে নেই। তিনি একলা। দূরে অন্ধকারে তাকিয়ে শ্বাপদের প্রজ্জ্বলিত চক্ষু দেখতে পেলেন। তৎক্ষণাৎ উঠে, অগ্নিকুণ্ডের কাছে গিয়ে, খুঁচিয়ে আগুনের শিখা উসকিয়ে তুললেন। জ্বলন্ত একটি কাঠের টুকরো নিয়ে তিনি চারপাশে তাকালেন। অগ্নিশিখার প্রভায় জ্বলন্ত শ্বাপদ চক্ষুগুলো দূরান্তরে আত্মগোপন করেছে। কিন্তু তারা প্রত্যাশায় আশেপাশেই সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে। শাম্ব আশপাশ থেকে কাঠের টুকরো নিয়ে, অগ্নিকুণ্ড বিস্তৃত করলেন। জ্বলন্ত কাঠ ছড়িয়ে, নিজের চারপাশে ব্যূহের সৃষ্টি করলেন, এবং নিশ্চিন্ত হয়ে উপবেশন করলেন। এখন শুধু নক্ষত্ররাজি অতি ধীরে আকাশের কক্ষপথে গমন করছে। নদীস্রোতে নক্ষত্রেরই রেখা মাঝে মাঝে ঝিলিক দিচ্ছে, আর কলকল ধ্বনি ভেসে আসছে।

শাম্ব নদীর দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন।

অতি প্রত্যুষে, অন্ধকার বিদায় নেবার আগে, যখন গাছে পাখির প্রথম স্খলিত জিজ্ঞাসু ডাক শোনা গেল, শাম্ব তখন চন্দ্রভাগার বেগবতী শীতল স্রোতে অবগাহন করলেন। জলের ধারা যেন তাঁর দেহের গভীরে প্রবেশ করে, অন্তরস্থল পর্যন্ত ধৌত করে দিল। তাঁর মন ও প্রাণ যেন গভীর এক আনন্দানুভূতিতে ভরে উঠলো। স্নানের শেষে তাঁর একমাত্র সম্বল দ্বিতীয় বস্ত্রখণ্ডখানি দেহে জড়িয়ে, ভেজা বস্ত্র নিংড়ে, গা মাথা মুছলেন।

আকাশের পুব দিগন্ত ক্রমে রক্তিম হয়ে উঠছে। শাম্ব দেখলেন, পাতার কুটিরে বা মৃত্তিকা গহ্বরের কেউ এখনো জাগেনি। তিনি এদের সঙ্গে এখন আর দেখা করতে চাইলেন না। বরং তারা জেগে ওঠে, এই আশংকায় তিনি দ্রুত পূর্বদিকে গমন করলেন।

অনতিঘন অরণ্যানী ও বনস্পতির ফাঁকে ফাঁকে একটি মন্দিরের আকৃতি দেখা গেলেও, তার দূরত্ব যে কিছু কম, তা মনে হল না। সেই মন্দিরের কিঞ্চিৎ দর্শনে, শাম্ব তাঁর হৃদয়ে এক রকমের ব্যাকুলতা বোধ করলেন, এবং যথাসম্ভব দ্রুত অগ্রসর হলেন। ক্রমেই পাখিদের স্খলিত স্বর স্পষ্ট ও সরব উঠতে লাগলো। দেখলেন, যে অঞ্চলকে নিতান্ত অরণ্যানী মনে করেছিলেন, তা নানা ফুলে ফলে সুশোভিত এক সুবিশাল রমণীয় কানন। তাঁর মনে হল, জীবনের বাকি দিনগুলো এমন রমণীয় কাননে কাটিয়ে যেতে পারলেও, তাঁর অভিশপ্ত প্রাণ অনেক শান্তিতে মৃত্যুকে বরণ করতে পারবে।

শাম্ব যতোই মন্দিরের নিকটবর্তী হলেন ততোই যেন কাননের শোভা অধিকতর রমণীয় হয়ে উঠতে লাগলো। মন্দিরের আকৃতি ও বিবিধ দেবতা যক্ষ, গন্ধর্ব, অপ্সরাদের মূর্তি, প্রায়ই চোখের সামনে ভেসে উঠলো। পূর্বের আকাশ ক্রমে গাঢ় থেকে গাঢ়তর সিন্দুরের মত লাল হয়ে উঠলো। তাঁর ডান দিকে বেগবতী চন্দ্রভাগার বুকে যেন রুধিরের তরল স্রোত বয়ে চলেছে। নদীর কলকল, বাতাসের মৃদু শনশন, পাখির সুমিষ্ট ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। শাম্বর মনে হল, মানুষের সমাজ সংসার ছাড়িয়ে, তিনি যেন এক অপার্থিব মায়াময় স্থানে পৌঁছেছেন। এখানে কি প্রকৃতই সেই অত্যুজ্জ্বল পুরুষ পরমাত্মা অবস্থান করেন?

শাম্বর মনে এই চিন্তার উদয়মাত্রই তাঁর শরীর রোমাঞ্চিত হল। কারণ মহর্ষি কথিত সেই অত্যুজ্জ্বল মূর্তির এক কল্পনা তাঁর অন্তরে গ্রথিত হয়ে আছে। তিনি নদীর তীরবর্তী মন্দিরের দক্ষিণ দ্বারে এসে উপস্থিত হলেন। যথার্থ দক্ষিণে বলা যায় না, দক্ষিণ পূর্ব কোণে এবং একটি বৃহৎ রথের ন্যায় মন্দিরের গঠন। দ্বার আছে, কিন্তু কোনও প্রাচীরের দ্বারা মন্দিরটি বেষ্টিত নয়। রথের ন্যায় মন্দিরের চারদিকে চারটি দ্বার, পিঙ্গলা-দণ্ডনায়ক, রাজ্ঞা ও স্তোশ্রা, কালমাস-পক্ষীন, ভিওমান ও নগ্নদিণ্ডি, দ্বারপালগণ রয়েছেন। অপ্সরাগণ রথের বিভিন্ন অংশে নৃত্যে সংগীতে ও বাদ্যযন্ত্রাদি বাদনের অপরূপ ভঙ্গিতে রয়েছেন। তাছাড়া দেবতাগণ, যক্ষ, গন্ধর্বগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, অশ্বিনীগণ, মারুতগণ সকলেই যথাস্থানে অবস্থান করছেন। মাথার ওপরে ছত্র, সেই আশ্চর্য পুরুষমূর্তি অবস্থান করছেন। শিরস্ত্রাণ তাঁর মস্তকে, কোমরবন্ধরূপে রয়েছে অভিয়ঙ্গ, পদতলের কনুইয়ের উর্ধ্ব পর্যন্ত পাদুকা শোভ পাচ্ছে।

শাম্বর অন্তরে গ্রহরাজের নানা বিস্ময়কর ও বিচিত্র কাহিনী উদিত হল। তিনি আভূমি নত হয়ে, সেই পুরুষমূর্তিকে প্রণাম করলেন, ভাবলেন, এই কি নারোদোক্ত সেই সূর্যক্ষেত্র? তবে কেমন করে এই সর্বদেবমান্য পরমাত্মাকে আমি আরাধনা করবো? তাঁর তুষ্টিবিধান করে, শাপমুক্ত হবো? তিনি কি মূর্তিমানরূপে আমার সামনে কখনো দেখা দেবেন? কেমন করে তাঁর আশীর্বাদ পাবো? তিনি কি আমাকে সেই ব্রহ্মরূপ শব্দের দ্বারা, শাপমোচনের নির্দেশ দেবেন? এই চিন্তা ও জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে তাঁর অন্তরে যেন এক গভীর কল্পবোধ দৃঢ়তর হল। তিনি সেই পরমাত্মার দুই পাশে তাঁর দুই পত্নী, রাজ্ঞি ও নিক্ষুভাকে দেখলেন। সকলেই যেন তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করে আছেন। শাম্বর অন্তর বারে বারে শিহরিত হতে লাগলো।

এইরূপ চিন্তার মধ্যে, শাম্ব চারটি দ্বার প্রদক্ষিণ করে আবার নদীতীরে এসে দাঁড়ালেন। এই সময়ে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য তাঁর দৃষ্টিগোচর হল। দেখলেন, পূর্বাকাশব্যাপী রক্তাভার মধ্যে এক বিশাল সিন্দূর গোলকের ন্যায় সূর্য উদিত হচ্ছেন। একজন উজ্জ্বলবর্ণ পুরুষ, তাঁর সারা গায়ে জল, শুভ্র কেশ ও গুম্ফ ও শ্মশ্রু বিন্দু বিন্দু জলে চিকচিক করছে। সামান্য একখণ্ড সিক্ত ধুতি তাঁর পরিধানে। সদ্যোত্থিত সূর্যের আভায় সেই পুরুষের সর্বাঙ্গ যেন রক্তিম দেখাচ্ছে। তিনি নদীতীরে দাঁড়িয়ে, চোখ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে সূর্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে আছেন। তার করজোড় দুই হাত সূর্যের প্রতি প্রসারিত। তিনি কি কোনও মন্ত্রোচ্চারণ করছেন? কিন্তু তাঁর ঠোঁট নড়ছে না। কী করে তিনি রক্তবর্ণ তেজোদৃপ্ত সূর্যের দিকে অপলক দৃষ্টিপাত করে আছেন? শাম্বর ধারণা, এইরূপে মানুষের দৃষ্টি শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। অথচ এই সদ্যোস্নাত উজ্জ্বল পুরুষের চোখে কোনওরকমে বিকার দেখা যাচ্ছে না।

শাম্ব সহসা তাঁর সামনে গেলেন না। অপেক্ষা করতে লাগলেন। ভাবলেন ইনিই কি সেই ব্যক্তি, যাঁর কথা গত রাত্রে হতমান অবিশ্বাসী ব্যাধিগ্রস্তরা বলছিল? কে ইনি? প্রকৃতই কি একজন ঋষি, যিনি সর্বদা রক্তমাংসের দেহ ধারণ করে সূর্যকে বেদোক্ত ভাষায় বন্দনা করেন? মহর্ষি নারদ বলেছিলেন, ঋষিগণ সে স্থানে বেদোক্ত প্রার্থনাদি আবৃত্তি করেন।

শাম্ব এই ভাবনার মধ্যেই সেই পুরুষ দুই হাত দিয়ে তাঁর দুই চোখ ধীরে মার্জনা করলেন। তারপর তীরের উচ্চভূমিতে উঠে, মন্দিরের দিকে না এসে, উত্তরদিকে গমন করলেন। শাম্ব যেন চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণে সেই পুরুষের পশ্চাতে অনুসরণ করলেন। মৃদুমন্দ বাতাসে নানা ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। পাখিরা যেন সদ্যোত্থিত সূর্যকে বন্দনা করে গান করছে। কিছুদূর যাবার পর রমণীয় কানন মধ্যে একটি কুটির ও তপোবন দেখা গেল। শাম্ব সেই পুরুষকে আর অনুসরণ করতে যখন দ্বিধাগ্রস্ত, তখনই তিনি পিছন ফিরে শাম্বর দিকে তাকালেন। শাম্বর মনে হল, রৌদ্রোলোক তাঁকে অত্যুজ্জ্বল করেছে। আর অগ্রসর না হয়ে সেখান থেকেই, নতজনু, হয়ে সেই পুরুষকে আভূমি প্রণাম জানিয়ে বললেন, 'হে মহাভাগে অত্যুজ্জ্বল পুণ্যদেহ! আপনি আমার অপরাধ নেবেন না! আপনাকে আমি নদীতীরে সূর্য নমস্কার করতে দেখেছি। অন্তরে যথেষ্ট দ্বিধা থাকা সত্ত্বেও, আমাকে যেন কোনও অদৃশ্য শক্তি আপনার প্রতি আকর্ষণ করলো। আমি আপনাকে অনুসরণ না করে থাকতে পারলাম না। হে মহাতপাঃ, আপনি আমাকে মার্জনা করুন।'

সেই পুরুষ প্রস্তরমূর্তির মত অপলক চোখে শাম্বর দিকে তাকিয়ে রইলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ কিছুই বললেন না। তাঁর অপলক চোখের দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ ও অন্তর্ভেদী। শাম্বর মনে হল, তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করে এই পুরুষ যেন তাঁর সমুদয় বিষয় অবগত হলেন। তথাপি শাম্ব এই তপোধনের অসন্তুষ্টির আশংকায় হাত জোড় করে আমার বললেন, 'মহাত্মন, আপনাকে অশেষতেজঃপ্রভাযুক্ত দেখছি। আমি মহাব্যাধি আক্রান্ত অভিশপ্ত। এই মহাক্ষণে আপনার দৃষ্টিকে আমি হয়তো আহত করেছি। আপনার পবিত্র অন্তরের শান্তিকে বিঘ্নিত করেছি! আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন না। আমি যেন এক অলৌকিক আকর্ষণের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে আপনাকে অনুসরণ করেছি। আপনি আমাকে অজ্ঞ জ্ঞানে ক্ষমা করুন।'

শাম্বর কথা শেষ হতেই অদূরে বহুকণ্ঠের কোলাহল শোনা গেল। পুরুষমূর্তি বললেন, 'আমার সঙ্গে এসো।'

শাম্ব যেন নিজের শ্রবণকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। সদ্যোস্নাত উপাসক যে তাঁকে এক কথায় আহ্বান করবেন, এ কথা তিনি ভাবতে পারেননি। মহাপ্রভঃ ঋষি আবার পিছন ফিরে চলতে আরম্ভ করেছিলেন। শাম্ব তাঁর অন্তরে গভীর আস্থা অনুভব করে দ্রুত পায়ে ঋষিকে অনুসরণ করলেন। দূরে দক্ষিণের কোলাহল শুনে তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর সমব্যাধিগ্রস্ত সেই সব পুরুষ রমণী বালক-বালিকারা বোধহয় নদীর জলে স্নান করছে। তারপরে মন্দিরে নমস্কার করে সদলে সবাই ভিক্ষে করতে বেরোবে।

ঋষি পুরুষ কুটির প্রবেশে উদ্যত হয়ে থমকিয়ে দাঁড়ালেন, পিছনে ফিরে তাকালেন। শাম্ব আগেই অনেকখানি দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। প্রভাযুক্ত পুরুষ বললেন, 'তুমি তপোবন মধ্যে মুক্ত রৌদ্রে কোথাও বসো। তুমি স্নান করে এসেছো, দক্ষিণ-পূর্ব হয়ে বসো। অল্পক্ষণেই আমার পূজা সাঙ্গ হবে। তারপরে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলবো।' এই বলে তিনি কুটির মধ্যে প্রবেশ করলেন।

শাম্ব প্রতিটি নির্দেশই যথাবিহিত পালন করলেন। তিনি ফুল-ফল সুশোভিত তরুবীথির ছায়া পরিত্যাগ করে দক্ষিণ-পূর্বে মুখ করে মুক্ত রৌদ্রে উপবেশন করলেন। এ স্থানমাহাত্ম্য কিনা তিনি বুঝতে পারলেন না, যুগপৎ তাঁর অন্তরে এক অনুশোচনা ও অনির্বচনীয় আনন্দবোধ তরঙ্গায়িত হতে লাগলো। অনুশোচনা এই কারণে, তিনি এমন আশ্চর্য রমণীয় তপোবনে কখনো একান্ত একলা বসেননি। এর মধ্যে যে এক মহত্তর আনন্দ ও সৌন্দর্যবোধ বিরাজ করছে, আগে কখনো অনুভব করেননি। ভোগ, বীরত্ব, শত্রুনিধন, ক্ষত্রিয় ধর্মপালন এসবই তিনি জানতেন। কিন্তু অভিজ্ঞতার স্বরূপ অনন্য। কেন তিনি আগেই এই অনন্য সৌন্দর্য উপভোগ করতেন পারেননি! এই অনুশোচনা তাঁর মনে জাগছে, এবং এক অনির্বচনীয় আনন্দের ধারা প্রতি মুহূর্তে তা ধৌত করে দিচ্ছে।

নারদোক্ত বৃষ্ণিব্যাঘ্র যে-ভাবে বসেছিলেন, সূর্য তাঁর মুখোমুখি ছিলেন না, অথচ সর্বাঙ্গে রৌদ্র স্পর্শ করছিল। তিনি নদী, পরবর্তী তীর এবং দূরের আকাশে তাকিয়ে রইলেন, এবং ক্রমে এক ভাবাবেশে তিনি চোখ মুদ্রিত করলেন। তাঁর চোখের সামনে কুসুমের বর্ণ দুলতে লাগলো। কতোক্ষণ তিনি এভাবে ছিলেন, অনুমান করতে পারেন না। হঠাৎ শুনলেন, 'এই নাও, এই ফলমূলাদি খাও। যৎসামান্য মিষ্টি খেয়ে জলপান করো।'

শাম্ব সংবিৎ ফিরে পেয়ে দ্রুত গাত্রোত্থানে উদ্যত হলেন। সেই প্রভাযুক্ত ঋষি তাঁর সামনে জলপদ্মের পাতায় ফলমূল মিষ্ট নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। শাম্বকে গাত্রোত্থানে উদ্যত দেখে, নিরস্ত করে বললেন, 'তোমাকে উঠতে হবে না। যেখানে বসে আছো, সেখানেই বসো। এই নাও, এই যৎসামান্য ফলমূলাদি খাও। তুমি নিশ্চয় ক্ষুধার্ত। তার আগে একবার গ্রহরাজকে প্রণাম করো।'

শাম্ব সূর্যকে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করলেন। তারপরে ঋসির প্রতি হাত প্রসারিত করলেন। ভেবেছিলেন, প্রভাযুক্ত ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই জলপদ্মের পাতা তাঁর দিকে ছুঁড়ে দেবেন। কিন্তু তিনি তা আদৌ করলেন না। যেমনভাবে একজনকে পাতায় খাদ্য পরিবেশন করতে হয়, তেমনিভাবেই শাম্বর সামনে তা ভূমিতে রাখলেন। তাঁর বাঁ হাতে ছিল একটি মৃত্তিকার জলপূর্ণ পাত্র। সেটিও পাতার পাশে রাখলেন, বললেন, 'খাও। আমি বসছি। তোমার খাওয়া হলে, বৃত্তান্ত শুনবো।'

শাম্বর হৃদয় অতি আকুঞ্চিত হয়ে, নিশ্বাস অতি গভীরে আবর্তিত হল, এবং মনে হল, তাঁর চোখ ফেটে জল আসবে। হতভাগ্যের মত অনেকগুলো দিন অতিবাহিত করবার পরে এইরকম প্রভাযুক্ত একজন উজ্জ্বল ঋষি পুরুষ তাঁকে স্বহস্তে খাদ্য পরিবেশন করলেন, সুবাক্য বললেন, এবং তাঁর মুখের অভিব্যক্তিতে বিন্দুমাত্র ঘৃণার কুঞ্চন দেখা গেল না। তিনি যেন একজন বিকলাঙ্গ কুৎসিত কুষ্ঠরোগগ্রস্তের সামনে নেই, এমনই স্বাভাবিক, বরং তার অধিক, শান্ত সৌম্য তাঁর মুখভাব, আচরণ আশ্চর্য অনায়াস ও ভব্যযুক্ত।

শাম্ব অতি কষ্টে তাঁর হৃদয়াবেগ দমন করলেন ও অশ্রুসংবরণ করলেন। দেখলেন তাঁর কপালে চন্দ্রভাগা তীরের মৃত্তিকারই একটি গোলাকার ফোঁটা চিহ্ন। মাথায় সুদীর্ঘ চুলে এক খণ্ড বস্ত্র জড়িত চূড়ার মত বাঁধা। তাঁর শুভ্র শ্মশ্রু যেন উজ্জ্বল রৌপ্যের ন্যায়, মুখমণ্ডলে সুবর্ণ দীপ্তিতে কোথাও বার্ধক্যের বলিরেখা পড়েনি। ইনিই প্রকৃত মহর্ষি নারদোক্ত অত্যুজ্জ্বল পরমাত্মা গ্রহরাজ নন তো? কায়ারূপ ধারণ করে শাম্বকে আচ্ছন্ন করছেন না তো?

প্রভাযুক্ত পুণ্যদেহধারী আবার বললেন, 'খাও। খাওয়া হলে তোমার সঙ্গে আমি কথা বলবো।'

শাম্ব আবার করজোড়ে তাঁকে নমস্কার জানিয়ে, ফল মুখে দিলেন। কিন্তু তাঁর হৃদয় মধ্যে সেই আবর্ত বারে বারে আকুঞ্চিত হতে লাগলো এবং চোখ জলে ভরে উঠতে চাইলো। তিনি নিজেকে অতি কষ্টে সংবরণ করলেন এবং অমৃতবৎ ফলমূলাদি খেতে লাগলেন। প্রভাযুক্ত ঋষি নিকটেই একটি আমলকী বৃক্ষমূলে উপবেশন করলেন এবং নদীর স্রোতের দিকে তাকিয়ে রইলেন। শাম্ব দুগ্ধজাত মিষ্টি

খেয়ে, জলপান করলেন। ঋষি তাঁর দিকে ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাকে আমি গতকাল এখানে দেখিনি।'

শাম্ব বললেন, 'আমি গত সন্ধ্যায় এখানে এসে পৌঁছেছি।'

ঋষি পুরুষ বললেন, 'তোমাকে দেখে, আমি সেইরকমই অনুমান করেছি। কিন্তু এখানে তোমার মত যারা আসে, তারা সকলেই জীবনের প্রতি বিশ্বাসহীন বীতশ্রদ্ধ অসংযমী হয়ে যায়। তাদের কথাবার্তা আর পূর্বের সুস্থ জীবনের মত থাকে না। আচরণও বদলে যায়। তোমাকে আমি তার ব্যতিক্রম দেখলাম।'

শাম্ব বললেন, 'আমি সাত ঋতু অতিক্রম করে এখানে এসে পৌঁছেছি। আমি শত শত গ্রাম জনপদ ও নগরীর মধ্যে দিয়ে এসেছি। অধিবাসীদের আমাকে দেখে ভয় ও ঘৃণার জন্য, তাদের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র রাগ হয়নি। আমি নিজেকে দিয়েই তাদের মনোভাব বিচার করেছি। তথাপি তারা আমাকে খেতে দিয়েছে। দুরন্ত বর্ষায়, তীব্র শীতে খামারে গোয়ালের ধারে বহির্বাটির মাথাঢাকা দাওয়ায় থাকতে কোনও বাধা দেয়নি। সারমেয়কুল সর্বত্রই একরকম এবং অবোধ বালক-বালিকাগণও। তারা আমাকে নানাভাবে তাড়না করেছে, পীড়ন করেছে। কিন্তু আমি রাগ করিনি। পরমাত্মার কাছে তাদের সুমতির প্রার্থনা করেছি। তবে হে মহাত্মন, গৃহত্যাগ করার পরে, আপনার মত দয়াময় ব্যক্তির সাক্ষাৎ আমি এই প্রথম পেলাম; তাতে আমার এই প্রত্যয় জন্মেছে, হয়তো আমি সিদ্ধিলাভ করতে পারবো।'

'সিদ্ধিলাভ? কিসের সিদ্ধিলাভ?'

'শাপমোচন।' কথাটি উচ্চারণ করেই, শাম্ব যেন সহসা বিব্রত বোধ করে আবার বললেন, 'আরোগ্যলাভই আমার সিদ্ধি।'

প্রভাযুক্ত ঋষি কয়েক মুহূর্ত শাম্বর দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই স্থানের কথা তোমাকে কে বলেছে, কী বলেছে?'

শাম্ব এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বললেন, 'যিনি সকল বর্ষসমূহ ও অন্তরীক্ষ ভ্রমণ করেছেন, সেই মহর্ষি নারদ।'

'নারদ!' প্রভাযুক্ত পুরুষ বিস্মিত স্বরে উচ্চারণ করলেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় তোমার সঙ্গে মহর্ষির সাক্ষাৎ হয়েছিল? তোমার পরিচয়ই বা কী?'

শাম্ব মৌনাবলম্বন করে মাথা নত করলেন। প্রভাযুক্ত পুরুষ তীক্ষ্ণ চোখে শাম্বকে দেখলেন, কিন্তু তিনি ক্রুদ্ধ হলেন না, বরং কোমল স্বরে বললেন, 'পরিচয় দিতে যদি কুণ্ঠা থাকে, তবে থাক। হয়তো এই তোমার উপযুক্ত কাজ।'

শাম্ব প্রকৃতই কুণ্ঠাবোধ করছিলেন। তিনি যে বাসুদেবতনয়, এই পরিচয় দেওয়ার অর্থ এক সুদূরপ্রসারী কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করা। একমাত্র বংশপরিচয়ের দ্বারা অপরের উৎসাহকে তিনি বৃদ্ধি করতে চান না। কিন্তু এই মহাত্মা এ কথা কেন বললেন, 'হয় তো এই তোমার উপযুক্ত কাজ?' শাম্ব বললেন, 'আপনি আমাকে মার্জনা করবেন, অসন্তুষ্ট হবেন না। এখন আমার একমাত্র পরিচয়, আমি অভিশপ্ত। শাপমোচনের দ্বারা মোক্ষ লাভই আমার লক্ষ্য।'

প্রভাযুক্ত ঋষি বললেন, 'বুঝেছি। তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তবে মহর্ষি নারদ তোমাকে কী বলেছিলেন, কী নির্দেশ দিয়েছেন তা আমি শুনতে চাই।

শাম্ব নির্দ্বিধায় নারদোক্ত সূর্যক্ষেত্র ও তার বর্ণনাদি এবং এখানে আগমন করে চন্দ্রভাগায় স্নান ইত্যাদি সব কথাই বললেন। তাঁর গতকাল অতিসায়াহ্নে আগমন, হতমান অবিশ্বাসী রোগগ্রস্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও রাত্রিবাসের বর্ণনা দিলেন এবং তারা এই প্রভাযুক্ত ঋষির বিষয়ে কী বলেছে, তাও বললেন। বর্ণনা দিলেন, আজ অতি প্রত্যুষে চন্দ্রভাগায় স্নান করে, সূর্যক্ষেত্র দর্শনের পর, মহাত্মার দর্শন, এই রমণীয় কানন ও তপোবন তাঁর মনে কী গভীর শান্তি ও অনির্বচনীয়তা এনে দিয়েছে। তিনি বারে বারে মহাত্মার প্রশস্তি করে বললেন, 'আপনি যদি বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ না হন, তা হলে এ বিষয়ে আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।'

প্রভাযুক্ত ঋষি প্রসন্ন মুখে বললেন, 'একটা কেন, তোমার যা জিজ্ঞাস্য আছে, করো। আমি সাধ্যমত জবাব দেবো।'

শাম্ব বললেন, 'আমি দেখলাম, আপনি সূর্যদেবকে নমস্কার করে, কুটিরে গমন করলেন। মন্দিরের বিগ্রহকে তো আপনি পূজা করলেন না?'

ঋষি হেসে বললেন, 'তুমি গতকালই রাত্রে, আস্তানার কুষ্ঠরোগীদের কাছে শুনেছো, মন্দিরের বিগ্রহের পূজা হয় না। আমার ওই পরমাত্মা বিগ্রহকে পূজা করার কোনও অধিকার নেই। বেদ বলেছেন, গ্রহরাজ সূর্য সর্বদেবমান্য, সর্বভূতমান্য, সর্বশ্রুতিমান্য। বেদে আমার অধিকার থাকলেও বিগ্রহ পূজা সকল শ্রেণীর দ্বারা সম্ভব না। বিশেষত আমি দেবলক ব্রাহ্মণ, আমার বিগ্রহ পূজা নিষেধ। কিন্তু আমি এই মিত্রবনে বাস করি, অতি প্রাচীনকাল থেকে এ স্থান সূর্যলোক নামে খ্যাত, আমি প্রতিদিন গ্রহরাজেরই পূজা করি। প্রাচীনতম কালে যখন এই গ্রহরাজের কোনও মূর্তি কল্পনা করা হয়নি, তখন একটি রক্ত মণ্ডলাকার অঙ্কনদ্বারা সর্বত্র তাঁর উপাসনার প্রচলন ছিল। আমি প্রতিদিন একটি মণ্ডলাকার অঙ্কন করে সবিত্রের উপাসনা করি।'

শাম্ব নতুন বৃত্তান্ত শুনে অবাক হলেন, তাঁর কৌতূহল বর্ধিত হল। তিনি বললেন, 'মহাত্মন, মহর্ষির কথা শুনে আমি ভেবেছিলাম এখানে এসে আমি গ্রহরাজকে কায়ারূপে দর্শন করবো। এখন বুঝতে পারছি, আমি মহর্ষির কথা অর্বাচীনের ন্যায় ভেবেছি। আপনি আমাকে অনুগ্রহ করে বলুন এই গ্রহরাজের মূর্তি কী ভাবে, কবে থেকে মন্দিরে বিগ্রহের ন্যায় কল্পিত হয়েছিল?'

ঋষি প্রীত হয়ে বললেন, 'যে সব মহাপুরুষগণ এই পৃথিবী নামক গ্রহকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান অবস্থাপ্রাপ্ত হতে দেখেছেন, তাঁরা বলেছেন, এই গ্রহরাজ আদি ও অনন্ত। তিনিই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, রক্ষাকর্তা এবং নিয়ন্তা। তিনি ভয়ংকর কিন্তু শান্ত। তিনি প্রচণ্ড অগ্নিময়, কিন্তু জীবের জীবনধারণের কারণ। আমরা বিভিন্ন রূপে তাঁকে পূজা করেছি, বিভিন্ন নামে তাঁকে অভিহিত করেছি। আমাদের স্বভাব এইরকম যে যাকে আমরা ঈশ্বর রূপে ধ্যান করি, তাঁকে নিজেদের মনোমত একটি রূপ দিতে চাই। সেই রূপ হওয়া চাই অতি তেজোদৃপ্ত, মহাবলশালী, অতি ক্ষমতাসম্পন্ন। গ্রহরাজের এক নাম আমরা দিয়েছি, 'বিবস্বান'। কে এই বিবস্বান, তুমি কি জানো?'

শাম্ব অতিশয় চমৎকার হয়ে বললেন, 'আমি সূত মুখে এক অতি পরাক্রান্ত গন্ধর্বরাজ বিবস্বানের নামে শুনেছি। তিনি ছিলেন এই ভারতবর্ষ ও ইলাবৃতবর্ষের মধ্যস্থল পর্বতের অন্তরীক্ষবাসী। তাঁর সন্তানগণের নাম বৈবস্বত মনু, যম, যমী, সাবর্নি মনু আর অশ্বিদ্বয়। আমি আরও শুনেছি, এই মহাবল গন্ধর্বরাজ চাক্ষুষ মন্বন্তরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইক্ষ্বাকু এই বিবস্বানেরই বংশধর ছিলেন। পরবর্তীকালে এই ইক্ষ্বাকু রাজের বংশধরেরা সূর্যবংশীয় নামে খ্যাত ছিলেন।'

ঋষিপুরুষ অতি প্রসন্ন ও বিস্মিত মুগ্ধ চোখে শাম্বর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি পরিচয় না দিলেও, আমি ঠিকই অনুমান করেছি,

তুমি কোনও খ্যাতনামা সদ্বংশজাত; নিতান্ত অর্বাচীন নও। তুমি যা শুনেছো, আর মনে রেখেছো, তা অতীব সত্য। সেই গন্ধর্বরাজ বিবস্বান এমনই পরাক্রান্ত মহাবলশালী তেজোদৃপ্ত ছিলেন যে, সেই কালের লোকেরা তাঁকে গ্রহরাজ সূর্যের সঙ্গে তুলনা করতেন। কালে এমনই হল, বিবস্বান বললে, সূর্যকে বোঝায়, আবার রাজাকেও বোঝায়। সেই কারণেই ইক্ষ্বাকুবংশকে সূর্যবংশ বলা হয়। কিন্তু আমরা গ্রহরাজকে বিবস্বান নামে অভিহিত করলাম। তাঁর বহু নামের মধ্যে এইটি একটি। গ্রহরাজের বর্তমান যে-মূর্তি কল্পিত হয়েছে, তা গন্ধর্বরাজ বিবস্বানের ন্যায় হওয়া বিচিত্র নয়। বিশ্বকর্মা সম্প্রদায়ের শিল্পীগণ অতিশয় পরিশ্রমী ও গুণী। তাঁরাই এই কল্পনাকে মূর্তির রূপদান করেছেন। তাঁরা বিবিধ যন্ত্রের ব্যবহার জানেন। তাঁদের চাক্ষুষ সৃষ্টি মানুষের মনে মায়ার সঞ্চার করতে সক্ষম।'

শাম্ব বিস্মিত ও উৎফুল্ল হয়ে বললেন, 'আমি আপনার কথার সমুদয় অর্থ হৃদয়ঙ্গম করেছি। এখন আমি জানতে ইচ্ছা করি, এখানে কে এই সূর্যক্ষেত্র সৃষ্টি করলেন, মন্দিরই বা কার সৃষ্টি? এই পরম রমণীয় কাননই বা কে সৃষ্টি করেছেন?'

ঋষি বললেন, 'আমি যাবতকাল এখানে এসে বাস করছি, তখন থেকেই এসব দেখছি। আমাদের বংশে চর্মরোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। আমি আমার পূর্বপুরুষগণের কাছে শুনেছি, এই স্থানকে গ্রহরাজের মূলস্থান বলা হয়। আরও শুনেছি, গ্রহরাজের এটি অস্তাচলমানস্থান। তিনি যখন এই ভূমণ্ডলের চক্রে অন্য পৃষ্ঠে আলোক দান করেন, তখন এখানে তাঁর শেষ কিরণের একটি গুণ কার্যকরী হয়।'

শাম্ব সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন, 'দয়া করে আমাকে বলুন, শেষ কিরণের সেই গুণ কী? অস্তাচলমানস্থানই কী? কাকেই বা মূলস্থান বলে?'

ঋষি বললেন, 'এই ক্ষেত্রকে মূলস্থান কল্পনা করা হয়েছে। অস্তাচলমানস্থান বলা হয়, কারণ, গ্রহরাজ যখন ত্রিগুণ সীমাতিক্রান্ত হোন তখন তিনি 'পুরুষ' রূপে অভিহিত হন। তাঁর সেই অস্তাচলাভাব বিবিধ চর্মরোগ, দেহের বিকৃতি বিনাশ করে। আমি অস্তাচলগামী গ্রহরাজের পূজা প্রতিদিন স্নানাদি শেষে করে থাকি।'

শাম্বর অন্তর আশার আলোয় উদ্ভাসিত হল। তিনি অধিকতর আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন; 'গ্রহরাজের কিরণের কি এরূপ আরও স্থান ও কাল বিভাগ আছে?'

ঋষি পুরুষ বললেন, 'আছে। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই তোমাকে বলছি। এই মহাদেশের পূর্বাঞ্চলে লবণদধি তীরে উদয়াচলে তিনি প্রথম আবির্ভূত হন। সেখানে তিনি পূর্বোত্তর কোণে উদিত হন, সেজন্য তাঁকে সেখানে কোণাদিত্য বলা হয়। এই আদ্যস্থানে তিনি পশ্চিম দক্ষিণে অস্তাচলে যান। ময়ুনার দক্ষিণ ভাগে দ্বারকার নিকটবর্তী স্থানে তিনি মধ্যাহ্ন অবস্থান করেন। তখন তিনি কালপ্রিয় নামে অভিহিত হন। মহাব্যাধি থেকে মুক্তির জন্য, এই তিন স্থানে, তিন কালে তাঁর প্রভা অঙ্গে ধারণ করা বিধেয়।'

শাম্ব মনে মনে সংকট অনুভব করে, ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এক উদয় থেকে অস্তকালের মধ্যে, এই সুদূরবর্তী তিন স্থানে তিন কালে কী করে মানুষের পক্ষে গমনাগমন সম্ভব?'

ঋষি শাম্বকে আশ্বস্ত করে হেসে বললেন, 'সম্ভব না। সম্বৎসরে এই তিনকালকে ভাগ করে তিন স্থানে তোমাকে অবস্থান করতে হবে। আমিও করেছি।'

শাম্ব প্রভাযুক্ত ঋষিকে প্রণাম করে বললেন, 'আপনাকে দর্শনমাত্রেই আমি অনুভব করেছিলাম, আপনি অশেষগুণসম্পন্ন উজ্জ্বল পুরুষ। আপনি জ্ঞানী, মুক্ত পুরুষ। আপনার সান্নিধ্য অতি আনন্দদায়ক। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন, যেন আমি এই ত্রিক্ষেত্রে গমন করতে পারি।'

ঋষি স্বস্তিবাক্য উচ্চারণ করে বললেন, 'তোমার বিশ্বাসই তোমাকে উত্তরণের পথে নিয়ে যাবে। তার আগে, তোমার আরও একটি বিশেষ পরিশ্রমসাধ্য কাজ করতে হবে।'

'মহাত্মন, আমি শ্রমবিমুখ নই। আপনি আমাকে আজ্ঞা করুন, প্রাণপণে আমি তা পালন করবো।'

'আজ্ঞার বিষয় কিছু না, তোমারই কল্পকর্মের কথা আমি বলছি। যে-দ্বাদশ নামে গ্রহরাজ অভিহিত হয়ে থাকেন, আমি সেই নাম সকল বলছি। আদিত্য, সবিত্র, সূর্য, মিহির, অর্ক, প্রভাকর, মার্তণ্ড, ভাস্কর, ভানু, চিত্রভানু, দিবাকর, রবি। এই দ্বাদশ নাম এবং দ্বাদশ রূপে তিনি দ্বাদশ মাসে স্বাদশ তীর্থ ও নদ নদীতে, অতি ক্রিয়াশীল থাকেন। দ্বাদশ মাসে, দ্বাদশ দিন সেই সব নদনদীতে স্নান ও রশ্মিযুক্ত হলে, ব্যাধির আরোগ্য ঘটে।'

শাম্ব বাগ্র কৌতূহলে জানতে চাইলেন, 'সেই দ্বাদশ তীর্থ ও নদ নদীর নাম আপনি দয়া করে বলুন।

ঋষি বললেন, 'এই চন্দ্রভাগা তার মধ্যে একটি। এছাড়া, তোমাকে যেতে হবে পুষ্কর, নৈমিষ্য, কুরুক্ষেত্র, পৃথুদক, গঙ্গা, সরস্বতী, সিন্ধু, নর্মদা, পয়িস্বনী, যমুনা, তাম্রা, ক্ষিপ্রা এবং বেত্রবতী। এই সমস্ত অঞ্চলই উত্তর অংশে, বিন্ধ্যপদে, দক্ষিণের উত্তরাঞ্চল সীমানায়। তুমি প্রত্যেক স্থানে একদিন অবস্থানে করলেও, আমার মনে হয় ছয় ঋতু অতিক্রম করবে। সাত ঋতুতে তুমি এখানে পৌঁচেছো। আরও ছয় ঋতু এইভাবে পরিভ্রমণ করা তোমার পক্ষে সম্ভব কী না তোমারই বিচার্য।'

শাম্ব অতি উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'মহাভাগে, আপনি আশীর্বাদ করুন, আমি নিশ্চয়ই পারবো। আপনি আমাকে আর কিছু নির্দেশ দেবেন?'

ঋষি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি শুনেছি, প্রতি মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে গ্রহরাজের প্রভা উজ্জ্বলতর হয়। এই দিনটি উপবাস করা বিধেয়।'

শাম্ব দ্বিধা ভরে জিজ্ঞেস করলেন, "মহাত্মন্, আপনি বলছেন, 'আমি শুনেছি', আপনি হৃষ্ট মনে আমাকে জবাব দিন, কোথায় কার কাছে শুনেছেন? আপনার পূর্বপুরুষদের নিকট?'

ঋষি হাস্য করে মাথা নাড়লেন, বললেন, 'না। তুমি দ্বাদশস্থান পরিভ্রমণ করে আসার পরে, আমি তোমাকে নতুন বৃত্তান্ত বলবো।'

শাম্ব করজোড়ে বললেন, 'আমার মহাভাগ্য। আমি আপনাকে আর একটি কথা বলবো। আমি গতকাল অতি সায়াহ্নে যখন এখানে এলাম, টিলার মৃত্তিকা গহ্বরে ও পাতার কুটিরে ব্যাধিগ্রস্ত হতাশ অবিশ্বাসীদের দেখে, আমার অন্তর বিষাদে পূর্ণ হয়েছে। আপনার উপদেশ ওরা গ্রহণ করেনি। আমি এক হতভাগ্য, ওরা যেন আরও অধিক হতভাগ্য। আমি ওদের জন্য এতই বিচলিত বোধ করছি, কেবলই মনে হচ্ছে, ওরাও কি দ্বাদশ স্থানে যেতে পারে না? আরোগ্য লাভ করতে পারে না? আমি কি ওদের সঙ্গে আহ্বান করতে পারি না?'

প্রভাযুক্ত ঋষি সহসা কোনও কথা বললেন না, অপলক নিবড়ি চোখে শাম্বর মুখের দিকে তাকালেন। শাম্বর চোখের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। শাম্বর ব্যাধিগ্রস্ত বিশাল শরীরের প্রতি লক্ষ করলেন। শাম্ব অন্যায় আশংকায় ক্ষমা প্রার্থনা করতে উদ্যত হলে, তিনি হাত তুলে

তাঁকে নিরস্ত করে বললেন, 'আমি তোমার কথায় বিরক্ত হওয়া দূরে থাক, অত্যন্ত বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছি। তুমি যে-ই হও, আমার বিশ্বাস, তোমার শাপমোচন ঘটলে, তার সঙ্গে কোনও মহৎ কর্মেরও সাধন হবে। অন্যথায় এ চিন্তা তোমার মনে উদিত হতো না। ওই সব কুটিরের অধিবাসীদের প্রতি আমি বিমুখ নই। তোমাকে আমি যা যা বলেছি, ওদেরও তা বলেছি। হতভাগ্য অবিশ্বাসীরা মানেনি। তুমি যদি ওদের তোমার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারো, এক বিশাল জনসংখ্যা আস্তে আস্তে রোগমুক্ত হতে পারে। তুমি যদি ওদের সম্মত করাতে পারো, তাহলেই সার্থক।' এই বলে ঋষি বৃক্ষমূল থেকে গাত্রোত্থান করে বললেন, 'তুমি কাছেপিঠে যদৃচ্ছা ঘুরে বেড়াও। স্থানীয় অধিবাসীরা আমাকে তণ্ডুল ফলমূলাদি দেয়। এক গোপরমণী দুধ ও দুগ্ধজাত ক্ষীর মিষ্টান্ন দেয়। আমি দিনান্তে একবার স্ব-পাকে রান্না করি। অস্তগামী আদিত্যের পূজা ও মন্ত্রোচ্চারণ, অন্নগ্রহণ করি। তুমিও আমার অন্নের ভাগ গ্রহণ করবে।'

শাম্ব আবার আভূমি নত হয়ে ঋষিকে প্রণাম করলেন। ঋষি তাঁর কুটিরে গমন করলেন। শাম্বও গাত্রোত্থান করলেন, কিন্তু বেশি দূরে কোথাও গেলেন না। চন্দ্রভাগা তীরে গিয়ে জলের সামনে বসে, ঋষির কথিত কর্তব্যকর্ম বিষয়ে ভাবতে লাগলেন। আর মনে মনে বললেন, 'হে বিশ্বের স্রষ্টা, নিয়ন্তা, তুমি আমাকে শক্তি দাও, শক্তি দাও।'

শাম্ব সূর্যাস্তের পরে, ঋষির পূজা শেষে তাঁর কাছ থেকে অন্ন গ্রহণ করে, রাত্রের মত বিদায় চাইলেন। ঋষি তাঁকে বললেন, 'তুমি এখন ওই টিলার গায়ে যাবে। সাবধানে থেকো। এই মিত্রবনের কোথাও তুমি একটি কুটির নির্মাণ করে থাকো এই আমার ইচ্ছা। তবে তার আগে তুমি দ্বাদশস্থানে ঘুরে এসো, এবং সেই অবিশ্বাসীদের যদি সম্মত করাতে পারো, তার চেষ্টা পাও।'

শাম্ব ঋষিকে প্রণামপূর্বক বিদায় নিয়ে, নদীতীরের সেই বিস্তৃত টিলা অঞ্চলে উপস্থিত হলেন। অন্ধকার নেমে এসেছে। অগ্নিকুণ্ডগুলো জ্বলছে, এবং সেই আলোয় দেখা গেল, পুরুষ-রমণীগণ বালক-বালিকাগণ ইতস্তত গুচ্ছ গুচ্ছ বসে আছে। দেখেই বোঝা যায়, তাদের রান্না খাওয়া সবে শেষ হয়েছে। তখনো কেউ কেউ খাচ্ছিল। শাম্বকে দেখে সবাই ব্যঙ্গবিদ্রূপপূর্ণ বাক্যে কলরব করে উঠলো। একজন চিৎকার করে বললো, 'নীলাক্ষি, গতকালের সেই লোকটা ভোর রাত্রেই কোথায় চম্পট দিয়েছিল, আবার এখন ফিরে এসেছে। নিশ্চয়ই ও আজ তোমার খাবার আবার ভাগ বসাতে এসেছ।'

'আজ হয়তো ও সারাদিন না খেয়ে বুঝেছে, নীলাক্ষির সঙ্গে থাকাই ভাল।' আর একজন বিদ্রূপ করে বললো।

একজন কাছে এসে বললো, 'তোমার সঙ্গে কি ওই ঋষি লোকটার দেখা হয়েছিল? নিশ্চয়ই অনেক জ্ঞান দিয়েছে?'

শাম্ব বললেন, 'উনি একজন প্রকৃত জ্ঞানী। তবে উনি আমাকে কিছু উপদেশ দিয়েছেন।'

শাম্ব আশেপাশে যারা ছিল, তার কথা শুনতে পেলো, সবাই হই হই করে উঠলো, 'হতেই হবে, হতেই হবে। ও ব্যাটা যাকে পায়, তাকেই গুচ্ছের উপদেশ দেয়। তোমরা শোনো, একেও সেই ঋষি লোকটা অনেক উপদেশ দিয়েছে।'

শাম্বর গম্ভীর অথচ দৃঢ়স্বরে বলে উঠলেন, 'থামো। তিনি একজন প্রকৃতই জ্ঞানী। তাঁর সম্পর্কে তোমরা সংযত বাক্য উচ্চারণ কর।'

শাম্বর গম্ভীর অথচ দৃঢ় স্বরে এমনই একটি প্রত্যয় ছিল, সকলেই কেমন সচকিত বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকালো। কয়েক মুহূর্ত কেউ কোনও কথা বললো না। কিছুক্ষণ পরে একজন বলে উঠলো, 'এ লোকটা রাজরাজড়া ঋষিদের মত কথা বলে। এও নিশ্চয়ই আমাদের কোনও জ্ঞান দেবে।'

'না, আমি তোমাদের কোনও জ্ঞান দেবো না।' শাম্বর স্বর যেন গম্ভীর শঙ্খের নিনাদে ধ্বনিত হল, 'আমি তোমাদের একটি মাত্র অনুরোধ করবো।'

সকলেই কিছুটা হতবাক বিস্ময়ে নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো। এই সময়ে নীলাক্ষি তার শিশুটিকে বুকে নিয়ে শাম্বর সামেন এসে দাঁড়ালো। তার ক্ষয়-ক্ষত স্ফীত ঠোঁটে বিস্ফারিত হাসি। শাম্ব শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'নীলাক্ষি, তোমার আজ ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ হয়েছে তো?'

নীলাক্ষি ঠোঁট কুঞ্চিত করে বললো, 'ওসব পূর্ণটূর্ণ জানি না। ঝুলি কোনওদিনই ভরে না, লোকে ঠ্যাঙা নিয়ে তাড়া করে আসে। কিন্তু তুমি কী যেন বলেছিলে?'

'ও আমাদের কী একটা অনুরোধ করবে।' কয়েকজন সমস্বরে বলে উঠলো, 'ওর ভাবগতিক মোটেই সুবিধের না। ও নিশ্চয়ই আমাদের জ্ঞান দেবার তালে আছে।'

শাম্ব দৃঢ় এবং কিছুটা তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন, 'না, আমি তোমাদের কোনও জ্ঞান দেবো না। তোমরা ভুলে যাচ্ছো, আমিও তোমাদের মতই মহাব্যাধিগ্রস্ত দুর্ভাগা অভিশপ্ত। তোমাদের সঙ্গে আমার কোনো প্রভেদ নেই। প্রভেদ শুধু একটাই–'

'যে তুমি ঋষি রাজরাজড়াদের মতন কথা বলো।' কয়েকজন বাধা দিয়ে বলে উঠলো।

শাম্ব সেই কয়েকজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'না। প্রভেদ এই, তোমরা বিশ্বাস হারিয়েছো, আমি এখনো বিশ্বাস হারাইনি।'

'কিসের বিশ্বাস? আমাদের আবার কিসের বিশ্বাস থাকতে পারে?' সমস্বরে রমণী পুরুষ বলে উঠলো।

শাম্ব কয়েক মুহূর্ত প্রায় সকলের মুখের দিকে যেন আলাদা আলাদা করে তাকালেন, বললেন, 'আরোগ্যলাভের বিশ্বাস।'

'তখনই বলেছিলাম লোকটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটা জ্ঞান দেবে!' কয়েকজন লাফালাফি করে বলে উঠলো, 'ও আমাদের বিশ্বাস করতে বলছে, আমরা ভাল হয়ে যাবো।'

সবাই নানা ইতর ভাষা উচ্চারণ করে, বিকৃত উচ্চস্বরে হাসতে লাগলো, আর ধিক্কারের ভঙ্গিতে বলতে লাগলো, 'মিথ্যা স্তোক, মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা।'...

শাম্ব শান্ত ভাবে অপেক্ষা করলেন। যখন ওরা কিঞ্চিৎ শান্ত হলো, তখন তিনি বললেন, 'একটু ধৈর্য ধরে শোন, আমরা সমগোত্রীয়, সকলেই সমান। সংসারের সব মানুষ আমাদের কারোকে আলাদা চোখে দেখে না। আমার জীবন যা সত্য, তোমাদের জীবনেও তা সত্য। তবে কেন তোমাদের আমি মিথ্যা কথা বলবো। তোমরা ব্যাধিগ্রস্ত হয়েও যদি সম্পদশালী হতে, তা হলে আমি তস্করের ন্যায় মিথ্যা কথা বলতে পারতাম, ছলনা করতে পারতাম। এক্ষেত্রে তারও কোনও সম্ভাবনা নেই।'

সকলের মধ্যে একটা দ্বিধাগ্রস্ত ভাব দেখা দিল। একজন বৃদ্ধা কাছ থেকে বললো, 'এটা ঠিক, আমাদের ঠকাবার কিছুই নেই। আর ও আমাদের মতনই একজন কুষ্ঠরোগী।'

'কিন্তু ও যে কী সব বিশ্বাস-ফিশ্বাসের কথা বলছে। ওসব তো মিথ্যা। ছলনা' একজন বলে উঠলো।

শাম্ব বললেন, 'কখনোই না। যার বিশ্বাস হারায়, তার সবই হারিয়ে যায়।'

'আমাদেরও সবই হারিয়ে গেছে।' কয়েকজন সমস্বরে বলে উঠলো, 'আমাদের আর কোনও কিছুতে বিশ্বাস নেই।'

শাম্ব বললেন, 'আমার সঙ্গে তোমাদের এই প্রভেদের কথাই বলছিলাম। আমি বিশ্বাস করি, আমার পাপই আমাকে বিনাশ করতে উদ্যত হয়েছে, আর একমাত্র মুক্তির উপায়, দুষ্কর প্রায়শ্চিত্ত। এই আমার বিশ্বাস।'

'কী সেই প্রায়শ্চিত্ত?' নীলাক্ষি জিজ্ঞেস করলো।

শাম্ব বললেন, 'আরোগ্যলাভের চেষ্টা। এসো, আমরা সবাই আরোগ্যলাভের চেষ্টা করি।'

সকলে সমস্বরে হই হই করে উঠতেই, নীলাক্ষি তীক্ষ্ণ স্বরে বাধা দিয়ে বলে উঠলো, 'চুপ করো। ও আমাদের মতই কুষ্ঠরোগী। ওর কথা আমাদের শোনা উচিত। ও কী বলে, আমরা শুনবো।'

শাম্ব চমৎকৃত বিস্ময়ে দেখলেন, নীলাক্ষির প্রতিবাদে এক অবিশ্বাস্য আশাতীত প্রতিক্রিয়া ঘটলো। নীলাক্ষির প্রতিবাদও যেন উপস্থিত সকলের কাছে আশাতীত বোধ হওয়ায়, তারা স্তম্ভিত স্তব্ধ হয়ে গেল। অনেকে নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো। নীলাক্ষি শাম্বকে বললো, 'এসো, তুমি বসো, আমরাও বসি। তুমি কী বলো, আমরা শুনি। তোমার কথা যদি আমাদের মনে লাগে, ভাল। নইলে তোমাকে আর তোমার কথা আমরা ছুঁড়ে ফেলে দেবো।'

শাম্বর মনে হল। এ যেন সেই গত রাত্রের কুষ্ঠরোগগ্রস্ত রমণী না, যে অতিপ্রার্থিনী হয়ে তাঁকে উত্তম যুক্তির দ্বারা রমণে প্ররোচিত করেছিল। উত্তম যুক্তি ছিল তার কথায়, কারণ এই ব্যাধি এবং দেহের বহিরাবরণ ও অভ্যন্তরের অনুভূতি আর মানসিকতা বিষয়ে ওর বক্তব্যে কোনও ত্রুটি ছিল না। কিন্তু এই রমণী যে এমন অঘটনঘটনপটিয়সী হতে পারে, তিনি অনুমানও করতে পারেননি। তার কথার মধ্যে এখনো তেজ ও যুক্তি লক্ষণীয়। শাম্ব এদের সম্পর্কে যতোটা হতাশ হয়েছিলেন, ততোটাই আশান্বিত হলেন। তিনি নীলাক্ষির সঙ্গেই একটি অগ্নিকুণ্ডের অদূরে বসলেন। দেখা গেল অনেকেই সামনে এসে বসলো। কেউ কেউ দাঁড়িয়ে রইলো। যেন বন্যহস্তীযূথ এখনো পুরোপুরি নতি স্বীকার করতে পারছে না, অথচ বিদ্রোহও করতে পারছে না, এইরকম তাদের অবস্থা। তার মধ্যেই তিনি শুনতে পেলেন, কেউ কেউ বলাবলি করছে, 'নীলাক্ষি যখন বলছে, তখন শোনাই যাক, কী বলো হে! আমাদের কেউ না হতে পারে, নীলাক্ষি তো আমাদের।'

শাম্ব দেখলেন, নীলাক্ষি এবং সকলেই তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। তিনি বললেন, 'আমার যা বলবার, তা তোমাদের বলেছি। তবু আমি আবার তোমাদের বলছি, আমাদের সামনে জীবনের আর কী অবশিষ্ট আছে?'

'মরা মরা। পচে গলে মরা।' কয়েকজন সমস্বরে বলে উঠলো।

শাম্ব দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, 'না। সুস্থ হয়ে বাঁচা। লয় ক্ষয় ও মৃত্যু অনিবার্য। স্বর্গলোকেও এই জীবনমৃত্যুর লীলা চলছে। যাঁরা মহৎ কর্মের দ্বারা দিবি আরোহণ করেছেন, তাঁরা নক্ষত্রলোকে বিরাজ করছেন। আমরা তাঁদের স্মৃতিচারণ করি, পূজা করি। কিন্তু মৃত্যু অনিবার্য জেনেও আমরা সুস্থ সবল ভাবে বাঁচতে চাই। আমাদের সামনে জীবনের এইটাই একমাত্র অবশিষ্ট আছে।' বলে তিনি নীলাক্ষির কোল থেকে তার শিশুটিকে নিয়ে তুলে ধরে দেখিয়ে বললেন, 'এই সুন্দর শিশুটি কী অপরাধ করেছে যে, সে তার পিতামাতার ব্যাধি নিয়ে অকালে মরে যাবে? ওর অপরাধ কি এই, এই পৃথিবীতে ও জন্মেছে? নিজেদের আর ওকে, ওর মত আমাদের এখানে আরও শিশুদের বাঁচিয়ে রাখার কোনও জবাব দায়িত্ব কি আমাদের নেই?'

সহসা কেউ কোনও জবাব দিল না, কিন্তু প্রতিবাদে চিৎকার করেও উঠলো না। শিশুটিও যেন বিশেষ কৌতুক ও আকর্ষণে শাম্বর দিকে তাকিয়ে রইলো, কেঁদে উঠলো না। শাম্ব আবার বললেন, 'ব্যাধি হলে আরোগ্যলাভের নানা উপায় আছে। আমাদের সেই উপায় অবলম্বন করতে হবে। এখনো আমাদের আশা আছে। মনে বিশ্বাস থাকলে আমরা আরোগ্যলাভ করতে পারবো। এই সব শিশু বালক বালিকারাও সুস্থ হবে। বড় হয়ে ওরা তোমাদের জয়গান করবে।'

নীলাক্ষি বললো, 'ভালো হওয়ার কী উপায়?' শাম্ব বললেন, 'হতাশ হয়ে, এক স্থানে পঙ্গুর মত বসে থাকা না।' বলে তিনি ঋষি কথিত দ্বাদশ স্থান ও নদনদীর কথা বললেন।

কয়েকজন চিৎকার করে উঠলো, 'এ সেই ঋষি লোকটার কথাই বলছে।'

'কিন্তু ও নিজে আমাদের মতই একজন কুষ্ঠরোগী।' নীলাক্ষি উচ্চস্বরে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'ও সুস্থ লোকের মতন আমাদের কেবল উপদেশ দিতে আসেনি। ও আমাদের সঙ্গে যাবে, ও আমাদের মতন একজন। আমি ওর সঙ্গে যাবো।'

তৎক্ষণাৎ কয়েকজন নীলাক্ষির কথার প্রতিধ্বনি করলো, 'হ্যাঁ, আমিও যাবো, আমিও যাবো। ও আমাদের মতনই একজন।'

একজন রুদ্ধ স্বরে শাম্বকে দেখিয়ে বলে উঠলো, 'ওকে আমার ছদ্মবেশী যক্ষ বলে মনে হচ্ছে। কুষ্ঠরোগী সেজে এসেছে, আমাদের ভুলিয়ে নিয়ে যাবে।'

আর একজন মাটিতে লুটিয়ে কেঁদে বললো, 'হা ঈশ্বর, আমি কি আবার সত্যি ভাল হয়ে যাবো? একি আশ্চর্য কথা শুনছি?'

শাম্ব নীলাক্ষির কোলে তার শিশুটিকে তুলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ভূলুণ্ঠিত ক্রন্দনমান লোকটিকে জড়িয়ে ধরে তুলে বললো, 'আশা রাখো, বিশ্বাস রাখো। আমার অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি, সংসার প্রকৃতই বিস্ময়কর, ঘটনাবলী সকল আশ্চর্যজনক।'

'তা নইলে কেন আমাদের এই মহারোগ হবে?' নীলাক্ষি বললো, এবং শাম্বর দিকে তাকিয়ে আবার বললো, 'আমার মনে আশা জাগছে। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের মনেও আশা জাগছে। তোমাকে আমরা বিশ্বাস করি।' অনেকে সমস্বরে বলে উঠলো।

শাম্বর চারপাশে অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারা এসে দাঁড়ালো। শাম্ব সকলের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। রমণীরা তাদের শিশুদের শাম্বর দিকে এগিয়ে দিল। শাম্ব শিশুদের কপালে মাথায় তাঁর অসাড় হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন। ফিরে তাকালেন নীলাক্ষির দিকে। নীলাক্ষি এগিয়ে এলো। শাম্ব তার শিশুটিকে স্পর্শ করলেন। তাদের এই আচরণ যেন তাঁর কাছে আত্মসমর্পণের সঙ্কেত। কিন্তু নীলাক্ষির বিষয়ে তাঁর মনে তখনো একটি দ্বিধা ও সন্দেহ ছিল। তিনি আশংকা করছিলেন, নীলাক্ষি হয়তো গত রাত্রের মতই, অভ্যস্ত বাসনায় রমণেচ্ছা প্রকাশ করবে।

নীলাক্ষি সেই মুহূর্তেই বলে উঠলো, 'কাল রাত্রে আমি তোমার ওপর অন্যায় রাগ করেছিলাম। তোমাকে এই কারণেই আমি আরও বিশ্বাস করি, তুমি আমাদের মতন হয়েও আমাদের থেকে তোমার

মনের জোর বেশি। তুমি যেন কাল রাত্রের কথা মনে রেখে আমার ওপর রাগ করো না।'

শাম্ব অন্তর মুহূর্তের জন্য দুর্বল হল। বহুদিন তিনি কোনও মরণীকে স্নেহ ও সোহাগ করেননি। এখন মনে হল, নীলাক্ষিকে তিনি সোহাগ ও আদর করবেন, তার বাসনা পূর্ণ করবেন। আবার ক্ষণ পরেই তিনি মনের দুর্বলতা দমন করলেন, বললেন, 'আমি কখনোই তোমার ওপর রাগ করিনি। বরং আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। আমি দেখছি, তোমার মধ্যেও শক্তি আছে।'

নীলাক্ষির ভগ্ন নাসা, পুচ্ছহীন রক্তাভ চোখ, ক্ষয়-ক্ষত ঠোঁট, স্ফীত মুখে সলজ্জ হাসি ফুটলো। বললো, 'না না, আমার কোনও শক্তি নেই। আমি তোমার কাছ থেকেই শক্তি পেয়েছি। এবার বলো আমরা কবে কখন যাত্রা করবো।'

শাম্ব বললেন, 'শুভ কাজে বিলম্ব করতে নেই। আমরা সকলেই কল্প গ্রহণ করে, আগামীকাল প্রত্যুষে চন্দ্রভাগায় স্নান করে যাত্রা করবো।'

কেউ কেউ তাদের সংগৃহীত অতি সামান্য বস্তুর জন্য আর্তস্বরে বলে উঠলো, সে-সব কেমন করে তারা ফেলে যাবে? শাম্ব বললেন, 'এখানে সব যেমন আছে, তেমনই থাকবে। আমরা কেবল আমাদের এই দেহগুলো নিয়ে যাত্রা করবো। আর নিতান্ত ব্যবহার্য বস্তু সকল বহন করবো।'

'আজো আমার কিছু বাড়তি খাবার আছে।' নীলাক্ষি শাম্বকে বললো, 'তোমাকে এনে দিই, খাও।'

শাম্বর হৃদয় এক অনাস্বাদিত ব্যথায় ও আনন্দে ভরে উঠলো। বললেন, 'নীলাক্ষি, তোমার হৃদয়ে অতুলনীয়। এখানে আসার আগে, তপোবনের ঋষিই আমাকে তাঁর স্বপাক অন্ন খেতে দিয়েছিলেন। তোমার বাড়তি খাবার তুমি কাল স্নানের পরে খেও।'

'কিন্তু তুমি আজও কি চারদিকে আগুনে জ্বালিয়ে সারা রাত জেগে বসে থাকবে?' নীলাক্ষি উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলো।

শাম্ব বললেন, 'না। আমি এখন তপোবনে যাবো। কাল প্রত্যুষে এসে তোমাদের জাগিয়ে তুলবো।'

এক বৃদ্ধা বললো, 'হ্যাঁ, তাই যাও। আমি শুনেছি ওই তপোবনে কোনও জন্তু জানোয়াররা হামলা করে না।'

শাম্ব রাত্রের জন্য সকলের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। তাঁর তপোবনে যাবার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, আগামীকাল প্রত্যুষেই সকলকে নিয়ে তাঁর যাত্রার কথা ঋষিকে জানানো। অবিশ্যি তিনি কুটির বন্ধ করে নিদ্রিত থাকলে তাঁকে জাগাবার কোনও প্রশ্নই নেই। তা হলে শাম্ব আজ রাত্রিটা মন্দির সংলগ্ন কাননে কোথাও কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু এই ঘটনায় তিনি এখনো বিস্ময় বোধ করছিলেন। তিনি একজন ক্ষত্রিয়। কোনও কার্য সমাধা করতে হলে অস্ত্র ও বাহুবলেই তিনি অধিকতর বিশ্বাসী। অথচ সমস্ত ঘটনাটি ঘটে গেল এক মানবিক আবেদনে। এ ক্ষেত্রে তিনি দেখলেন, নীলাক্ষিই তাঁর অস্ত্র স্বরূপ কাজ করলো।

শাম্ব মন্দিরের নিকটবর্তী হতেই, অন্ধকারে ঋষির কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন, 'তুমি বোধহয় আমার সন্ধানে যাচ্ছো?'

শাম্ব থমকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। এই রমণীয় কানন অন্ধকার হলেও সবই যেন আবছায়ার মত দেখা যাচ্ছে। ঋষির পিছনেই নদী ও নক্ষত্রখচিত আকাশ। শাম্ব তাঁকে স্পষ্ট দেখতে পেলেন। করজোড়ে তাঁকে নমস্কার জানিয়ে শাম্ব বললেন, 'মহাত্মন্, আপনিই যথার্থই অনুমান করেছেন।'

'অনুমান না বৎস, আমি দূরের অন্তরাল থেকে সবই দেখেছি ও শুনেছি।' ঋষি শাম্বর কথা শেষের আগেই বলে উঠলেন, 'তোমার অভিপ্রায় শুনে, আমার অত্যন্ত কৌতূহল ও আগ্রহ জন্মেছিল। প্রকৃতপক্ষে আমার মনে গভীর সন্দেহ ছিল। কিন্তু তুমি যে-ই হও, অশেষ তোমার ক্ষমতা। আমি আবার তোমাকে আশীর্বাদ করি, তুমি শাপমুক্ত হও, তোমার অনুগামীরা সকলে আরোগ্যলাভ করুক। এখন আর বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নেই। এই কারণ মধ্যে এক আশ্চর্য শাখাবিস্তৃত বৃক্ষ আছে। একজন মানুষ অনায়াসে নিশ্চিন্তে সেখানে শয়ন করতে পারে। কোনও হিংস্র শ্বাপদ তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। এসো, তোমাকে আমি সেই বৃক্ষ দেখিয়ে দিই। কাল প্রত্যুষে যাত্রাকালে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে।'

শাম্ব বুঝলেন, ঋষিপুরুষও শুভ কাজের মধ্যে আর কোনও আলাপাদি বা বিলম্ব করতে চান না। তিনি ঋষিকে অনুসরণ করলেন।

অন্ধকারে পাখির প্রথম ডাকেই শাম্বর নিদ্রাভঙ্গ হল। এ ডাক রাত্রিচর পাখির, প্রভাতের প্রত্যাশায় ব্যাকুল স্খলিত জিজ্ঞাসু পাখির স্বর। শাম্ব দেখলেন, পূর্বাকাশে ঈষৎ রক্তাভা জেগে উঠেছে। তিনি সেই খট্টিকার ন্যায় প্রশস্ত ও বিস্তৃত শাখাযুক্ত বৃক্ষ থেকে অবতরণ করে আগেই গেলেন সেই টিলা অঞ্চলে। তখনো সকলেই নিদ্রিত। শাম্ব যদি জানতেন নীলাক্ষি কোন্ কুটিরে বা মৃত্তিকা গহ্বরে বাস করে, তাহলে প্রথমে তাকেই ডাকতেন। তা জানা না থাকায় তিনি প্রতিটি কুটিরের সামনে, মৃত্তিকা গহ্বরের কাছে গিয়ে সবাইকে ডেকে তুললেন।

মুহূর্ত মধ্যেই সমস্ত অঞ্চলটি কোলাহলে পূর্ণ হল। সকলেই প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করে চন্দ্রভাগার জলে স্নান করে নিল। শাম্বও তাদের সঙ্গে স্নান করলেন। পুবের আকাশে ক্রমেই অতি উজ্জ্বল রক্তাভা ছড়িয়ে যেতে লাগলো। শাম্বর নির্দেশে সকলেই দ্রুত প্রস্তুত হল। ব্যবহার্য বস্ত্রাদি, খাবারের ও রন্ধনের পাত্রাদি বোঝায় বেঁধে নিল। শাম্বর মনে পড়ে গেল, শাম্ব এবং অন্যান্য বীরদের সঙ্গে যুদ্ধের কথা, কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামের চিত্র ভেসে উঠলো চোখের সামনে। আজও যেন তিনি যুদ্ধযাত্রা করছেন। এই যুদ্ধের রূপ আলাদা। তিনি আগেই স্থির করে রেখেছিলেন, চন্দ্রভাগার তীর ধরে উত্তরে গমন করবেন এবং সিন্ধু ও চন্দ্রভাগার সঙ্গমে উপস্থিত হবেন। সিন্ধুর উৎপত্তিস্থল হিমালয়। চন্দ্রভাগ যে-স্থানে শাখা নদী রূপে অবতরণ করেছে, সে-স্থানও হিমালয়ের ওপরে।

নদীর তীর ধরে যাবার সময়ে, সেই প্রভাযুক্ত ঋষি, গতকাল যেখানে ভোরে দাঁড়িয়েছিলেন, এখনো সেখানেই প্রতীক্ষা করছিলেন। এখনো গ্রহরাজ উদিত হননি। শাম্ব তাঁর সামনে গিয়ে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করলেন। তাঁর সঙ্গের দল কখনোই ঋষিকে কোনওরকম শ্রদ্ধা দেখায়নি। আজ তারা কপালে করজোড় স্পর্শ করে, নানা জনে নানারকম মন্তব্য করলো। কেউ বললো, 'তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হল হে ব্রাহ্মণ।'

কেউ বললো, 'আমরা ভাল হয়ে আবার এখানে আসবো।'

ঋষি দু হাত প্রসারিত করে সকলের শুভযাত্রা ও মঙ্গলকামনা করলেন।

শাম্ব যাত্রার আগেই গণনা করেছিলেন, শিশু থেকে বৃদ্ধ, নানা বয়সের নরনারী সর্বসাকুল্যে সত্তরজন ছিল। দ্বাদশ স্থানে ও নদনদীতে স্নান করে, দ্বাদশ মাস পরে তিনি যখন আবার চন্দ্রভাগাকূলে অস্তাচলমান

স্থানে ফিরে এলেন, তখন তাঁকে বাদ দিয়ে চৌদ্দজন মাত্র জীবিত। বাকি কিছুসংখ্যক লোক ব্যতিরেকে, সকলেই পথিমধ্যে প্রাণত্যাগ করেছে। কেউ কেউ ব্যাধির অতি প্রাবল্যে মারা গিয়েছে। সুদীর্ঘ পথ পরিভ্রমণ করাও সকলের সাধ্যায়ত্ত ছিল না। বিশেষতঃ অসুস্থ বালক-বালিকাগণ। কিছুসংখ্যক লোক নানা স্থানে থেকে গিয়েছে। কষ্ট স্বীকার করতে রাজী হয়নি। নীলাক্ষির শিশুটিও মারা গিয়েছে। কিন্তু অন্যান্য মায়েরা তাদের শিশুকে হারিয়ে যেমন শাম্বকে অভিসপ্তাত দিয়েছিল, নীলাক্ষি তা দেয়নি।

শাম্ব যে-চৌদ্দজনকে নিয়ে ফিরে এলেন, তাদের মধ্যে তিনজন রমণী, দুইটি বালক-বালিকা, বাকি সকলেই পুরুষ। তাদের সকলের বিকৃত দেহে একটি পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। শাম্ব যেমন অনুভব করেছেন, ক্ষীণতর হলেও তাঁর সম্পূর্ণ অসাড় দেহে, এই এক বৎসরের মধ্যে অনুভূতিবোধ ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হচ্ছে, বাকি চৌদ্দজনের অভিজ্ঞতাও তাঁর মতই। ভ্রূ বা মস্তকের কেশের ভঙ্গুরতা ও পতন বন্ধ হয়েছে। তাঁর মত, পুরুষদের সকলের গুম্ফ ও শ্মশ্রুও এখন অভগ্ন ও ঘন। দেহের ক্ষয় ও ক্ষতের বৃদ্ধিলাভ ঘটেনি। যদিও অনেক সঙ্গীকে হারাতে হয়েছে এবং সকলেই শোকার্ত, তথাপি সকলের মধ্যেই নবজীবন লাভের একটি উদ্দীপনা জেগেছে। অথচ সেই উদ্দীপনার মধ্যে কোনওরকম উচ্ছৃঙ্খল উচ্ছ্বাস নেই। আছে এক নতুন আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা, সকলের আচরণে এক প্রশান্ত গাম্ভীর্য লক্ষণীয়। শাম্বও অন্তরে এক গভীর আস্থা ও প্রশান্তি লাভ করেছেন। এই নবজন্মের সূচনায়, যেন একটি নতুন সংঘের স্থাপনা ঘটেছে।

রমণীদের মধ্যে এবং সকলের মধ্যেই নীলাক্ষিকে নেত্রীস্থানীয়া মনে হয়। সে হয়ে উঠেছে সর্বাপেক্ষা শ্রীময়ী, মন্দিরের অপ্সরাদের ন্যায় তার সর্বাঙ্গে যেন রূপ ও লাবণ্যের সঞ্চার হয়েছে, অথচ গ্রহরাজের প্রতি তদ্‌গত ভক্তিতে এক ধ্যানমগ্না পূজারিণী। তাকে দেখলে এখন আর বিশ্বাস করা যায় না, সে ছিল বিশ্বাসহীনা, প্রত্যহ যে-কোনও পুরুষের সহবাসে অভ্যস্ত কামতাড়িতা। সকলের মধ্যেই এই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে।

সর্বোপরি এক বিশিষ্ট ঘটনা এই, সিন্ধু ও চন্দ্রভাগা সঙ্গমের জলে, শাম্ব পেয়েছেন একটি দারুমূর্তি যাঁর সঙ্গে এই মিত্রবনের গ্রহরাজের মূর্তির আশ্চর্য সাযুজ্য বর্তমান। মাথায় শিরস্ত্রাণ, কপালের ওপর এসে পড়েছে যেন এক খণ্ড বস্ত্রের আবরণ, বিশাল চক্ষুদ্বয়, শিরস্ত্রাণের বাইরে বিন্যস্ত কেশপাশের অংশ, মনোহর গুম্ফ, কুঞ্চিত শ্মশ্রু রাজকীয় পোশাকের কোমরে অভিয়ঙ্গ বন্ধন এবং চরণদ্বয় পাদুকাবৃত। দারুমূর্তিটি মোটেই খুব ছোটখাটো না, একজন দীর্ঘদেহ ক্ষত্রিয়ের ন্যায় এবং নিতান্ত হালকাও না। বর্ষসমূহে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর ন্যায়, শাম্বর মনও সেই মূর্তি প্রাপ্তিতে, যেন এক গভীর সংকেতময় আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। জীবনের কিছুই নিরর্থক না। সকল প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির মধ্যে একটি অর্থপূর্ণ নির্দেশ বর্তমান।

শাম্ব মূর্তি প্রাপ্ত হয়ে, ব্যাকুলিত চিত্তে বক্ষে ধারণা করেছিলেন, আর কখনোই ত্যাগ করেননি। এই সমস্ত ঋতুগুলো এবং সমস্ত পথ-পরিক্রমায় দারুমূর্তিটি তিনি স্কন্ধে বহন করেছেন। এক সঙ্গে স্নান করেছেন, এই মিত্রবনের ঋষি-উক্ত তিনটি বিশেষণের দ্বারা প্রত্যহ পূজা করেছেন, সর্বদেবমান্য, সর্বভূতমান্য, সর্বশ্রুতিমান্য।

মিত্রবনের ঋষি শাম্বর সঙ্গীগণসহ প্রত্যাবর্তনে, যেন পরিবার ও স্বজনকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে শিশুর ন্যায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। প্রণামের জবাবে তিনি সকলকেই আলিঙ্গন করলেন, রমণীদের মস্তকে ও কপালে হাতের স্পর্শ দিয়ে স্বস্তিবচন উচ্চারণ করলেন। শাম্বর মূর্তিপ্রাপ্তিতেই তিনি সর্বাপেক্ষা বেশি চমৎকৃত, বিস্ময়ে উদ্বেলিত ও চঞ্চল হলেন। শাম্বকে বললেন, 'এই মিত্রবনেই, রমণীয় কানন মধ্যে তুমি এই মূর্তিকে প্রতিষ্ঠা করো। আমি দেখেই বুঝতে পারছি, এ মূর্তি কল্পবৃক্ষের দ্বারা তৈরি। এ নিশ্চয়ই কোনও নিপুণ বিশ্বকর্মার সৃষ্টি। কিন্তু তোমার দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল।'

শাম্ব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'দায়িত্ব!'

ঋষি তাঁকে এই প্রথম নিজের কুটিরের মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'বসো। তোমার সঙ্গে আমার একান্তে কিছু কথা আছে। তোমাকে এবার প্রস্তুত হতে হবে আর এক বিরাট পরিশ্রমসাধ্য কাজের জন্য।'

শাম্ব মৃত্তিকায় জোড়াসনে বসে বললেন, 'আজ্ঞা করুন।'

ঋষি বললেন, 'আজ্ঞা নয়, তোমার আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করতে হবে। হয় তো মহর্ষি নারদ উপস্থিত থাকলে তিনিই তোমাকে বলতে পারতেন।'

শাম্ব বললেন, 'আপনাকে মহর্ষির তুল্য অভিজ্ঞ মনে হয়। আপনিই আমার কর্তব্যের কথা বললেন।'

ঋষি মহর্ষির উদ্দেশ্যে কপালে জোড় হাত ঠেকিয়ে বললেন, 'আমার অভিজ্ঞতা জীবনের তাগিদে। মহর্ষি বিশ্বভ্রমণ করে জ্ঞানলাভ করেছেন। যাই হোক, তোমার নিশ্চয় মনে আছে, তুমি যখন আমার কাছে জানতে চেয়েছিলে, কেন গ্রহরাজ বিগ্রহের কোনও পূজা হয় না, তোমাকে বলেছিলাম, আমার সে-অধিকার নেই। এখন তোমাকে বলি, সে-অধিকার আছে শাকদ্বীপের ব্রাহ্মণদের। তোমাকে যেতে হবে সেই শাকদ্বীপে, সেখানকার ব্রাহ্মণদের তোমাকে ভারতবর্ষে নিয়ে আসতে হবে!'

শাম্ব অজ্ঞাতবশতঃ বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কখনো শাকদ্বীপের নাম শুনিনি। সে-স্থান কোথায়, গমনযোগ্য কী না, আপনিই বা সে-স্থানের কথা কেমন করে জানলেন আমাকে সবই ব্যক্ত করুন।'

ঋষি বললেন, 'সবই তোমাকে বলবো। তোমরা এই যে দ্বাদশস্থান পরিভ্রমণ করলে, স্নান করলে, উপবাসাদি করলে এ সবই প্রাকৃতিক চিকিৎসা রূপে গণ্য হবে। শাকদ্বীপের ব্রাহ্মণেরা কেবল সুর্যোপাসক নন, এই ব্যাধিকে দেহ থেকে আমুল ধ্বংসের চিকিৎসাবিধি একমাত্র তাঁরাই জানেন। সূর্যালোকের বিবিধ স্থান ও কাল, তাঁরাই নির্ণয় করেছেন, কারণ তাঁরা জানেন, গ্রহরাজই এই সব ব্যাধির নিরাময় করতে পারেন। তাঁরা উপাসনা ও বিবিধ কর্মের দ্বারা এই গুণ আয়ত্ত করেছেন। আমার মনে হয় কখনো কখনো তাঁরা কোনও পরাক্রান্ত রাজার দ্বারা ভারতবর্ষে আনীত হয়েছিলেন, কিন্তু যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায়, আবার নিজ স্থানে প্রত্যাবর্তন করেছেন। মিত্রবনের এই মন্দির দেখেই তা বোঝা যায়। কারণ একমাত্র শাকদ্বীপের ব্রাহ্মণরাই গ্রহরাজবিগ্রহের পূজার অধিকারী।'

শাম্ব অতি কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে বললেন, 'মহাত্মন্, এ সকল সংবাদই আমার কাছে নতুন। আমি সেই ক্ষমতাশালী ব্রাহ্মণদের দর্শনের জন্য বিশেষ ব্যাকুল হচ্ছি, কারণ তাঁরাই একমাত্র এই ব্যাধি দেহ থেকে আমূল ধ্বংসের চিকিৎসাবিধি জানেন। এখন বলুন, এঁদের কথা আপনি কেমন করে জানলেন, কোথায় এবং কোন পথেই বা শাকদ্বীপে গমন করা যায়। আমি তাঁদের আনয়নের যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।'

ঋষি বললেন, 'আমি বিশ্বাস করি, তোমার দ্বারাই তা সম্ভব।

শোন, আমি পূর্বপুরুষদের কাছে এই শাকদ্বীপের ব্রাহ্মণদের কথা শুনেছিলাম। সেখানে মগ ও ভোজক দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন, উভয় শ্রেণীই সূর্যোপাসক। শুনেছি ভোজক শ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদি সম্পর্কের ক্ষেত্রে, রক্তের সম্পর্ক মানামানি নেই। এই রীতি আমাদের দেশে সম্মানের চোখে দেখা হয় না, পরন্তু বিরাগ ও বিতৃষ্ণারই সৃষ্টি করতে পারে। তুমি সেখানে গেলেই সব চাক্ষুষ করতে পারবে। পথ নিঃসন্দেহে খুবই দুর্গম। এখান থেকে তোমাকে অন্তরীক্ষে গমন করতে হবে। অন্তরীক্ষ অতিক্রম করে দেবলোক ইলাবৃতবর্ষের নিকটবর্তী কোনও স্থানের নাম শাকদ্বীপ। সেখানে গমন করলে, অধিবাসীরা তোমাকে সম্যক শাকদ্বীপ চিনিয়ে দেবে। শাকদ্বীপ গমনের পূর্বে, তুমি গ্রহরাজ মূর্তিকে কানন মধ্যে স্থাপন করো। তথাপি একটি সমস্যা থেকে যাচ্ছে।'

'কী, বলুন। চেষ্টা করবো, যাতে সমস্যা দূর করা যায়।'

'বিশ্বকর্মা সম্প্রদায়কে এখানে আনয়ন করে তোমার কল্পবৃক্ষমূর্তির জন্য একটি মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। এখান থেকে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে সেই মহান শিল্পীরা বাস করেন। তাঁরা এখানে এসে কাজে হাত দিলে, তাঁদের ভরণপোষণের কী উপায়।'

শাম্ব কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন, 'মহাত্মন্, অর্থানুকূল্য ব্যতীত এইরূপ এক বিশাল কাজ সম্ভব না। আমি একজন ক্ষত্রিয়। ক্ষাত্র ধর্মানুযায়ী আমি শত্রুকে নিধন ও পরাজিত করে, তাদের ধনসম্পত্তি সকল লাভ করেছি। এই কাজে কি আমি সেই সকল ধনসম্পদ ব্যয় করতে পারি না?'

ঋষি বিস্মিত ও অত্যুৎসাহী হয়ে বললেন, 'তুমি এবং তোমার নিজের যা কিছু সংগ্রহ, সকলই তুমি এ বিশাল যজ্ঞকাণ্ডে ব্যয় করতে পারো।'

শাম্ব এখন ঋষির নিকটে নিজের পরিচয় দিলেন এবং পিতার অভিশাপের বিষয়ে বর্ণনা করলেন। বললেন, 'মহাত্মন্, জন্মসূত্রে আমি বাসুদেবপুত্র, যদুবংশের বৃষ্ণিশাখার বংশধর। ক্ষাত্রবীর্যের স্পর্ধা, প্রণয়শীলা রমণীগণের দ্বারা। পরিবেষ্টিত সুখী ও বিলাসের জীবন এখন আমার কাছে অতীত স্মৃতিমাত্র। তা আমাকে আকর্ষণ করে না, বিচলিত করে না। যে কল্পারম্ভের দ্বারা আমি কর্ম ও মোক্ষলাভের পথে চলেছি আমার গৌরব তা ছাড়া আর কিছু নেই।'

ঋষি শাম্বকে আঙ্গিন করে, চমৎকৃত হয়ে বললেন, 'সাধু সাধু!।'

শাম্ব ঋষিকে প্রণাম করে বললেন, 'আমি একন অশ্বচালনায় সমর্থ। এ অঞ্চল থেকে অশ্ব সংগ্রহ করে, আমি অবিলম্বে দ্বারকায় যাবো। ধনসম্পদ নিয়ে পশ্চিম দক্ষিণাঞ্চলের বিশ্বকর্মাগণকে আমার অভিপ্রায় নিবেদন করবো। এখানে ফিরে এসে, আমি কালমাত্র অপেক্ষা না করে, শাকদ্বীপে যাবো। নীলাক্ষি এবং অন্যান্য সকলে এখানে থাকবে, প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্ম ও অন্যান্য সকল কাজের প্রতি লক্ষ ও যত্ন করবে।'

ঋষি বললেন, 'মাত্র কয়েকদিন পরেই শুক্লা সপ্তমী তিথি। তুমি সেইদিন তোমার কল্পবৃক্ষমূর্তি কানন মধ্যে কোনও উৎকৃষ্ট স্থানে স্থাপন করে দ্বারকায় গমন করো। তোমার যাত্রা শুভ হোক।'

শাম্বর সঙ্গে ঋষির কথার পরে, এক নতুন কর্মযজ্ঞের সূচনা হল। শাম্ব তাঁর সঙ্গীদের সবাইকেই তাঁর পরিচয় দিলেন, ইচ্ছার কথা জানালেন। সকলের যা কিছু কাজ সবই বুঝিয়ে দিলেন, সপ্তমী তিথিতে উপবাস করে, চন্দ্রভাগাকূলের কানন মধ্যে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। পরদিবসেই সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, বেগবান অশ্বে আরোহণ করলেন। যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে, নীলাক্ষির মুগ্ধ ও বিস্মিত চোখের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিবিনিময় হলো। শাম্ব গম্ভীর হলেন, নীলাক্ষির সামনে গমন করলেন। বললেন, 'নীলাক্ষি, তোমার চোখে এই মুগ্ধতা কিসের?'

নীলাক্ষি বললো, 'মানুষের। তাকিয়ে দেখ, সকলেই তোমার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখছে।'

শাম্ব দেখলেন, নীলাক্ষি মিথ্যা বলেনি। তথাপি নীলাক্ষির চোখে মুখে যেন প্রকৃতি লক্ষণ অতি গাঢ়তর মনে হল। একি নিতান্ত তাঁরই ভ্রম? নীলাক্ষি আবার বললো, 'আমি তোমার শুভযাত্রা কামনা করছি। কাজ শেষ করে তুমি দ্রুত ফিরে এসো।'

শাম্ব নীলাক্ষির দিকে আবার তাকালেন। নীলাক্ষি হেসে বললো, 'আমাকে ভুল বোঝার কোনও কারণ কাজ নেই।'

শাম্বও হাসলেন, বললেন, 'আমরা সকলেই মানুষ, ভুল আমারও হতে পারে। কিন্তু আমাদের কল্প কর্ম শেষ হতে এখনো অনেক বিলম্ব আছে।'

নীলাক্ষি বললো, 'অনর্থক চিন্তা করো না। তোমার শুভযাত্রা ত্বরান্বিত কর।'

শাম্ব আশ্বস্ত হয়ে অশ্বচালনা করলেন। এক পক্ষকাল মধ্যে তিনি দ্বারকায় পৌঁছলেন। বাসুদেব পুত্র দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। জাম্ববতী শাম্বকে আলিঙ্গন করে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করলেন এবং মাতৃগণ সকলেই তাঁকে অশেষ সাধুবাদের দ্বারা স্নেহ ও সোহাগ জানালেন। শাম্বর নিজ গৃহে উৎসবের আয়োজন শুরু হয়ে গেল। কিন্তু শাম্ব একদিন মাত্র দ্বারকায় অবস্থান করবেন জেনে তাঁর অন্তঃপুরে যেন শোকের ছায়া নেমে এলো। সংবাদ পেয়ে বাসুদেবও বিস্মিত উদ্বেগে দেখা করতে এলেন।

শাম্ব পিতা, মাতৃগণ, লক্ষ্মণা ও অন্যান্য অন্তঃপুরিকা রমণীগণের সামনেই তাঁর আগমনের কারণ ও আসন্ন কর্মের কথা সব ব্যক্ত করলেন। তিনি সকলের সম্মতি ও শুভাকাঙ্ক্ষা প্রার্থনা করলেন। বাসুদেব ম্রিয়মান হলেন, কিন্তু শাম্বর কল্পের কথা শুনে, তাঁকে বাধা দিতে পারলেন না, বরং সম্মান করলেন। জাম্ববতীর অন্তর বিদীর্ণ হল, তথাপি তিনি স্বামীর কথানুযায়ী সম্মতি দিলেন।

লক্ষ্মণা অতি কাতর হয়ে দুই হাতে শাম্বকে আকর্ষণ করে, কান্নায় ভেঙে পড়ে বললেন, 'স্বামী, আমি কী নিয়ে এই দ্বারকায় থাকবো? কেন থাকবো? কতোকাল থাকবো?'

শাম্ব লক্ষ্মণাকে নানাবাক্যে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দিয়ে বললেন, 'কুরুকন্যা, শোন, আমার ব্রত এখনো শেষ হয়নি। আমাকে দেখেই তুমি বুঝতে পারছো, আমার এখনো মুক্তি ঘটেনি। নিতান্ত অর্থের প্রয়োজনেই আমি এখানে এসেছিলাম। আমার অতীত জীবন আর কখনোই ফিরে আসবে না। তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে যে-কোনও সময় পঞ্চনদীর দেশে, চন্দ্রভাগাতীরে মিত্রবনে এসো। সেখানেই তোমার যদি বাস করতে ইচ্ছা হয়, বাস করো। আরো শোন লক্ষ্মণা, জীবন কখনো এক স্থানে দাঁড়িয়ে থাকে না, তা সতত সঞ্চরমান, পরিবর্তনশীল। তুমি তপোবনে গেলে, রৈবতকের এই হর্ম্যতলের বিলাসকক্ষের জীবন পাবে না। তোমারর স্বামীকেও পূর্বের ন্যায় পাবে না। তোমাকে বলেছিলাম, অভিশাপ প্রশ্নের অতীত। এখন তুমি একমাত্র আমার অমোঘ নিয়তির সঙ্গেই মিলিত হতে পারো।'

শাম্ব দ্বারকায় এক রাত্রি বাস করলেন। যদুবংশের বিশিষ্ট পুরুষ জ্যেষ্ঠ ও ভ্রাতৃগণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। পরের দিন তিনি রথারোহণে তাঁর বিবিধ সুবর্ণ, মণিমুক্তা ইত্যাদি নিয়ে প্রত্যাবর্তন

করলেন। মিত্রবনের পথে যাত্রা করে তিনি বিশ্বকর্মা সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর যাবতীয় রত্নাদি ও রথ তাঁদের পারিশ্রমিক হিসাবে দান করে মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রার্থনা জানালেন। বিশ্বকর্মা সম্প্রদায় প্রীতির সঙ্গে মিত্রবনে গিয়ে মন্দির তৈরি করতে স্বীকৃত হলেন।

শাম্ব আর এক পক্ষকালের মধ্যে অশ্বারোহণে মিত্রবনে পৌঁছে, একটি সপ্তমীতিথি পর্যন্ত অবস্থান করলেন। অষ্টমী তিথিতে সকলের সম্মতি নিয়ে পদব্রজে শাকদ্বীপ যাত্রা করলেন। পঞ্চনদীর দেশের সমতলভূতি অতিক্রম করে, হিমালয়ের পাদদেশে পৌঁছতে তাঁর মাসাধিকাল কেটে গেল। শুরু হল অন্তরীক্ষের পথ। অতি দুর্গম গিরিশিখর ও বনভূমির মধ্য দিয়ে গমনের সময় শাম্ব তাঁর জীবনে এক অনন্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন। অন্তরীক্ষের পার্বত্যপথ অতি দুর্গম, কিন্তু শান্ত ও গম্ভীর। দৃশ্যাবলী অতি মনোমুগ্ধকর। ফলমূল এবং পার্বত্য ঝরনার জলই তাঁর খাদ্য ও পানীয়। তবে যতোই অন্তরীক্ষ নিকটবর্তী হতে লাগলো, সেখানকার অধিবাসী গন্ধর্বদের সাক্ষাৎ পেতে লাগলেন। গন্ধর্ব রমণী ও পুরুষেরা সকলেই অতি মনোহর রূপ। ধবল গিরিশৃঙ্গে প্রথম আদিত্য কিরণপাতে যে বর্ণ ধারণ করে এদের গাত্রবর্ণ সেইরকম। কেশ এবং চক্ষু নিবিড় কৃষ্ণ। অশ্বযুক্ত রথ, অশ্ব ছাড়াও কৃষ্ণবর্ণ বৃহৎ পার্বত্য ছাগ পৃষ্ঠে অনেকে গমনাগমন করে। প্রকৃত অন্তরীক্ষ পর্বত মধ্যস্থিত এক বিশাল উপত্যকাভূমি। সুদীর্ঘ হ্রদ ও একটি বেগবতী নদীতে গন্ধর্বরা নৌকারোহণেও চলাচল করে।

শাম্ব স্বভাবতই এই অপরিচিত জাতি সম্পর্কে শঙ্কিত ও চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর আশঙ্কার কোনও কারণ ছিল না। অন্তরীক্ষের অধিবাসীরা সকলেই তাঁর সঙ্গে ভাল আচরণ করেছে। তাঁর শারীরিক বিকৃতির জন্য কেউ ঘৃণা করেনি। খাদ্য ও আশ্রয় দিয়েছে। পথ দেখিয়ে দিয়েছে এবং সাবধান করে দিয়েছে, ইলাবৃতবর্ষের অধিবাসীদের সঙ্গে অসুরদের প্রায়ই যুদ্ধ চলছে। শাম্ব যেন সাবধানে গমন করেন।

শাম্ব এই বিচিত্র পার্বত্যদেশসমূহ ও তার অধিবাসীদের দেখে দুর্গম পথের ক্লান্তি অনেকখানি ভুলে থাকতে পেরেছেন। উত্তর পশ্চিমের নির্দিষ্ট পথে যেতে গিয়ে তিনি অসুর সৈন্যদের অনেকগুলো অবরোধ সৃষ্টিকারী **স্কন্দাবার** দেখতে পেয়েছেন। তাঁকে সর্বত্রই নিজের পরিচয়, গন্তব্য ও গন্তব্যস্থলে গমনের কারণসমূহের বিবরণ দিতে হয়েছে। অসুরদের সীমানা অতিক্রমের পরে শাকদ্বীপে গমনের আগে সুরসেনাদের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে। স্বর্গের প্রতিটি মানুষেরই তিনি পদধূলি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁদের ব্যবহার খুব ভাল ছিল না।

দশ ঋতু অতিক্রান্ত করে, শাম্ব শাকদ্বীপে পৌঁছুলেন। দেখলেন, সে স্থানের অধিবাসীদেরও উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দীর্ঘকান্তি। চোখের রঙ মিশ্রিত, কৃষ্ণ নীল এবং গোমেধ বর্ণ। অন্তরীক্ষের অধিবাসীদের তুলনায় স্বর্গলোকের দেবতাদিগের সঙ্গেই শাকদ্বীপের মানুষদের সাদৃশ্য বেশি। শাম্বকে সর্বাপেক্ষা বিস্মিত করলো শাকদ্বীপ মগ ব্রাহ্মণদের বেশবাস। পুরুষদের কাঁধ থেকে পায়ের কনুই পর্যন্ত পোশাকের কোমরে অভিয়ঙ্গের বন্ধন। পায়ে পাদুকা। মাথার ওপরে কপাল পর্যন্ত একখণ্ড বস্ত্রদ্বারা আবৃত। সকলেরই জটা ও শ্মশ্রু রয়েছে এবং প্রতিদান পুবঙ্ক ও বর্ম ধারণ করে থাকেন।

শাম্ব মগ সম্প্রদায়শ্রেষ্ঠ এক ব্রাহ্মণের পাদ্যার্ঘ গ্রহণ করে তাঁকে পরিচয় এবং আগমনের কারণ সকল ব্যক্ত করলেন। এবং করুণ ও বিনীতভাবে তাঁর প্রার্থনা জানালেন। তাঁর আচরণে মগশ্রেষ্ঠ প্রীত হলেন। বিভিন্ন পরিবারকে আহ্বান করে আলাপ করে আলাপ-আলোচনা করলেন। তাঁর আশঙ্কা প্রকাশ করলেন, সুদূর ভারতবর্ষে তাঁদের যথার্থরূপে প্রতিষ্ঠা করা হবে কী না? এবং কতোজনকে শাম্ব নিয়ে যেতে চান?

শাম্ব বললেন, 'আপনাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে, আপনাদের কেউ কখনো ভারতবর্ষে গমন করে থাকবেন। হয়তো আপনাদের প্রতিষ্ঠা ও যত্নের অব্যবস্থায় আপনারা বিরক্ত হয়েছেন। কিন্তু আমি এক কল্প করে আপনাদের আহ্বান করতে এসেছি। আপনাদের প্রতিষ্ঠা ও যত্নের কোনওরকম ত্রুটি হবে না। আমি আপনাদের গৃহ, গার্হস্থ্যজীবনধারণেরর সমস্ত ব্যবস্থাদি করবো। কর্ষণযোগ্য ভূমি ও গাভী দান করবো। আপনারা আঠারোজন ব্রাহ্মণ, আপনাদের পরিবারবর্গ নিয়ে চলুন। আমাদের বিশাল দেশে এই মহাব্যাধির অতি প্রাদুর্ভাব হয়েছে। আপনারাই একমাত্র এই মহাব্যাধির আমূল ধ্বংস করতে পারেন। আমার ব্যাকুল প্রার্থনা আপনারা রক্ষা করুন।

মগ ব্রাহ্মণগণ শাম্বর কথা বিবেচনা করলেন। শাম্ব বহু দূরদেশ থেকে অমানুষিক ক্লেশ সহ্য করে তাঁদের নিতে এসেছেন। শাম্বর ব্যবহার আচরণ কথাবার্তায় তাঁদের বিশ্বাস উৎপাদিত হল। পরিবারস্থ মহিলাগণ শাম্বর প্রতি প্রীতি হলেন। মগ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ অষ্টাদশ পরিবারকে শাম্বর সঙ্গে যেতে অনুমতি দিলেন, এবং তাঁদের গমনের প্রস্তুতিপর্বের মধ্যেই শাম্বর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে বললেন।

শাম্বর শাকদ্বীপে যেতে যতো বিলম্ব হয়েছিল, ফিরে এলেন তার থেকে দ্রুত। কারণ আঠারোটি পরিবার তাঁদের অশ্ব পার্বত্য গর্দভ ও বিরাটাকৃতি ছাগ, অর্ণবচালিত রথে ভারতবর্ষে এলেন। অস্তাচলমানস্থানের মিত্রবনে ফিরে শাম্ব দেখলেন, এক বিশাল রথের ন্যায় মন্দির অনেকখানি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। অগ্নিহোত্র গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন তাঁর জন্য বাকি ছিল। তিনি ফিরে আসায় সে-কাজ দ্রুত সম্পন্ন হল।

মিত্রবনের ঋষি ও সকলেরই শাম্বর প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। তাঁর রূপের আশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছে। তাঁর উজ্জ্বলবর্ণে চারিপার্শ্বের প্রকৃতি, নদী, নরনারী সকলই যেন প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। এই রূপই শাম্বর সেই প্রকৃত রূপ। তাঁর রূপদর্শনে সকলে মোহিত হয়ে তাঁকে স্পর্শ করার জন্য ব্যাকুল হল।

নীলাক্ষি শাম্বর পদধূলি নিয়ে বললো, 'প্রণাম হে বিবস্বান।'

শাম্ব চমকিত হয়ে বললেন, 'নীলাক্ষি, ওই নামে আমাকে কখনো সম্বোধন করো না। এক মহাপরাক্রান্ত রাজা ও গ্রহরাজ ছাড়া ওই নাম আর কারোর হতে পারে না।'

'কিন্তু তোমাকে দেখে আমার সেই রূপের কথাই মনে হচ্ছে।' নীলাক্ষি বললো।

শাম্ব বললেন, 'তুমি আমাকে শাম্ব নামে সম্বোধন করবে।'

নীলাক্ষি বললো, 'না, তোমাকে আমি এখন থেকে বৃষ্ণিরত্ন বলে ডাকবো।'

শাম্ব বললেন, 'সেই ভাল।'

কিন্তু শাম্বর কার্য সমাধার অবকাশ কম ছিল। মিত্রবনের ঋষির সঙ্গে আলোচনান্তে তিনি মগদের ছয়টি পরিবারকে মিত্রবনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। বাকি বারোটি পরিবার ও বিশ্বকর্মা বংশধরদের নিয়ে প্রথমে যাত্রা করলেন মথুরার সন্নিকটে যমুনার দক্ষিণ তীরে। সেখানে একটি অগ্নিহোত্র গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে ছয়টি মগ ব্রাহ্মণ পরিবারকে প্রতিষ্ঠা করলেন। বিশ্বকর্মা বংশধরদের, যাঁদের সঙ্গে এনেছিলেন, তাঁদের একাংশের কাছে প্রার্থনা করলেন, এই কালপ্রিয় স্থানে একটি

মন্দির আপনারা তৈরি করুন।'

এক মহাযজ্ঞ যখন শুরু হয় তখন সকলের হৃদয়ে ও মনে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসে। বিরোধ এবং আলস্য সেখানে কোনও বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। বিশ্বকর্মাগণ স্বীকৃত হলেন। অতঃপর শাম্ব, বাকি ছয়টি মগ ব্রাহ্মণ পরিবারকে নিয়ে উদয়াচলের ওড্রদেশে লবণদধির তীরে উপস্থিত হলেন। সেখানে প্রাচী নদীর একটি শাখা চন্দ্রভাগা নামে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হয়েছে। এখানে তিনি অবশিষ্ট ছয়টি মগ পরিবারকে প্রতিষ্ঠা করলেন। শেষ বিশ্বকর্মা বংশধরগণ যাঁরা ছিলেন, তাঁদেরও সেখানে একটি মন্দির তৈরি করতে অনুরোধ করলেন। তাঁরা সম্মত হলেন। শাম্ব এখানেও একটি অগ্নিহোত্র গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন।

এক বছর পরে তিনি যখন মিত্রবনে ফিরে এলেন তখন দেখলেন, সেখানে একটি ছোটখাটো নগরী সৃষ্টি হয়েছে। সকলেই তার নাম দিয়েছে শাম্বপুর। শাম্ব বিন্দুমাত্র উৎসাহিত হলেন না, কারণ তাঁর এরকম কোনও অভিপ্রায় ছিল না। বরং তিনি দেখে সুখী ও চমৎকৃত হলেন, মগ ব্রাহ্মণদের চিকিৎসায় সকলেই পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করেছে। সকলেই যেন দিব্যমূর্তি ধারণ করেছে। এবং কল্পবৃক্ষ মূর্তির নিত্য পূজাদি অদি সুচারুরূপে সম্পন্ন হচ্ছে।

মিত্রবনের ঋষির নির্দেশ মত শাম্ব প্রতি চার মাসে তিনস্থানে বৎসরান্তে ভ্রমণ করতে লাগলেন। মূলস্থান-মিত্রবন, কালপ্রিয়-কালনাথক্ষেত্র, উদয়াচলের সমুদ্রতীরে কোণবল্লভ ক্ষেত্র। এই সময় তাঁর সঙ্গে আদি চৌদ্দজন তিন স্থানেই গমনাগমন করলো।

দ্বাদশ বৎসর শেষে তিনটি মন্দির পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হল। নীলাঙ্গি উদয়াচলের মন্দিরে আজীবন বাস করার প্রার্থনা জানালো। শাম্ব বললেন, 'তুমি যেখানে থেকে গ্রহরাজকে সেবা করে সুখী থাকবে, সেখানেই থাকো।'

নীলাক্ষি বললো, 'আমি এই সমুদ্র ও চন্দ্রভাগা তীরের মধ্যবর্তী স্থলেই থাকতে চাই। বৃষ্ণিরত্ন, আমি আজীবন কোণাদিত্যের পূজা করবো, কিন্তু আমি নিতান্ত প্রস্তরের অপ্সরামূর্তি নই। আমি মানুষ, তুমি আমার মহামৈত্র। তোমার দর্শনের আশায় আমার প্রাণ ব্যাকুলিত হবে। বৎসরান্তে একবার দেখা দেবে তো?'

শাম্ব দেখলেন, নীলাক্ষির ঘনকৃষ্ণপক্ষযুক্ত নীলচক্ষুদ্বয় অশ্রুকণায় চিকচিক করছে। শাম্ব হৃদয়ে অনুভব করলেন, এক অনাসক্ত অথচ কাতর আবেগ। বললেন, 'নীলাক্ষি, মিত্রবনের প্রথম এবং দ্বিতীয় রাত্রের কথা আমি ভুলিনি। তুমিও আমার অতি শক্তিময়ী মমতাময়ী মৈত্র। তুমি বিনা আজ এ সার্থকতা সম্ভব ছিল না।'

নীলাক্ষি শাম্বর পদযুগল স্পর্শ করে বললো, 'শক্তির কথা বলো না, তুমিই আমার শক্তি। তবে আজ থেকে এই কোণাদিত্যক্ষেত্রের নাম হোক মৈত্রেয়বন।'

শাম্ব আনন্দিত হয়ে বললেন, 'নীলাক্ষি, অপরূপ তোমার কল্পনা, এর অধিক ভাল নাম আর এ স্থানের হয় না।'

নীলাক্ষি বললো, ' হে মৈত্রেয়, যে কারণে এ স্থানের নাম আজ থেকে মৈত্রেয়বন, সেই কারণ রক্ষা করো।'

শাম্ব নীলাক্ষির কপালে ডান হাত স্পর্শ করে বললেন, 'মৈত্রেয় কখনো মৈত্রেয়কে মিথ্যা বা দ্বিধাসূচক কথা বলে না।'

নীলাক্ষি অশ্রুপূর্ণ চোখে হাসলো। মৈত্রেয়বনে বাতাস শনশন নিস্বনে প্রবাহিত হচ্ছে। কোণাদিত্য যেন তাকেই স্নেহপূর্ণ লোচনে অবলোকন করছিলেন।

মহর্ষি নারদ এলেন মিত্রবনে। মন্দিরকে কেন্দ্র করে শাম্বপুর নগরী এখন ক্রমবর্ধমান। শাম্ব নারদকে অভ্যর্থনা করলেন, পূজা করে পাদ্যার্ঘ গ্রহণ করলেন। মহর্ষি বললেন, 'শাম্ব, তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি। তুমি কি আর কখনো দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করতে চাও না? সেখানে রাজকীয় সুখভোগ করতে চাও না?'

শাম্ব বললেন, 'মহর্ষি, আমার আর ঐশ্বর্যপূর্ণ দ্বারকায় রাজকীয় সুখভোগের কোনও বাসনা নেই। আমি এই মিত্রবনে, কালপ্রিয়ক্ষেত্রে ও মৈত্রেয়বনে এক অপরূপ আনন্দে অতিবাহিত করছি। মগ ব্রাহ্মণদের প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় হয়েছে, ব্যাধিগ্রস্তরা চিকিৎসিত হচ্ছে এবং তিন স্থানের তিনকালের আলোকে স্নান করছে। অভিশাপ কী, ব্যাধি কী, আমি তা জেনেছি, অতএব এখন যা দেখছি, এর তুল্য আনন্দ আমার আর কিছু নেই।'

মহর্ষি মুগ্ধবিস্ময়াপন্ন চোখে শাম্বর মুখের দিকে দেখলেন, বললেন, 'চলো, আমি তোমার প্রতিষ্ঠিত গ্রহরাজকে পূজা করবো।'

'চলুন। শাম্ব ব্যস্ত হয়ে পূজাদির নানা উপকরণ নিয়ে মহর্ষিকে অনুসরণ করলেন।

মহর্ষি চন্দ্রভাগার জল ও ফুলপত্রাদিসহ কৃতাঞ্জলিপুট হয়ে সেই কল্পবৃক্ষ মূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি গ্রহরাজকে সম্বোধন করে উচ্চারণ করলেন, 'হে সর্বদেবমান্য, সর্বভূতমান্য, সর্বশ্রুতিমান্য, হে শাম্বাদিত্য! আপনি সন্তুষ্ট হোন, আমার পূজা গ্রহণ করুন।'

শাম্বর সারা শরীর শিহরিত হল। শাম্বাদিত্য! এ কী নামে মহর্ষি গ্রহরাজকে সম্বোধন করলেন?

মহর্ষি শাম্বকে স্পর্শ করে বললেন, 'হ্যাঁ, আজ থেকে এই বিগ্রহের আর এক নাম শ্বাম্বাদিত্য। এই নামেই তিনি এখানে পূজিত হবেন।'

শাম্ব তাঁর অভিশাপের দিনেও অশ্রুমোচন করেননি। আজ এই মুহূর্তে তাঁর পক্ষে অশ্রুপাত রোধ করা কঠিন বোধ হল। তিনি দেখলেন মহর্ষির দুই চোখও অশ্রুপূর্ণ, মুখে অনির্বচনীয় হাসি। তিনি ধীরে ধীরে মন্দির থেকে বাইরে চলে গেলেন। •

কালকূট

কালকূট ও ভ্রমর প্রখ্যাত লেখক সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮)-র ছদ্মনাম। *অমৃত কুম্ভের সন্ধানে*, *কোথায় পাব তারে*সহ অনেক উপন্যাস তিনি কালকূট ছদ্মনামে লিখেছেন। তাঁর রচনায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, শ্রমজীবী মানুষের জীবন এবং যৌনতাসহ বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সুনিপুণ বর্ণনা ফুটে উঠেছে। তার শৈশব কাটে বিক্রমপুরে আর কৈশোর কলকাতার নৈহাটিতে। বিচিত্র সব অভিজ্ঞতায় তাঁর জীবন ছিল পরিপূর্ণ। বিচিত্র বিষয় এবং আঙ্গিকে নিত্য ও আমৃত্যু ক্রিয়াশীল এই লেখক জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছিলেন পেশাদার লেখক। ছদ্মনামে লেখা *শাম্ব* উপন্যাসের জন্য তিনি ১৯৮০ সালে আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন।

নিবন্ধ

দ্বারকা

সমুদ্রের গভীরে হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন নগরী

তৌফিকুর রহমান

বহুকাল আগের কথা। কোনও এক বনের কোনও এক গাছের নিচে ধ্যানরত অবস্থায় ছিলেন একজন। বিশাল এক নগরীর প্রতিষ্ঠাতা তিনি। হঠাৎ এক অসতর্ক শিকারীর তীরের আঘাতে নিহত হন তিনি। আর তার কিছুকাল পরেই সমুদ্রগর্ভে হারিয়ে যায় তার প্রতিষ্ঠিত সেই বিশাল নগরী। হারিয়ে যায় পৌরাণিক দ্বারকা নগরী।

বর্তমানের দ্বারকা ভারতের উত্তর-পশ্চিমের রাজ্য গুজরাটের একটি জেলা। এটি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের চারটি প্রধান ধর্মীয় স্থান বা ধামের একটি। দ্বারকা শব্দের 'দ্বার' অর্থ দরজা আর 'কা' অর্থ স্বর্গ কিংবা মোক্ষ। সে অর্থে দ্বারকা মানে 'স্বর্গের দ্বার' কিংবা মোক্ষলাভের উপায়। এছাড়াও দ্বারকা ভারতের সপ্তপুরী নামে পরিচিত সাতটি বিখ্যাত প্রাচীন শহরের একটি। এটি এখানে অবস্থিত ৮০০ বছর পুরনো ও ৫৭ মিটার উঁচু কৃষ্ণ মন্দিরের জন্য বেশ পরিচিত। তবে বর্তমানের এই দ্বারকা শহর মূলত হিন্দুধর্মের দেবতা শ্রীকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠিত সেই প্রাচীন নগরীর জন্যই বেশি প্রসিদ্ধ, যা একসময় ডুবে গিয়েছিল সমুদ্রের নিচে। অতীতে এটিকে শুধু পৌরাণিক গল্প হিসেবে মনে করা হলেও ২০০০ সালে এই স্থানে এক প্রত্নতত্ত্বীয় অভিযানে সমুদ্রের নিচে খোঁজ মেলে প্রাচীন এক নগরীর ধ্বংসাবশেষের, যা সেই প্রাচীন নগরী দ্বারকাকেই নির্দেশ করে। চলুন আজকে জেনে নিই সেই প্রাচীন দ্বারকা নগরীর ইতিহাস ও পরিণতি সম্পর্কে।

মথুরা ত্যাগের পর কৃষ্ণ নতুন এক শহর প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন বোধ করেন। এক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন কাহিনি প্রচলিত রয়েছে। প্রথমটির মতে কৃষ্ণ গরুড়ে (কৃষ্ণের বাহন) চড়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিমের সৌরাষ্ট্রে আসেন এবং সেখানে দ্বারকা নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতীয় কাহিনি অনুসারে নতুন এই শহর প্রতিষ্ঠার জন্য কৃষ্ণ নির্মাণের দেবতা 'বিশ্বকর্মা'র সাহায্য নেন। বিশ্বকর্মা কৃষ্ণকে জানান, যদি সমুদ্রদেব তাদের কিছু জমি প্রদান করেন শুধুমাত্র তবেই এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। কৃষ্ণ তখন সমুদ্রদেবের পূজা করেন এবং সমুদ্রদেব খুশি হয়ে কৃষ্ণকে ১২ যোজন (৭৭৩ বর্গ কিমি) জমি প্রদান করেন।

পৌরাণিক দ্বারকা নগরী

পৌরাণিক নগরী দ্বারকার কথা প্রাচীন ভারত ও হিন্দু ধর্মের অন্যতম প্রধান মহাকাব্য মহাভারতসহ ভগবদ্গীতা, স্কন্দপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। হিন্দু ধর্মের পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে দ্বারকা হল সেই প্রাচীন শহর যেখানে বিষ্ণুর অষ্টম অবতার কৃষ্ণ একসময় বাস করতেন। বিভিন্ন সূত্রানুসারে শ্রীকৃষ্ণ বর্তমান ভারতের দিল্লির দক্ষিণে অবস্থিত উত্তর প্রদেশের মথুরায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

কৃষ্ণের মামা কংস ছিলেন তৎকালীন মথুরার অত্যাচারী রাজা। পরবর্তীকালে কৃষ্ণ কংসকে হত্যা করেন। ফলে এ খবর শুনে কংসের শ্বশুর, মগধের রাজা জরাসন্ধ রেগে যান এবং এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মথুরা আক্রমণ করেন। কিন্তু ১৭বার মথুরা আক্রমণের পরও জরাসন্ধ মথুরা জয় করতে ব্যর্থ হন। তবে এই ১৭বার আক্রমণে মথুরার অধিবাসী যাদবরা দুর্বল হয়ে পড়ে। কৃষ্ণ যখন বুঝতে পারেন জরাসন্ধ আর একবার আক্রমণ করলে তারা আর তা প্রতিরোধ করতে পারবেন না, তখন তিনি তার লোকদের নিয়ে মথুরা ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন।

কৃষ্ণের দ্বারকা প্রতিষ্ঠা

মথুরা ত্যাগের পর কৃষ্ণ নতুন এক শহর প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন বোধ করেন। এক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন কাহিনি প্রচলিত রয়েছে। প্রথমটির মতে কৃষ্ণ গরুড়ে (কৃষ্ণের বাহন) চড়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিমের সৌরাষ্ট্রে আসেন এবং সেখানে দ্বারকা নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতীয় কাহিনি অনুসারে নতুন এই শহর প্রতিষ্ঠার জন্য কৃষ্ণ নির্মাণের দেবতা 'বিশ্বকর্মা'র সাহায্য নেন। বিশ্বকর্মা কৃষ্ণকে জানান, যদি সমুদ্রদেব তাদের কিছু জমি প্রদান করেন শুধুমাত্র তবেই এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। কৃষ্ণ তখন সমুদ্রদেবের পূজা করেন এবং সমুদ্রদেব খুশি হয়ে কৃষ্ণকে ১২ যোজন (৭৭৩ বর্গ কিমি) জমি প্রদান করেন। জমি পাওয়ার পর বিশ্বকর্মা সেখানে দ্বারকা নগরী নির্মাণ করেন।

দ্বারকা নগরীর নকশা ও বিবরণ

মহাভারত অনুযায়ী দ্বারকা ছিল শ্রীকৃষ্ণ তথা যদুবংশীয়দের রাজধানী। খুব ভালভাবে পরিকল্পনা করেই দ্বারকা নগরী নির্মাণ করা হয়েছিল। পুরো শহরটি মোট ৬টি ভাগে বিভক্ত ছিল। আবাসিক ও বাণিজ্যিক এলাকা, চওড়া রাস্তা, নগরচত্বর, সোনা, রূপা ও দামী পাথর দিয়ে নির্মিত বিশাল বিশাল প্রাসাদ, জনগণের সুযোগ সুবিধার জন্য নানা স্থাপনা সহ নানা উদ্যান ও হ্রদ ইত্যাদি নিয়ে গড়ে উঠেছিল দ্বারকা নগরী। প্রায় ৭ লক্ষ ছোটবড় প্রাসাদ ছিল এ নগরীতে। এখানে ছিল 'সুধর্ম সভা' নামের এক বিশাল হলঘর, যেখানে নানা ধরনের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হত। গোটা নগরীটি ছিল জলবেষ্টিত। এটি

ছিল মূলত একটি দ্বীপ-নগর। চারপাশে বেষ্টিত জলরাশি দ্বারকাকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করত। দ্বারকা নগরী ছিল দু'ভাগে বিভক্ত। একটি মূল দ্বারকা নগরী ও অন্যটি দ্বীপ-দ্বারকা, যা মূলত 'বেট-দ্বারকা' নামেই বেশি প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন সূত্রানুযায়ী এই দুই দ্বারকার মাঝে ছিল অগভীর সমুদ্র। মূল অংশের সঙ্গে দ্বীপ শহরটি নানা ব্রিজ ও বন্দর দ্বারা যুক্ত ছিল। জোয়ারের সময় মূল দ্বারকা থেকে দ্বীপ দ্বারকা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। আবার ভাটার সময় যুক্ত হয়ে যেত এ দুটি।

কৃষ্ণ তার বাকি জীবন এ দ্বারকা নগরীতেই অতিবাহিত করেছিলেন। শেষের দিকে তিনি ভাল্‌কা নামে এক বনে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দুর্ঘটনাবশত এক শিকারীর তীর বিদ্ধ হয়ে নিহত হন। কৃষ্ণের মৃত্যুর পর গোটা দ্বারকা নগরী এক বিশাল বন্যায় সমুদ্রের গভীরে হারিয়ে যায়। বলা হয়ে থাকে, কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠিত সেই দ্বারকা নগরী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর বহু শতাব্দী ধরে বহু সভ্যতার মানুষ সেই স্থানে তাদের শহর নির্মাণ করে এসেছে। বর্তমানে সেখানে যে দ্বারকা নগরী রয়েছে সেটি ঐ স্থানে এমনইভাবে নির্মিত সপ্তম শহর। দ্বারকার মূল মন্দিরটির বর্তমান নাম দ্বারকাধীশ মন্দির।

অনেকের মতে, এই পাঁচতলা মন্দিরটি ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত। বর্তমানে দ্বারকা ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় একটি দর্শনীয় স্থান। হিন্দু ধর্মাবলম্বীসহ পৃথিবীর বহু দেশ থেকে মানুষ এ স্থানে বেড়াতে আসেন। ২০১১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এখানে প্রায় ৩৮,৩৮৭ মানুষের বাস রয়েছে।

শুধুই কি গল্প?

দ্বারকা নগরী ও এর পরিণতি কারও কারও মতে শুধুই কাল্পনিক গল্প। তবে অনেকেই আছেন যারা খুব জোরালোভাবেই বিশ্বাস করেন যে, দ্বারকা নগরীর ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে। তবে আসলেই এ নগরী ছিল কিনা তা খুঁজতে বহু প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানী অভিযান চালানো হয় বর্তমানের দ্বারকা মন্দিরের সামনের সমুদ্রে। সমুদ্রের নিচের অভিযানে প্রত্নতত্ত্ববিদরা খুঁজে পেয়েছেন বহু প্রাচীন এক নগরীর ধ্বংসাবশেষ, যা আনুমানিক প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দীরও পূর্বের।

এই আবিষ্কারের পরিপ্রেক্ষিতে উপকূলজুড়ে গবেষকরা আরও কয়েকটি অনুসন্ধান চালান। এই অনুসন্ধানে দেখা যায়, বাস্তবেই বর্তমান দ্বারকা নগরীর সামনের সমুদ্রের নিচে প্রায় ৩৬ মিটার গভীরে রয়েছে প্রাচীন সেই নগরীর বিভিন্ন ধ্বংসাবশেষ। এর মধ্যে রয়েছে পাথর নির্মিত বিভিন্ন আকৃতির নোঙর, ভবন ও দুর্গ তৈরিতে ব্যবহৃত নানা পাথরের ব্লক। গবেষণায় দেখা গেছে, এসব ধ্বংসাবশেষের সবগুলোই প্রায় পঞ্চাদশ শতাব্দীর, যা মহাভারতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ নির্মিত সেই দ্বারকা নগরীর সঙ্গে মিলে যায়। এটি প্রমাণ করে তৎকালীন সময়ে দ্বারকা ভারতের অন্যতম ব্যস্ত একটি বন্দর নগরী ছিল। এই আবিষ্কারের ফলে পৌরাণিক দ্বারকা নগরীর অস্তিত্ব কিন্তু চাইলেই আর গল্প বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বাস্তবেই হয়তো কোনও এক সময় সমুদ্রের কিনারে এই নগরীটির অস্তিত্ব ছিল। হয়তো এটিই একসময় মানুষের কোলাহলে পরিপূর্ণ হয়ে থাকত, যা এখন হারিয়ে গিয়েছে নীল সমুদ্রের অতল গহ্বরে!

তৌফিকুর রহমান প্রাবন্ধিক

নিবন্ধ

মহাভারত

অনিন্দিতা বসু

পূর্বাভাস

হস্তিনাপুরের রাজা শান্তনু গঙ্গাদেবীকে বিবাহ করেন। তাঁদের অষ্টম সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠটি প্রাণে রক্ষা পায়। এর নাম রাখা হয় দেবব্রত। দিনে দিনে দেবব্রত যোগ্য যুবরাজ হয়ে উঠলেন। এ-সময় শান্তনু সত্যবতী নামে এক ধীবরকন্যার প্রেমে পড়লেন। সত্যবতীর পুত্র রাজা হবে এই শর্তে কেবল সত্যবতীর পিতা কন্যার বিবাহদানে সম্মত। দেবব্রতকে কিভাবে রাজ্য বঞ্চিত করবেন, এই ভেবে শান্তনু এ প্রস্তাবে রাজি হলেন না। দেবব্রত বিষয়টি জানতে পেরে ধীবর রাজপুরীতে উপস্থিত হয়ে জীবনে বিবাহ করবেন না, এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা করে সত্যবতীকে হস্তিনাপুরে নিয়ে এসে পিতার সঙ্গে বিবাহ দিলেন। আমৃত্যু কৌমার্য ধারণের এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্য তাঁর নাম হল ভীষ্ম। শান্তনু পুত্রের ওপর খুব খুশি হলেন এবং মৃত্যুক্ষণ নিজে নির্ধারণ করতে পারবে বলে পুত্রকে বরদান করলেন।

যথাকালে সত্যবতী ও শান্তনুর দুই পুত্র জন্মাল। শান্তনুর যথেষ্ট বয়স হয়েছিল– কিছুদিন পর তিনি দেহ রাখলেন। রাজপুত্ররা নাবালক, কাজেই সত্যবতীর সঙ্গে পরমর্শক্রমে ভীষ্ম রাজ্যপাট দেখাশুনো করতে লাগলেন।

ক্রমে পুত্ররা যৌবনে পদার্পণ করল। জ্যেষ্ঠভ্রাতা গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে প্রাণ হারালে কনিষ্ঠ বিচিত্রবীর্য সিংহাসনে বসলেন। বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে বিবাহের উদ্দেশ্যে ভীষ্ম প্রতিবেশী রাজ্য থেকে তিন রাজকন্যাকে অপহরণ করে হস্তিনাপুরে নিয়ে এলেন। জ্যেষ্ঠ কন্যাটি অন্যকে ভালবাসেন জানালে তাঁকে দয়িতের কাছে ফিরে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়। পরবর্তী দুই কন্যার সঙ্গে বিচিত্রবীর্যের পরিণয় সম্পন্ন হল। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, কিছুদিন পরে নিঃসন্তান অবস্থায় বিচিত্রবীর্য মৃত্যুবরণ করলেন।

ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর

পারিবারিক ক্রম বজায় রাখতে সিংহাসনের উত্তরাধিকার রক্ষার জন্যে সত্যবতী রাজবধুদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন বাসনায় তাঁর পুত্র ব্যাসকে ডেকে পাঠালেন। শান্তনুর সঙ্গে বিবাহের আগে কুমারী সত্যবতীর সঙ্গে মহাঋষি পরাশরের মিলনে ব্যাসের জন্ম। তখনকার দিনে কুমারীমাতার সন্তান বিবাহ-পরবর্তী স্বামীর সৎসন্তান হিসেবে গৃহীত হত। সেভাবে ব্যাস শান্তনুর পুত্র। কুরুবংশ রক্ষার এবং হস্তিনাপুর সিংহাসনের উত্তরাধিকার ধারাক্রম বজায় রাখতে নিয়োগ প্রথায় ব্যাস দুই রানীর গর্ভে দু'টি পুত্র উৎপাদন করলেন। বড়রানীর গর্ভে জন্মালেন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র আর ছোট রানীর গর্ভে জন্মালেন স্বাস্থ্যবান কিন্তু অতিশয় পাণ্ডুবর্ণ এক পুত্র, তার নাম রাখা হল পাণ্ডু। সত্যবতীর আদেশে রানীমাতাদের দাসীর সঙ্গে ব্যাসদেবের মিলনে এক দিব্যসন্তান জন্মগ্রহণ করল। তার নাম বিদুর। ভীষ্ম তিনটি বালককেই পরম যত্নে লালন-পালন করতে লাগলেন। উত্তরকালে ধৃতরাষ্ট্র দেশের সব রাজপুত্রদের মধ্যে বলশালী বলে পরিগণিত হলেন; পাণ্ডু হয়ে উঠলেন যুদ্ধ ও ধনুর্বিদ্যায় অত্যন্ত কৃতবিদ্য আর বিদুর সমস্ত বিদ্যা, রাজনীতি ও রাষ্ট্রপরিচালানার পাঠ নিলেন।

রাজপুত্ররা বড় হয়ে উঠলে হস্তিনাপুরের শূন্য সিংহাসন পূর্ণ করার সময় এসে গেল। জন্মান্ধ বলে জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রের বদলে কনিষ্ঠ পাণ্ডু রাজা হলেন। ভীষ্ম গান্ধার রাজকন্যা গান্ধারীর সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের এবং কুন্তী ও মাদ্রীর সঙ্গে পাণ্ডুর বিবাহ দিলেন। পাণ্ডু আশেপাশের অনেক রাজ্য জয় করে কুরুরাজ্যের পরিধি বহুগুণে বর্ধিত করলেন এবং প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী হলেন। ক্রমে কুরুরাজ্য সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠল। এ-সময় রাজ্যপরিচালনার দায়িত্ব জ্যেষ্ঠভ্রাতার ওপর অর্পণ করে পাণ্ডু তাঁর দুই পত্নীকে নিয়ে বানপ্রস্থে গেলেন।

কৌরব ও পাণ্ডবেরা

কয়েকবছর পর কুন্তী পাঁচটি অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক এবং পাণ্ডু ও মাদ্রীর মরদেহ নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন। পাঁচটি বালক পাণ্ডুর পুত্র– এরা কুন্তী ও মাদ্রীর গর্ভে নিয়োগপ্রথায় জন্মগ্রহণ করেছেন। জ্যেষ্ঠ যুধিষ্টির জন্মেছেন ধর্মের ঔরসে; দ্বিতীয় ভীম জন্মেছেন বায়ুর ঔরসে এবং তৃতীয় অর্জুন জন্মেছেন ইন্দ্রের ঔরসে– এঁদের মাতা কুন্তী। কনিষ্ঠ দু'টি জমজ– নকুল ও সহদেব– এঁরা জন্মেছেন অশ্বিনীভ্রাতৃদ্বয়ের ঔরসে মাদ্রীর গর্ভে। এদিকে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর শতপুত্র ও এক কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। কুরুবৃদ্ধরা পাণ্ডু ও মাদ্রীর পারলৌকিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করলেন এবং ও তাঁর সন্তানদের রাজপুরীতে স্বাগত জানালেন।

একশো পাঁচজন রাজপুত্র প্রথমে কৃপ ও পরে দ্রোণর কাছে বিদ্যা ও অস্ত্রশিক্ষায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন। হস্তিনাপুরে দ্রোণর পাঠশালে অন্য কয়েকটি বালকও বিভিন্ন বিদ্যা শিক্ষার জন্য আসত। এদের একজন সূতপুত্র কর্ণ। এই বিদ্যার্জনকালেই ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর পুত্রদের মধ্যে বৈরিতা দানা বেঁধে উঠল।

জ্যেষ্ঠকৌরব দুর্যোধন দ্বিতীয়পাণ্ডব ভীমকে বিষপ্রয়োগে হত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তৃতীয়পাণ্ডব অর্জুনের সঙ্গে ধনুর্বিদ্যায় কলহের সুবাদে কর্ণ দুর্যোধনের শিবিরে গিয়ে ভিড়লেন। যথাসময়ে শিক্ষা সমাপ্ত হলে কুরুপ্রবীণেরা তাদের বিদ্যাবত্তা প্রদর্শনের আয়োজন করলেন। প্রদর্শনীর দিন জনসাধারণ রাজপরিবারের দুইপক্ষের মধ্যে বৈরিতার ব্যাপারটা জানতে পারল: দুর্যোধন ও ভীমের গদাযুদ্ধ কদর্য আকার ধারণ করল; অনাহুত কর্ণ অর্জুনকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানিয়ে রাজবংশজাত নয় বলে অপমানিত হলেন, সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোধন তাকে একটি রাজ্যদান করে রাজপদে বৃত করলেন। এ-সময় ধৃতরাষ্ট্রের সিংহাসন অধিকার করে রাখা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে লাগল। পাণ্ডু তাঁকে বিশ্বাস করে সিংহাসনের দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন। শান্তি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠপাণ্ডব যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার ঘোষণা দিলেন। তিনিই দৃশ্যত সিংহাসনের উত্তরাধিকারী।

প্রথম নির্বাসন

যুধিষ্ঠির যুবরাজ হওয়ায় এবং প্রজাদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা বেড়ে যাওয়ায় দুর্যোধন অতিশয় অসূয়াপরবশ হয়ে পড়লেন। তার পিতা কার্যত রাজা, সুতরাং যুবরাজ হওয়ার অধিকার তারই। তিনি পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে হীন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলেন। তিনি কুন্তী ও তার পুত্রদের শিব-চতুর্দশীর মেলায় পার্শ্ববর্তী একটি শহরে পাঠাবার জন্যে পিতাকে মন্ত্রণা দিলেন। সেখানে তাদের থাকার জন্য একটি প্রসাদের ব্যবস্থা করা হল। পিতৃব্য বিদুরের মাধ্যমে আগেভাগেই ষড়যন্ত্রের আঁচ পেয়ে পাণ্ডবেরা ঐ প্রসাদের তলদেশে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে নিরাপদে পলায়নের ব্যবস্থা করে রাখে। একদিন পাণ্ডবেরা শহরের লোকদের জন্যে এক বিরাট নৈশভোজের আয়োজন করে। ঐ ভোজে এক বনবাসী নারী ও তার পাঁচপুত্রকে দেখা গেল অঢেল পান-ভোজন করে ঠিকমত দাঁড়াতে পারছে না, ভোজসভা ত্যাগ করা তো দূরের কথা! তারা ঐ কক্ষেই অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল। পাণ্ডবেরা সেইদিন প্রাসাদে আগুন লাগিয়ে দিয়ে নিরাপদে সুড়ঙ্গপথে পলায়ন করে। আগুন নিভলে সবাই সেই নারী ও তার পুত্রদের পোড়া হাড়গোড় দেখে ভাবল কুন্তী ও তাঁর পুত্ররা অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেছেন। দুর্যোধন ভাবলেন তার ষড়যন্ত্র সফল হয়েছে– এখন তার পৃথিবী পাণ্ডবমুক্ত।

অর্জুন ও দ্রৌপদী

এদিকে, কুন্তী ও পাণ্ডবেরা দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে বনে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তারা সারাদিন ভিক্ষা করে সন্ধ্যায় যা কিছু পান মাকে এনে দেন। কুন্তী সেই ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য রান্না করে দুইভাগ করে একভাগ ভীমকে, অপরভাগ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে ক্ষুণ্নিবৃত্তি নিবারণ করেন। এরকম একদিন এক গ্রামে ভীম দুই রাক্ষস-সহদরকে হত্যা করে এবং তাদের বোন হিড়িম্বাকে বিবাহ করেন। তাদের ঘটোৎকচ নামে এক রাক্ষসপুত্রের জন্ম হয়। সেই সময় তারা একদিন পাঞ্চালরাজকন্যার স্বয়ংবর সভার খবর শুনে পাঞ্চাল দেশে গিয়ে হাজির হলেন। এ স্বয়ংবরকে ঘিরে পাঞ্চালে রীতিমত উৎসব রেগে গেছে। সেখানে গিয়ে তারা যথারীতি মাকে তাদের কুটিরে রেখে ভিক্ষায় বের হলেন। তারা সয়ংবরসভায় পৌছলে রাজা তাদের প্রচুর ভিক্ষাদ্রব্য দিলেন। গোটা ব্যাপারটা দেখার জন্য পাঁচভাই সভাকক্ষে এসে একপাশে বসে রইলেন। রূপে-গুণে অসামান্যা

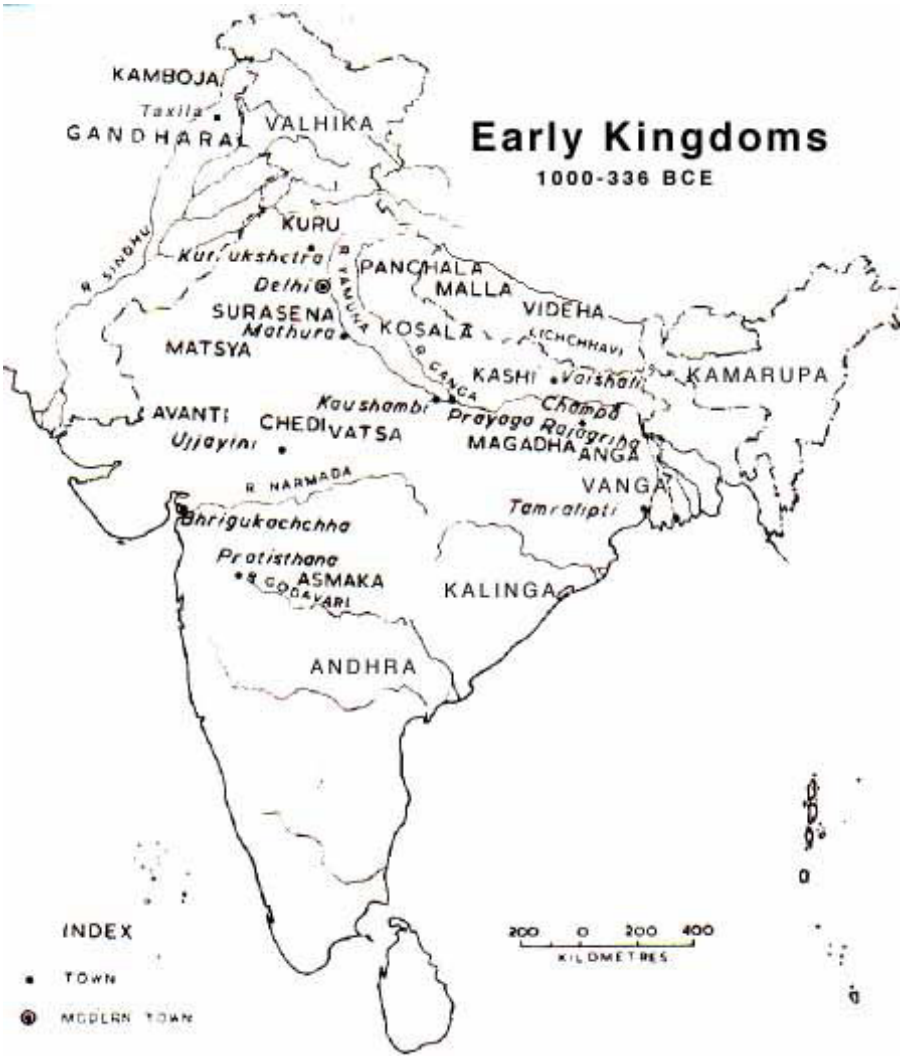

অগ্নিজাতা দ্রৌপদী সভা আলো করে বসে আছেন, নানা দিকের নানা রাজ্য থেকে রাজপুত্ররা এসেছেন তার বরমাল্য পাবার আশায়। স্বয়ংবরের শর্তটি বেশ জটিল: মাটিতে একটি লম্বা দণ্ড ঘূর্ণায়মান। তার ওপর একটি মাছ আটকানো। দণ্ডটির নিচে একটা জলপাত্র রাখা। রাজকুমারদের সেই জল-দর্পণে তাকিয়ে ধনুকে তীরযোজনা করে সেই মাছের চোখে বেঁধাতে হবে। একজন পাণিপ্রার্থী পাঁচবার লক্ষ্যভেদের সুযোগ পাবেন। এটা নিশ্চিত যে, একমাত্র সুদক্ষ তীরন্দাজ অর্জুন এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারতেন, কিন্তু তিনি তো বারণাবতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেছেন!

একের পর এক রাজা ও রাজপুত্ররা আসছেন, মাছের দিকে তীর নিক্ষেপ করছেন, আর ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন। অনেকে ধনুকে তীরযোজনা করতেই পারছেন না। কৌরবদের সঙ্গে কর্ণও এসেছেন স্বয়ংবরসভায়। কর্ণ ধনুক তুলে নিয়ে টংকার দিলেন, তারপর তীরযোজনা করে লক্ষ্যস্থির করার আগেই দ্রৌপদী সূতপুত্র বলে তাকে বরমাল্যদানে অস্বীকৃতি জানালেন। প্রত্যেক রাজন্য যখন ব্যর্থ, তৃতীয়পাণ্ডব অর্জুন এগিয়ে এগিয়ে গেলেন ঘূর্ণায়মান দণ্ডের দিকে, ধনুক তুলে নিয়ে টংকার দিলেন, তারপর একে একে পাঁচটি তীরই যোজনা করলেন ধনুকে। জলদর্পণে তাকিয়ে মাছের চোখে লক্ষ্যস্থির করে একত্রে ছুঁড়লেন পাঁচটি তীর। অব্যর্থ নিশানা। অর্জুন দ্রৌপদীর বরমাল্য লাভ করলেন।

ব্রাহ্মণ-ছদ্মবেশী পাণ্ডবেরা পাঁচভাই দ্রৌপদীকে নিয়ে তাদের পর্ণকুটিরে ফিরে কুন্তীকে বললেন, 'মা মা, দেখ আজ আমরা কী নিয়ে এসেছি।' কুন্তী বললেন, 'যা এনেছ, নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নাও।' তারপর বাইরে বেরিয়ে তার চোখ তো ছানাবড়া! আজকের ভিক্ষাবস্তু যে এক পরমা সুন্দরী কন্যা। তিনি চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইলেন। সকলের সামনে যে কুন্তী এমন কথা বলে ফেলেছেন!

এদিকে সাধারণ এক হতদরিদ্রের হাতে বোনকে তুলে দিয়ে দ্রৌপদীর জমজভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্ন যারপরনাই মনক্ষুণ্ন। তিনি পাণ্ডবদের অনুসরণ করে কুন্তীর কুটিরে এসে উপস্থিত। পাণ্ডবদের অনুসরণ করে যদুবংশের রাজকুমার কৃষ্ণও তার ভ্রাতা বলরামকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত। এই অজ্ঞাতপরিচয় অসামান্য তীরন্দাজ অর্জুন না হয়ে যান না, এমন ভেবেছিলেন কৃষ্ণ, যদিও কয়েকমাস আগে পাণ্ডবদের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর রটেছিল। এই দুই রাজকুমার পাণ্ডবদের আত্মীয়, কুন্তী তাদেও পিসীমা, যদিও তাদের সঙ্গে ইতোপূর্বে কখনও দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। ঘটনাচক্রে ব্যাসও তখন সেখানে এসে হাজির। পাণ্ডবদের পর্ণকুটিরে যেন চাঁদের হাট বসেছে। এই অভাবিত মিলনে সকলের চোখে আনন্দাশ্রু দেখা দিল। কুন্তীর কথা রক্ষায় দ্রৌপদী পাণ্ডবদের অভিন্ন পত্নী হলেন। ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্ন ও পিতা দ্রুপদ এই অপ্রচল ব্যবস্থা মেনে নিলেন, কিন্তু সব কথাবার্তাই তারা ব্যাস ও যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বললেন।

অনিন্দিতা বসু প্রাবন্ধিক

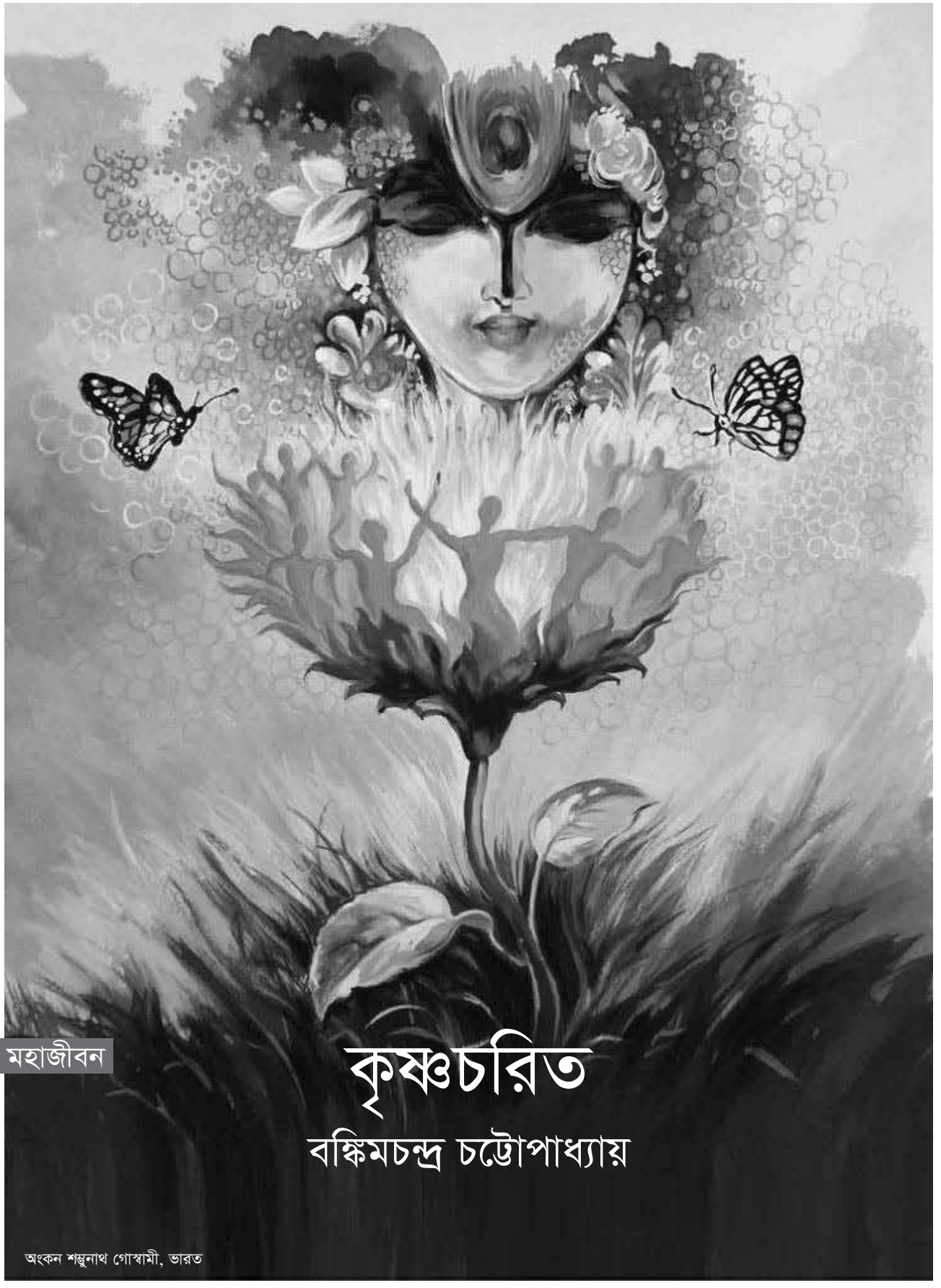

মহাজীবন

কৃষ্ণচরিত

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অংকন শম্ভুনাথ গোস্বামী, ভারত

ভূমিকা

পণ্ডিতেরা নানা তথ্য, যুক্তি-তর্ক ও তত্ত্ব-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের যে কাল নির্ণয় করেছেন, তা মোটামুটি ১৪৩০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ। মহাভারতের যুদ্ধকালে কৃষ্ণ সক্রিয়ভাবে উপস্থিত ছিলেন এবং সে-সময় তিনি সত্তরোর্ধ একজন প্রবীণ পরিণত মানুষ।

মহাভারত প্রধানত কুরু-পাণ্ডবের ইতিহাস, সুতরাং পাণ্ডব-সম্পর্কিত কৃষ্ণকথাই এতে বর্ণিত হয়েছে, সমগ্র জীবনকথা এখানে নেই। হরিবংশ কৃষ্ণের পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত। অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, বায়ু, শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত, স্কন্দ, বামন ও কূর্মপুরাণে কৃষ্ণবৃত্তান্ত পাওয়া যায়। যে-সব পুরাণে কৃষ্ণচরিত্রের প্রসঙ্গ আছে, তার মধ্যে ব্রহ্ম, বিষ্ণু, ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তই প্রধান। ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার বলে বর্ণিত হয়েছেন। এখানে বলে রাখা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, মহাভারত, হরিবংশ এবং অষ্টাদশ পুরাণের সবই ব্যাসদেবের রচিত বলে বহুলপ্রচারিত। কিন্তু মনুষ্যলোক, গন্ধর্বলোক, নাগলোক, দেবলোক প্রভৃতি সপ্তলোকের জন্য সাত লক্ষ শ্লোক একজন কবির পক্ষে রচনা সম্ভব কিনা, তার ওপর হরিবংশ ও অষ্টাদশ পুরাণও একই ব্যক্তির, এমন না-ও হতে পারে। মহাভারতকারের নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। তিনি বেদ সংকলন ও চারভাগে সুবিন্যস্ত করেছিলেন বলে বেদব্যাস নামেও কথিত। ভারতবর্ষে এখনও বহু মানুষের পদবী ব্যাস। কাজেই এইসব ব্যাস একই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে বৈকি!

পণ্ডিতেরা নানা যুক্তিতর্ক ও নির্ণায়ক ব্যবহার করে বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের রচনাকাল নির্ণয় করেছেন যথাক্রমে খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম; খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ; খ্রিস্টীয় সপ্তম-নবম ও খ্রিস্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দী। এ পর্যন্ত আদিম মহাভারতের যে কাঠামো পাওয়া গেছে, তাতে শ্লোকের সংখ্যা ২৪ হাজারের অধিক নয়। ব্যাসদেব তাঁর পুত্র শুকদেবকে ২৪ হাজার শ্লোকবিশিষ্ট মহাভারতই কীর্তন করেছিলেন বলে মহাভারতেই উল্লেখিত আছে। অর্থাৎ ৯৬ হাজার শ্লোকবিশিষ্ট আধুনিককালে প্রাপ্ত মহাভারতের ৭২ হাজার শ্লোকই প্রক্ষিপ্ত। প্রক্ষিপ্ত মানে হচ্ছে পরবর্তীকালে সংযোজিত। সনাতন চার বেদের পর মহাভারতের স্থান। এজন্য একে 'পঞ্চম বেদ' বলা হত। মহাভারত লোকশিক্ষার অন্যতম বাহন। প্রাচীন বলেই মহাভারত এবং পরবর্তীকালের পুরাণসমূহে কৃষ্ণ-আলোচনায় অনেক গল্পকথা ঢুকে গেছে।

প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে জন্মগ্রহণকারী (মহাভারতের যুদ্ধকাল + কৃষ্ণের তৎকালীন বয়স = খ্রিস্টপূর্ব ১৪৩০+৭০= খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০) অনিন্দ্যসুন্দর অমিত বলশালী এবং সর্বগুণসম্পন্ন এই মানুষটিকে ঘিরে গল্পকথা-কিংবদন্তীর শেষ নেই। মানুষ চিরকালই গল্পপ্রিয়। আর বিখ্যাত মানুষদের নিয়ে মানুষের আগ্রহ-কৌতূহল বরাবরই সীমাহীন। তাই আধুনিককালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মাতৃ-আজ্ঞা পালনে ঝঞ্ঝামুখর নদী সাঁতরানোর গল্প আমাদের কাছে সত্যের অধিক। গল্পটি বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সঙ্গে এমনই মানানসই যে, আমরা গল্পটিকে সত্য বলেই জানি। কৃষ্ণ যেহেতু অপরাজেয়, অপরাজিত, বিশুদ্ধ, পুণ্যময়, প্রীতিময়, দয়াময়, অনুষ্ঠেয় কাজে সদা তৎপর– ধর্মাত্মা, বেদজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, ধর্মজ্ঞ, লোকহিতৈষী, ন্যায়নিষ্ঠ, ক্ষমাশীল, নিরপেক্ষ, শাস্তিদাতা, নির্মম, নিরহংকার, যোগযুক্ত, তপস্বী– সর্বগুণে গুণান্বিত একজন মানুষ, একই সঙ্গে ঈশ্বরাবতারও, তাই, তাঁকে ঘিরে কাব্য-আখ্যান রচিত ও প্রচারিত হওয়াটা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

অধুনা কৃষ্ণের জীবনের বিভিন্ন লীলা এবং শ্রীরাধাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু সমালোচনাকালে আমরা ভুলে যাই যে, কৃষ্ণ যখন বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় যান, তাঁর বয়স দশ পেরিয়েছে। একাদশবর্ষীয় এক নওলকিশোরের পক্ষে কতটুকু লীলা সম্ভব, সচেতন পাঠককে ভেবে দেখতে বলি। যে রাধাকে নিয়ে এত বিতর্ক, যে রাধাকে নিয়ে ভারতবর্ষ বিশেষত বাংলা মাতোয়ারা, সেই রাধার উল্লেখ কিন্তু মহাভারতের কোথাও নেই। অর্থাৎ কৃষ্ণের জীবনের আদিমতম বিশ্বস্ত ইতিহাসে রাধা অনুপস্থিত। এমনকি বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ বা ভাগবতেও নেই। আছে শুধু ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ আর জয়দেবের কাব্যে। আগেই বলেছি যে, পুরাণসমূহের মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত সর্বাধুনিক আর এর রচনাকাল দশম-একাদশ শতাব্দী। এ কালখণ্ডটি ভারতবর্ষের ইতিহাসেও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য– এসময় বহিরাগতরা বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচারের জন্য স্থলপথে শস্য-সম্পদে ভরপুর ভারতভূমিতে দলে দলে আসতে থাকে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ বাংলার বৈষ্ণবদের ওপর খুব প্রভাব বিস্তার করেছে। কবি জয়দেব ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের নতুন বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বন করে গীতগোবিন্দ রচনা করেন। জয়দেব ছিলেন ছিলেন লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি, তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতী ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারিণী। জয়দেব পালা লিখতেন, পদ্মাবতী গাইতেন। জয়দেবের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বিদ্যাপতি, বড়ু চণ্ডীদাস প্রভৃতি মধ্যযুগীয় কবিরা কৃষ্ণ-সংগীত রচনা করেন। এই ধর্ম অবলম্বন করেই শ্রীচৈতন্যদেব কান্তরসাশ্রিত অভিনব ভক্তিবাদ প্রচার করেছেন। এখন সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে কৃষ্ণ উপাসনার প্রধান অঙ্গ হলেন রাধা। রাধা ছাড়া এখন কৃষ্ণনাম নেই। রাধা ছাড়া কৃষ্ণের মন্দির নেই, মূর্তি নেই। বৈষ্ণবদের অনেক রচনায় কৃষ্ণের চেয়েও রাধা প্রাধান্য লাভ করেছেন। পাঠককে কী আর বলে দিতে হবে যে, রাধা চরিত্রটি কাল্পনিক! এখানে আরেকটি কথা প্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে করি, ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক শ্রীমন্ত শংকরদেব অসমে যে বৈষ্ণববাদ প্রচার করেন, সেখানেও রাধা অনুপস্থিত।

তিনি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন বলে কৃষ্ণ; সকলের হৃদয় হরণ করেন এবং সর্ব অমঙ্গল হরণ করেন বলে তিনি হরি; তিনি নারের (জলের) আয়ন (আশ্রয়) অর্থাৎ সর্বদেহীর প্রাণ বলে নারায়ণ; তিনি সমস্ত ব্যেপে আছেন বলে বিষ্ণু, ব্রহ্ম; তিনি সর্বভূতে বাস করেন বলে বাসুদেব। কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং। তিনি মানুষী শক্তি দিয়ে যাবতীয় কার্যনির্বাহ করেছেন, কিন্তু তাঁর চরিত্র মনুষ্যাতীত। এরকম মানুষী শক্তির দ্বারা অতিমানবীয় চরিত্রের বিকাশ থেকে তাঁর মনুষ্যত্ব বা ঈশ্বরত্ব অনুমান করা উচিত কিনা, তা পাঠক নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুসারে স্থির করবেন। আমরা শুধু কৃষ্ণের চরিত্র ঘিরে যে অলীক কুতর্ক কুনাট্য ঘনিয়ে উঠেছে, নির্মোহভাবে সে-সব জঞ্জাল সরিয়ে পরম জ্ঞানী লোকাতীত মহিমাময় মহত্তম মানুষটির জীবনেতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

উপক্রমণিকা

মহতস্তমসঃ পারে পুরুষং হ্যতিতেজসম্।
যং জ্ঞাত্বা মৃত্যুমত্যেতি তস্মৈ জ্ঞেয়াত্মনে নমঃ ॥
– মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৪৭ অধ্যায়।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ হিন্দুর, বাঙলা দেশের সকল হিন্দুর বিশ্বাস যে, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং– এই তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস। বাঙলা দেশে কৃষ্ণের উপাসনা সবচেয়ে বেশি। গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণের মন্দির, ঘরে ঘরে কৃষ্ণের পূজা, প্রায় মাসে মাসে কৃষ্ণোৎসব, উৎসবে উৎসবে কৃষ্ণযাত্রা, মুখে মুখে কৃষ্ণগীতি, সবার মুখে কৃষ্ণনাম। কারও গায়ে কৃষ্ণনামাবলি, কারও গায়ে কৃষ্ণনামের ছাপ। কেউ কৃষ্ণনাম না করে কোথাও যাত্রা করেন না; কেউ কৃষ্ণনাম না লিখে কোনও পত্র বা কোনও লেখাপড়া করেন না; ভিখারী 'জয় কৃষ্ণরাধে' না বলে ভিক্ষা চায় না। কোনও ঘৃণার কথা শুনলে 'রাধেকৃষ্ণ!' বলে আমরা ঘৃণা প্রকাশ করি; বনের পাখি পুষলে তাকে 'রাধেকৃষ্ণ' বলতে শেখাই। কৃষ্ণ এদেশে এমন সর্বব্যাপক।

কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং– এই যদি বাঙালির বিশ্বাস, তবে সব সময়ে কৃষ্ণ আরাধনা, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা ধর্মেরই উন্নতিসাধক। সকল সময়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করার চেয়ে মানুষের মঙ্গল আর কী আছে? কিন্তু এঁরা ভগবানকে কী রকম ভাবেন? ভাবেন, ইনি বাল্যে চোর– ননী-মাখন চুরি করে খেতেন; কৈশোরে পারদারিক– অসংখ্য পতিব্রতার ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট করেছেন; পরিণত বয়সে বঞ্চক ও শঠ– বঞ্চনা করে দ্রোণ প্রভৃতির প্রাণহরণ করেছিলেন। ভগবৎচরিত কি এমন? যিনি শুদ্ধসত্ত্ব, যাঁর থেকে সব ধরনের শুদ্ধি, যাঁর নামে অশুদ্ধি ও পাপ দূর হয়, মানবদেহ ধারণ করে এসমস্ত পাপাচরণ কি সেই ভগবৎচরিত্রে শোভা পায়?

ভগবৎচরিত্রের এমন কল্পনায় ভারতবর্ষের পাপস্রোতই শুধু বৃদ্ধি পেয়েছে। পুরাণ-ইতিহাস আলোচনা করে দেখেছি, কৃষ্ণসম্বন্ধীয় যে-সব পাপ-উপাখ্যান জনসমাজে প্রচলিত– সবই অমূলক কুনাট্য বই নয়। এসব বাদ দিলে বাকি যা থাকে, তা অতি বিশুদ্ধ, পরম পবিত্র, অতিশয় মহৎ। তাঁর মত সর্বগুণান্বিত, সর্বপাপসংস্পর্শশূন্য আদর্শ চরিত্র আর কোথাও নেই। কোনও দেশীয় ইতিহাসে না, কোনও দেশীয় কাব্যেও না।

মহাভারত কৃষ্ণচরিত্রের প্রাচীনতম প্রামাণ্য দলিল। এই মহাভারতেও আবার বহু কাহিনি-উপকাহিনি প্রক্ষিপ্ত হয়ে একে ভারাক্রান্ত, কণ্টকিত করে তুলেছে। মহাভারতপ্রণেতা কৃষ্ণদৈপায়ন ব্যাস তাঁর পুত্র শুকদেবকে প্রথমত ২৪ হাজার শ্লোকের মহাভারতীয় কাহিনি শুনিয়েছিলেন। সুতরাং অধুনা যে মহাভারত প্রচলিত আছে, তার কতখানি ব্যাসপ্রণীত, আর কতখানি প্রক্ষিপ্ত তা সহজেই অনুমেয়। আমরা যাবতীয় জঞ্জাল সরিয়ে আদিম মহাভারতীয় কৃষ্ণনেতিহাস এখানে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছি।

প্র থ ম অ ধ্যা য়
বৃন্দাবন

যো মোহয়তি ভূতানি স্নেহপাশানুবন্ধনৈঃ।
সর্গস্য রক্ষণার্থায় তস্মৈ মোহাত্মনে নমঃ ॥
– মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৪৭ অধ্যায়।

যদুবংশ

প্রাচীনকালে এই ভারতবর্ষে পুরুরবা নামে এক চন্দ্রবংশীয় ঐতিহাসিক রাজা ছিলেন। চন্দ্রের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র ইলা, ইলার পুত্র পুরুরবা। উর্বশীর গর্ভে পুরুরবার যে পুত্র হয়, তার নাম আয়ু। আয়ুর পুত্র বিখ্যাত নহুষ। নহুষের পুত্র বিখ্যাত যযাতি। যযাতির ছিল পাঁচ পুত্র– যদু, তুর্বসু, দ্রুহ্য, অনু এবং পুরু। যদু যাদবদের আদিপুরুষ। পুরু কুরু-পাণ্ডবদের আদিপুরুষ।

কথিত আছে, যযাতির জ্যেষ্ঠ চারপুত্র তাঁর আজ্ঞা পালন না করায় তাদের অভিশাপ দেন এবং কনিষ্ঠপুত্র পুরুকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। এই পুরুর বংশে দুষ্মন্ত, ভরত, কুরু, অজমীঢ় প্রভৃতি রাজারা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দুর্যোধন-যুধিষ্ঠির প্রভৃতি কৌরবেরা পুরুর বংশধর এবং কৃষ্ণ প্রভৃতি যাদবেরা যদুর বংশধর। হরিবংশের হরিবংশপর্বে যে যদুবংশের কথা বলা হয়েছে তা যযাতিপুত্র যদুরই বংশকথন।

কিন্তু হরিবংশের বিষ্ণুপর্বে বলা হয়েছে, হর্যশ্ব নামে একজন ইক্ষ্বাকুবংশীয় অযোধ্যার রাজা ছিলেন। তিনি মধুবনের রাজা মধুর কন্যা মধুমতীকে বিয়ে করেছিলেন। এই মধুবনই মথুরা। হর্যশ্ব কোন কারণে অযোধ্যা থেকে বিতাড়িত হয়ে শ্বশুরবাড়ি মথুরাতে এসে বসবাস শুরু করেন। এঁরই পুত্র যদু। হর্যশ্বের মৃত্যুর পর ইনি রাজা হন। যদুর পুত্র মাধব। মাধবের পুত্র সত্ত্বত, সত্ত্বতের পুত্র ভীম। মধুর পুত্র লবণকে রামের ভাই শত্রুঘ্ন পরাজিত করে তাঁর রাজ্য দখল করে মথুরানগর নির্মাণ করেন। রাঘবেরা মথুরা ত্যাগ করলে ভীম তা পুনরায় অধিকার করেন এবং এই যদুর বংশই মথুরাবাসী যাদবগণ।

আবার, ঋগ্বেদসংহিতার ১০ম মণ্ডলের ৬২ সূক্তে যদু ও তুর্বা (তুর্বসু) দাস জাতীয় রাজা বলে কথিত।

যাহোক, এ পর্যন্ত আমরা তিনজন যদুর কথা পেলাম–

১. যযাতিপুত্র ২. ইক্ষ্বাকুবংশীয় ৩. অনার্য রাজা।

কৃষ্ণ কোন্ যদুর বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তার মীমাংসা করা কঠিন। এঁদের যখন মথুরা ছাড়া পাইনি এবং ঐ মথুরা ইক্ষ্বাকুবংশীয়দের নির্মিত, তখন যাদবেরা ইক্ষ্বাকুবংশীয় নন, এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না।

যে যদুবংশেই কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করুন না কেন, সেই বংশে মধু, সত্ত্বত, বৃষ্ণি, অন্ধক, কুকুর ও ভোজ প্রভৃতি রাজারা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই বৃষ্ণি, অন্ধক, কুকুর ও ভোজবংশীয়রা একত্রে মথুরায় বাস করতেন। কৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশীয়। কংস ও দেবকী ভোজবংশীয়। কংস ও দেবকীর এক পিতামহ।

কৃষ্ণের জন্ম

কংসের পিতা উগ্রসেন ছিলেন যাদবদের রাজা। তাঁর রাজ্যের নাম মথুরা। কৃষ্ণের পিতা বসুদেব, মা দেবকী। কংস ছিলেন ভীষণ উচ্চাভিলাষী। ইতোমধ্যে তিনি পিতা উগ্রসেনকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজেই রাজা হয়েছেন এবং ক্রমে অতিশয় দুরাচারী হয়ে উঠেছেন।

তিনি যাদবদের ওপর এমন পীড়ন শুরু করেন যে, অনেকে ভয়ে মথুরা থেকে পালিয়ে অন্য দেশে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করেন। বসুদেব তার আরেক পত্নী রোহিণীকে যমুনা নদীর অপর তীরে অবস্থিত গোকুলনগরের ঘোষপল্লীতে নন্দ নামে এক গোপ ব্যবসায়ীর গৃহে রেখে এসেছিলেন। তিনি বসুদেবের আত্মীয়। সেখানে রোহিণী এক পুত্রসন্তান প্রসব করেন, সেই পুত্রের নাম বলরাম।

উৎপীড়কমাত্রই কাপুরুষ। কাজেই কংস ভেবেছিলেন, যাদব বংশের যে-কোন পুরুষ সন্তানই তাঁর জন্য বিপদের কারণ। বিবাহের পর প্রীতিবশত বসুদেব ও দেবকীর রথচালনা করলেও কংস আশংকা করেছিলেন, এঁদের গর্ভের সন্তানও তাঁর জন্য একদিন বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে। সে-জন্য তিনি তাঁদের কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং কারাগারে জন্মগ্রহণকারী তাঁদের একের পর এক সন্তানকে কারাগার থেকে নিয়ে হত্যা করেন। এভাবে তাঁদের প্রথম ৬ সন্তানকে কংস হত্যা করলেন। সপ্তম গর্ভের সন্তান গর্ভেই বিনষ্ট হয়েছিল। দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হলেন। সেটি ছিল রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথির রাত। ঘোর ঝড়জলে দশদিক অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। বসুদেব প্রাণভয়ে সদ্যোজাত পুত্রকে রাতের অন্ধকারেই সেই ঝড়জলের মধ্যে যমুনার অপরপারে নন্দের গৃহে রেখে এলেন। সদ্য সন্তান হারানো যশোদাও তাঁকে পেয়ে পুত্রবোধে লালন-পালন করতে লাগলেন। সেখানে কৃষ্ণ ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলেন।

বাল্যকাল

যশোদার আদর-স্নেহে কৃষ্ণ প্রতিপালিত হতে লাগলেন। বাল্যকালে আর দশটি শিশুর মতই তিনি দুরন্ত ছিলেন। বলশালীও ছিলেন। কৃষ্ণ-বলরাম দুই ভাইয়ের দস্যিপনা করে দিন কাটতে লাগল। জনৈকা স্ত্রীলোকের স্তন পান করার সময় সজোরে স্তন টানার জন্য আতুড়ঘরেই তাঁর পূতনা রোগ দূর হয়েছিল। তিনি একদা শকুনি পাখি মেরেছিলেন। পা দিয়ে একবার একটি খেলনা গাড়ি ভেঙে ফেলেছিলেন। একবার চক্রবায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। শৈশবে কৃষ্ণ গোপীদের বাড়িতে দৌরাত্ম্য করে বেড়াতেন– তাদের ননী-মাখন চুরি করে খেতেন, বানরদের খেতে দিতেন। কৃষ্ণ অতিশয় সুন্দর, মাধুর্যময় ও ক্রীড়াপরায়ণ বালক ছিলেন– তিনি বৃন্দাবনের সকলেরই খুব প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন।

তিনি সকলের প্রতি সহৃদয়তাপরবশ, সকলের দুঃখমোচনে সচেষ্ট। একবার এক স্ত্রীলোক ফল বিক্রি করতে এলে তিনি তাকে অঞ্জলিভরে রত্ন দিয়েছিলেন। একবার কৃষ্ণ দুরন্তপনা করছিলেন বলে যশোদা তাঁকে পেটে দড়ি দিয়ে উদূখলে বেঁধে রেখেছিলেন। কৃষ্ণ উদূখল টেনে নিয়ে চললেন। এভাবে চলতে চলতে দুটি অর্জুন (কুরচি) গাছের মধ্য দিয়ে যাবার সময় উদূখলটি গাছের মূলে বেধে যায়। কৃষ্ণ জোরে টান দিলে গাছ দুটি ভেঙে যায়। কৃষ্ণের দস্যিপনায় অতিষ্ঠ হয়ে যশোদা তাঁকে আরেকবার গরুর দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন। সেজন্য তাঁর আরেক নাম দামোদর।

কৈশোর

সে-সময় ঘোষ নিবাসে নেকড়ে বাঘের উপদ্রব খুব বেড়ে গিয়েছিল। কৃষ্ণও নানা বিপদে পড়েছিলেন। তাই নন্দ ও অন্যান্য গোপেরা পূর্ব বাসস্থান ত্যাগ করে অধিকতর নিরাপদ সুখের জায়গা বৃন্দাবনে গিয়ে বসতি স্থাপন করলেন।

যমুনাতীরবর্তী বৃন্দাবন অতি মনোরম স্থান। বৃন্দাবনে এসে কৃষ্ণ একটি বকনা বাছুর, বক ও সাপ মেরেছিলেন বলে ভাগবতকাররা দাবি করেছেন। তবে মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, এমনকি হরিবংশেও এমন দাবির স্বীকৃতি নেই। তবে বলবান শিশুর পক্ষে এসব কাজ অসম্ভব কিছু নয়। একবার বৃন্দাবনে দাবানলের সৃষ্টি হলে কৃষ্ণ গোপনে অক্লান্ত চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। যমুনার একটি হ্রদে কালিয় নামে এক বিষধর সাপ বংশ বিস্তার করেছিল। তাদের বিষে যমুনার জল এমন বিষময় হয়ে উঠেছিল যে, কেউ সে-জল পান করলে মারা যেত। কৃষ্ণের আঘাতে মুমূর্ষু কালিয় সবংশে অন্যত্র পালিয়ে বাঁচে। মহাভারতে অবশ্য এর উল্লেখমাত্র নেই। বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ ও ভাগবতে এটি প্রসিদ্ধ কৃষ্ণলীলা।

বৃন্দাবনের সীমানায় গোবর্ধন নামে একটি পাহাড় ছিল। এখনও আছে। পাহাড়টি দেখে মনে হয়, কোনও প্রাকৃতিক বিপ্লবে পাহাড়টি উৎক্ষিপ্ত হয়ে পুনঃস্থাপিত হয়েছিল। বর্ষাশেষে নন্দাদি গোপেরা বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রের পূজা করতেন। বৃষ্টিতে শস্য ভাল জন্মে। শস্য মানুষের খাদ্য। ঘাস খেয়ে গোরু দুগ্ধবতী হয়। কৃষ্ণ তাদের বোঝালেন, আমাদেও গোরু-বাছুর গোবর্ধনের আশ্রয়ে লালিত-পালিত। অতএব তার পুজোই বিধেয়। এতে কূপিত হয়ে ইন্দ্র এমন বারিবর্ষণ শুরু করলেন যে, বৃন্দাবন বুঝি তলিয়ে যায়! তখন শ্রীকৃষ্ণ হাতের আঙুলে গোবর্ধনকে ছাতার মত মাথার ওপরে সাতদিন ধরে রেখে বৃন্দাবনকে রক্ষা করেছিলেন। মহাভারতে শিশুপালের কথায় এই পাহাড়পূজার প্রসঙ্গের সামান্য উল্লেখ আছে যে, কৃষ্ণ বল্মীকতুল্য গোবর্ধন ধারণ করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবতা এই, গোবর্ধন আজও আছে– বল্মীক নয়, পাহাড়ই বটে। যাহোক, কৃষ্ণ গোবর্ধন পূজা করে দরিদ্রদের ভুরিভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন। আমরা সবক্ষেত্রে মহাভারতকে টানছি এ কারণে যে, কৃষ্ণচরিত ব্যাখ্যায় মহাভারতই প্রাচীনতম প্রামাণ্য গ্রন্থ।

ব্রজগোপী

কৃষ্ণবিদ্বেষীরা কৃষ্ণচরিত্রে কলঙ্ক আরোপের জন্য ব্রজগোপীতত্ত্ব ফেনায়িত করেন কিন্তু মহাভারতে ব্রজগোপীদের কথা কিছুই নেই। সভাপর্বে শিশুপালবধ পর্বাধ্যায়ে শিশুপালের কৃষ্ণনিন্দার সবিস্তার বর্ণনার কোথাও ব্রজগোপীঘটিত কৃষ্ণের কলংকের কথা উচ্চারিত হয়নি। যদি এ কলংক থাকত, তাহলে শিশুপাল কিংবা শিশুপালবধবৃত্তান্ত যিনি প্রণয়ন করেছেন, তিনি কখনই কৃষ্ণনিন্দাকালে তা পরিত্যাগ করতেন না। শুধু সভাপর্বে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণকালে দ্রৌপদী কৃষ্ণকে সকাতরে ডাকার সময় একবার 'গোপীজনপ্রিয়' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। সুন্দর শিশুর প্রতি স্ত্রীজনসুলভ স্নেহ থাকাটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। বিষ্ণুপুরাণে বিষয়টি পবিত্রভাবে উত্থাপিত হয়েছে। হরিবংশে কিছু বিলাসিতা দেখা যায়, ভাগবতে আদিরসের বিস্তার শুরু হয়েছে আর ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আদিরসের স্রোত বয়ে গেছে। বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম অংশের ত্রয়োদশ অধ্যায় ছাড়া ব্রজগোপীদের কথা আর কোথাও নেই। সেখানে রাসলীলার উল্লেখ আছে। রাস হল নারী-পুরুষে পরস্পরের হাত ধরাধরি করে চক্রাকার ঘুরতে ঘুরতে নাচ-গান করা। বালক-বালিকারা এরকম নাচ-গান করে থাকে। সদ্যকিশোর কৃষ্ণও গোপ বালক-বালিকাদের সঙ্গে এমন নাচ-গান করেছেন। সদা ক্রীড়াশীল বালকের এমন প্রমোদে আদিরস থাকতে পারে না। কেবল কৃষ্ণের মথুরা গমনকালে

তাঁদের খেদোক্তি আছে। হরিবংশেও ব্রজগোপীদের কথা বিষ্ণুপর্বের ৭৭ অধ্যায় (গ্রন্থান্তরে ৭৬ অধ্যায়) ছাড়া আর কোথাও নেই। তবে হরিবংশে 'রাস' শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি, তার পরিবর্তে 'হল্লীষ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই অধ্যায়ের নাম 'হল্লীষক্রীড়নম্'। 'হল্লীষ' এবং 'রাস' একই কথা– নৃত্যবিশেষ। কবিত্বে, গাম্ভীর্যে, পাণ্ডিত্যে ও ঔদার্যে হরিবংশকার বিষ্ণুপুরাণকারের তুলনায় অনেক লঘু। তিনি বিষ্ণুপুরাণকারের রাসবর্ণনার নিগূঢ় তাৎপর্য ও গোপীদের ভক্তিযোগে কৃষ্ণে একাত্ম হয়ে যাওয়ার বিষয়টি বুঝতে পারেননি। তাই বিষ্ণুপুরাণের চপলা বালিকা আনন্দে চঞ্চলা, হরিবংশে সেই গোপীরা বিলাসিনীর ভাব প্রকাশ করছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রজগোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ শুধু রাসলীলায় সীমাবদ্ধ নেই। ভাগবতকার গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের লীলার বিশেষ বিস্তার ঘটিয়েছেন। সময়ে সময়ে তা আধুনিক রুচিবিরুদ্ধ। কিন্তু এসব বর্ণনার বহিরঙ্গ রুচিবিরুদ্ধ মনে হলেও অন্তরঙ্গে অতি পবিত্র ভক্তিতত্ত্ব নিহিত রয়েছে। হরিবংশকারের মত ভাগবতকার বিলাসপ্রিয়তা-দোষে দূষিত নন। তাঁর অভিপ্রায় অতি নিগূঢ় ও বিশুদ্ধ।

ভাগবতের দশম স্কন্ধের ২১ অধ্যায়ে প্রথমত গোপীদের পূর্বরাগ বর্ণিত হয়েছে। তারা কৃষ্ণের বাঁশি শুনে মোহিত হয়ে পরস্পরের কাছে কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ ব্যক্ত করছেন। সেই পূর্বানুরাগ বর্ণনায় কবি অসাধারণ কবিত্ব প্রকাশ করেছেন। আর সেটা ব্যাখ্যা করতে তিনি 'বস্ত্রহরণ' পালা ফেঁদেছেন, যার সারমর্ম হচ্ছে ভগবানকে পেতে সর্বস্ব ত্যাগ করা যায়, লজ্জা যে নারীর ভূষণ, তাও ত্যাগ করা যায়। বস্ত্রহরণের কোনও কথা মহাভারতে, বিষ্ণুপুরাণে বা হরিবংশে নেই, এটি ভাগবতকারের একান্ত কল্পনাপ্রসূত।

শ্রীরাধা

কৃষ্ণ উপাসনার প্রধান অঙ্গ রাধা। রাধা ছাড়া এখন কৃষ্ণনাম নেই। রাধা ছাড়া বাংলায় কৃষ্ণের মন্দির নেই, মূর্তি নেই। বৈষ্ণবদের অনেক রচনায় কৃষ্ণের চেয়েও রাধা প্রাধান্য লাভ করেছেন। যে রাধাকে নিয়ে ভারতবর্ষ বিশেষত বাঙলা মাতোয়ারা, সেই রাধার উল্লেখ মহাভারতে নেই– বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, এমনকি ভাগবতেও নেই। আছে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ আর জয়দেবের কাব্যে।

আদিম ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ বিলুপ্ত। এখন যে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ পাওয়া যায়, তা পুরাণসমূহের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ বলে বোধ হয়। এখানে নতুন দেবতত্ত্ব হাজির করা হয়েছে। আমরা চিরকাল জানি, কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার। অথচ এখানে বলা হচ্ছে, কৃষ্ণই বিষ্ণুকে সৃষ্টি করেছেন। বিষ্ণু থাকেন বৈকুণ্ঠে, কৃষ্ণ থাকেন গোলোকে রাসমণ্ডলে– বৈকুণ্ঠ তার অনেক নীচে। ইনি কেবল বিষ্ণুকে নন, ব্রহ্মা, রুদ্র, লক্ষ্মী, দুর্গা প্রভৃতি সমস্ত দেবদেবী, দানব ও জীবের সৃষ্টি করেছেন। গোলকধামে গো, গোপ ও গোপিনীরা বাস করে। তারা দেবদেবীর উপর। সেই গোলকধামের অধিষ্ঠাত্রী কৃষ্ণবিলাসিনী দেবীই রাধা। রাধার আগে রাসমণ্ডল, রাসমণ্ডলে ইনি রাধাকে সৃষ্টি করেন। গোপীদের বাসস্থান গোলোকধাম বৃন্দাবনের অবিকল নকল। এখানে কৃষ্ণযাত্রার চন্দ্রাবলীর মত রাধার প্রতিযোগিনী গোপীর নাম বিরজা। মানভঞ্জন যাত্রায় যেমন যাত্রাওয়ালারা কৃষ্ণকে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে নিয়ে যায়, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণকারও তেমনি কৃষ্ণকে গোলোকধামে বিরজার কুঞ্জে নিয়ে গেছেন। তাতে যাত্রার রাধিকার মনে যেমন ঈর্ষা ও কোপের সৃষ্টি হয়, ব্রহ্মবৈবর্তের রাধিকার মনেও তেমনি ঈর্ষা ও কোপের সৃষ্টি হয়েছিল। তাতে আরেক মহা গোলযোগ ঘটে যায়। রাধিকা কৃষ্ণকে হাতেনাতে ধরার জন্যে রথে চড়ে বিরজার মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে বিরজার দ্বার রক্ষা করছিলেন শ্রীদামা বা শ্রীদাম। শ্রীদাম রাধিকাকে দ্বার ছাড়ে না। এদিকে রাধিকার ভয়ে বিরজা গলে জল হয়ে নদীতে রূপান্তরিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাতে দুঃখিত হয়ে তাঁকে পুনর্জীবন ও পূর্বরূপ প্রদান করলেন। বিরজা গোলোকনাথের সঙ্গে নিত্য আনন্দ অনুভব করতে লাগলেন। ক্রমে তার সাতটি পুত্র জন্মাল। কিন্তু পুত্ররা আনন্দ অনুভবের বিঘ্ন, তাই মা তাদের অভিশাপ দিলেন, তারা সাত সমুদ্র হয়ে রইল। এদিকে রাধা কৃষ্ণবিরজা-বিত্তান্ত জানতে পেরে কৃষ্ণকে যারপরনাই ভর্ৎসনা করলেন, এবং অভিশাপ দিলেন যে, তুমি পৃথিবীতে গিয়ে বাস কর। অপরদিকে কৃষ্ণসখা শ্রীদাম রাধার এহেন দুর্ব্যবহারে অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে ভর্ৎসনা করলেন। শুনে রাধা শ্রীদামকে গালমন্দ করে শাপ দিলেন, তুমি পৃথিবীতে গিয়ে অসুর হয়ে জন্মগ্রহণ কর। শ্রীদামও কম যান না। তিনিও রাধাকে শাপ দিয়ে বললেন, তুমিও পৃথিবীতে গিয়ে রায়ানপত্নী (যাত্রার আয়ান ঘোষ) হয়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং কলঙ্কিনীরূপে খ্যাত হবে।

শেষে দু'জনেই কৃষ্ণের কাছে এসে কেঁদে পড়লেন। কৃষ্ণ শ্রীদামকে বর দিয়ে বললেন যে, তুমি অসুরেশ্বর হয়ে জন্মাবে, কেউ তোমাকে পরাজিত করতে পারবে না। শেষে শঙ্করের শূলের স্পর্শে মুক্ত হবে। রাধাকেও আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'তুমি যাও; আমিও যাচ্ছি।' শেষে পৃথিবীর ভার লাঘবের জন্য তিনি পৃথিবীতে এসে অবতীর্ণ হলেন।

এ সব কথা নতুন হলেও এবং সব শেষে প্রচারিত হলেও এই ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ বাঙলার বৈষ্ণবধর্মের ওপর অতিশয় প্রভাব বিস্তার করেছে। জয়দেব প্রভৃতি বাঙালি বৈষ্ণবকবিরা, বাঙলার জাতীয় সংগীত, বাঙলার যাত্রা মহোৎসবাদির মূল ব্রহ্মবৈবর্তে। তবে ব্রহ্মবৈবর্তকারকথিত একটা বড় মূল কথা বাঙলার বৈষ্ণবেরা গ্রহণ করেননি, অন্তত সেটা বাঙালির বৈষ্ণবধর্মে তেমনভাবে পরিস্ফুট হয়নি– রাধিকা রায়ানপত্নী বলে পরিচিতা, কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তের মতে তিনি কৃষ্ণের বিধিসম্মত বিবাহিতা পত্নী। সেই বিবাহবৃত্তান্তে আমাদের কাজ নেই, আগ্রহীরা ব্রহ্মবৈবর্তের ক্লেদ উদ্ধার করে সেই আনন্দলাভ করুন।

যা হোক, পাঠক দেখবেন যে, ব্রহ্মবৈবর্তকার সম্পূর্ণ নতুন বৈষ্ণবধর্ম সৃষ্টি করেছেন। সে বৈষ্ণবধর্মের নামগন্ধ বিষ্ণু বা ভাগবত বা অন্য পুরাণে নেই। রাধাই এই বৈষ্ণবধর্মের কেন্দ্রস্বরূপ। জয়দেব কবি, গীতগোবিন্দ কাব্যে এই নতুন বৈষ্ণবধর্ম অবলম্বন করেই গোবিন্দগীতি রচনা করেছেন। এই ধর্ম অবলম্বন করেই শ্রীচৈতন্যদেব কান্তরসাশ্রিত অভিনব ভক্তিবাদ প্রচার করেছেন।

এখন দেখা যাক, এই নতুন ধর্মের তাৎপর্য কি এবং কোথা থেকে এ উৎপত্তি?

ভারতবর্ষের প্রধান ছয়টি দর্শনের মধ্যে বেদান্ত ও সাঙ্খ্যের প্রাধান্য বেশি। বেদান্তের মূল কথা হচ্ছে, এই জগৎ ও জীবসকল ঈশ্বরের অংশ। তিনি এক ছিলেন, বহু হলেন। তিনি পরমাত্মা। জীবাত্মা সেই পরমাত্মার অংশ। ঈশ্বরের মায়া থেকে জীবাত্মার সৃষ্টি এবং সেই মায়ামুক্তি ঘটলেই আবার ঈশ্বরে বিলীন হবে। বেদান্ত দর্শন এই অদ্বৈতবাদে পূর্ণ।

আধুনিককালে শংকরাচার্য, রামানুজাচার্য, মাধ্বচার্য ও বল্লভাচার্য

অদ্বৈতবাদের চাররকম ব্যাখ্যা হাজির করেছেন। এগুলো যথাক্রমে অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও বিশুদ্ধদ্বৈতবাদ। কিন্তু প্রাচীন বৈষ্ণবধর্মে এত বিভেদ ছিল না, শুধু ছিল জগৎ ঈশ্বর বা ঈশ্বর জগৎ নন, কিন্তু ঈশ্বরে জগৎ আছে– 'সূত্রে মণিগণ্য ইব'।

অন্যদিকে কপিলের সাঙ্খ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। পরবর্তী সাঙ্খ্যরা অবশ্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। সাঙ্খ্যের মোদ্দা কথা হচ্ছে, জড়জগৎ বা জড়জগন্ময়ীশক্তি হচ্ছেন প্রকৃতি। ইনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কর্ত্রী। পরমাত্মা বা পুরুষ সম্পূর্ণ সঙ্গশূন্য। এই পুরুষপ্রকৃতিতত্ত্ব থেকে তান্ত্রিকধর্মের উদ্ভব। সাঙ্খ্যের প্রকৃতি তন্ত্রে এসে হল শক্তি। বৈষ্ণবদেও অদ্বৈতবাদ-বিরোধী মানুষের কাছে এই তান্ত্রিকধর্ম জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তখন তান্ত্রিকধর্মের সারাৎসার আত্মসাৎ করে ব্রহ্মবৈবর্তকার এই শক্তিকে বৈষ্ণবীশক্তি আখ্যায়িত করে অভিনব বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করলেন। এখানে রাধা সাঙ্খ্যদের মূলপ্রকৃতিস্থানীয়া। যদিও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে বলা হয়েছে, কৃষ্ণ মূলপ্রকৃতিকে সৃষ্টি করে তারপর রাধাকে সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দেখা যায়, কৃষ্ণ নিজেই রাধাকে বার বার মূলপ্রকৃতি বলে সম্বোধন করছেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বেদান্তের মায়াবাদ সাঙ্খ্যে হল প্রকৃতিবাদ। প্রকৃতিবাদ থেকে শক্তিবাদ। শক্তিবাদ থেকে ব্রহ্মবৈবর্তকারের বৈষ্ণবী শক্তিবাদ। পুরাণকার লিখেছেন যে, কৃষ্ণ রাধাকে বলছেন: 'তুমি না থাকলে আমি কৃষ্ণ, তুমি থাকলে আমি শ্রীকৃষ্ণ।' বিষ্ণুপুরাণে শ্রী সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, ব্রহ্মবৈবর্তে রাধা সম্বন্ধে ঠিক তাই বলা হয়েছে। রাধা সেই শ্রী। এজন্য আমার পরিচ্ছেদের শিরোনাম শ্রীরাধা। রাধা ঈশ্বরের শক্তি, উভয়ের বিধিসম্মত পরিণয়, শক্তিমানের শক্তির পরিচয় এবং শক্তিরই প্রকাশ উভয়ের বিহার।

সুতরাং বিদ্যমান ব্রহ্মবৈবর্তে 'রাধাতত্ত্ব' কি, তা নিশ্চয়ই পাঠক বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু আদিম ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রাধা কৃষ্ণ-আরাধিকা আদর্শরূপিণী গোপী ছিলেন, সন্দেহ নেই।

উপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, বৃন্দাবনে বসবাসকালে কৃষ্ণের রাসলীলা বা হল্লীষক্রীড়া বা বস্ত্রহরণ অথবা শ্রীরাধিকার সঙ্গে প্রেমলীলা নিতান্তই কবিকল্পনা। এইসব লীলাবিস্তার করে কৃষ্ণের মহিমান্বিত চরিত্রকে অযথা কলঙ্কিত করার চেষ্টা হয়েছে। কংসবধের কথাপ্রসঙ্গে তাঁর নিজের কথা থেকে মনে হয়, কংসবধের আগে থেকেই তিনি মথুরায় বাস করতেন। ভাবুন একবার, যদি বৃন্দাবনেই না গিয়ে থাকেন, তাহলে বৃন্দাবনলীলা আসে কোথা থেকে?

যাহোক, আবার কৃষ্ণচরিত বর্ণনায় ফিরে আসি। বৃন্দাবন পর্বে কৃষ্ণ অরিষ্ট (বৃষরূপী) এবং কেশী (অশ্বরূপী) নামে দুই অসুরকে বধ করেছিলেন বলে শিশুপালের কৃষ্ণনিন্দায় দেখা যায়। অত্যাচারী কংসের ভয়ে বসুদেব তাঁর পত্নী রোহিণী ও দুই পুত্র রাম এবং কৃষ্ণকে নন্দালয়ে গোপনে রেখেছিলেন, সেকথা আমরা ইতোপূর্বে জেনেছি। কৃষ্ণের শৈশব ও কৈশোর সেখানে অতিবাহিত হয়। তিনি শৈশবে রূপলাবণ্যে ও শিশুসুলভ গুণে সকলের প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। কৈশোরে তিনি অতিশয় বলশালী ছিলেন। বৃন্দাবনের অনিষ্টকারী পশুপাখি প্রভৃতি হত্যা করে তিনি গোপবালকদের সবসময় রক্ষা করতেন। তিনি শৈশবাবধি সকল মানুষ ও জীবের প্রতি করুণাঘন ছিলেন– সবার উপকার করতেন। সবার সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করতেন, সবাইকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতেন এবং কৈশোরেই তাঁর হৃদয়ে প্রকৃত ধর্মতত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়।

দ্বি তী য় অ ধ্যা য়
মথুরা-দ্বারকা

যস্তনোতি সতাং সেতুমৃতেনামৃতযোনিনা।
ধর্মার্থব্যবহারাঙ্গৈস্তস্মৈ সত্যাত্মনে নমঃ ॥
– মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৪৭ অধ্যায়।

কংসবধ

এদিকে, কংসের কাছে খবর পৌঁছল যে, বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-বলরাম অতিশয় বলশালী হয়ে উঠেছেন। পূতনা থেকে অরিষ্ট পর্যন্ত কংসের অনুচরদের বধ করেছেন। দেবর্ষি নারদ গিয়ে কংসকে বললেন, কৃষ্ণ-বলরাম বসুদেবের পুত্র। দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত বলে যে-কন্যাকে কংস হত্যা করেছিলেন, সে নন্দ-যশোদার কন্যা। বসুদেব সন্তান পরিবর্তন করে কৃষ্ণকে নন্দালয়ে গোপনে রেখে এসেছিলেন। এসব শুনে কংস ভীত ও ক্রুদ্ধ হয়ে বসুদেবকে ভর্ৎসনা করলেন, হত্যা করতে উদ্যত হলেন। তিনি বলরাম ও কৃষ্ণকে আনবার জন্য অক্রূর নামে একজন যাদবপ্রধানকে বৃন্দাবনে পাঠালেন এবং নিজের বিখ্যাত মল্লদের দিয়ে দু'ভাইকে হত্যার জন্য ধনুর্মুখ নামে এক যজ্ঞের আয়োজন করলেন। বলরাম ও কৃষ্ণ অক্রূরের সঙ্গে সেখানে এসে রঙ্গভূমিতে ঢুকে কংসের শিক্ষিত হাতি কুবলয়াপীড়, লব্ধপ্রতিষ্ঠ মল্ল চাণূর ও মুষ্টিককে হত্যা করলেন। কংস এসব দেখে নন্দকে লোহার শেকলে বেঁধে রাখার এবং বসুদেবকে হত্যা করার আদেশ দিয়ে কৃষ্ণ-বলরামকে তাড়িয়ে দিতে বললেন। তখন যে মঞ্চে বসে কংস ও অন্যান্য যাদব মল্লযুদ্ধ দেখছিলেন, ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ একলাফে সেখানে গিয়ে কংসকে চুল ধরে টেনে মল্লভূমিতে এনে ফেললেন এবং চোখের নিমেষে হত্যা করলেন। পরে বসুদেব-দেবকী প্রভৃতি গুরুজনদের যথাবিহিত বন্দনা করে কংসের পিতা উগ্রসেনকে সিংহাসনে বসালেন। নিজে রাজা হলেন না। হরিবংশ ও পুরাণসমূহে এমন কংসবধ বৃত্তান্ত বলা হয়েছে।

কিন্তু মহাভারতের সভাপর্বে জরাসন্ধবধ পর্বে কৃষ্ণ নিজের কথা যুধিষ্টিরকে বলছেন এভাবে, 'কিছুদিন গত হলে কংস যাদবদের পরাজিত করে সহদেবা ও অনুজা নামে বার্হদ্রথের দুই কন্যাকে বিয়ে করেছিল। ঐ দুরাত্মা বাহুবলে জ্ঞাতিদের পরাজিত করে সর্বাপেক্ষা প্রধান হয়ে উঠল। ভোজবংশীয় বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়রা মূঢ়মতি কংসের দৌরাত্ম্যে ব্যথিত হয়ে জ্ঞাতিদের ত্যাগ করার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। আমি তখন অক্রূরকে আহুক-কন্যার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে জ্ঞাতিদের হিতসাধনে বলভদ্রকে সঙ্গে নিয়ে কংস ও সুনামাকে হত্যা করলাম।'

এতে কৃষ্ণ-বলরামের বৃন্দাবন থেকে মথুরায় নিয়ে আসার কোনও কথা নেই। বরং তারা কংসবধের আগে থেকেই মথুরায় বাস করতেন বলে ধারণা করা যায়। কংসবধে অন্যান্য যাদবগণ প্রকাশ্যে তাঁদের সাহায্য করুন বা না করুন, কংসকে রক্ষায় তাঁরা কেউই এগিয়ে আসেননি, এটা স্পষ্ট। কংস তাদের সবার ওপর অত্যাচার করত, এজন্য বোধহয় তারা রাম-কৃষ্ণের বলাধিক্য দেখে তাঁদের হাতে নেতৃত্ব তুলে দিয়ে কংসবধে তৎপর হয়েছিলেন।

কৃষ্ণ কংসকে হত্যা করে কংসের পিতা উগ্রসেনকে সিংহাসনে বসান। প্রচলিত রীতি ও নীতি এই যে, যে রাজাকে হত্যা করে, সেই তার রাজ্যভোগী হয়। কংসকে হত্যা করে কৃষ্ণ অনায়াসেই মথুরার

সিংহাসনে বসতে পারতেন; কিন্তু তিনি তা করলেন না, কারণ, ধর্মত সিংহাসন উগ্রসেনেরই প্রাপ্য। কংস পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করে রাজা হয়েছিলেন। কৃষ্ণ ধর্মপ্রাণ, শৈশব থেকেই ধর্মাত্মা। যাদবদের হিতসাধনে তিনি কংসবধে অগ্রসর হয়েছিলেন। কংসকে হত্যা করে করুণ হৃদয় আদর্শ পুরুষ কৃষ্ণ কংসের জন্য বিলাপ করেছিলেন। কংসবধে আমরা দেখি, কৃষ্ণ পরম বলশালী, পরম কার্যাদক্ষ, পরম ন্যায়পরায়ণ, পরম ধর্মাত্মা, পরিহিতে ব্রতী এবং পরের জন্য কাতর। এখানে তাঁকে আমরা আদর্শ মানুষ হিসেবে পাই।

শিক্ষালাভ

পুরাণে বলা হয়েছে যে, কংসবধের পর কৃষ্ণ-বলরাম কাশীতে সান্দীপনি ঋষির কাছে শিক্ষাগ্রহণের জন্য গেলেন। সেখানে চৌষট্টি দিনের মধ্যে অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত হয়ে গুরুদক্ষিণা দিয়ে মুথরায় ফিরে এলেন। কৃষ্ণের শিক্ষা সম্বন্ধে এছাড়া পুরাণেতিহাসে আর কিছু পাওয়া যায় না। নন্দের গৃহে তাঁর কোনওপ্রকার শিক্ষা হওয়ার কোন প্রসঙ্গ কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। অথচ নন্দ জাতিতে বৈশ্য ছিলেন, বৈশ্যদের বেদে অধিকার ছিল। বৈশ্যের গৃহে তাঁদের কোনও প্রকার বিদ্যশিক্ষা না হওয়া বিচিত্র বটে। বোধহয়, শিক্ষার সময় উপস্থিত হওয়ার আগেই তিনি নন্দের গৃহ থেকে পুনরায় মথুরায় আনীত হয়েছিলেন। ইতোপূর্বে মহাভারত থেকে যে কৃষ্ণবাক্য উদ্ধৃত করা হয়েছে, তাতে এমন অনুমানই সঙ্গত যে, কংসবধের অনেক আগে থেকেই তিনি মথুরায় বাস করছিলেন এবং মহাভারতের সভাপর্বে শিশুপালের কৃষ্ণনিন্দায় দেখা যায়, শিশুপাল তাঁকে কংসের অন্নভোজী বলে তিরস্কার করে বলছেন,

যস্য চানেন ধর্মজ্ঞ ভুক্তমন্নং বলীয়সঃ।
স চানেন হতঃ কংস ইত্যেতন্ন মহাদ্ভুতং ॥
– মহাভারত, সভাপর্ব, ৪০ অধ্যায়।

অতএব বোধহয়, শিক্ষার সময় উপস্থিত হতে না হতেই কৃষ্ণ মথুরায় আনীত হয়েছিলেন। বৃন্দাবনের গোপীদের সঙ্গে তাঁর কৈশোরলীলা যে উপন্যাসমাত্র, এটা তার অন্যতর প্রমাণ। হয়তো তাঁরা কংসবধের অনেক আগে থেকেই মথুরায় অবস্থান করছিলেন। সান্দীপনি ঋষির কাছে ছাড়াও তিনি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন এবং নিখিল বেদ-বেদাঙ্গ পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি আঙ্গিরসবংশীয় ঘোর ঋষির কাছ বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন বলে ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রমাণ পেয়েছি।

সে-সময় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের উচ্চশিক্ষার উপরিভাগকে তপস্যা বলা হত। তপস্যা বলতে আমরা বনে গিয়ে চক্ষু বুজে নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে ঈশ্বরের ধ্যান করা বুঝি, সে-সময় তা বুঝাত না। তপস্যা বলতে তখন চিত্ত সমাহিত করে আপনার শক্তিসমূহের অনুশীলন ও স্ফূরণ করা বুঝাত। কৃষ্ণ দশবছর হিমালয় পর্বতে তপস্যা করেছিলেন। মহাভারতের ঐশিক পর্বে আছে, অশ্বত্থামার ব্রহ্মশিরা অস্ত্রে উত্তরার গর্ভপাতের আশংকা দেখা দিলে কৃষ্ণ সেই মৃত শিশুকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রতিজ্ঞা করে অশ্বত্থামাকে বলছেন, 'তুমি আমার তপোবল দেখবে।'

জরাসন্ধ

দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে অন্তত ভারতবর্ষের উত্তরার্ধে এক একজন সম্রাট থাকতেন, তাঁর প্রাধান্য অন্য রাজারা স্বীকার করে নিতেন। কেউ-বা করদ, কেউ-বা আজ্ঞানুবর্তী, এবং যুদ্ধকালে সবাই সম্রাটের সহায় হতেন। আমরা যে-সময়ের বর্ণনা করছি, সে-সময়ে মগধের অধিপতি বিখ্যাত জরাসন্ধ ছিলেন উত্তর-ভারতের সম্রাট। পশ্চিম-ভারতে মথুরার অত্যাচারী কংস ছিলেন জরাসন্ধের জামাতা; মধ্য-ভারতে চেদিরাজ শিশুপাল ছিলেন তাঁর ডানহাত। পূর্বাঞ্চলে শোণিতপুরের বাণ, অধুনা বাঙলার পশ্চিমভাগে অবস্থিত পুণ্ড্র রাজ্যের বাসুদেব প্রভৃতি পরাক্রান্ত রাজারা ছিলেন জরাসন্ধের অনুগত। এঁদের ভয়ে উত্তর-ভারতের পলায়নপর রাজারা পশ্চিম ও দক্ষিণদেশে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। জরাসন্ধের বল-প্রতাপের কথা মহাভারত, হরিবংশ ও পুরাণসমূহে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সব ক্ষত্রিয় একত্রিত হয়েছিলেন এবং সেখানে উভয় পক্ষে মোটে ১৮ অক্ষৌহিণী সেনা উপস্থিত ছিল। আর একা জরাসন্ধের ছিল ২০ অক্ষৌহিণী সেনা। ১ অক্ষৌহিণী সেনাদলে ৬৫ হাজার ৬১০টি ঘোড়া, ২১ হাজার ৮৭০টি হাতি, ২১ হাজার ৮৭০টি রথ এবং ১ লাখ ৯ হাজার ৩৫০ পদাতিক সৈন্য থাকে।

কংস জরাসন্ধের দুই কন্যা সহদেবা ও অনুজাকে বিয়ে করেছিলেন। কংসবধের পর তাঁর বিধবা কন্যারা জরাসন্ধের কাছে গিয়ে পতিহন্তার দমনে কান্নাকাটি শুরু করেন। জরাসন্ধ কৃষ্ণবধের জন্য সৈন্যসামন্ত নিয়ে মথুরা অবরোধ করেন। জরাসন্ধের অসংখ্য সৈন্যের তুলনায় যাদবদের সৈন্য অতি অল্প। কৃষ্ণের সেনাপতিত্বগুণে যাদবেরা জরাসন্ধকে বিমুখ করলেন। কিন্তু জরাসন্ধের বলক্ষয় করা তাদের অসাধ্য। কেন-না, জরাসন্ধের সৈন্য অগণন। জরাসন্ধ বারবার মথুরা আক্রমণ করতে লাগলেন। প্রতিবারই তাদের বিমুখ করা হল। কিন্তু এই পুনঃ পুনঃ আক্রমণে যাদবদের সৈন্যক্ষয় হতে হতে তারা সৈন্যশূন্য হওয়ার উপক্রম হলেন। কিন্তু সমুদ্রে জোয়ার-ভাটার মত জরাসন্ধের অগাধ সৈন্যের ক্ষয়বৃদ্ধি কিছু জানতে পারা গেল না। এভাবে সতেরবার আক্রান্ত হবার পর যাদবেরা কৃষ্ণের পরামর্শে মথুরা ত্যাগ করে দুরাক্রম প্রদেশে দুর্গনির্মাণ করে বাস করার অভিপ্রায় করলেন। সাগরদ্বীপ দ্বারকায় যাদবদের জন্য পুরী নির্মিত হতে লাগল এবং দুরারোহ রৈবতক পর্বতে দ্বারকা রক্ষার্থে দুর্গশ্রেণী স্থাপন করা হল। কিন্তু তাঁরা দ্বারকা যাবার আগেই জরাসন্ধ অষ্টাদশবারের মত মথুরা আক্রমণ করতে এলেন।

এ সময় জরাসন্ধের উত্তেজনায় আরেক প্রবল শত্রু কৃষ্ণকে আক্রমণ করার জন্য উপস্থিত হল। তার নাম কালযবন। পুরাকালে শক, হুন, গ্রিক প্রভৃতি জাতিমাত্রকেই যবন বলা হত। সে-সময় কালযবন নামে একজন যবন রাজা ভারতবর্ষে প্রবলপ্রতাপ হয়ে উঠেছিল। সে এসে সসৈন্যে মথুরা অবরোধ করল। কিন্তু পরম সমররহস্যবিদ কৃষ্ণ তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইলেন না। কেন-না ক্ষুদ্র যাদবসেনা তার সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে বিমুখ করলেও সংখ্যায় কম বড় হয়ে যাবে। অবশিষ্ট যা থাকবে তা দিয়ে জরাসন্ধকে বিমুখ করা অসম্ভব হয়ে উঠবে ভেবে কৃষ্ণ সসৈন্যে কালযবনের সম্মুখীন না হয়ে একাকী তার শিবিরে উপস্থিত হলেন। কালযবন তাঁকে চিনতে পারল। কৃষ্ণকে ধরবার জন্য হাত বাড়ালে তিনি ধরা না দিয়ে পালিয়ে গেলেন। কালযবন তাঁর পিছু নিল। কৃষ্ণ যেমন বেদে বা যুদ্ধবিদ্যায় সুপণ্ডিত, শারীরিক ব্যায়ামেও তেমনি পারঙ্গম। কালযবন কৃষ্ণকে ধরতে পারল না। কৃষ্ণ গিয়ে একটি পর্বতগুহায় প্রবেশ করলেন। কালযবনও তাঁকে অনুসরণ করে পর্বতগুহায় ঢুকল। কৃষ্ণ দ্বৈরথে তাকে হত্যা করলেন। কালযবন নিহত হলে তার সকল সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়ে মথুরা ত্যাগ করল।

তারপর জরাসন্ধ অষ্টাদশবার আক্রমণ করলে সেবারও বিমুখ

হলেন। এ বর্ণনা হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণাদির। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের কাছে শ্রীকষ্ণ জরাসন্ধের যে পরিচয় দিচ্ছেন, তাতে দেখা যায়, জরাসন্ধ একবার মথুরা আক্রমণ করতে এসেছিলেন, কিন্তু হংস নামে তার এক অনুগত বীর বলদেবের হাতে নিহত হওয়ায় জরাসন্ধ দুঃখিত মনে ফিরে গিয়েছিলেন।

কৃষ্ণ বলছেন, 'হংস নামে সুবিখ্যাত এক নরপতি ছিলেন। বলদেব তাঁকে সংগ্রামে নিহত করেন। ডিম্বক লোকমুখে হংস মরেছে, এই কথা শুনে একই নামে তার সহচর হংস নিহত হয়েছে ভেবে, 'হংস ছাড়া আমার জীবন ধারণে প্রয়োজন নেই' বিবেচনা করে যমুনার ডুবে প্রাণত্যাগ করে। এদিকে, তার সহচর হংসও পরম বন্ধু ডিম্বকের অকাল মৃত্যুর সংবাদে অতিশয় দুঃখিত হয়ে যমুনার জলে প্রাণ বিসর্জন দেয়। জরাসন্ধ এই দুই বীরের মৃত্যু সংবাদ শুনে দুঃখিত ও শূন্যমনে নিজের রাজধানীতে ফিরে গেলেন। জরাসন্ধ বিমনা হয়ে স্বপুরে চলে গেলে আমরা পরম আহ্লাদে মথুরায় বাস করতে লাগলাম।

'কিছুদিন পর পতিবিয়োগ দুঃখিনী জরাসন্ধ কন্যারা পিতার কাছে গিয়ে 'আমার পতিহন্তাকে সংহার কর' বলে কেঁদে-কেটে বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন। আমরা আগেই জরাসন্ধের বলবিক্রমের কথা শুনেছিলাম, এখন তা স্মরণ করে খুব উৎকণ্ঠিত হলাম। তখন আমরা আমাদের বিপুল ধনসম্পত্তি ভাগ করে সবাই কিছু কিছু নিয়ে স্বস্থান ত্যাগ করে পশ্চিম দিকে পালিয়ে গেলাম। ঐ পশ্চিম দেশে রৈবতক পর্বতশোভিত পরম রমণীয় কুশস্থলী নামে পুরীতে বাস করছি– সেখানে এমন দুর্গ নির্মাণ করেছি যে, সেখানে থেকে বৃষ্ণিবংশীয় মহারথীরা তো বটেই, স্ত্রীলোকেরাও অনায়াসে যুদ্ধ করতে পারে। হে রাজন! এখন আমরা নির্ভয়ে ঐ নগরীর মধ্যে বাস করছি। মাধবগণ মগধদেশব্যাপী সেই সর্বশ্রেষ্ঠ রৈবতক পর্বত দেখে খুব খুশি হলেন। হে কুরুকুল প্রদীপ! আমরা সামর্থ্যযুক্ত হয়েও জরাসন্ধের উপদ্রবভয়ে পর্বতে আশ্রয় নিয়েছি। এ পর্বত দৈর্ঘ্যে ৩ যোজন [এক যোজন= ৪ ক্রোশ। এক ক্রোশ= ৪০০০ গজ, অর্থাৎ ৩ যোজন= ৩চ৪চ৪০০০= ৪৮,০০০ গজ] অর্থাৎ ২৭.২৭ মাইল এবং প্রস্থে ১ যোজনের (অর্থাৎ ৯.০৯ মাইল) বেশি এবং ২১টি শৃঙ্গবিশিষ্ট। তাতে এক যোজন পর পর শত শত দ্বার এবং উন্নত তোরণ সন্নিবেশিত। যুদ্ধে দুর্ধর্ষ মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়রা সেখানে বাস করছেন। হে রাজন! আমাদের কুলে ১৮ হাজার ভাই আছে। আহুকের একশো পুত্র, তারা সবাই অমরতুল্য। চারুদেষ্ণ ও তাঁর ভাই, চক্রদেব, সাত্যকি, আমি, বলভদ্র, যুদ্ধবিশারদ শাম্ব– আমরা এই সাতজন রথী; কৃতবর্মা, অনাবৃষ্টি, সমীক, সমিতিঞ্জয়, কক্ষ, শঙ্কু ও কুন্তি– এই সাতজন মহারথ এবং অন্ধক ভোজের দুই বৃদ্ধ পুত্র ও রাজা এই মহাবলশালী দৃঢ় কলেবর ১০ জন মহাবীর– এঁরা সবাই জরাসন্ধ অধিকৃত মধ্যম দেশ স্মরণ করে যদুবংশীয়দের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন।'

জরাসন্ধ একবার মথুরা আক্রমণে এসেছিলেন এবং নিষ্ফল হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার আক্রমণের আশংকা ছিল, কিন্তু কৃষ্ণ দেখলেন যে, চতুর্দিকে সমতল ভূমির মধ্যবর্তী মথুরা নগরীতে বাস করে জরাসন্ধের অসংখ্য সৈন্যদের বারংবার অবরোধ নিষ্ফল করা যাবে না। তাই যেখানে দুর্গ নির্মাণ করলে দুর্গাশ্রয়ে ক্ষুদ্র সেনা রক্ষা করে জরাসন্ধকে বিমুখ করা যাবে, সেখানে রাজধানী স্থানান্তর করলেন। দেখেশুনে জরাসন্ধ আর ঘেঁষলেন না।

কৃষ্ণের বিবাহ

কৃষ্ণ বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণীকে বিবাহ করেন। রুক্মিণী অতিশয় রূপবতী ও গুণবতী শুনে কৃষ্ণ ভীষ্মকের কাছে গিয়ে রুক্মিণীকে বিবাহের জন্য প্রার্থনা করলেন। রুক্মিণীও কৃষ্ণের অনুরক্তা ছিলেন। কিন্তু ভীষ্মক কৃষ্ণের শত্রু জরাসন্ধের পরামর্শে রুক্মিণীকে কৃষ্ণের হাতে সমর্পণ করতে রাজি হলেন না। তিনি কৃষ্ণদ্বেষক চেদিরাজ শিশুপালের সঙ্গে রুক্মিণীর বিয়ে ঠিক করে সমস্ত রাজাদের নিমন্ত্রণ করলেন। যাদবদের এ বিয়েতে নিমন্ত্রণ করা হল না। কৃষ্ণ স্থির করলেন, যাদবদের সঙ্গে নিয়ে ভীষ্মকের রাজধানীতে যাবেন এবং রুক্মিণীকে বিয়ে করবেন।

বিয়ের দিন রুক্মিণী দেবমন্দিরে পূজা দিতে গেলে কৃষ্ণ সেখান থেকে তাঁকে রথে তুলে নিলেন। ভীষ্মক ও তার পুত্ররা এবং জরাসন্ধ প্রভৃতি ভীষ্মকের মিত্র রাজারা কৃষ্ণের আগমন সংবাদ শুনে এমন ঘটনা ঘটতে পারে আশংকায় প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। তাঁরা সসৈন্যে কৃষ্ণের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। কিন্তু কেউই কৃষ্ণ ও যাবদবের পরাভূত করতে পারলেন না। কৃষ্ণ রুক্মিণীকে দ্বারকায় নিয়ে গিয়ে যথাশাস্ত্র বিয়ে করলেন।

একে 'হরণ' বলে। কিন্তু 'হরণ' কথাটা মৌলিক মহাভারতে কোথাও নেই। হরিবংশে ও পুরাণে আছে। শিশুপাল ভীষ্মকে তিরস্কারের সময় কাশিরাজের কন্যাহরণের জন্য তাঁকে গালি দিয়েছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকে তিরস্কারের সময় রুক্মিণীহরণের কোন কথা তোলেননি। রুক্মিণীকে শিশুপাল প্রার্থনা করেছিলেন বটে, কিন্তু ভীষ্মক রুক্মিণীকে কৃষ্ণকেই সম্প্রদান করেছিলেন বলে মনে হয়। রুক্মিণীর বড় ভাই রুক্মী এতে অপমানিত বোধ করলেন। তিনি শিশুপালের পক্ষ নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হলেন। তিনি অতিশয় কলহপ্রিয় ছিলেন। পরে অনিরুদ্ধের বিবাহকালে বলরামের হাতে পাশা খেলাজনিত বিবাদে তিনি প্রাণ হারান। কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ।

এ সময় আধুনিক বাঙলা দেশের পশ্চিমভাগে পৌণ্ড্রক বাসুদেব নামে একজন অনার্য রাজা ছিলেন। তিনি নিজেকে ঈশ্বরের অবতার ও দ্বারকা নিবাসী কৃষ্ণকে জাল বাসুদেব বলে প্রচার করতে শুরু করেন। তিনি কৃষ্ণকে বলে পাঠালেন, শঙ্খ-চক্র-পদ্ম প্রভৃতি যে-সব চিহ্নে আমার প্রকৃত অধিকার, তুমি নিজে এসে সে-সব আমাকে দিয়ে যাবে। কৃষ্ণ 'তথাস্তু' বলে পৌণ্ড্ররাজ্যে গিয়ে চক্র প্রভৃতি অস্ত্র নিক্ষেপ করে পৌণ্ড্রকের প্রাণনাশ করলেন। বারাণসীর আধপতিরা পৌণ্ড্রকের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। পৌণ্ড্রকের মৃত্যুর পর তারা কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কৃষ্ণ বারাণসী আক্রমণ করে শত্রুদের সংহার করেন এবং বারাণসীতে আগুন ধরিয়ে দেন।

দ্বারকায় কৃষ্ণ রাজা ছিলেন না। যাদববীরেরা সমাজের অধিনায়ক ছিলেন, পরস্পরের প্রতিস্পর্ধী ছিলেন। তাঁরা বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রধান বিবেচনা করতেন, সে জন্য উগ্রসেনের রাজা নাম। কিন্তু এ ধরনের প্রধান ব্যক্তির কার্যত তেমন কর্তৃত্ব থাকত না। যে বুদ্ধিবিক্রমে প্রধান, নেতৃত্ব তার হাতেই থাকত। কৃষ্ণ যাদবদের মধ্যে বলবীর্য বুদ্ধিবিক্রমে সর্বশ্রেষ্ঠ, এজন্যই তিনি যাদবদের নেতাস্বরূপ ছিলেন। তাঁর অগ্রজ বলরাম, কৃতবর্মা প্রভৃতি বয়োজ্যেষ্ঠ যাদবেরা তাঁর বশীভূত ছিলেন। কৃষ্ণ সবসময় তাঁদের মঙ্গল কামনা করতেন। কৃষ্ণই তাঁদের রক্ষা করতেন এবং তিনি বহু রাজ্য জয় করলেও জ্ঞাতিদের না দিয়ে নিজে কোন ঐশ্বর্য ভোগ করতেন না। তিনি সবাইকে সমান ভালবাসতেন; সকলেরই কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত থ

াকতেন। জ্ঞাতিদের প্রতি আদর্শ মানুষের যেমন ব্যবহার কর্তব্য, কৃষ্ণ সবসময় তা করতেন। কিন্তু জ্ঞাতিভাব চিরকালই সমান। তাঁর বলবিক্রমের ভয়ে জ্ঞাতিরা তাঁর বশীভূত ছিল বটে, কিন্তু তাঁর প্রতি হিংসাশূন্য ছিল না। এ বিষয়ে কৃষ্ণ নিজে নারদকে যা বলেছিলেন, ভীষ্ম তা নারদের মুখে শুনে যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন, কথাগুলো সত্য হোক মিথ্যা হোক, লোকশিক্ষার জন্য আমরা শান্তিপর্ব থেকে তা উদ্ধৃত করছি:

'জ্ঞাতিদের ঐশ্বর্যের অর্ধেক প্রদান ও তাদের কটুবাক্য শুনে তাদের দাসের মত আছি। আগুনের জন্য যেমন লোকে অরণিকাঠ ঘষে, তেমনি জ্ঞাতিদের দুর্বাক্য আমার হৃদয়কে পোড়ায়। বলদেব গদাকুশলতায় এবং আমার আত্মজ প্রদ্যুম্ন অতুল সৌন্দর্যে লোকসমাজে অদ্বিতীয় বলে প্রতিপন্ন হয়েছেন। আর অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়রাও মহাবলশালী, উৎসাহী ও অধ্যবসায়ী; তাঁরা যার সহায়তা না করেন, সে বিনষ্ট হয় এবং যার সহায়তা করেন, সে অনায়াসে অসামান্য ঐশ্বর্য লাভ করে থাকে। ঐসব ব্যক্তি আমার পক্ষে থাকতেও আমি অসহায়ের মত কাল কাটাচ্ছি। আহুক ও অক্রূর আমার পরম সুহৃৎ, কিন্তু তাদের একজনকে স্নেহ করলে, অন্যে রেগে যায়; সেজন্য আমি কারও প্রতি স্নেহ প্রকাশ করি না। আবার প্রীতিবশত তাদের ত্যাগ করতেও পারি না। তারপর আমি ঠিক করলাম যে, আহুক ও অক্রূর যার পক্ষে, তার দুঃখের সীমা নেই, আর তাঁরা যার পক্ষ নন, তার চেয়েও দুঃখী আর কেউ নেই। যাহোক, এখন আমি উভয়েরই জয় প্রার্থনা করছি। হে নারদ! আমি ঐ দুই মিত্রকে আয়ত্ত করার জন্য এমন কষ্ট পাচ্ছি।'

বিভিন্ন লীলাবিস্তার ও রাধিকাবিলাস ছাড়াও স্যমন্তক মণি প্রসঙ্গে কৃষ্ণের বহুবিবাহের কথা এসে পড়ে। এটি একটি বহু চর্চিত লোকপ্রবাদ যে, কৃষ্ণের ষোল হাজার একশো এক মহিষী ছিলেন। মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত অংশ, বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশে তাঁর বহুবিবাহ বিষয়ে নানা অনৈসর্গিক অলীক ব্যাপারের অবতারণা করা হয়েছে। কৃষ্ণ একাধিক বিবাহ করেছিলেন কি না, সে বিষয়ে কোন গ্রহণযোগ্য প্রমাণ নেই। ভল্লুকদৌহিত্র শাম্বর কথা বাদ দিলে রুক্মিণী ছাড়া আর কোনও কৃষ্ণ-মহিষীর পুত্র-পৌত্রকে কার্যক্ষেত্রে কোথাও দেখা যায় না। রুক্মিণীরই একটি পুত্রসন্তানের উল্লেখ পাই, যার নাম প্রদ্যুম্ন। রুক্মিণীবংশই রাজা হল, আর কারও বংশের কেউ কোথাও রইল না। শাম্বর মায়ের নাম জাম্ববতী, তিনি ভল্লুক জাম্ববানের কন্যা। কৃষ্ণ স্যমন্তক মণি উদ্ধারকালে জাম্ববতীকে বিবাহ করেছিলেন বলে বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশে উল্লেখ আছে। কিন্তু কৃষ্ণ ভল্লুককন্যাকে বিবাহ করেছিলেন, একথা বিশ্বাস করা কঠিন।

তৃতীয় অধ্যায়
ইন্দ্রপ্রস্থ

অকুণ্ঠং সর্বকার্যেষু ধর্মকার্যার্থমুদ্যতম্।
বৈকুণ্ঠস্য চ যদ্রূপং তস্মৈ কার্যাত্মনে নমঃ ॥
– মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৪৭ অধ্যায়।

দ্রৌপদীস্বয়ংবর

মহাভারতে কৃষ্ণের প্রথম উল্লেখ দেখা যায় দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে। দ্রুপদরাজের কন্যা দ্রৌপদীর বিয়ে উপলক্ষে স্বয়ংবর সভার আয়োজন করা হয়। অন্যান্য ক্ষত্রিয়দের মত তিনি ও অন্যান্য যাদবেরা নিমন্ত্রিত হয়ে পাঞ্চালে এসেছিলেন। তবে অন্যান্য ক্ষত্রিয়রা দ্রৌপদী-আকাঙ্ক্ষায় লক্ষ্যবেধের প্রয়াস পেয়েছিলেন, কিন্তু যাদবদের কেউ সে-চেষ্টা করেননি। পাণ্ডবেরা এ সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। তবে নিমন্ত্রিত হয়ে নয়। দুর্যোধন তাঁদের প্রাণহানির চেষ্টা করেছিলেন। এজন্য তাঁরা আত্মরক্ষার জন্য ছদ্মবেশে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। এখন দ্রৌপদীর স্বয়ংবরের কথা শুনে ছদ্মবেশে সেখানে উপস্থিত হলেন।

এই সমবেত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়মণ্ডলের মধ্যে কৃষ্ণই ছদ্মবেশী পাণ্ডবদের চিনতে পারেন। অর্জুনের শরযোজনা দেখে তিনি বলদেবকে বলেন, 'মহাশয়, যিনি এই বিস্তীর্ণ ধনুক আকর্ষণ করছেন, ইনিই অর্জুন, তাতে সন্দেহ নেই। আর যিনি বাহুবলে গাছ উপড়ে নির্ভয়ে রাসমণ্ডলে এলেন, ইনি বৃকোদর।' কৃষ্ণ অন্যদের তুলনায় তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন বলে তাদের চিনতে পেরেছিলেন।

এরপর অর্জুন লক্ষ্য বিঁধলে সমাগত রাজাদের সঙ্গে তাঁর বিবাদ বেধে গেল। অর্জুন ব্রাহ্মণবেশধারী ভিক্ষুক। একজন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ তাবড় তাবড় রাজাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে যাবে, এ তাঁদের সহ্য হল না। তাঁরা অর্জুনকে আক্রমণ করলেন। যতদূর যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে অর্জুনই জয়ী হয়েছিলেন। কৃষ্ণের কথায় যুদ্ধ থামে। মহাভারতে এইটুকু কৃষ্ণের প্রথম কাজ। তিনি কীভাবে বিবাদ মিটিয়েছিলেন, সে কথা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য। বিবাদ মেটাবার অনেক উপায় ছিল। তিনি নিজে বিখ্যাত বীরপুরুষ এবং বলদেব, সাত্যকি প্রভৃতি অদ্বিতীয় বীরেরা তাঁর সহায় ছিলেন। অর্জুন তাঁর আত্মীয়– পিসির ছেলে। তিনি যাদবদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের সাহায্যে নামলে, তখনই বিবাদ মিটে যেত। কিন্তু কৃষ্ণ আদর্শ ধার্মিক, যা বিনাযুদ্ধে মিটে যেতে পারে, তার জন্যে তিনি যুদ্ধে কেন প্রবৃত্ত হবেন? নিজের ও পরের রক্ষায় যুদ্ধ ধর্ম, যুদ্ধ না করাই অধর্ম। আর ধর্মস্থাপনে তাঁর যুদ্ধে আপত্তি ছিল না। যেখানে যুদ্ধ ছাড়া ধর্মের উন্নতি নেই, সেখানে যুদ্ধ না করাই অধর্ম। এখানেও তিনি যুদ্ধের কথা মনে আনলেন না। তিনি বিবদমান রাজাদের বললেন, 'ভূপালবৃন্দ! এঁরাই রাজকুমারীকে ধর্মত লাভ করেছিলেন, তোমরা ক্ষান্ত হও, আর যুদ্ধের প্রয়োজন নেই।' সে-কালের ক্ষত্রিয় রাজারা ধর্মভীত ছিলেন। তাৎক্ষণিক রাগান্ধ হয়ে তাঁরা ধর্মের কথা ভুলে গিয়েছিলেন– কৃষ্ণের কথা শুনে নিরস্ত্র হলেন। কোন বাজে লোক দৃপ্ত রাজাদের ধর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে, তাঁরা যুদ্ধে বিরত হতেন না। কিন্তু যিনি ধর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, তিনি মহাবলশালী এবং গৌরবান্বিত। তিনি জ্ঞান, ধর্ম ও বাহুবলে সকলের প্রধান ছিলেন। সুতরাং তাঁর কথা সবাই মেনে নিলেন।

অর্জুন লক্ষ্য বিঁধে রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে ইতি টেনে ভাইদের নিয়ে আশ্রমে ফিরে গেলেন। কৃষ্ণ বলদেবকে সঙ্গে নিয়ে ভার্গবকর্মশালায় ভিক্ষুক বেশধারী পাণ্ডবদের বাসস্থানে গিয়ে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরের চরণ বন্দনা করে নিজের পরিচয় দিলেন। বলদেবও কৃষ্ণের অনুরূপ করলেন। যুধিষ্ঠির তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি আমাদের কীভাবে চিনলে?' তিনি উত্তর দিলেন, 'ভস্মাচ্ছাদিত আগুন কি লুকানো থাকে?' এই প্রথম তাঁদের সাক্ষাৎ ও পরিচয়। তিনি যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সদালাপ ও তার মঙ্গল কামনা করে ফিরে এলেন। তারপর পাণ্ডবদের বিয়ে শেষ হওয়া পর্যন্ত নিজের শিবিরে অবস্থান করতে লাগলেন। বিবাহ শেষ হলে তিনি কৃতদার পাণ্ডবদের যৌতুক হিসেবে বৈদূর্যমণি, স্বর্ণালংকার, বিভিন্ন দেশের মহার্ঘ কাপড়,

রমণীয় শয্যা, বিবিধ গৃহসামগ্রী, বহু দাসদাসী, সুশিক্ষিত হাতি, উৎকৃষ্ট ঘোড়া, অসংখ্য রথ এবং কোটি কোটি সোনা-রূপার টাকা একত্র করে পাঠালেন। এসব তখন পাণ্ডবদের ছিল না। অথচ এসবে তাঁদের বিশেষ প্রয়োজন, কেন-না তাঁরা রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করে গৃহী হয়েছেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের পাঠানো দানসামগ্রী পরম আহ্লাদে গ্রহণ করলেন। কাজটা হয়তো সামান্য। যুধিষ্ঠির কুটুম্ব; যদি কৃষ্ণের সঙ্গে তার আগে থেকে পরিচয়, প্রণয় ও ভালবাসা

থাকত, তাহলে এমন কাজকে ভদ্রজনোচিত বলে ক্ষান্ত হতে পারতাম, কিন্তু অপরিচিত দরিদ্র কুটুম্বকে খুঁজে বের করে উপকার করা নিঃসন্দেহে বড় কাজ। বড় মনের পরিচায়ক।

দ্রৌপদীর সঙ্গে বিবাহের পর পাণ্ডবেরা স্বরূপে প্রকাশিত হলে ধৃতরাষ্ট্র কুরুবংশের পরিত্যক্ত জঙ্গলাকীর্ণ রাজধানী খাণ্ডবপ্রস্থ সংস্কার করে সেখানে তাদের বসবাসের নির্দেশ দিলেন এবং অর্ধেক রাজ্য প্রদান করলেন। পাণ্ডবেরা সংস্কারকৃত খাণ্ডবপ্রস্থের নতুন নামকরণ করলেন ইন্দ্রপ্রস্থ এবং সেখানে সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন। কোনও কারণে অর্জুন ১২ বছরের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থ ছেড়ে বিদেশে যান। বিভিন্ন দেশ ঘুরে শেষে তিনি দ্বারকায় এসে উপস্থিত হন। যাদবেরা তাঁকে বিশেষ সমাদর ও সৎকার করেন। অর্জুন কিছুদিন সেখানে থাকলেন। একদা যাদবেরা রৈবতক পর্বতে এক মহোৎসবের আয়োজন করেন। সেখানে যদুবীর ও যদুকুলবধূরা উপস্থিত হয়ে আমোদ-আহ্লাদ করছিলেন। অন্যান্য স্ত্রীলোকদের মধ্যে সুভদ্রাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কুমারী ও বালিকা। অর্জুন তাঁকে দেখে মুগ্ধ হলেন। কৃষ্ণ তা জানতে পেরে বললেন, 'সখা! বনচর হয়েও অনঙ্গশরে চঞ্চল হলে?' অর্জুন অপরাধ স্বীকার করে সুভদ্রা যাতে তাঁর মহিষী হন সে ব্যাপারে কৃষ্ণের পরামর্শ চাইলেন। কৃষ্ণ পরামর্শ দিয়ে বললেন, 'অর্জুন! স্বয়ংবরই ক্ষত্রিয়দের বিধেয় কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রবৃত্তির কথা কিছুই বলা যায় না, সুতরাং সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আর ধর্মশাস্ত্রকাররা বলেন, বিয়ের উদ্দেশ্যে বলপূর্বক হরণ করাও মহাবীর ক্ষত্রিয়দের প্রশংসনীয় কাজ। অতএব স্বয়ংবরকাল উপস্থিত হলে তুমি আমার ভগ্নিকে বলপূর্বক হরণ করে নিয়ে যাবে; কারণ স্বয়ংবরকালে সে কার প্রতি অনুরক্ত হবে, কে বলতে পারে?'

অর্জুন কৃষ্ণের সঙ্গে পরামর্শের পর যুধিষ্ঠির ও কুন্তীর অনুমতি আনতে দূত পাঠালেন। তাঁদের অনুমতি পেলে, একদিন সুভদ্রার রৈবতক পর্বত প্রদক্ষিণ করে দ্বারকায় ফিরবার পথে অর্জুন তাঁকে বলপূর্বক রথে তুলে নিয়ে চলে গেলেন।

আধুনিক বিচারে কাজটি নিন্দার্হ বটে। কিন্তু বড় ভাই ও বংশের শ্রেষ্ঠ হিসেবে অর্জুনের মত সৎপাত্রে সুভদ্রাকে অর্পণ করায় সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হবে বলে কৃষ্ণ মনে করেছিলেন। কুমারী ও বালিকা বলেই হয়তো সুভদ্রা অর্জুনের প্রতি ইচ্ছা-অনিচ্ছা কিছু প্রকাশ করেননি। প্রাচীন ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয়দের মধ্যে গান্ধর্ব্য ও রাক্ষস বিবাহ প্রচলিত ছিল। বরকনে উভয়ের অনুরাগঘটিত বিবাহ গান্ধর্ব্য, সে বিবাহ 'কামসম্ভব'। সুভদ্রার অনুরাগের অভাবে সে বিবাহ অসম্ভব। কাজেই রাক্ষস বিবাহ অর্থাৎ হরণপূর্বক বিবাহ ছাড়া অর্জুনের গত্যন্তর ছিল না।

অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করে নিয়ে গেছেন শুনে ক্ষুব্ধ যাদবেরা রণসজ্জা করছিলেন। বলদেব বললেন, অত গণ্ডগোল করার আগে কৃষ্ণ কি বলেন শোনা যাক। কৃষ্ণ চুপ করে আছেন দেখে বলদেব রাগ করে বললেন, 'অর্জুন আমাদের বংশের অপমান করছেন, এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কী?' কৃষ্ণ বললেন, 'অর্জুন আমাদের কুলের অবমাননা করেননি বরং সমধিক রক্ষাই করেছেন। তিনি তোমাদের অর্থলোভী ভাবেননি বলে অর্থ দিয়ে সুভদ্রাকে গ্রহণ করার চেষ্টা করেননি। স্বয়ংবরে কন্যালাভ অতীব দুরূহ ব্যাপার, এ জন্য তাতে সম্মত হননি। আর বাবা-মায়ের অনুমতি নিয়ে কন্যার পাণিগ্রহণ তেজস্বী ক্ষত্রিয়ের প্রশংসনীয় নয়। তাই আমার মনে হচ্ছে, কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় সবদিক বিবেচনা করে বলপূর্বক সুভদ্রাকে হরণ করেছেন। এই সম্বন্ধ আমাদের কুলোচিত হয়েছে এবং কুলশীল বিদ্যা ও বুদ্ধিসম্পন্ন পার্থ বলপূর্বক সুভদ্রাকে হরণ করেছেন বলে সুভদ্রাও যশস্বিনী হবেন, সন্দেহ নেই।'

এখানে কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়দের চার ধরনের বিবাহের কথা বলেছেন– এক. অর্থ (বা শুল্ক) দিয়ে বিবাহ (আসুর); দুই. স্বয়ংবর; তিন. বাবা-মায়ের সম্প্রদানকৃত কন্যার সঙ্গে বিবাহ (প্রাজাপত্য) এবং চার. বলপূর্বক হরণ (রাক্ষস)। এর মধ্যে প্রথমটিতে কন্যাকুলের অকীর্তি ও অযশ, দ্বিতীয়ের ফল অনিশ্চিত, তৃতীয়ে বরের অগৌরব। কাজেই চতুর্থই এখানে একমাত্র বিহিত বিবাহ। রাক্ষস বিবাহ সেকালে ক্ষত্রিয়দের মধ্যে প্রশংসিত ছিল।

সুভদ্রা হরণের পর খাণ্ডবদাহে আবার কৃষ্ণের দেখা পাওয়া যায়। পাণ্ডবেরা খাণ্ডবপ্রস্থে বসবাস করছিলেন। তাঁদের রাজধানীর কাছে একটি বড় বন ছিল, সেখানে অনেক হিংস্র পশু বাস করত। কৃষ্ণার্জুন তাতে আগুন লাগিয়ে হিংস্র পশুদের বিনষ্ট করে জঙ্গল আবাদযোগ্য করে তোলেন। বনমধ্যে ময় দানব নামে একজন অনার্যবংশীয় অতিশয় কৃতবিদ্য প্রকৌশলী বাস করত। সেও পুড়ে মরার উপক্রম। সে অর্জুনের কাছে প্রাণভিক্ষা চাইলে অর্জুন তার প্রাণ রক্ষা করলেন। তখন কৃতজ্ঞ ময় অর্জুনের প্রত্যুপকার করতে চাইল। অর্জুন কোনমতেই প্রত্যুপকার নেবেন না। শেষে নাছোড় ময়কে বললেন, 'যদি উপকার করতেই হয় তবে তুমি কৃষ্ণের কোনও কাজ কর। তাহলেই আমার প্রত্যুপকার করা হবে।' কৃষ্ণও নিজের জন্য কিছু চাইলেন না। তিনি বললেন, 'যুধিষ্ঠিরের জন্য একটি সভা নির্মাণ কর। এমন সভা গড়বে, মানুষ যেন তার অনুকরণ করতে না পারে।' কৃষ্ণ জানতেন ময় দানবকুলের বিশ্বকর্মা। ময় তাই করল। খাণ্ডবদাহনই কৃষ্ণ-অর্জুনের সহকর্মিতার প্রথম মহৎ দৃষ্টান্ত– কেননা সে-উপলক্ষে অর্জুন যেমন গাণ্ডীব ও অক্ষয় তূণ এবং বিশ্বকর্মা-রচিত দিব্যরথ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কৃষ্ণও তেমনি পেয়েছিলেন তাঁর গদা ও সুদর্শন চক্র।

খাণ্ডবদাহের পর বাসুদেব প্রীতিভাজন পাণ্ডবদের সান্নিধ্যে কিছু দিন খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করলেন। পরিশেষে পিতৃদর্শনে ব্যাকুল হয়ে দ্বারকায় যেতে মনস্থ করলেন। বিদায়ের সময় উপস্থিত হল। তিনি প্রথমে যুধিষ্ঠিরকে সঙ্গে নিয়ে পিসি কুন্তী দেবীর পদবন্দনা করলেন। তারপর বোন সুভদ্রার কাছে গিয়ে তাঁকে নানা উপদেশ-পরামর্শ দিলেন। চারুভাষিণী সুভদ্রাও তাঁকে মা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে কী কী বলতে হবে পই পই করে বুঝিয়ে বলে বারবার পূজা ও প্রণাম করলেন। বৃষ্ণিকুলতিলক কৃষ্ণ তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দ্রৌপদী ও কুলপুরোহিত ধৌম্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন; ধৌম্যকে যথাবিধি বন্দন ও দ্রৌপদীকে সম্ভাষণ ও আমন্ত্রণ জানিয়ে অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি চারভাইয়ের কাছে গেলেন। সেখানে বাসুদেব পঞ্চপাণ্ডব পরিবেষ্টিত হয়ে অমরগণ-পরিবৃত মহেন্দ্রর ন্যায় শোভা পেতে লাগলেন।

তারপর কৃষ্ণ যাত্রা করবেন বলে স্নান করে অলংকার পরে মালা জপ, নমস্কার ও নানা গন্ধদ্রব্য দিয়ে দেব-দ্বিজের পূজা শেষ করলেন। যাত্রার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন। স্বস্তিবাচক ব্রাহ্মণেরা দইয়ের পাত্র, ফুল ও আতপচাল প্রভৃতি মাঙ্গল্য বস্তু হাতে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বাসুদেব তাদের প্রত্যেককে যথাযোগ্য ধনদান করে উত্তম তিথি-নক্ষত্রযুক্ত মুহূর্তে গদা, চক্র, অসি, সার্ঙ্গ প্রভৃতি অস্ত্রসজ্জিত হয়ে সুবর্ণ রথে উঠে দ্বারকার উদ্দেশ্যে রওনা করবেন, এমন সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির স্নেহ ও সৌজন্যবশত সেই রথে উঠে দারুক সারথিকে সরিয়ে তার জায়গায় বসে নিজে সারথি হয়ে বলগা হাতে নিলেন। মহাবাহু অর্জুনও রথে উঠে চামর হাতে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বাতাস করতে লাগলেন। মহাবল ভীমসেন, নকুল এবং সহদেব ঋত্বিক ও পুরোহিতদের নিয়ে তাঁর রথের পেছন পেছন আসতে লাগলেন। তিনি অর্জুনকে আমন্ত্রণ ও আলিঙ্গন, যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে পূজা এবং নকুল সহদেবকে সম্ভাষণ করলেন। যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও অর্জুন তাঁকে আলিঙ্গন এবং নকুল ও সহদেব তাঁকে অভিবাদন করলেন। এভাবে প্রায় আধা যোজন পথ অতিক্রম করার পর কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করে 'ফিরে যান' বলে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পতিতপাবন কমললোচন কৃষ্ণকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাঁর কপালে চুমু খেয়ে দ্বারকায় যাবার অনুমতি দিলেন। তখন ভগবান বাসুদেব পাণ্ডবদের সঙ্গে যথাবিধি প্রতিজ্ঞা করে বহু কষ্টে তাদের নিবৃত্ত করলেন। কৃষ্ণের রথ দ্বারাবতীর দিকে ধেয়ে চলল। পাণ্ডবেরা যতক্ষণ কৃষ্ণকে দেখতে পেলেন ততক্ষণ নির্নিমেষে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর যখন কৃষ্ণ দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলেন, বিকলমনে তারা খাণ্ডবপ্রস্থে ফিরে গেলেন। দেবকীনন্দন কৃষ্ণও অনুগামী মহাবীর ও দারুক সারথির সঙ্গে শিগগিরই দ্বারকাপুরে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণ আসছেন শুনে উগ্রসেন প্রভৃতি যদুশ্রেষ্ঠগণ এগিয়ে গিয়ে তাঁর পূজা করতে লাগলেন। বাসুদেব প্রাসাদে ঢুকে প্রথমে বৃদ্ধ পিতা, আহুক ও যশস্বিনী মাকে, পরে বলভদ্রকে অভিবাদন করলেন। তারপর তিনি প্রদ্যুম্ন শাম্ব নিশঠ চারুদেষ্ণ গদ অনিরুদ্ধ ও ভানুকে আলিঙ্গন করে প্রবীণদের অনুমতি নিয়ে রুক্মিণীর ভবনে উপস্থিত হলেন। অন্যদিকে, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অনুজ ও স্বজনদের নিয়ে স্বপুরে প্রবেশ করলেন এবং ভাই, পুত্র ও বন্ধুদের বিদায় দিয়ে দ্রৌপদীর সঙ্গে আমোদ-প্রমোদে সময় কাটাতে লাগলেন।

সভাগৃহ নির্মাণ শেষ হল। যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করার অভিলাষ ব্যক্ত করলেন। একে একে তিনি মন্ত্রী, ভীমার্জুন প্রভৃতি অনুজ, ধৌম্য দ্বৈপায়ন প্রভৃতি ঋষিদের কাছে তাঁর অভিলাষ জানালে সবাই একবাক্যে তাঁকে যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করতে বললেন। তবুও তাঁর সন্দেহ যায় না। তিনি কৃষ্ণের মত না নিয়ে এত বড় কাজে হাত দিতে নারাজ। তিনি অপ্রমেয় মহাবাহু সর্বলোকোত্তম কৃষ্ণের পরামর্শ নেবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠলেন। তিনি জানেন, কৃষ্ণ সর্বজ্ঞ ও সর্বকৃৎ, তিনি অবশ্যই তাকে সৎপরামর্শ দেবেন। তিনি কৃষ্ণকে আনতে রথ পাঠালেন। কৃষ্ণও সংবাদ পেয়ে খাণ্ডবপ্রস্থে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণ এলে যুধিষ্ঠির বললেন, 'আমি রাজসূয় যজ্ঞ করার অভিলাষ করেছি। ঐ যজ্ঞ কেবল ইচ্ছা করলেই সম্পন্ন হয় এমন নয়, কীভাবে তা সম্পন্ন হয়, তা তোমার সুবিদিত আছে। দেখ, যে ব্যক্তি সবকিছু করতে পারে, যে ব্যক্তি সর্বত্রপূজ্য এবং যিনি সমুদয় পৃথিবীর ঈশ্বর, সেই ব্যক্তিই রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র। আমার অন্যান্য সুহৃদ আমাকে ঐ যজ্ঞ করতে পরামর্শ দিয়েছেন, কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করে এ কাজে হাত দিতে পারি না। হে কৃষ্ণ! কোনও কোনও ব্যক্তি বন্ধুতার জন্যে নিন্দাসূচক বাক্য বলেন না। কেউ কেউ স্বার্থপর হয়ে প্রিয়বাক্য বলেন। কেউ-বা যাতে নিজের লাভ হয়, তাই ভাল বলে মনে করে। হে মহাত্মন! পৃথিবীতে এ ধরনের লোকই বেশি, সুতরাং তাদের পরামর্শ নিয়ে কোন কাজ করা যায় না। তুমি ঐসব দোষ ও কাম-ক্রোধ বিবর্জিত; তুমি আমাকে যথাযথ পরামর্শ দাও।'

যুধিষ্ঠির যা ভেবেছিলেন, তাই হল, যে অপ্রিয় বাক্য আর কেউ বলেননি, কৃষ্ণ তাই বললেন। তিনি বললেন, 'হে মহারাজ! আপনি সর্বগুণে গুণবান, অতএব রাজসূয় যজ্ঞ করা আপনার পক্ষে অবিধেয় নয়। আপনি সর্বজ্ঞ, তবু াপনাকে কিছু কথা বলি, শুনুন। এখন মহীপতি জরাসন্ধ নিজ বাহুবলে সমস্ত ভূপতিকে পরাজিত করে, নিজ করায়ত্ব কওে, তাদেও পেয়ে ভূমণ্ডলে একাধিপত্য কায়েম করেছেন। যে রাজা সকলের প্রভূ এবং সমস্ত জগৎ যাঁর হস্তগত, নিয়মানুসাওে তিনিই সাম্রাজ্য লাভ করেন। প্রতাপশালী শিশুপাল মহীপতি জরাসন্ধের আশ্রয় নিয়ে সেনাপতি হয়েছেন। মায়াযোধী বীর্যবান করুষাধিপতি বক্র শিষ্যের মত তাঁর সেবা করছেন। মহাবল-পরাক্রান্ত হংস ও ডিম্বক তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। দন্তবক্র, করুষ, করভ ও মেঘবাহন তাঁর বশীভূত হয়েছেন। যিনি মুরু ও নরকদেশ শাসন করেন, আপনার পিতৃবন্ধু মহাবল-পরাক্রান্ত যবনাধিপতি বৃদ্ধ ভগদত্ত সতত তাঁর প্রিয়কার্য করে থাকেন।

'যিনি আপনার প্রতি অতিশয় স্নেহবান, যিনি পশ্চিম-দক্ষিণ ভাগের অধিপতি, সেই শত্রুনিসূদন কুন্তিবংশবর্ধন আপনার মাতুল পুরুজিৎ জরাসন্ধের অনুগত। যে দুরাত্মা নিজেকে পুরুষোত্তম বলে মনে করে, যে মোহবশত সতত আমার চিহ্নাদি ধারণ করে থাকে, যে ভূমণ্ডলে বাসুদেব বলে খ্যাত, সেই পরাক্রান্ত পৌণ্ড্রক এখন তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেছে। যিনি পৃথিবীর চতুর্থাংশ ভোগ করছেন, যিনি পাণ্ড্য, ক্রথ ও কৈশিক দেশ জয় করেছেন, সেই শত্রুনিসূদন ভীষ্মকও তাঁর বশবর্তী হয়েছেন। ভীষ্মক আমাদের আত্মীয়, কিন্তু তিনি জরাসন্ধের কীর্তি শুনে বিমুগ্ধ হয়ে কী কুলাভিমান, কী বলাভিমান সমুদয় জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁর শরণাপন্ন হয়েছেন।

'উত্তর দেশনিবাসী রাজাগণ ও অষ্টাদশ ভোজকুল জরাসন্ধের ভয়ে পশ্চিম দিকে পলায়ন করেছেন। শূরসেন, ভদ্রকার, বোধ, শাম্য, পটচ্চর, সুস্থল, মুকুট, কুলিন্দ, কুন্তি, শালায়ন-বংশীয় রাজারা, দক্ষিণ পঞ্চালস্থ ভূপতিগণ এবং পূর্বকোশলনিবাসী রাজারা সুহৃদ ও অনুচরদের নিয়ে পশ্চিম দিকে পলায়ন করেছেন। মৎস্য এবং সন্নস্ত পাদদেশীয় নরপতিরা সাতিশয় ভীত হয়ে উত্তর দিক ছেড়ে দক্ষিণ দিকে চলে গেছেন। যাবতীয় পঞ্চালদেশীয় মহীপতিগণ নিজ নিজ রাজ্য পরিত্যাগ করে এখানে সেখানে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।'

কৃষ্ণ বললেন, 'কিছু হল, দুরাত্মা কংস নিজ বাহুবলে জ্ঞাতিদের পরাজিত করে সর্বাপেক্ষা প্রবল হয়ে উঠেছিল। ভোজবংশীয় বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়রা মূঢ়মতি কংসের দৌরাত্ম্যে অতিশয় ব্যথিত হয়ে জ্ঞাতিদের পরিত্যাগ করার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। আমি তখন অক্রূরকে আহুকের কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে জ্ঞাতিদের কল্যাণে বলভদ্রকে সঙ্গে নিয়ে কংস ও সুনামাকে সংহার করি। তাতে কংসভয় নিবারিত হল বটে, কিন্তু কিছুদিন পরে জরাসন্ধ প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে উঠল। তখন আমরা জ্ঞাতি-বন্ধুদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে পরামর্শ করলাম যে, যদি আমরা শত্রুনাশক মহাস্ত্র দিয়ে তিনশো বছর অবিশ্রাম জরাসন্ধের

সৈন্য বধ করি, তাও তাদের নিঃশেষ করতে পারব না। দেবতাদের অনুরূপ তেজস্বী মহাবলশালী হংস ও ডিম্বক নামে তাঁর অনুগত দুই বীর আছে। ওরা অস্ত্রাঘাতে কখনও নিহত হবে না। আমার নিশ্চিত বোধ হচ্ছে, এই দুই বীর এবং জরাসন্ধ– এই তিনজন একত্র হলে ত্রিভুবন জয় করতে পারে।

'আপনি সম্রাটতুল্য গুণশালী, অতএব আপনার সম্রাট হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু আমি নিশ্চিত, জরাসন্ধ জীবিত থাকতে আপনি কখনই রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে কৃতকার্য হতে পারবেন না। জরাসন্ধ রাজসূয় যজ্ঞ করবে বলে প্রতিজ্ঞা করে বাহুবলে রাজন্যবর্গকে পরাজিত করে গিরিদুর্গে বন্দী করে রেখেছে। যজ্ঞকালে একশো রাজাকে মহাদেবের কাছে বলি দেবে, জরাসন্ধের এই অভিপ্রায়। দুরাত্মা জরাসন্ধ এ পর্যন্ত ছিয়াশিজন নৃপতিকে বন্দী করতে সক্ষম হয়েছে। আর চোদ্দজন নৃপতিকে বন্দী করতে সক্ষম হলে সে সবাইকে একযোগে হত্যা করবে। বলি প্রদানে মনোনীত নৃপতিগণ রুদ্রের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হয়ে পশুপতিগৃহে পশুর ন্যায় অতি কষ্টে জীবন ধারণ করছেন। এখন যে ব্যক্তি দুরাত্মা জরাসন্ধের এই পাশবিক কর্মে বাধা দিতে পারবেন, তাঁর যশোরাশি ভূমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়বে এবং যিনি তাকে পরাজিত করতে পারবেন তিনি নিশ্চয়ই সাম্রাজ্য লাভের অধিকারী হবেন।

'যদি আপনার রাজসূয়-যজ্ঞ করার ইচ্ছা থাকে, তবে আগে জরাসন্ধের হাতে বন্দী রাজাদের মুক্ত এবং দুরাত্মা জরাসন্ধবধে তৎপর হন; নতুবা আপনি কোনক্রমেই রাজসূয় সম্পন্ন করতে পারবেন না। এই আমার মত, এখন আপনি বিবেচনা করে যা উচিত হয় বলুন।'

কৃষ্ণবিদ্বেষীরা শুনে বলবেন, 'জরাসন্ধ কৃষ্ণের পূর্বশত্রু, কৃষ্ণ নিজে তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেননি, এখন সুযোগ বুঝে বলবান পাণ্ডবদের দিয়ে তাকে হত্যা করে নিজের মনস্কামনা পূর্ণ করার জন্য এমন পরামর্শ দিলেন।' কিন্তু কৃষ্ণ কাম-ক্রোধ-লোভ-মদ-মোহ-মাৎসর্যবর্জিত, সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী, সর্বদোষরহিত, সর্বলোকোত্তম আদর্শ ধার্মিক। তিনি তো ভুল পরামর্শ দিতে পারেন না। তদুপরি তিনি সমরকুশলী। জানতেন, সসৈন্য জরাসন্ধকে আক্রমণ করলে জয়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ। পাণ্ডবসৈন্য তার সমকক্ষ হতে পারবে না।

যুধিষ্ঠির সাবধান ব্যক্তি, সহজে জরাসন্ধের সঙ্গে বিবাদে রাজি হলেন না। কিন্তু ভীমের দৃপ্ত তেজস্বী ও অর্জুনের তেজোগর্ভ বাক্যে ও কৃষ্ণের পরামর্শে শেষপর্যন্ত সম্মত হলেন। ভীমার্জুন ও কৃষ্ণ এই তিনজন জরাসন্ধ-জয়ে যাত্রা করলেন। সেকালে দ্বৈরথ যুদ্ধের চল ছিল। অর্থাৎ কেউ একজন আরেকজনের সঙ্গে একাকী লড়তে চাইলে তাকে একাকীই লড়তে হত। যে অধিক বলশালী, জয় তারই হত। কৃষ্ণ ভাবলেন, অনর্থক লোকক্ষয় না করে তাঁরা তিনজন জরাসন্ধের সম্মুখীন হয়ে তাকে দ্বৈরথ যুদ্ধের আহ্বান জানাবেন– তিনজনের মধ্যে একজনের সঙ্গে যুদ্ধে সে অবশ্যই রাজি হবে।

তাঁরা জারাসন্ধের রাজধানীতে উপস্থিত হয়ে, তার প্রাসাদের ঢাক-প্রাচীরস্থাপত্য প্রভৃতি ভেঙে ফেলে সরবে তার সভায় উপস্থিত হয়ে তাঁদের অভিপ্রায় জানালেন। জরাসন্ধ সেদিন প্রস্তুত ছিলেন না। রাত্রে তাঁরা জরাসন্ধের প্রাসাদে অবস্থান করলেন। নিশীথকালে যজ্ঞাগারে জরাসন্ধ তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের পূজা করতে উদ্যত হলে কৃষ্ণ বললেন, হে বৃহদ্রথনন্দন, বীর ব্যক্তিগণ শত্রুগৃহে অপ্রকাশ্যভাবে এবং সুহৃদগৃহে প্রকাশ্যভাবে প্রবেশ করে থাকেন। হে রাজন! আমরা নিজেদের উদ্দেশ্যসাধনে শত্রুগৃহে এসে তার পূজা গ্রহণ করি না। এই আমাদের নিত্যব্রত।

জরাসন্ধ বললেন, আমি কোনও সময়ে তোমাদের সঙ্গে শত্রুতা করেছি, এমন স্মরণ হয় না। তাহলে কীসের জন্য বিনা অপরাধে আমাকে শত্রুজ্ঞান করছ?

কৃষ্ণ বললেন, তুমি রাজাদের মহাদেবের কাছে বলি দেবার জন্য বন্দী করেছ। তাই যুধিষ্ঠিরের নিয়োগক্রমে আমরা তোমার প্রতি সমুদ্যত হয়েছি। তোমার পাপে আমাদেরও পাপ। যেহেতু আমরা ধর্মচারী ও ধর্মরক্ষায় সমর্থ, তাই এই অন্যায়ের প্রতিকার করতে এসেছি। আমরা ক্ষত্রিয়– যুদ্ধ প্রার্থনা করি, অন্য কিছু নয়।'

জরাসন্ধ বললেন, 'দেখ, ধর্ম ও অর্থের উপঘাতে মনঃপীড়া জন্মে। কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করে ধর্মজ্ঞ হয়েও নিরপরাধ লোকের ধর্মার্থে উপঘাত করে, তার ইহকালে অমঙ্গল ও পরকালে নরকগমন হয়।'

ধর্মের রক্ষা অর্থাৎ নির্দোষ অথচ প্রপীড়িত রাজাদের উদ্ধার করাই কৃষ্ণের উদ্দেশ্য। তিনি জরাসন্ধকে অনেক বোঝালেন। তারপর বললেন, 'আমি বাসুদেবনন্দন কৃষ্ণ, আর এই দুই বীরপুরুষ পাণ্ডুতনয়। আমরা তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করছি, এখন হয় ভূপতিদের পরিত্যাগ কর, নয় যুদ্ধ করে যমালয়ে যাও।'

জরাসন্ধ দ্বৈরথে সমাধান খুঁজলেন। পাছে যুদ্ধে তার মৃত্যু হয়, সে কথা ভেবে জরাসন্ধ তাঁর পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। তারপর পৌরবর্গ ও মগধবাসীদের সমক্ষে দ্বৈরথ শুরু হল। একে একে চোদ্দদিন যুদ্ধ হল। যুদ্ধকালে জরাসন্ধের পুরোহিত যুদ্ধজাত অঙ্গবেদনা নাশক ওষুধাদি নিয়ে কাছাকাছি রইলেন। ভীমার্জুন-কৃষ্ণের জন্য অবশ্য সে-রকম ব্যবস্থা হল না।

যুদ্ধের জন্য ভীমকে মনোনীত করে জরাসন্ধ যশস্বী ব্রাহ্মণকে দিয়ে স্বস্ত্যয়ন করে ক্ষত্রধর্ম অনুসারে বর্ম ও কিরীট ত্যাগ করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। তখন যাবতীয় পুরবাসী ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র বনিতা ও বৃদ্ধগণ তাঁদের সংগ্রাম দেখতে সেখানে উপস্থিত হলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে জনতার ঢল নামল। বিনা ভোজনে ও বিনা বিশ্রামে তারা একটানা তেরোদিন যুদ্ধ করলেন। চতুর্দশ দিনে বাসুদেব জরাসন্ধকে ক্লান্ত দেখে ভীমসেনকে সম্বোধন করে বললেন, 'কৌন্তেয়! ক্লান্ত শত্রুকে পীড়ন করা উচিত নয়; অধিকতর পীড়িত হলে জীবন ত্যাগ করে। অতএব ইনি তোমার পীড়নীয় নহেন। হে ভারতর্ষভ, এঁর সঙ্গে বাহুযুদ্ধ কর।' কিন্তু ভীম সে-কথা শুনলেন না। তিনি শ্রান্ত ও বয়োবৃদ্ধ জরাসন্ধকে পীড়ন করেই হত্যা করলেন। তারপর তাঁরা কারারুদ্ধ মহীপালদের বিমুক্ত করলেন এবং জরাসন্ধপুত্র সহদেবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। সহদেব কিছু উপঢৌকন দিলে, তাঁরা তা গ্রহণ করলেন। কারামুক্ত রাজারা কৃতাঞ্জলি হয়ে কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন এই ভৃত্যদের কী করতে হবে, অনুমতি করুন।'

কৃষ্ণ বললেন, 'রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করতে অভিলাষ করেছেন, আপনারা সেই সাম্রাজ্য প্রত্যাশী ধার্মিককে সাহায্য করুন, এই প্রার্থনা।'

বোঝা গেল, যুধিষ্ঠিরকে কেন্দ্র করে ধর্মরাজ্য স্থাপন কৃষ্ণের জীবনের উদ্দেশ্য।

প্রাচীন ভারতের মানচিত্র সামনে রেখে উপরোক্ত বিবরণ পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে যে, সেই কালে ভারতবর্ষ বহু ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং এসব রাজ্যেও অধিকাংশই জরাসন্ধের করায়ত্ব ছিল বা তার সঙ্গে মিত্রতা-পাশে আবদ্ধ ছিল। পশ্চিম ভারতের মথুরায় অত্যাচারী কংস ছিল জরাসন্ধের জামাতা, শ্রীকৃষ্ণ

কংসকে বধ করলে জরাসন্ধ ১৮ বার মথুরা আক্রমণ করেন, পরিশেষে কৃষ্ণের পরামর্শে যাদবগণ পশ্চিম সমুদ্রতীরে দ্বারকায় সুদৃঢ় দুর্গাদি নির্মাণ করে বসতি করেন। উত্তর ভারতের পাঞ্চাল, কোশল প্রভৃতি রাজ্যের রাজারা পালিয়ে দক্ষিণ দিকে আশ্রয় নেন। মধ্য-ভারতে চেদিরাজ্যে প্রবল পরাক্রান্ত শিশুপাল, পূর্বাঞ্চলে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে (বর্তমান অসম) ভগদত্ত, বঙ্গ ও পৌণ্ড্র দেশে (উত্তরবঙ্গ) বাসুদেব তার মিত্র ছিলেন। এই বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন ধারণ করে নিজেকেই শ্রীকৃষ্ণ বলে পরিচয় দিতেন।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ হল। যজ্ঞ রক্ষার ভার পড়ল মহাবাহু কৃষ্ণের ওপরে। তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা ধারণ করে যজ্ঞ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে স্থির হয়ে রইলেন। এই যজ্ঞের মহাসভায় কৃষ্ণের হাতে শিশুপাল নামে প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজা নিহত হন। পাণ্ডবদের সংশ্লেষে কৃষ্ণের এই একমাত্র অস্ত্রধারণ।

আজকের দিনেও আমাদের দেশে একটি প্রথা প্রচলিত আছে যে, কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়িতে সভা হলে সভাস্থ সর্বপ্রধান ব্যক্তিকে মালাচন্দনে ভূষিত করা হয়। প্রাচীনকালেও তেমনি সভাস্থ সর্বপ্রধান ব্যক্তিকে অর্ঘ প্রদান করা হত।

যুধিষ্ঠিরের সভায় অর্ঘ দিতে হবে– কে এর উপযুক্ত পাত্র? ভারতবর্ষের সব রাজা সভায় এসেছেন, এদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে?

কুরুবৃদ্ধ মহামতি ভীষ্ম বললেন, ক্ষত্রগুণে অর্থাৎ তেজ, বল ও পরাক্রমে কৃষ্ণই ক্ষত্রিয়দের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এঁকে অর্ঘ প্রদান করি। এই কথা অনুসারে কৃষ্ণকে অর্ঘ প্রদান করা হল। তিনিও তা গ্রহণ করলেন। এটা শিশুপালের অসহ্য হল। শিশুপাল ভীষ্ম, কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের তীব্র ভাষায় তিরস্কার করলেন। তিনি বললেন, কৃষ্ণ রাজা নন। তবে এত রাজা থাকতে তিনি অর্ঘ পান কেন? যদি স্থবির (প্রবীণ) বলে তার পূজা করে থাক, তবে তার বাপ বসুদেবকে পূজা করলে না কেন? তিনি তোমাদের আত্মীয় ও প্রিয়চিকীর্ষু বলে কি তাঁর পূজা করেছ? শ্বশুর দ্রুপদ থাকতে তাঁকে কেন? কৃষ্ণকে আচার্য মনে করেছ? দ্রোণাচার্য থাকতে কৃষ্ণের অর্চনা কেন? ঋত্বিক বলে কি তাঁকে অর্ঘ দাও? বেদব্যাস থাকতে কৃষ্ণ কেন? ইত্যাদি। ইত্যাদি।

মহারাজ শিশুপাল কথা বলতে বলতে ক্রমশ গরম হয়ে উঠলেন। তখন তিনি যুক্তি ছেড়ে গালি দিতে শুরু করলেন। তারপর পাণ্ডবদের ছেড়ে কৃষ্ণকে নিয়ে পড়লেন। তিনি কৃষ্ণকে অপ্রাপ্ত লক্ষণ, ধর্মভ্রষ্ট, দুরাত্মা, ঘৃতভোজী কুক্কুর, দারপরিগ্রহকারী ক্লীব ইত্যাদি গালির একশেষ করলেন।

শুনে ক্ষমাগুণের পরম আধার, পরমযোগী, আদর্শ পুরুষ কোনও উত্তর করলেন না। কৃষ্ণের এমন শক্তি ছিল যে, তিনি তক্ষুনিই শিশুপালকে বধ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি নীরব রইলেন।

কর্মকর্তা যুধিষ্ঠির আহুত রাজার রাগ প্রশমিত করতে সান্ত্বনা দিতে গেলেন– যজ্ঞবাড়ির কর্মকর্তার যেমন দস্তুর। মধুরবাক্যে তিনি কৃষ্ণের কুৎসাকারীকে তুষ্ট করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম যেন লোহার তৈরি– তাঁর সেটা বড় ভাল লাগল না। তিনি স্পষ্টই বললেন, 'কৃষ্ণের অর্চনায় যার অনভিমত, এমন ব্যক্তিকে অনুনয় বা সান্ত্বনা করা অনুচিত।'

তিনি বললেন, 'এই মহতী নৃপসভায় একজন মহীপালও দেখা যায় না, যাকে কৃষ্ণ তেজোবলে পরাজিত করেননি। কৃষ্ণ জন্মাবধি যে-সব কাজ করেছেন, লোকে বার বার তা আমার কাছে বর্ণনা করেছে। তিনি অত্যন্ত বালক হলেও আমরা তাঁর পরীক্ষা করে থাকি। কৃষ্ণের শৌর্য, বীর্য, কীর্তি ও বিজয় সমস্ত জেনে তাঁর পূজার বিধান করেছি।'

তিনি বলতে লাগলেন, 'কৃষ্ণের পূজার দুটি কারণ। তিনি নিখিল বেদ-বেদাঙ্গ পারদর্শী ও সমধিক বলশালী। মানবলোকে তাঁর মত বলবান ও বেদাঙ্গসম্পন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখা যায় না। দান, দয়া, শ্রুত, শৌর্য, লজ্জা, কীর্তি, বুদ্ধি, বিনয়, অনুপম শ্রী, ধৈর্য ও সন্তোষ প্রভৃতি সমুদায় গুণ কৃষ্ণের মধ্যে নিত্য বিরাজমান। অতএব সেই সর্বগুণসম্পন্ন আচার্য, পিতা, গুরুস্বরূপ পূজার্হ কৃষ্ণের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন তোমাদের সর্বতোভাবে কর্তব্য। তিনি ঋত্বিক, গুরু, সম্বন্ধী, স্নাতক, রাজা ও প্রিয়পাত্র। এজন্য অচ্যুতকে অর্চনা করা হয়েছে।'

ভীষ্ম কথা শেষ করে নিতান্ত অবজ্ঞাভরে বললেন, যদি কৃষ্ণের পূজা শিশুপালের একান্ত অসহ্য হয়ে থাকে, তবে যেমন ইচ্ছা করুন। অর্থাৎ 'ভাল না লাগলে উঠে যান।'

কৃষ্ণ অর্চিত হলেন দেখে সুনীথ নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত বীরপুরুষ রাগে কাঁপতে কাঁপতে চোখ লাল করে বললেন, 'আমি আগে সেনাপতি ছিলাম। এখন যাদব ও পাণ্ডবদের সমূলে উৎপাটনের জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হব।' চেদিরাজ শিশুপাল অন্যান্য রাজাদের অবিচলিত উৎসাহ দেখে উৎসাহিত হয়ে যজ্ঞে ব্যাঘাত সৃষ্টির জন্য মন্ত্রণা করতে লাগলেন। কৃষ্ণ স্পষ্টই বুঝতে পারলেন অভিষেক পণ্ড করার লক্ষ্যে রাজারা যুদ্ধের পরামর্শ করছেন।

রাজা যুধিষ্ঠির সাগরের জল যেমন ফুলে ওঠে, তেমনি সংক্ষুব্ধ রাজমণ্ডলকে দেখে পিতামহ ভীষ্মকে বললেন, 'এই মহান রাজসমুদ্র সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। এখন যা কর্তব্য, অনুমতি করুন।'

শিশুপাল আবার ভীষ্ম ও কৃষ্ণকে এক পশলা গালিগালাজ করলেন। তিনি কৃষ্ণকে দুরাত্মা, গোপাল, দাস, বালকেরও ঘৃণার পাত্র প্রভৃতি বাক্যবাণে বিঁধতে লাগলেন। পরমযোগী শ্রীকৃষ্ণ পুনর্বার তাকে ক্ষমা করে নীরব রইলেন। কৃষ্ণ যেমন বলের আদর্শ তেমনি ক্ষমার আদর্শ। ভীষ্ম প্রথমে কিছু বললেন না, কিন্তু ভীম অত্যন্ত রেগে গিয়ে শিশুপালকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে ভীষ্ম তাকে নিরস্ত করে বললেন, 'শিশুপাল কৃষ্ণের তেজেই তেজস্বী, তিনি এখনই শিশুপালের তেজোহরণ করবেন।' শিশুপাল রাগে জ্বলতে জ্বলতে ভীষ্মকে অনেক গালাগালি দিয়ে শেষে বললেন, 'তোমার জীবন এই ভূপালদের অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল, এঁরা মনে করলে এখনই তোমার প্রাণসংহার করতে পারেন।' ভীষ্ম তখনকার ক্ষত্রিয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। তিনি বললেন, 'আমি এদের তৃণতুল্যও মনে করি না।' শুনে সমবেত রাজমণ্ডলী গর্জন করে উঠলেন, 'এই ভীষ্মকে পশুর মত হত্যা কর অথবা আগুনে পুড়িয়ে মার।' ভীষ্ম উত্তর করলেন, 'যা হয় কর। এই আমি তোমাদের মাথার ওপর পা তুলে দিলাম।'

বুড়াকে জোরেও এঁটে ওঠা যায় না, বিচারেও আঁটার যো নেই। তিনি যা বললেন, তার মর্মকথা এই 'ভাল, কৃষ্ণের পূজা করেছি বলে গোল করছ, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব মানছ না। গোলে কাজ কী, তিনি তো সামনেই আছেন– একবার পরীক্ষা করে দেখ না? যার মরণ-চুলকুনি আছে, সে কৃষ্ণকে একবার যুদ্ধে আহ্বান করে দেখুক না?'

শুনে শিশুপাল কি আর চুপ করে থাকতে পারে? সে কৃষ্ণকে আহ্বান করে বলল, 'এস, সংগ্রাম কর। আমি তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করছি।'

এখন কৃষ্ণ প্রথম কথা বললেন। তিনি সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করে শিশুপালের করা পূর্বাপর সকল অপরাধের একটি একটি করে বর্ণনা দিলেন। তারপর বললেন, 'এতদিন ক্ষমা করেছি। আজ আর

নয়।'

শিশুপাল দুরন্ত, কৃষ্ণদ্বেষী; কৃষ্ণও বলবান, মনে করলে শিশুপালকে মাছির মত টিপে মেরে ফেলতে পারেন, এমন অবস্থায় পিসি যে ভ্রাতুষ্পুত্রকে অনুরোধ করবেন, এটাই স্বাভাবিক। ক্ষমাপরায়ণ কৃষ্ণ শিশুপালকে নিজগুণে ক্ষমা করলেও পিসির অনুরোধ স্মরণ রাখবেন, এটা খুবই সম্ভব। আর পিসির ছেলেকে হত্যা করা নিন্দনীয় কাজ বটে। তাই কৃষ্ণ এতদিন শিশুপালকে কিছু বলেননি। কিন্তু আজ আর চুপ করে থাকা যায় না। তাঁর সংহার মূর্তি দেখে করূষরাজ প্রমুখ রাজন্যবর্গ যে শিশুপালের সম্মান বৃদ্ধি করেছিলেন, তারা সিংহস্বরূপ কৃষ্ণকে রথে উপবিষ্ট দেখে চেদিরাজকে ছেড়ে হরিণের মত পালিয়ে গেলেন। তিনি তখন অবলীলাক্রমে শিশুপালকে বধ করে পাণ্ডবদের যশ ও মান বৃদ্ধি করলেন। এভাবে যজ্ঞ বিঘ্নকারীদের উৎখাত করে কৃষ্ণ যজ্ঞানুষ্ঠান নিষ্কণ্টক করলেন। মহাভারতের কবি বলছেন, 'কৃষ্ণের কৌশল ও ভীম-অর্জুনের বলের দ্বারা জরাসন্ধ ও শিশুপালকে সংহার করিয়ে যুধিষ্ঠির অন্ন ও দক্ষিণাসম্পন্ন সর্বগুণান্বিত রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হলে কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে গেলেন।

ইতোমধ্যে পাণ্ডবদের শৌর্য-বীর্য-ঐশ্বর্যে অসূয়াপরবশ হয়ে দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় আমন্ত্রণ জানালেন। দ্যূতক্রীড়া এড়ানো যায় না। সরল ধর্মপুত্র পাশা খেলায় শুকুনির কাছে হেরে গিয়ে দ্রৌপদীকে হারানোর পর কৌরবসভায় তাঁর বড় অসম্মান হল। এখানে একবার কৃষ্ণের নাম উচ্চারিত হয়। কেশাকর্ষণ করে সভাস্থলে দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে প্রবৃত্ত হলে নিরুপায় কৃষ্ণা (দ্রৌপদীর আরেক নাম) মনে মনে 'গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয়' সম্বোধন করে কৃষ্ণকে তাঁর সম্ভ্রমরক্ষার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সভাপর্বে আর তাঁকে দেখতে পাই না। তারপর বনপর্ব। বনপর্বে তিনবার মাত্র কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। রাজ্যহারা পাণ্ডবেরা বনবাসে গিয়েছেন শুনে বৃষ্ণিভোজেরা সবাই তাঁদের দেখতে এসেছিলেন– কৃষ্ণও সেই সঙ্গে এসেছিলেন। বারো বছরের বনবাসের শেষদিকে পাণ্ডবেরা কাম্যক বনে উপস্থিত হয়েছেন শুনে কৃষ্ণ আবার তাঁদের দেখতে গিয়েছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়
উপপ্লব্য

সর্বভূতাত্মভূতায় ভূতাদিনিধনায় চ।
অক্রোধদ্রোহমোহায় তস্মৈ শান্তাত্মনে নমঃ ॥
– মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৪৭ অধ্যায়।

মহাভারতের মহারণ

ইতোমধ্যে বনবাস শেষে পাণ্ডবেরা একবছরের অজ্ঞাতবাসে বিরাটরাজের পুরীতে ছদ্মবেশে আশ্রয় নিয়েছেন। ক্রমে অজ্ঞাতবাসও সমাপ্ত হল। ঐ এক বছরে কেউ তাঁদের চিনতে পারেনি। অতএব তাঁরা দুর্যোধনের কাছ থেকে নিজেদের রাজ্য ফিরে পাবার ন্যায়ত ও ধর্মত অধিকারী। কিন্তু দুরাচার দুর্যোধন কি তাঁদের রাজ্য ফিরিয়ে দেবেন? না দেবারই সম্ভাবনা।

অজ্ঞাতবাসের এক বছর উত্তীর্ণ হলে পাণ্ডবেরা বিরাটরাজের কাছে নিজেদের পরিচয় দিলেন। বিরাটরাজ তাঁদের পরিচয় পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে নিজকন্যা উত্তরাকে অর্জুনপুত্র অভিমন্যুর সঙ্গে বিয়ে দিলেন। সেই বিবাহে অভিমন্যুর মামা কৃষ্ণ, বলদেব ও অন্যান্য যাদবেরা এসেছিলেন। পাণ্ডবদের শ্বশুর দ্রুপদ ও অন্যান্য কুটুম্বরাও এসেছিলেন। তাঁরা সবাই বিরাটরাজের সভায় আসীন হলে পাণ্ডবরাজ্য পুনরুদ্ধারের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হল। নৃপতিরা কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করে চুপ করে রইলেন। তখন কৃষ্ণ রাজাদের সম্বোধন করে সকল অবস্থা ঝুঝিয়ে বললেন। ঘটনা পরম্পরা বর্ণনা করে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'এখন কৌরব ও পাণ্ডবদের পক্ষে যা হিতকর, ধর্ম, যশস্কর ও উপযুক্ত, আপনারা তা চিন্তা করুন।'

তিনি পুনরায় বললেন, 'ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অধর্মাগত দেবলোকও কামনা করেন না, কিন্তু ধর্মাগত একটি গ্রামের আধিপত্যেও অধিকতর অভিলাষী।' তারপর কৌরবদের লোভ ও শঠতা, যুধিষ্ঠিরের ধার্মিকতা এবং এঁদের পরস্পর-সম্বন্ধ বিবেচনা করে কর্তব্য নির্ধারণের জন্য রাজাদের অনুরোধ জানালেন। নিজের ইচ্ছার কথাও কিছু ব্যক্ত করলেন। দুর্যোধন যাতে যুধিষ্ঠিরকে অর্ধেক রাজ্য প্রদান করেন– এরকম সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে কোনও ধার্মিকপুরুষ দূত হয়ে তার কাছে যান, এমন অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। কৃষ্ণের ইচ্ছা, যুদ্ধ নয়, সন্ধি– এমনকি অর্ধেক রাজ্য দিয়ে হলেও।

কৃষ্ণের কথা শেষ হলে বলদেব তাঁর কথার অনুমোদন করলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলার জন্য নিন্দা করলেন, তারপর বললেন, 'সন্ধি করে সম্পাদিত অর্থই অর্থকর, সংগ্রাম করে উপার্জিত অর্থ, অর্থকর হয় না।'

বলদেবের কথা শেষ হলে কৃষ্ণের শিষ্য মহাবীর সাত্যকি কৃষ্ণের সন্ধি প্রস্তাব সম্পর্কে কিছু না বলে বলদেবকে ক্লীব কাপুরুষ ইত্যাদি বলে অপমানিত করলেন। পাশা খেলার জন্য বলদেব যুধিষ্ঠিরকে যেটুকু দোষ দিয়েছিলেন, তার প্রতিবাদ করে সাত্যকি বললেন, যদি কৌরবেরা পাণ্ডবদের পৈতৃক রাজ্য ফেরত না দেন, তবে কৌরবদের সমূলে নির্মূল করাই কর্তব্য।

তারপর বৃদ্ধ দ্রুপদও উঠে দাঁড়িয়ে সাত্যকির মতকে সমর্থন করলেন। তিনি যুদ্ধের উদ্যোগ নিতে, সৈন্য সংগ্রহ করতে এবং মিত্র রাজাদের কাছে দূত পাঠাতে পাণ্ডবদের পরামর্শ দিলেন। তবে তিনি এমনও বললেন যে, দুর্যোধনের কাছেও দূত পাঠানো হোক।

সবার অভিমত শুনে কৃষ্ণ পুনরায় উঠে দাঁড়ালেন। দ্রুপদ প্রাচীন এবং সম্বন্ধে গুরুজন, এ জন্য কৃষ্ণ সরাসরি তার কথার বিরোধিতা করলেন না। কিন্তু এমন ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন যে, যুদ্ধ বেধে গেলে তিনি নিজে সে যুদ্ধে নির্লিপ্ত থাকতে চান। তিনি বললেন, 'কুরু ও পাণ্ডবদের সঙ্গে আমাদের তুল্য সম্বন্ধ। তাঁরা কখনও মর্যাদা লঙ্ঘন করে আমাদের সঙ্গে অশিষ্ট ব্যবহার করেননি। আমরা বিবাহে নিমন্ত্রিত হয়ে এখানে এসেছি। আপনিও সে কারণে এখানে এসেছেন। এখন বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে, আমরা পরম আহ্লাদে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যাব।' গুরুজনকে এর চেয়ে আর কীভাবে ভর্ৎসনা করা যেতে পারে? কৃষ্ণ আরও বললেন, 'যদি দুর্যোধন সন্ধি না করে, তাহলে আগে অন্যান্য ব্যক্তিদের কাছে দূত পাঠিয়ে শেষে আমাদের ডাকবেন। এ যুদ্ধে যুক্ত হতে আমাদের বড় ইচ্ছা নেই।' একথা বলে কৃষ্ণ দ্বারকায় চলে গেলেন।

এদিকে উভয়পক্ষে যুদ্ধের উদ্যোগ হতে লাগল, সেনা সংগ্রহের কাজ শুরু হল এবং রাজাদের কাছে দূত যেতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণের অনন্যসাধারণ বল-বিক্রম বিষয়ে দুর্যোধন প্রভৃতিও বিশেষ সচেতন ছিলেন। দুর্যোধন কৃষ্ণকে আগে যুদ্ধে বরণ করার জন্য 'বায়ুবেগশালী

তুরঙ্গসমূহের সাহায্যে' দ্রুত দ্বারকানগরে গমন করলেন। কৃষ্ণকে যুদ্ধে বরণ করার জন্য অর্জুনও ঐদিন একইসময়ে সেখানে উপস্থিত। তারপর যা ঘটল, মহাভারত থেকে উদ্ধৃত করছি।

'বাসুদেব তখন শয়নকক্ষে নিদ্রিত ছিলেন। প্রথমে রাজা দুর্যোধন তাঁর শয়নগৃহে ঢুকে তাঁর মাথার কাছে রাখা প্রশস্ত আসনে বসে পড়লেন। ইন্দ্রনন্দন অর্জুন পরে ঢুকে অন্য আসন না থাকায় বিনীত ও কৃতাঞ্জলি হয়ে যাদবপতির পায়ের কাছে শয্যায় আসীন হলেন। অতঃপর জাগরিত হয়ে বৃষ্ণিনন্দন প্রথমে ধনঞ্জয়, পরে দুর্যোধনকে দেখে তাঁদের সঙ্গে কুশলাদি বিনিময় করে আগমনের কারণ জানতে চাইলেন।

দুর্যোধন হাসিমুখে বললেন, 'হে যাদব! এই উপস্থিত যুদ্ধে আপনার সহায়তা চাই। যদিও আপনার সঙ্গে আমাদের উভয়েরই সমান সম্বন্ধ ও তুল্য সৌহার্দ, তবু আমি আগে এসেছি। সাধু ব্যক্তিরা প্রথমে আসা ব্যক্তিরই পক্ষাবলম্বন করে থাকেন; আপনি সাধুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মাননীয়; অতএব আপনি আজ সেই সদাচার পালন করুন।'

কৃষ্ণ বললেন, 'হে কুরুবীর! আপনি যে আগে এসেছেন, এ-বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি কুন্তীকুমারকে আগে দৃষ্টিগোচর করেছি। এজন্য আমি আপনাদের উভয়কেই সাহায্য করব। কিন্তু এটা সর্বজনবিদিত যে, আগে বালককে বরণ করতে হয়। কাজেই আগে কুন্তীকুমারকেই বরণ করা উচিত।' এই বলে ভগবান্ ধনঞ্জয়কে বললেন, 'হে কৌন্তেয়! আগে তোমাকেই বরণ করব। আমার সমান যোদ্ধা এক অর্বুদ (অর্থাৎ দশ কোটি) গোপ একপক্ষের সৈনিক পদ গ্রহণ করুক, আর অন্যপক্ষে আমি যুদ্ধপরাঙ্মুখ ও নিরস্ত্র হয়ে অবস্থান করি, এর মধ্যে যে পক্ষ তোমার ভাল লাগে, বেছে নাও।'

জনার্দন যুদ্ধপরাঙ্মুখ ও নিরস্ত্র থাকবেন জেনেও ধনঞ্জয় তাঁকেই বরণ করলেন। আর রাজা দুর্যোধন এক অর্বুদ নারায়ণী সেনা পেয়ে কৃষ্ণকে যুদ্ধপরাঙ্মুখ বিবেচনা করে সন্তুষ্টচিত্তে বিদায় নিলেন। তিনি মনে করলেন, অর্জুনকে জয় করেছি, কাজেই যুদ্ধ-জয় সুনিশ্চিত।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, 'আমি অস্ত্রত্যাগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, এটা জেনেও আমাকে বরণ করলে কেন? আমাকে নিয়ে কি করবে?

অর্জুন সসঙ্কোচে বললেন, 'আমার মনে একটা আকাঙ্ক্ষা, তা আপনি পূর্ণ করুন, আপনি আমার সারথ্য গ্রহণ করুন।'

বাসুদেব বললেন, 'তুমি আমার প্রতি যে স্পর্ধা দেখিয়েছ, তা খুবই উপযুক্ত; আচ্ছা, আমি তোমার সারথ্য করব।'

ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সারথি হওয়া অতি হেয় কাজ। মদ্ররাজ শল্যকে কর্ণের সারথি হবার অনুরোধ করলে তিনি খুব রেগে গিয়েছিলেন। কিন্তু আদর্শপুরুষ অহংকারশূন্য। অতএব কৃষ্ণ তখনই অর্জুনের সারথি হতে রাজি হয়ে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিলেন।

কিন্তু কৃষ্ণ অর্জুনের সারথ্য স্বীকার করেছেন শুনে অন্ধরাজ ভয়ে অস্থির হয়ে উঠলেন। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, 'কৃষ্ণ যাঁদের অগ্রণী. কোন্ ব্যক্তি তাঁদের প্রতাপ সহ্য করতে পারবে। কৃষ্ণ অর্জুনের সারথি হতে চেয়েছেন শুনে ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত হচ্ছে।' কৃষ্ণের শৌর্য-বীর্য-বল-বিক্রম সম্বন্ধে তিনি অন্যত্র সঞ্জয়কে বলছেন, 'বাসুদেব যে-সব অনন্যসাধারণ দিব্যকর্ম সম্পাদন করেছেন, তা শোন। মহাত্মা বাসুদেব বাল্যকালে যখন গোকুলে বেড়ে উঠছিলেন, তখনই তাঁর বাহুবল ত্রিভুবনে বিখ্যাত হয়েছিল। তিনি উচ্চৈঃশ্রবার মত বলবান ও বাতাসের মত বেগশালী যমুনাতীরবর্তী অশ্বরাজকে বধ করেছেন। সেই পুণ্ডরীকাক্ষ প্রলম্ব, নরক, জম্ভ, মহাশূর পীঠ ও সুরতুল্য মুরকে বিনাশ করেছেন। তিনি বিক্রমপূর্বক জরাসন্ধের প্রতিপালিত মহাতেজা কংসকে তার আজ্ঞাবাহী বীরদের সঙ্গে সংগ্রামে নিপাতিত করেছেন। সেই জনার্দন অক্ষৌহিণীপতি মহাবাহু জরাসন্ধকে অন্যের দ্বারা নিপাতিত করেছেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে পরাক্রমশালী চেদিরাজ শিশুপাল অর্ঘ্য-বিষয়ে বিবাদ করেছিলেন বলে তিনি পশুর মত তাঁর মুণ্ডচ্ছেদ করেছিলেন। সেই পুণ্ডরীকাক্ষ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, কাশী, কৌশল, বাৎস্য, গার্গ, করুষ, পৌণ্ড্র, আবন্ত, দাক্ষিণাত্য, পার্বত্য, দাশেরক, কাশ্মীরক, ওরসিক, পৈশাচ, মুদ্গল, কাম্বোজ, বাটধান, চোল, পাণ্ড্য, ত্রিগর্ত, মালব, দরদ, নানা দিক্‌দেশ থেকে সমাগত খস ও শক এবং সানুচর যবনদের জয় করেছিলেন।'

এ বর্ণনা আরও সুবিস্তৃত, তাই কতকাংশ বাদ দিতে হল। শেষে ধৃতরাষ্ট্র বলেছিলেন, 'এটা কখনও শোনা যায়নি যে, রাজাদের মধ্যে একজনও কৃষ্ণের কাছে পরাজিত হননি।' শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ড ও অপ্রতিহত প্রতাপ কেউ সহ্য করতে পারেননি। তিনি অপরাজেয়। ধৃতরাষ্ট্র বলছেন. 'যদি কৌরবরা পাণ্ডবদের জয় করেন, তা হলে মহাবাহু বাসুদেব তাঁদের জন্য উৎকৃষ্ট শস্ত্র গ্রহণ করে সমুদয় নরপতি ও কৌরবকে সংহার করে কুন্তীকে মেদিনী দান করবেন।'

উভয়পক্ষে যুদ্ধের প্রস্তুতির মধ্যে দ্রুপদের পরামর্শক্রমে যুধিষ্ঠির প্রমুখরা দ্রুপদের পুরোহিতকে ধৃতরাষ্ট্রের সভায় সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে পাঠালেন। কিন্তু পুরোহিত মশাই কৃতকার্য হতে পারলেন না। দুর্যোধনের এক কথা, 'বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।' এদিকে যুদ্ধে ভীমার্জুন ও কৃষ্ণকে ধৃতরাষ্ট্রের বড় ভয়। অতএব পাণ্ডবেরা যাতে যুদ্ধ না করে, এমন পরামর্শ দেবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র তাঁর মন্ত্রী সঞ্জয়কে পাণ্ডবদের কাছে পাঠালেন। 'তোমাদের রাজ্য আমরা অধর্ম করে কেড়ে নেব, কিন্তু সেজন্য তোমরা যুদ্ধ কোরো না, কাজটা ভাল নয়', এমন অসঙ্গত কথা নিতান্ত নির্লজ্জ ব্যক্তিও মুখ ফুটে বলতে পারে না। কিন্তু দূতের লজ্জা নেই। অতএব সঞ্জয় পাণ্ডবসভায় এসে যা বললেন, তার মর্মকথা এই যে, 'যুদ্ধ গুরুতর অধর্মের কাজ, তোমরা সেই অধর্মে প্রবৃত্ত হয়েছ, অতএব, তোমরা বড় অধার্মিক!'

তার উত্তরে যুধিষ্ঠির সঞ্জয়কে বললেন, 'এই পৃথিবীতে দেবতাদের প্রার্থনীয় যে ধনসম্পত্তি আছে, তার সবকিছু, স্বর্গ, এমনকি ব্রহ্মলোকও আমি অধর্মত পেতে চাই না। মহাত্মা কৃষ্ণ ধর্মজ্ঞ, নীতিসম্পন্ন ও ব্রাহ্মণদের উপাসক। উনি কৌরব ও পাণ্ডব উভয় কুলেরই হিতৈষী এবং মহাবলশালী ভূপতিদের শাসক। এখন উনিই বলুন, আমি যদি সন্ধিপথ ত্যাগ করি, তাহলে নিন্দনীয় হই, আর যদি যুদ্ধে না জড়াই, তাহলে আমার স্বধর্ম পরিত্যাগ করা হয়, এমন অবস্থায় কী করণীয়। মহাপ্রভাব শিনির নাতি এবং চেদি, অন্ধক, বৃষ্ণি, ভোজ, কুকুর ও সৃঞ্জয়বংশীরা বাসুদেবের বুদ্ধিপ্রভাবে শত্রুদের দমন করে সুহৃদদের আনন্দিত করছেন। ইন্দ্রকল্প উগ্রসেন প্রভৃতি বীরগণ এবং মহাবলশালী মনস্বী সত্যপরায়ণ যাদবেরা সততই কৃষ্ণের উপদেশ লাভ করে থাকেন। কৃষ্ণ ত্রাতা ও কর্তা বলে কাশীশ্বর বভ্রু শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছেন; গ্রীষ্মের শেষে মেঘরাশি যেমন প্রজাদের জলদান করে, তেমনি বাসুদেব কাশীশ্বরকে সমস্ত ঈপ্সিত জিনিস প্রদান করে থাকেন। কর্মের নিশ্চয়তা দানকারী কেশব এমনই গুণসম্পন্ন, ইনি আমাদের প্রিয় ও সাধুতম, আমি কখনই এঁর কথার অন্যথা করব না।'

রাজা রবি বর্মার আঁকা ছবি ॥ ধৃতরাষ্ট্রের সভায় সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে কৃষ্ণের আগমনে ক্রুদ্ধ দুর্যোধন। কৃষ্ণ সাত্যকিকে প্রশমিত করার চেষ্টা করছেন

বাসুদেব সঞ্জয়কে বললেন, 'আমি সবসময় পাণ্ডবদের অবিনাশ, সমৃদ্ধি ও হিত এবং সপুত্র ধৃতরাষ্ট্রের উন্নতি কামনা করি। কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়, এই আমার ইচ্ছা, আমি ওঁদের এ ছাড়া অন্য কোনও পরামর্শ দিই না। অন্যান্য পাণ্ডবদের সামনে রাজা যুধিষ্ঠিরের মুখেও অনেকবার সন্ধির কথা শুনেছি: কিন্তু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর পুত্ররা অতিশয় অর্থলোভী, পাণ্ডবদের সঙ্গে তাঁর সন্ধিস্থাপন নিতান্তই দুষ্কর। সুতরাং বিবাদ যে ক্রমশ বাড়বে, এতে আশ্চর্য কী? হে সঞ্জয়! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ও আমি কখনও ধর্মচ্যুত হইনি, এটা জেনেও তুমি কিসের জন্য নিজের কাজে সতত উৎসাহসম্পন্ন স্বজন-পরিপালক রাজা যুধিষ্ঠিরকে অধার্মিক বলে আখ্যায়িত করলে?'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'শুচি ও কুটুম্বপোষক হয়ে বেদ অধ্যয়ন করে জীবনযাপন করার শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধি বিদ্যমান থাকলেও ব্রাহ্মণদের নানারকম বুদ্ধি জন্মে থাকে। কেউ কর্ম করে, কেউ-বা কর্ম ত্যাগ করে একমাত্র বেদজ্ঞানে মোক্ষ লাভ হয়, এমন ভেবে থাকেন; কিন্তু না খেলে যেমন তৃপ্তি হয় না, তেমনি কর্ম না করে কেবল বেদজ্ঞ হলে ব্রাহ্মণদের কখনও মোক্ষ লাভ হয় না। যে-সব বিদ্যা দিয়ে কর্মসংস্থান হয়, তাই ফলবতী। যাতে কোনও কাজ করার বিধি নেই, সে বিদ্যা নিতান্ত নিষ্ফল। অতএব যেমন পিপাসার্ত ব্যক্তির জলপান মাত্র পিপাসা নিবারিত হয়, তেমনি ইহকালে যে-সব কাজের ফল প্রত্যক্ষ করা যায়, তারই অনুষ্ঠান করা উচিত। হে সঞ্জয় কর্মের জন্যই এমন বিধি করা হয়েছে, সুতরাং কর্মই সবচেয়ে বড়। যে ব্যক্তি কর্ম অপেক্ষা অন্য কোনও বিষয়কে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করে থাকে, তার সমস্ত কর্মই নিষ্ফল হয়।

'দেখ, দেবতারা কর্মবলে প্রভাবসম্পন্ন হয়েছেন, বাতাস কর্মবলে সতত সঞ্চারমান; সূর্য কর্মবলে রাতদিন নিরলস পরিভ্রমণ করছেন; চাঁদ কর্মবলে নক্ষত্রমণ্ডলী পরিবৃত্ত হয়ে পক্ষকাল উদিত হচ্ছেন; হুতাশন (আগুন) কর্মবলে নিরবচ্ছিন্ন তাপ প্রদান করছেন; পৃথিবী কর্মবলে নিতান্ত দুর্বহ ভার অনায়াসেই বহন করছেন; নদীসকল কর্মবলে প্রাণিদের তৃপ্তি সাধন করে জলরাশি ধারণ করছেন; দেবতাদের মধ্যে প্রাধান্য লাভের জন্য ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করেছিলেন যে অমিত বলশালী দেবরাজ ইন্দ্র, তিনিও কর্মবলে দশদিক ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করে বারিবর্ষণ করে থাকেন এবং নির্বিকারভাবে ভোগবাসনা বিসর্জন ও প্রিয় বস্তুসমূহ পরিত্যাগ করে শ্রেষ্ঠত্বলাভ করেছেন এবং দম (ইন্দ্রিয় দমন), ক্ষমা, সমতা, সত্য ও ধর্ম প্রতিপালন করে দেবরাজ্য অধিকার করেছেন। ভগবান্ বৃহস্পতিবার সমাহিত হয়ে ইন্দ্রিয়নিরোধের মাধ্যমে ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করেছিলেন; এ জন্য তিনি দেবতাদের আচার্যপদ লাভ করেছেন। রুদ্র, আদিত্য, যম, কুবের, গন্ধর্ব, যক্ষ, অপ্সর, বিশ্বাবসু ও নক্ষত্রমণ্ডলী কর্মপ্রভাবে বিরাজিত আছেন; মহর্ষিরা ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মচর্য ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন।'

তিনি সঞ্জয়কে বললেন, 'তুমি কোন্ কারণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভৃতি সকল লোকের ধর্ম বিশেষভাবে জেনেও কৌরবদের মঙ্গলের জন্য পাণ্ডবদের নিগ্রহ করার চেষ্টা করছ? ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বেদজ্ঞ, অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানকর্তা, যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী এবং হাতি-ঘোড়া-রথ চালনায় সুনিপুণ। এখন পাণ্ডবেরা যদি কৌরবদের ক্ষতি না করে ভীমসেনকে শান্ত রেখে রাজ্যলাভের কোনও উপায় করতে পারেন, তাহলে ধর্মরক্ষা ও পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান হয়। এঁরা যদি ক্ষত্রিয়ধর্ম পালন করে নিজেদের কাজ করতে গিয়ে দুর্ভাগ্যবশত মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাও ভাল। বোধ হয়, তুমি সন্ধি স্থাপনকেই ভাল মনে করছ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধে ধর্মরক্ষা হয়, যুদ্ধ না করলে কি ধর্মরক্ষা হয়? এর মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করবে, আমি তারই অনুষ্ঠান করব।'

আমরা দেখেছি, কৃষ্ণের জীবনে দু'টি কাজ– ধর্মরাজ্য সংস্থাপন ও ধর্ম প্রচার। এরপর শ্রীকৃষ্ণ চতুর্বর্ণের ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের ধর্ম সম্পর্কে যেমন বলা হয়েছে, সে-সব উল্লেখ করে সঞ্জয়কে অনেক কথা বললেন। তিনি বললেন, 'তস্কর প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে হঠাৎ যে সর্বস্ব অপহরণ করে, দুই-ই নিন্দনীয়। দুর্যোধনের কাজকেও একধরনের তস্করবৃত্তি বলে সাব্যস্ত করা যেতে পারে। এ জন্য যদি প্রাণ বিসর্জনও দিতে হয়, তাও ভাল, তবুও পৈতৃক রাজ্য পুনরুদ্ধারে পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত নয়।'

কৃষ্ণ সঞ্জয়ের ধর্মের ভণ্ডামি শুনে তাকে কিছু সঙ্গত তিরস্কারও করলেন। বললেন, 'তুমি এখন রাজা যুধিষ্ঠিরকে ধর্মোপদেশ দিচ্ছ, কিন্তু যখন দুঃশাসন সভামধ্যে দ্রৌপদীর ওপর অকথ্য অত্যাচার করেছিল, তাকে তো ধর্মোপদেশ দাওনি।' কৃষ্ণ সচরাচর প্রিয়বাদী, কিন্তু সত্যিকার দোষ ধরিয়ে দেবার সময় স্পষ্টবক্তা। সত্যই তাঁর কাছে সবসময় প্রিয়।

সঞ্জয়কে তিরস্কার করে শ্রীকৃষ্ণ উভয়পক্ষের হিত কামনায় স্বয়ং নিজে হস্তিনাপুর যাবার কথা বললেন। বললেন, 'যাতে পাণ্ডবদের অর্থহানি না হয় এবং কৌরবরাও সন্ধি স্থাপনে সম্মত হন, এজন্যে যত্নবান হওয়া দরকার। তাহলে বড় পুণ্য কাজ হয় এবং কৌরবরাও মৃত্যুপাশ থেকে মুক্ত হতে পারেন।'

লোকের কল্যাণ, অসংখ্য মানুষের জীবনহানি এবং কৌরবদেরও রক্ষায় তিনি নিজে উপযাচক হয়ে জড়াতে চাইলেন। সন্ধি স্থাপনে তাঁর চেষ্টা খুবই দুরূহ কাজ, কেন-না পাণ্ডবেরা এখন তাঁকে বরণ করেছেন; এজন্য কৌরবেরা তাঁর সঙ্গে শত্রুর মত ব্যবহার করতেই পারেন, এটা জেনেও তিনি বৃহত্তর কল্যাণে শত্রুপুরীতে ঢুকতে মনস্থ করলেন।

শ্রীকৃষ্ণের সন্ধির উদ্যোগ

শ্রীকৃষ্ণ নিজের অঙ্গীকার বজায় রাখতে সন্ধি স্থাপনের জন্য কৌরবদের কাছে যেতে প্রস্তুত হলেন। যাবার আগে তিনি যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন ও দ্রৌপদীকে তাদের প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন ধর্মোপদেশ দিলেন।

যেমন যুধিষ্ঠিরের কথার উত্তরে কৃষ্ণ বললেন, 'হে মহারাজ, ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিধেয় নয়। যাবতীয় আশ্রমবাসী ক্ষত্রিয়ের ভিক্ষাবৃত্তি নিষেধ করেছেন। বিধাতা সংগ্রামে জয়লাভ অথবা প্রাণত্যাগ ক্ষত্রিয়ের নিত্যধর্ম বলে নির্দেশ করেছেন; অতএব দীনতা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয়। হে শত্রুনিপাতন যুধিষ্ঠির! আপনি নমনীয় হলে কখনওই নিজের অংশ লাভ করতে পারবেন না। কাজেই বিক্রম দেখিয়ে শত্রুদের বিনাশ করুন।'

ভীমের কথার উত্তরে বললেন, 'মানুষ পুরুষকার ত্যাগ করে কেবল দৈব বা দৈব ত্যাগ করে কেবল পুরুষকার অবলম্বন করে জীবন ধারণ করতে পারে না। যে ব্যক্তি এটা নিশ্চিত জেনে কাজে নিযুক্ত হয়, সে কাজ সিদ্ধ না হলে ব্যথিত বা কাজ সিদ্ধ হলে সন্তুষ্ট হয় না।'

অর্জুনের কথার উত্তরে কৃষ্ণ বললেন, 'উর্বর খেতে যথানিয়মে হালচাষ বীজ বপন করলেও বর্ষা ছাড়া ফলোৎপাদন হয় না। পুরুষ

যদি পুরুষকারের সঙ্গে তাতে জলসেচ করে, তবু দৈব প্রভাবে তা শুকিয়ে যেতে পারে। অতএব প্রাচীন মহাত্মারা দৈব ও পুরুষকার উভয়ে একত্র না মিললে কার্যসিদ্ধি হয় না বলে স্থির করেছেন। আমি যথাসাধ্য পুরুষকার প্রকাশ করতে পারি, কিন্তু দৈব কর্মের অনুষ্ঠানে আমার কিছুমাত্র ক্ষমতা নেই।'

কৃষ্ণ দেবত্ব একেবারে অস্বীকার করলেন। কেন-না, তিনি মানুষী শক্তি দিয়ে কাজ করতে প্রবৃত্ত। ঐশী শক্তির দ্বারা কাজ করা ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে অবতারের কোনও প্রয়োজন থাকে না।

অন্যান্য বক্তার কথা শেষ হলে দ্রৌপদী কৃষ্ণকে বিস্ময়কর কিছু কথা বললেন। কৃষ্ণা [দ্রৌপদীর আরেক নাম] বললেন, 'অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করলে যে পাপ হয়, বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করলেও সেই পাপ হয়ে থাকে।' তিনি সজল চোখে কৃষ্ণকে বলতে লাগলেন, 'হে জনার্দন! দুরাত্মা দুঃশাসন আমার এই কেশ আকর্ষণ করেছিল। শত্রুরা সন্ধিস্থাপনের মত প্রকাশ করলে তুমি এই কেশকলাপ স্মরণ করবে। ভীমার্জুন ভিখারির মত সন্ধিস্থাপনে রাজি হয়েছেন, তাতে আমার কিছু ক্ষতি নেই, আমার বৃদ্ধ পিতা তার মহারথ পুত্রদের নিয়ে শত্রুদের সঙ্গে সংগ্রাম করবেন, আমার মহাবল পরাক্রান্ত পাঁচ ছেলে অভিমন্যুকে পুরস্কৃত করে কৌরবদের সংহার করবে। দুরাত্মা দুঃশাসনের বাহু ছিঁড়ে মাটিতে না গড়ানো পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। আমি বুকে ক্রোধের আগুন জ্বেলে তের বছর অপেক্ষা করেছি। তবুও সেই আগুন কিছুমাত্র প্রশমিত হয়নি। আজ আবার ধর্মের কথা বলে বৃকোদর যে শেল নিক্ষেপ করেছেন, তাতে আমার হৃদয় চৌচির হয়ে যাচ্ছে।'

মহাবাহু বাসুদেব তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'হে কৃষ্ণে! তুমি অল্প দিনের মধ্যেই কৌরবনারীদের কাঁদতে দেখবে। তুমি যেমন কাঁদছ, কুরু কুলনারীরাও তাদের জ্ঞাতি-বন্ধুরা নিহত হলে এমনই কাঁদবে। আমি যুধিষ্ঠিরের নিয়োগানুসারে ভীমার্জুন নকুল সহদেবকে নিয়ে কৌরবদের বধসাধনে প্রবৃত্ত হব। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা আমার কথা না শুনলে শিগগিরই নিহত ও শিয়াল-কুকুরের খাদ্য হয়ে ধরাতলে পতিত হবে। যদি হিমালয় চলতে শুরু করে, পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত ও আকাশমণ্ডল নক্ষত্রসমূহের সঙ্গে নিপতিত হয়, তবু আমার কথা মিথ্যা হবে না। হে কৃষ্ণে! অশ্রু সংরবণ কর। আমি তোমাকে যথার্থ বলছি, তুমি শিগগিরই তোমাদের স্বামীদের শত্রু সংহার করে রাজ্যলাভ করতে দেখবে।'

কৃষ্ণ নিশ্চিত জানতেন, দুর্যোধন অর্ধেক রাজ্য প্রদান করে সন্ধি স্থাপনে কখনও রাজি হবে না। তা জেনেও তিনি সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে কৌরবসভায় যেতে উদ্যোগী। তার কারণ এই যে, যা অনুষ্ঠেয়, তা সফল হোক বা না হোক, করতে হবে। সাফল্য বা ব্যর্থতা সমান জ্ঞান করতে হবে। সর্বত্রগামী সর্বকালব্যাপী বুদ্ধির প্রভাবে ভবিষ্যতে যা হবে তা তিনি স্পষ্ট দেখতে পেতেন, যে কারণেই এমন ভবিষ্যদ্বাণী করতে পেরেছিলেন।

যাহোক, রেবতী নক্ষত্রযুক্ত কার্তিকমাসের এক শুভ মুহূর্তে কৌরবসভায় গমনের ইচ্ছায় বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণদের মাঙ্গল্য ও পুণ্যঘোষণা শুনে ও প্রাতঃকৃত্য সেরে স্নান ও বসনভূষণ পরে কৃষ্ণ সূর্য ও অগ্নির উপাসনা করলেন এবং ষাঁড়ের লেজ দর্শন, ব্রাহ্মণদের অভিবাদন, অগ্নি প্রদক্ষিণ ও কল্যাণকর দ্রব্যাদি দর্শন করে যাত্রা করলেন। তখনকার দিনে ব্রাহ্মণেরা বিদ্বান, জ্ঞানবান, ধর্মাত্মা এবং নিঃস্বার্থভাবে সমাজের মঙ্গলসাধনে কাজ করতেন বলে অন্য বর্ণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা লাভ করতেন। কৃষ্ণও ব্রাহ্মণদের যথোচিত সৎকার করতেন।

মহাবাহু কেশব একটু দূরে গিয়ে রাস্তার দু'পাশে ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান কয়েকজন মহর্ষির দেখা পেলেন। তাঁদের দেখামাত্র তিনি রথ থেকে নেমে অভিবাদন করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহর্ষিগণ, সমস্ত লোকের কুশল? ধর্ম উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হচ্ছে? ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণ ব্রাহ্মণদের শাসনে অবস্থান করছে? আপনারা কোথায় সিদ্ধ হয়েছেন? কোথায় যেতে ইচ্ছা করেন? আপনাদের প্রয়োজন কী? আমাকে আপনাদের কোন্ কাজ করতে হবে? কী কারণে আপনারা ধরণীতলে অবতীর্ণ হয়েছেন?'

তখন মহাভাগ জামদগ্ন্য কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে বললেন, 'মধুসূদন! আমাদের মধ্যে কেউ কেউ দেবর্ষি, কেউ কেউ বহুশ্রুত ব্রাহ্মণ, কেউ কেউ রাজর্ষি এবং কেউ কেউ তপস্বী। আমরা অনেকবার দেবাসুরের সমাগম দেখেছি; এখন সমুদায় ক্ষত্রিয়, সভাসদ, রাজন্য ও আপনাকে দেখবার বাসনায় যাচ্ছি। আমরা কৌরবসভায় আপনার মুখনিঃসৃত ধর্মকথা শুনতে অভিলাষী হয়েছি। হে যাদবশ্রেষ্ঠ! ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতি মহাত্মারা এবং আপনি যে সত্য ও হিতকর বাক্য বলবেন, আমরা সে-সব শুনতে নিতান্ত উৎসুক। কাজেই এখন আপনি শিগগিরই কুরুরাজ্যে গমন করুন; আমরা সেখানে আপনাকে সভামণ্ডপে দিব্য আসনে আসীন ও তেজঃপ্রদীপ্ত দেখে পুনরায় আপনার সঙ্গে কথোপকথন করব।'

এখানে বলা দরকার, জামদগ্ন্য পরশুরাম কৃষ্ণের সমসাময়িক বলে বর্ণিত হয়েছেন। রামায়ণে আবার তিনি রামচন্দ্রের সমসাময়িক বলে বর্ণিত। অথচ পুরাণে তিনি রাম কৃষ্ণ উভয়েরই পূর্বগামী বিষ্ণুর অবতার বলে খ্যাত। পুরাণের দশাবতার কত দূর সঙ্গত, তা নিয়ে আমার সংশয় আছে।

হস্তিনাযাত্রার বর্ণনায় দেখা যায়, কৃষ্ণ নিজেও সাধারণ প্রজার পূজ্য ছিলেন। দেবকীনন্দন শস্যশ্যামল অতি রম্য ধানের খেত এবং অতি মনোহর হৃদয়তোষণ পশুপাখি দেখতে দেখতে বিবিধ পুর ও রাজ্য অতিক্রম করলেন। এদিকে পুরবাসীরা কৃষ্ণকে দেখার জন্য কুরুশাসিত উপপ্লব্য নগর থেকে রাস্তায় এগিয়ে এসে তাঁর প্রতীক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে বাসুদেব সেখানে উপস্থিত হলে সবাই যথাবিহিত তাঁর পূজা করতে লাগল।

ইতোমধ্যে সূর্যদেব তাঁর কিরণ পরিত্যাগ করে রক্তবর্ণ ধারণ করলে শত্রুবিনাশক মধুসূদন ক্ষুধা অনুভব করায় রথ থেকে নেমে যথাবিধি শৌচাদি শেষ করে রথের ঘোড়া খুলে দেবার আদেশ দিয়ে উপাসনায় বসলেন। দারুক কৃষ্ণের আজ্ঞামত ঘোড়াগুলিকে রথ থেকে বিযুক্ত করে পরিচর্যা ও গা মুছিয়ে ছেড়ে দিল। মহাত্মা মধুসূদন সন্ধ্যা শেষ করে পরিচারকদের বললেন, 'আজ যুধিষ্ঠিরের কাজে এখানে আমাদের রাত্রিযাপন করতে হবে।' তখন পরিচারকের দল মুহূর্তের মধ্যে পটমণ্ডপ নির্মাণ করে বিবিধ সুমিষ্ট অন্নপান তৈরি করল। এদিকে সেই গ্রামের আর্য কুলিন ব্রাহ্মণেরা মহাত্মা হৃষীকেশের কাছে এসে বিধিমত তাঁর পূজা ও আশীর্বাদ করে নিজ নিজ বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলেন। ভগবান্ মধুসূদন তাঁদের অর্চনা করে তাঁদের ইচ্ছানুসারে প্রত্যেকের বাড়িতে গেলেন। তারপর তাঁদের নিয়ে আবার পটমণ্ডপে ফিরে এলেন। তারপর ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিয়ে সুমিষ্ট খাদ্যদ্রব্য ভোজন করে হৃষ্টমনে রাত্রিযাপন করলেন।

এদিকে কৃষ্ণ আসছেন শুনে বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র তাঁর অভ্যর্থনা ও সম্মানের জন্য বড় বেশি আয়োজন করতে লাগলেন। নানা রত্নবিভূষিত অনেকগুলি সভা নির্মাণ করালেন। তাঁকে উপঢৌকন

দেবার জন্য অনেক হাতি, ঘোড়া, রথ, দাস, শতসংখ্যক কুমারী দাসী, মেষ, খচ্চর, মণিমাণিক্য ইত্যাদি সংগ্রহ করতে লাগলেন।

বিদুর দেখেশুনে বললেন, 'ভাল ভাল। তুমি যেমন ধার্মিক, তেমনি বুদ্ধিমান। কিন্তু রত্ন-মণিমাণিক্য দিয়ে কৃষ্ণকে ঠকাতে পারবে না। তিনি যে জন্য আসছেন, তা করতে পার কিনা দেখ। তাহলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন– অর্থের লোভে তোমার বশ হবেন না।'

ধৃতরাষ্ট্র ধূর্ত, বিদুর সরল; দুর্যোধন দুইই। তিনি বললেন, 'কৃষ্ণ পূজনীয় বটে কিন্তু তাঁর পূজা করব না। যুদ্ধ তো ছাড়ব না; তবে তাঁর সমাদরে কাজ কী? লোকে মনে করবে, আমরা ভয়ে পড়েই তার খোশামোদ করছি। আমি তার চেয়ে একটা সৎ পরামর্শ ঠিক করেছি। আমরা তাঁকে বেঁধে রাখব। পাণ্ডবদের বল-বুদ্ধি সবই কৃষ্ণ, কৃষ্ণ আটক থাকলে পাণ্ডবেরা আমার বশীভূত থাকবে।

একথা শুনে ধৃতরাষ্ট্রও পুত্রকে তিরস্কার করতে বাধ্য হলেন। কেন-না কৃষ্ণ দূত হয়ে আসছেন। কৃষ্ণভক্ত ভীষ্ম দুর্যোধনকে গালাগালি দিতে দিতে সভা ছেড়ে উঠে গেলেন।

নাগরিক ও কৌরবেরা বহু সম্মান-সমাদর করে কৃষ্ণকে কুরুসভায় নিয়ে এলেন। তাঁর জন্য যে-সব সভা নির্মিত ও মণিরত্ন রক্ষিত ছিল, তিনি তার প্রতি দৃক্‌পাত করলেন না। তিনি ধৃতরাষ্ট্রভবনে গিয়ে কুরুসভায় উপবেশন করে যে-যেমন যোগ্য তার সঙ্গে সে-রকম সৎসম্ভাষণ করলেন। পরে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে দীনবন্ধু বিদুরের দীনভবনে চললেন।

বিদুর, ধৃতরাষ্ট্রের একরকম ভাই। উভয়েই জন্ম ব্যাসদেবের ঔরসে। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র রাজা বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ পুত্র। অন্যদিকে বিদুর বিচিত্রবীর্যের এক বৈশ্যা দাসীর গর্ভে জন্মেছিলেন। তাঁকে বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ ধরলেও তাঁর জাতি নির্ণয় হয় না। কেন-না ব্রাহ্মণের ঔরসে, ক্ষত্রিয়ের ক্ষেত্রে, বৈশ্যার গর্ভে তাঁর জন্ম।

তিনি সামান্য ব্যক্তি কিন্তু পরম ধার্মিক। কৃষ্ণ রাজপ্রাসাদ ছেড়ে তাঁর বাড়ি গিয়ে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করলেন। সে-জন্য আজও এদেশে 'বিদুরের খুদ' বলে একটা কথা প্রচলিত আছে। পাণ্ডবদের মাতা কুন্তী, কৃষ্ণের পিসি, সেখানে বাস করতেন। বনবাসকালে পাণ্ডবেরা তাঁকে সেখানে রেখে গিয়েছিলেন। কৃষ্ণ কুন্তীকে প্রণাম করতে গেলেন। কুন্তী পুত্রদের এবং পুত্রবধূর দুঃখের বিবরণ শুনে কৃষ্ণের কাছে অনেক কান্নাকাটি করলেন। উত্তরে কৃষ্ণ কিছু অমূল্য কথা বললেন। কৃষ্ণ বললেন, 'পাণ্ডবেরা নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্রোধ, হর্ষ, ক্ষুধা, পিপাসা, হিম, রৌদ্র পরাজিত করে বীরোচিত সুখে আছেন। তাঁরা ইন্দ্রিয়সুখ ত্যাগ করে বীরোচিত সুখে সন্তুষ্ট আছেন; সেই মহাবল মহাউৎসাহী বীরেরা কখনও অল্পে সন্তুষ্ট হন না। বীর ব্যক্তিরা হয় অতিশয় ক্লেশ, না হয় অতিশয় সুখ ভোগ করে থাকেন। আর ইন্দ্রিয়সুখ অভিলাষী ব্যক্তিরা মাঝামাঝিতেই সন্তুষ্ট থাকেন; কিন্তু মধ্যাবস্থা দুঃখের আকর। রাজ্যলাভ বা বনবাস সুখের প্রধান কারণ।' কৃষ্ণ আরও বললেন, 'আপনি তাদের শত্রুবিনাশ করে সকল লোকের আধিপত্য ও অতুল সম্পত্তি ভোগ করতে দেখবেন।' 'রাজ্যলাভ বা বনবাস' একথা আধুনিক হিন্দু বোঝে না। হিন্দুর রাষ্ট্রচিন্তা নেই, থাকলে এত দুঃখ থাকত না।

এ থেকে বোঝা যায়, কৃষ্ণ নিশ্চিত জানতেন যে, সন্ধি হবে না– যুদ্ধ হবে। তবু সন্ধি স্থাপনের জন্য হস্তিনায় এসেছেন। কেন-না, যে কাজ অনুষ্ঠেয়, তা সিদ্ধ হোক বা না হোক, তা করতে হবে। একেই তিনি কর্মযোগ বলে গীতায় অভিহিত করেছেন। যুদ্ধের চেয়ে সন্ধিতে মানুষের কল্যাণ। এজন্য সন্ধি স্থাপনে কাজ করতে হবে। কিন্তু যখন যথাসাধ্য চেষ্টা করেও সন্ধি স্থাপনে ব্যর্থ হলেন, তখন যুদ্ধবিমুখ অর্জুনের তিনিই প্রধান পরামর্শদাতা ও সহায়, সেটা পরে আমরা জানতে পারব। কেন-না সন্ধি যখন অসাধ্য, তখন যুদ্ধ করাই ধর্ম।

তারপর কৃষ্ণ কুন্তীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পুনরায় কৌরবসভায় গেলেন। সেখানে গেলে দুর্যোধন তাঁকে খাবার নিমন্ত্রণ করলেন। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। দুর্যোধন কারণ জিজ্ঞাসা করলে কৃষ্ণ তাকে লৌকিক নীতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'দূতেরা কাজ শেষ হলে খাবার ও পূজা গ্রহণ করে থাকে; অতএব আমি কৃতকার্য হলে তবে আপনার পূজা গ্রহণ করব।' দুর্যোধন তবুও ছাড়েন না; আবার পীড়াপীড়ি করলেন। তখন কৃষ্ণ বললেন, 'লোকে হয় আন্তরিক বা বিপন্ন হয়ে অন্যের অন্ন ভোজন করে। আপনি আন্তরিকভাবে আমাকে খেতে দিতে চাননি, আর আমি বিপদগ্রস্তও নই, তাহলে কিসের জন্য আপনার অন্ন ভোজন করব?'

খাবার নিমন্ত্রণ একটা সামান্য কাজ; কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবন সাধারণত কতকগুলো সামান্য কাজের সমষ্টিমাত্র। সামান্য কাজের জন্যও একটা নীতি আছে বা থাকা উচিত। বড় কাজের ক্ষেত্রে নীতির যে ভিত্তি, ছোট কাজের নীতিরও সেই ভিত্তি। সে ভিত্তি হল ধর্ম। উন্নত চরিত্রের মানুষের সঙ্গে ক্ষুদ্রচেতা মানুষের পার্থক্য এই, ক্ষুদ্রচেতা মানুষ ধর্মে পরাঙ্মুখ না হলেও সামান্য বিষয়ে নীতি মেনে চলতে সক্ষম হন না, কেন-না তিনি নীতির ভিত্তি অনুসন্ধান করেন না। কিন্তু আদর্শ মানুষ এই ছোট বিষয়েও নীতির ভিত্তি অনুসন্ধান করেন। কৃষ্ণ আদর্শ মানুষ। তিনি দেখলেন যে, নিমন্ত্রণ গ্রহণ সরলতা ও সত্যের পরিপন্থী কাজ হবে। তাই তিনি দুর্যোধনকে স্পষ্ট কথা কর্কশভাবে বলতেও দ্বিধা করলেন না। যেখানে অকপট ব্যবহার ধর্মসম্মত, সেখানেও আমরা স্পষ্ট করে বলতে পারি না বা বলি না। এই ধর্মবিরুদ্ধ লজ্জা অনেক সময় আমাদের ছোট ছোট অধর্মে লিপ্ত ও বিপন্ন করে।

কৃষ্ণ তারপর কুরুসভা থেকে উঠে বিদুরের বাড়িতে গেলেন। রাত্রে তিনি সেখানেই থাকলেন। বিদুরের সঙ্গে তাঁর অনেক কথাবার্তা হল। বিদুর তাঁকে বোঝালেন যে, তাঁর হস্তিনায় আসা ঠিক হয়নি; কেন-না দুর্যোধন কোনওমতেই সন্ধি করবে না। কৃষ্ণও সে-কথা জানেন। তাই বললেন, 'যিনি বিপর্যস্ত সমুদয় পৃথিবীকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারেন, তাঁরই উৎকৃষ্ট ধর্মলাভ হয়।'

কৃষ্ণ পুনরায় বললেন, 'যে ব্যক্তি নেশাগ্রস্ত বন্ধুর নেশা ছোটাবার চেষ্টা করে না, পণ্ডিতেরা তাকে নৃশংস বলে থাকেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বন্ধুর চুল ধরে টেনে এনে হলেও তাকে অকাজ করতে দেন না।... যদি তিনি (দুর্যোধন) আমার কথা না শোনেন, তাতে কোন ক্ষতি নেই; বিমুখ আত্মীয়কে সদুপদেশ দান পরম আনন্দের ও ঋণ স্বীকারের মত। যে ব্যক্তি জ্ঞাতিবিরোধের সময় সৎপরামর্শ দেয় না, সে কখনও আত্মীয় হতে পারে না।'

পরদিন সকালে দুর্যোধন এবং শকুনি এসে শ্রীকৃষ্ণকে বিদুরের বাসভবন থেকে কৌরবসভায় নিয়ে এলেন। সেখানে নারদ প্রভৃতি দেবর্ষি এবং জমদগ্নি প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণ অসাধারণ বাগ্মিতায় ধৃতরাষ্ট্রকে সন্ধি স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করলেন। উপস্থিত ঋষিরাও খুব বোঝালেন। কিন্তু কিছুতে কিছু হল না। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, 'আমার সাধ্য নেই, দুর্যোধনকে বল।' দুর্যোধনকে কৃষ্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি অনেকভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। সন্ধিস্থাপন দূরে থাক, দুর্যোধন কৃষ্ণকে কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিলেন। কৃষ্ণও তার উপযুক্ত জবাব দিলেন। কৃষ্ণ দুর্যোধনের দুশ্চরিত্র ও পাপ

কাজের বিবরণ একে একে দিতে শুরু করলে দুর্যোধন রেগে সভাস্থল ছেড়ে উঠে গেলেন।

তখন কৃষ্ণ রাজনীতির নানা অন্ধি-সন্ধি ব্যাখ্যা করে ধৃতরাষ্ট্রকে সন্ধি স্থাপনের পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন, 'রাজনীতির মূল সূত্র হচ্ছে, প্রজাদের রক্ষায় দুস্কৃতকারীকে দণ্ডিত করা। অর্থাৎ অনেকের কল্যাণে দুষ্টের দণ্ডবিধান। সমাজ রক্ষায় হত্যাকারীকে বধ করাই বিহিত। যাকে বন্দী না করলে তার অপকর্মে বহু প্রাণির প্রাণ বিনষ্ট হবে, জ্ঞানীরা তাকে বন্দী করারই পরামর্শ দেন।' মহানীতিজ্ঞ কৃষ্ণ দুর্যোধনকে বন্দী করে হলেও পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে পরামর্শ দিলেন। তিনি নিজে যদুবংশ রক্ষায় মাতুল কংসকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছিলেন, সে উদাহরণও দিলেন। কিন্তু কোনও পরামর্শই গৃহীত হল না।

এদিকে, ক্রুদ্ধ দুর্যোধন কৃষ্ণকে আবদ্ধ করার জন্য কর্ণের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন। সাত্যকি কৃতবর্মা প্রভৃতি কৃষ্ণের জ্ঞাতিবর্গ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সাত্যকি কৃষ্ণের অনুগত ও প্রিয়; অস্ত্রবিদ্যায় অর্জুনের শিষ্য এবং প্রায় অর্জুনের সমতুল্য বীর। ইঙ্গিতজ্ঞ মহাবুদ্ধিমান সাত্যকি এ মন্ত্রণার কথা জানতে পেরে আরেক যাদববীর কৃতবর্মাকে সসৈন্যে নগরদ্বারে প্রস্তুত থাকতে বলে কৃষ্ণকে মন্ত্রণার কথা জানালেন। তারপর ধৃতরাষ্ট্রসহ সভার সকলকে জানালেন। শুনে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, 'পতঙ্গ যেমন আগুনে ঝাঁপ দেয়, এদের দশাও তেমন হবে। জনার্দন ইচ্ছা করলে যুদ্ধকালে সকলকেই বধ করতে পারবেন।'

কৃষ্ণ প্রকৃত বলশালী। তাই সতত রাগশূন্য ও ক্ষমাশীল। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, 'শুনেছি দুর্যোধনের দল আমাকে নিগৃহীত করবেন। কিন্তু আপনি অনুমতি দিয়ে দেখুন, আমি এদের আক্রমণ করি, না ওরা করে। আমি একাই এদের নিগৃহীত করতে পারি। কিন্তু আমি কোনও ধরনের নিন্দিত পাপ কাজ করব না। আপনার ছেলেরাই পাণ্ডবদের অর্থবিত্তে লোভী হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। বস্তুত এরা আমাকে নিগৃহীত করার চেষ্টা করে যুধিষ্ঠিরকেই সফল করছেন। আমি আজ এখন এদের এবং এদের সাঙ্গপাঙ্গদের নিগ্রহ করে পাণ্ডবদের নিষ্কণ্টক করতে পারি। তাতে আমার কোন পাপও হবে না। কিন্তু আপনার সামনে এমন ক্রোধ ও পাপ কাজে লিপ্ত হব না। কাজেই দুর্যোধনের সাঙ্গপাঙ্গরা তার ইচ্ছানুসারে যা ইচ্ছা করুক।'

এ কথার পর ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে ডেকে ভর্ৎসনা করে বললেন, 'তুমি অতি নৃশংস, পাপাত্মা ও নীচাশয় বলেই এমন অসাধ্য, অগৌরব ও গর্হিত পাপাচারে লিপ্ত হতে চাইছ। কুলবিনাশী মূঢ়ের মত দূরাত্মাদের সঙ্গে মিলে নিতান্ত দুর্ধর্ষ জনার্দনকে নিগ্রহ করতে চাইছ। অবুঝ বালক যেমন চাঁদ হাতে পেতে চায়, তুমি তেমনি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের দুরাক্রম্য কেশবকে বন্দী করার কথা ভাবছ। দেবতা, মানুষ, গন্ধর্ব, অসুর ও নাগকুল যার সংগ্রাম সহ্য করতে পারে না, তুমি কি সেই কেশবের পরিচয় পাওনি? বাছা! হাত দিয়ে বাতাস ধরা যায় না; করতল দিয়ে কখনও আগুন স্পর্শ করা যায় না; মাথা দিয়ে কখনও পৃথিবী ধরা যায় না; তেমনি বল দিয়ে কখনও কেশবকে ধরা যায় না।'

তারপর বিদুরও দুর্যোধনকে ভর্ৎসনা করলেন। বিদুরের কথা শেষ হলে বাসুদেব সাত্যকি ও কৃতবর্মার হাত ধরে হাসতে হাসতে কুরুসভা ত্যাগ করলেন। কুরুসভা থেকে বেরিয়ে কৃষ্ণ কুন্তীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উপপ্লব্য নগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পাণ্ডবেরা তখন এখানে অবস্থান করছিলেন। যাত্রাকালে তিনি কর্ণকে রথে তুলে নিলেন। যারা কৃষ্ণকে নিগ্রহ করার জন্য পরামর্শ করছিল, কর্ণ তাদের একজন। আমরা সাম ও দণ্ডনীতিতে কৃষ্ণের নীতিজ্ঞতা দেখেছি, এবার ভেদনীতিতে তাঁর পারদর্শিতা দেখব।

কর্ণ মহাবীর– অর্জুনের সমকক্ষ রথী। তাঁর বাহুবলেই দুর্যোধন নিজেকে বলবান ভাবেন। তাঁর বলের ওপর নির্ভর করেই তিনি পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান। কর্ণের সাহায্য না পেলে তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন না ভেবে কৃষ্ণ কর্ণের সঙ্গে একান্তে কথা বলতে চাইলেন।

কর্ণ অধিরথ নামে এক সূত (প্রাচীন জাতি)-র পুত্র বলে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে তিনি অধিরথের পুত্র নন– পালিত পুত্র। তবে একথা তিনি জানতেন না। তিনি সূতপত্নীর গর্ভজাত নন, কুন্তীর গর্ভজাত, সূর্যের ঔরসে তাঁর জন্ম। কুন্তীর কুমারীকালে তাঁর জন্ম হয়েছিল বলে কুন্তী পুত্র ভূমিষ্ঠ হবার পরেই তাঁকে ত্যাগ করেন। বস্তুত তিনি যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবদের সহোদর ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা। একথা কুন্তী ছাড়া আর প্রায় কেউই জানতেন না। কুন্তী কৃষ্ণের পিসি। ভোজরাজগৃহে এ ঘটনা ঘটে, কৃষ্ণ অসম্ভব বুদ্ধিমান বলে অতি গোপন ঘটনাটি কোনওভাবে জেনে থাকবেন।

কৃষ্ণ রথে যেতে যেতে কর্ণকে বললেন, 'শাস্ত্রজ্ঞরা বলেন, যিনি যে কন্যার পাণি গ্রহণ করেন, তিনি সেই কন্যার কুমারীকালে গর্ভজাত সন্তানের পিতা। কর্ণ! তুমি তোমার মায়ের কন্যাবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছ, সে জন্যই তুমি ধর্মত পাণ্ডুপুত্র; অতএব চল, ধর্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধেও তুমি রাজা হবে।' তিনি কর্ণকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তিনি জ্যেষ্ঠ, এ জন্য তিনিই রাজা হবেন, আর পঞ্চপাণ্ডব তাঁর আজ্ঞাবাহী হয়ে তাঁর সেবা করবে।

কৃষ্ণ একান্তভাবেই যুদ্ধ এড়াতে চাইছিলেন। কারণ যুদ্ধ মানেই লোকক্ষয়। বিরাট নগরে যখন যুদ্ধের প্রস্তাব হয়, কৃষ্ণ তার বিরোধিতা করেছিলেন। অর্জুন যখন তাঁকে যুদ্ধে বরণ করতে গেলেন, তিনি অস্ত্র ধরবেন না ও যুদ্ধ করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তাতেও যুদ্ধ বন্ধ হয় না দেখে তিনি কৌরবসভায় গেলেন সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে; সেখানেও যখন কাজ হল না, তিনি কর্ণকে রাজা হওয়ার প্রস্তাব দিলেন। কর্ণ রাজা হলে সব কুল রক্ষা হয়– কুরু-পাণ্ডবে অনিবার্য যুদ্ধ হয়তো নিবারণ সম্ভব।

কর্ণ কৃষ্ণের কথার উপযোগিতা স্বীকার করলেন। তিনিও বুঝেছিলেন যে, এ যুদ্ধে দুর্যোধনদের রক্ষা নেই। কিন্তু কৃষ্ণের কথায় রাজি হলে তিনি কয়েকটি গুরুতর অপরাধে অপরাধী হবেন। অধিরথ ও তার স্ত্রী রাধা তাঁকে প্রতিপালন করেছে। তাদের আশ্রয়ে তিনি বড় হয়েছেন; সূতবংশে বিয়ে করেছেন, সেখানে তার পুত্র-পৌত্রাদি জন্মেছে। তাদের তিনি কোনওমতেই ত্যাগ করতে পারেন না। আবার দুর্যোধনের আশ্রয়ে থেকে তিনি তের বছর রাজ্যভোগ করেছেন; দুর্যোধন তাঁকেই ভরসা করেন; এখন দুর্যোধনকে ত্যাগ করে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিলে লোকে তাঁকে কৃতঘ্ন, পাণ্ডবদের ঐশ্বর্যলোভী বা তাঁদের ভয়ে ভীত কাপুরুষ বলবে। এজন্য কর্ণ কোনওমতেই কৃষ্ণের কথায় সম্মত হলেন না।

কৃষ্ণ বললেন, 'আমার কথায় যখন তুমি রাজি হলে না, তখন নিশ্চয়ই পৃথিবীর সংহারদশা উপস্থিত হয়েছে।' কর্ণও সে-কথা মানলেন। তারপর কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে বিষণ্ণ মনে রথ থেকে নেমে গেলেন। কৃষ্ণ উপপ্লব্য নগরে ফিরে হস্তিনাপুরে যা যা ঘটেছে আনুপূর্বিক বর্ণনা করলেন।

পঞ্চম অধ্যায়
কুরুক্ষেত্র

যো নিষণ্ণো ভবেদ্রাত্রৌ দিবা ভবতি বিষ্ঠিতঃ।
ইষ্টানিষ্টস্য চ দ্রষ্টা তস্মৈ দ্রষ্টাত্মনে নমঃ ॥
– মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৪৭ অধ্যায়।

ভীষ্মের যুদ্ধ

কুরুক্ষেত্রে হেমন্তের এক অসাধারণ প্রভাতে, সূর্য যেদিন উদয়কালে ছিল দ্বিধাবিভক্ত আর আকাশে ছিল সাতটি গ্রহের সমাবেশ– কৌরবেরা পশ্চিম দিকে আর পাণ্ডবেরা পূর্ব দিকে মুখ করে দণ্ডায়মান। সময় সূচনার সংকেত জানিয়ে ভীষ্ম শঙ্খনাদ করলেন, আকাশে প্রতিধ্বনিত হল আরও অনেক শঙ্খ, চাক, তুরী, মৃদঙ্গ; আর অর্জুন কৃষ্ণচালিত তার বিখ্যাত কপিধ্বজ রথে আরূঢ়, হাতে তুলে নিয়েছেন গাণ্ডীব শরাসন। এখন মহাভারতের মহাযুদ্ধ শুরু হবে। মহাভারতের চারটি পর্বে এ যুদ্ধকথা বর্ণিত হয়েছে। দুর্যোধনের চার সেনাপতির নামে এই চারটি পর্বের নাম যথাক্রমে ভীষ্মপর্ব, দ্রোণপর্ব, কর্ণপর্ব ও শল্যপর্ব। উভয়পক্ষ যখন যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত, কৃষ্ণ অর্জুনকে দুর্গাস্তব জপ করে যুদ্ধ আরম্ভ করতে বললেন। অর্জুন দুর্গাস্তব পাঠ করে কৃষ্ণকে যুদ্ধক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে রথ স্থাপনের অনুরোধ করলেন। উদ্দেশ্য যুদ্ধংদেহি উভয়পক্ষকে অবলোকন। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাইকে রণসজ্জায় সুসজ্জিত দেখে অর্জুন বিমর্ষ হয়ে যুদ্ধ করবেন না বলে জানালেন। কৃষ্ণ তাঁকে নানা উপদেশ, পরামর্শ দিয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করতে চাইলেন। এই কৃষ্ণকথামৃতই গীতা। এটিই কৃষ্ণচরিত্রের প্রধান অংশ। গীতায় কৃষ্ণ এক অনুপম ধর্মকথা প্রচার করলেন, যার সারকথা হল, 'কর্মণ্যে বাধিকারাস্তে মা ফলেষু কদাচন।' গীতাই তাঁর আদর্শ মনুষ্যত্বের বা দেবত্বের অন্যতম প্রধান পরিচয়। গীতা ব্যাখ্যানে কৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করালেন। ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ে ভগবান্ অর্জুনকে বলছেন, 'তুমি ছাড়া আর কেউ এটি আগে দেখেনি।... তুমি ছাড়া মনুষ্যলোকে আর কেউই বেদ অধ্যয়ন, যজ্ঞের অনুষ্ঠান, দান, ক্রিয়াকলাপ, লয় ও অতি কঠোর তপস্যা দ্বারা আমার এমন রূপ অবলোকন করতে সমর্থ হয় না।' প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসে গীতার তুলনা নেই। ভগবদ্গীতা পর্বের পর ভীষ্মবধ পর্ব। এখানেই যুদ্ধারম্ভ।

ভীষ্মবধ পর্ব

মহাভারতের যুদ্ধে কৃষ্ণ অর্জুনের সারথিমাত্র। সারথিদের মন্দভাগ্য। কারণ দ্বৈরথ যুদ্ধে রথিরা পরস্পরের অশ্ব ও সারথিকে সবার আগে বিনাশ করার চেষ্টা করেন। কারণ, অশ্ব ও সারথি নষ্ট হলে আর রথ চলবে না। রথ না চললে রথী বিপন্ন হবেন। সারথিরা যোদ্ধা নয়– বিনা দোষে মৃত্যুবরণই তাদের নিয়তি। তিনি নিহত হননি বটে, কিন্তু আঠার দিনের যুদ্ধে মুহূর্তে মুহূর্তে বহুসংখ্যক বাণে বিদ্ধ হয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন। অন্যান্য সারথিরা বৈশ্য, জাতিতে ক্ষত্রিয় নয়। কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়, আত্মরক্ষায় অতিশয় সক্ষম, কিন্তু সারথির যুদ্ধ বিধেয় নয় বলে বসে বসে কেবল মার খেয়েছেন।

মহাভারতের যুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ করবেন না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তবু একদিন তিনি অস্ত্রধারণ করেছিলেন। ঘটনাটা এ রকম: ভীষ্ম দুর্যোধনের সেনাপতি। যুদ্ধে তিনি এত নিপুণ যে, পাণ্ডবসেনার মধ্যে অর্জুন ছাড়া আর কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিল না। কিন্তু অর্জুন তাঁর সঙ্গে তাঁর সামর্থ্য অনুসারে যুদ্ধ করেন না। তার কারণ এই যে, ভীষ্ম সম্পর্কে অর্জুনের পিতামহ এবং বাল্যকালে পিতৃহীন পাণ্ডবদের তিনিই পুত্রস্নেহে প্রতিপালন করেছিলেন। ভীষ্ম এখন দুর্যোধনের অনুরোধে নিরপরাধ পাণ্ডবদের শত্রু হয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন, যদিও ভীষ্ম ধর্মত অর্জুনের বধ্য, তবু পূর্বকথা স্মরণ করে অর্জুন কোনওমতেই ভীষ্মবধে সম্মত নন। এ জন্য ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত হলে তিনি মৃদুযুদ্ধ করেন, পাছে ভীষ্ম নিপতিত হন, এজন্য সর্বদা সঙ্কুচিত। আর তাতে ভীষ্ম অপ্রতিহত বীর্যে বহুসংখ্যক পাণ্ডবসেনা বধ করতেন। এসব দেখে যুদ্ধের তৃতীয় দিনে ভীষ্মকে বধ করার জন্য কৃষ্ণ নিজে চক্র হাতে রথ থেকে নেমে ভীষ্মের দিকে ছুটে গেলেন।

দেখে কৃষ্ণভক্ত ভীষ্ম পরম আহ্লাদে তাঁকে আহ্বান করে বললেন, 'এসো এসো দেবেশ জগন্নিবাস! হে শার্ঙ্গ-গদা-খড়্গধারী! তোমাকে নমস্কার। হে লোকনাথ ভূতশরণ্য! যুদ্ধে আমাকে অবিলম্বে রথ থেকে পাতিত কর।'

অর্জুন পেছন থেকে গিয়ে কৃষ্ণকে ধরে ফেললেন– অনুনয় করে সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করার প্রতিজ্ঞা করে তাঁকে ফিরিয়ে আনলেন। বললেন, 'আপনার সত্যভঙ্গ করবেন না। লোকে যেন আপনাকে মিথ্যাবাদী না বলে।'

কৃষ্ণ যুদ্ধ করেননি। ভীষ্ম সম্বন্ধীয় এ ঘটনার উদ্দেশ্য একটাই– যুদ্ধে পরাঙ্মুখ অর্জুনকে যুদ্ধে উত্তেজিত করা। এটা সারথিরা করতেন। উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল।

যুদ্ধের নবম দিনের রাতেও কৃষ্ণ অনুরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন। ভীষ্মকে অপরাজিত দেখে যুধিষ্ঠির সে রাতে যখন বন্ধু-বান্ধবদের ডেকে ভীষ্মবধের পরিকল্পনা করছেন, তখন কৃষ্ণ বললেন, 'আমাকে অনুমতি দাও, আমি ভীষ্মকে বধ করছি। অথবা অর্জুনের উপরই এর ভার থাক; অর্জুনও এতে সক্ষম।'

যুধিষ্ঠির একথায় সম্মত হলেন না। কৃষ্ণ যে ইচ্ছা করলেই ভীষ্মকে বধ করতে পারেন, এ কথা তিনি জানতেন। কিন্তু বললেন, 'আত্মগৌরবের জন্য তোমাকে মিথ্যাবাদী করতে চাই না। তুমি অযুধ্যমান থেকেই সাহায্য কর।' তিনি অর্জুনকে কিছুই বললেন না। পরে কৃষ্ণের সম্মতি নিয়ে তিনি অন্যান্য পাণ্ডব ও কৃষ্ণকে সঙ্গে করে ভীষ্মের কাছে তাঁর বধোপায় জানতে গেলেন।

ভীষ্ম নিজের বধের উপায় বলে দিলেন। দৃশ্যত সে রকম কাজ হল। কার্যত তার কিছুই হল না। বরং কৃষ্ণ যেমন বলেছিলেন, তাই-ই হল। অর্জুনই ভীষ্মকে শরশয্যাশায়িত ও রথ থেকে নিপাতিত করলেন।

দ্রোণবধ পর্ব

ভীষ্মের পর দ্রোণাচার্য সেনাপতি। দ্রোণপর্বে অভিমন্যুবধের পর কৃষ্ণকে কার্যত কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে দেখা গেল। যেদিন সপ্তরথী ঘিরে ফেলে অন্যায়যুদ্ধে অভিমন্যুকে বধ করে, সেদিন কৃষ্ণ-অর্জুন সে রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না, তাঁরা অন্যত্র কৃষ্ণের নারায়ণী সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন।

যুদ্ধশেষে সন্ধ্যায় শিবিরে ফিরে তাঁরা অভিমন্যুবধ বৃত্তান্ত শুনলেন। অর্জুন শোকে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। কৃষ্ণ যাবতীয় শোকমোহের অতীত। তিনি অর্জুনকে নানা প্রবোদবাক্যে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। গীতায় যে ধর্ম প্রচার করেছেন, সেই ধর্ম অনুমোদিত বাক্যে তিনি অর্জুনের শোকানল নির্বাপিত করলেন।

ঋষিরা যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধ দিচ্ছিলেন এই বলে যে, সকলেই মরেছে, সকলেই মরে থাকে। কৃষ্ণ সে কথা বললেন না। তিনি বললেন, 'যুদ্ধই ক্ষত্রিয়র পথ। যুদ্ধে মৃত্যুবরণই ক্ষত্রিয়দের সনাতন ধর্ম।' তিনি অভিমন্যুজননী সুভদ্রাকেও অনুরূপ প্রবোধ দিয়ে বললেন, 'সৎকুলজাত ধৈর্যশালী ক্ষত্রিয়ের যেভাবে প্রাণত্যাগ করা উচিত, তোমার পুত্রও সেভাবে প্রাণত্যাগ করেছে, কাজেই শোক কোরো না। মহারথ, ধীর, পিতার মত পরাক্রমশালী অভিমন্যু ভাগ্যক্রমে বীরদের কাঙ্ক্ষিত গতি প্রাপ্ত হয়েছে। মহাবীর অভিমন্যু অসংখ্য শত্রু বধ করে পুণ্যবলে অক্ষয় লোকে গমন করেছে। সাধুরা তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, শাস্ত্র ও প্রজ্ঞা দিয়ে যে-রকম গতি কামনা করেন, তোমার কুমার সে-রকম গতি লাভ করেছে। হে সুভদ্রা! তুমি বীরজননী, বীরপত্নী, বীরনন্দিনী, বীরবান্ধবা; পুত্রের জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়।' জানি, এসব কথায় মায়ের শোক নিবারণ হয় না। কিন্তু আমরা এমন প্রবোধবাক্যই সাধারণত বলে থাকি।

এদিকে পুত্রশোকে কাতর অর্জুন দারুণ রোষে এক নিদারুণ প্রতিজ্ঞা করে বসলেন। তিনি যা শুনলেন তাতে বুঝলেন, অভিমন্যুর মৃত্যুর প্রধান কারণ জয়দ্রথ। তিনি বললেন যে, পরদিন সূর্যাস্তের আগে জয়দ্রথকে বধ করবেন, না পারলে নিজে আগুনে আত্মাহুতি দেবেন।

এই প্রতিজ্ঞায় উভয় শিবিরে মহা হুলস্থূল পড়ে গেল। পাণ্ডবসৈন্যরা অতিশয় কোলাহল করতে লাগল, বাদ্যযন্ত্রীরা ভারি বাজনা বাজাতে লাগল। চমকিত কৌরবেরা অনুসন্ধান করে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা জানতে পেরে জয়দ্রথ রক্ষায় মন্ত্রণা করতে লাগল।

কৃষ্ণ দেখলেন, এক বিষম ব্যাপার উপস্থিত হয়েছে। অর্জুন বিবেচনা না করে যে কঠিন প্রতিজ্ঞা করে বসেছেন, তাতে উত্তীর্ণ হওয়া সহজ নয়। জয়দ্রথ নিজে মহারথী, সিন্ধুসৌবীর দেশের অধিপতি, বহু সেনার নায়ক এবং দুর্যোধনের ভগ্নীপতি। কৌরবপক্ষের অপরাজেয় যোদ্ধারা তাঁকে সাধ্যানুসারে রক্ষা করবেন। এদিকে পাণ্ডবপক্ষের প্রধান পুরুষেরা সবাই অভিমন্যুশোকে বিহ্বল– মন্ত্রণায় বিমুখ। অতএব কৃষ্ণ নিজেই নেতৃত্ব গ্রহণ করে কাজে প্রবৃত্ত হলেন। তিনি কৌরবশিবিরে গুপ্তচর পাঠালেন। চর এসে সেখানকার বৃত্তান্ত জানাল। দ্রোণাচার্য ব্যূহরচনা করবেন; তার পেছনে কর্ণ প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় বীরগণ একত্রিত হয়ে জয়দ্রথকে রক্ষা করবেন। এই দুর্ভেদ্য ব্যূহ পার হয়ে সকল বীরকে পরাজিত করে মহাবীর জয়দ্রথকে নিহত করা অর্জুনের পক্ষে অসাধ্য হতে পারে। আর অসাধ্য হলে অর্জুনের আত্মহত্যা নিশ্চিত।

অতএব কৃষ্ণ কর্তব্য সাব্যস্ত করে কাজে নেমে পড়লেন। তাঁর সারথি দারুককে ডেকে নিজের রথ ভাল ঘোড়ায় জুড়ে অস্ত্রশস্ত্রে পূর্ণ করে ভোরে প্রস্তুত রাখার নির্দেশ দিলেন। তাঁর ইচ্ছা এই যে, অর্জুন যদি একদিনে ব্যূহ ভেদ করে সকল বীরকে পরাস্ত করতে না পারেন, তবে নিজেই যুদ্ধ করে সকল কৌরববীরকে বধ করে জয়দ্রথবধের পথ পরিষ্কার করে দেবেন।

কৃষ্ণকে যুদ্ধ করতে হয়নি, অর্জুন নিজের বাহুবলেই কৃতকার্য হয়েছিলেন। তবে যদি যুদ্ধ করতে হত, তাহলেও সত্যভঙ্গ হত না। কারণ কুরু-পাণ্ডবের রাজ্য নিয়ে যে যুদ্ধ, এটা সে-যুদ্ধ নয়। আজকের যুদ্ধ অর্জুনের প্রতিজ্ঞার কারণে। এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য আলাদা। একদিকে জয়দ্রথের জীবন, অন্যদিকে অর্জুনের জীবন নিয়ে যুদ্ধ। যুদ্ধে অর্জুনের পরাভব হলে তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে। অর্জুন তাঁর সখা, শিষ্য ও ভগ্নীপতি। তাঁর আত্মহত্যা নিরাবণ কৃষ্ণের অবশ্য কর্তব্য।

পরদিন সূর্যাস্তের আগে অর্জুন কৌরববীরদের পরাভূত করে জয়দ্রথকে হত্যা করলেন।

প্রাচীন ভারতবর্ষে কেবল ক্ষত্রিয়রাই যুদ্ধ করতেন, এমন নয়। ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য যোদ্ধার কথা মহাভারতেই আছে। দুর্যোধনের সেনানায়কদের মধ্যে তিনজন প্রধান বীর ব্রাহ্মণ– দ্রোণ, তাঁর শ্যালক কৃপ এবং তাঁর পুত্র অশ্বত্থামা। অন্যান্য বিদ্যার মত যুদ্ধবিদ্যায়ও ব্রাহ্মণেরা আচার্য ছিলেন। দ্রোণ ও কৃপ এরকম যুদ্ধাচার্য। এজন্য এঁদের দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্য বলা হত।

এদিকে ব্রাহ্মণের সঙ্গে যুদ্ধে বিপদও বেশি। কেন-না, যুদ্ধে ব্রাহ্মণকে বধ কবলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। সে কারণে কৌরবপক্ষে সকলেই মরল, কেবল কৃপ ও অশ্বত্থামা মরলেন না। তাঁরা অমর বলে মহাভারতপ্রণেতা নিষ্কৃতি পেলেন। কিন্তু দ্রোণকে না মারলে চলে না, কারণ তিনি ভীষ্মের পর সর্বপ্রধান যোদ্ধা; তিনি জীবিত থাকলে পাণ্ডবেরা বিজয় লাভ করতে পারে না। দ্রোণাচার্যকে দ্বৈরথ যুদ্ধে পরাজিত করতে পারে, পাণ্ডবপক্ষে অর্জুন ছাড়া কেউই নেই। কিন্তু তিনি অর্জুনের গুরু, এ জন্য অর্জুনের পক্ষে বিশেষভাবে অবধ্য।

পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদীর পিতা দ্রুপদরাজার সঙ্গে পূর্বকালে দ্রোণের বড় বিবাদ হয়েছিল। দ্রুপদ তাঁর সমকক্ষ হতে পারেননি– অপদস্থ ও অপমানিত হয়েছিলেন। তাই তিনি দ্রোণবধের জন্য যজ্ঞ করেছিলেন। যজ্ঞকুণ্ড থেকে দ্রোণবধকারী পুত্র উদ্ভূত হয়– নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন। ধৃষ্টদ্যুম্ন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবদের সেনাপতি। তিনিই দ্রোণবধ করবেন, পাণ্ডবদের এই ভরসা। যিনি ব্রহ্মবধের জন্য দেবজাত, তার পক্ষে ব্রহ্মবধ পাপ নয়।

পনেরো দিন যুদ্ধ হল, ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্যের কিছুই করতে পারলেন না। বরং তাঁর কাছে পরাভূত হলেন। অতএব দ্রোণবধে ভরসা নেই– প্রতিদিন পাণ্ডবদের সৈন্যক্ষয় হতে লাগল।

আমরা জানি, যুদ্ধকালে গুজব ছড়ানো এক প্রকারের রণ-কৌশল। তাই মহাভারতকার এক কৌশল অবলম্বন করলেন। সেই কৌশল অশ্বত্থামা হত্যা সংক্রান্ত গুজব। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির সত্যবাদী বলে সর্বজনবিদিত। যুধিষ্ঠির যদি বলেন অশ্বত্থামা নিহত হয়েছেন, তাহলে পিতার মনোবলে চিড় ধরতে পারে; তিনি রণেভঙ্গ দিতে পারেন। যুধিষ্ঠির বললেন, অশ্বত্থামা কুঞ্জর মরেছে– কিন্তু কুঞ্জর শব্দটা অব্যক্ত রইল। মহাভারতে এতদ্‌সংক্রান্ত শ্লোকটি এরকম:

তমতথ্যভয়ে মগ্নো জয়ে সক্তো যুধিষ্ঠিরঃ।
অব্যক্তমব্রবীদ্বাক্যং হতঃ কুঞ্জর ইত্যুত ॥ ১৯১ ॥

'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' বলে বহুল প্রচলিত যে কথাটা আছে তা মহাভারতের নয়। বোধহয় কথকঠাকুরদের তৈরি। যাহোক, তাতেও কাজ হল না। বৃদ্ধ ক্ষণকাল বিমনা হলেন বটে, তারপর বিপুলবিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগলেন। মহাভারতে কথিত অন্যান্য দৈবাস্ত্রের মধ্যে ব্রহ্মাস্ত্র একটি। এদেশের মানুষ, যে উপায়ে যে কাজ করতে অব্যর্থ, তাকে সে-কাজের ব্রহ্মাস্ত্র বলে। এই ব্রহ্মাস্ত্র অস্ত্রে-অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রতি প্রয়োগ নিষিদ্ধ ও অধর্ম, ঋষিদের এমনই অভিমত। দ্রোণ ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগে অস্ত্রে-অনভিজ্ঞ সৈন্যদের বিনষ্ট করতে লাগলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন নিজের সাধ্যাতীত যুদ্ধ করে নিরস্ত্র ও বিরথ হয়ে দ্রোণের হাতে মরণাপন্ন হলেন। এসময় যদুবংশীয় সাত্যকি এসে ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করলেন। সাত্যকির সঙ্গে কেউই যুদ্ধ করতে সক্ষম হল না। দ্রোণও একটু দমে গেলেন। ইতোমধ্যে

যুধিষ্ঠির স্বপক্ষীয় বীরদের উদ্দীপ্ত করার জন্যে বললেন, 'হে বীরগণ, তোমরা দ্রুত দ্রোণের কাছে যাও। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্যবধে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। আজ দ্রুপদনন্দনের যুদ্ধকুশলতায় মনে হচ্ছে, উনি দ্রোণকে নিপাতিত করবেন। অতএব তোমরা মিলিত হয়ে দ্রোণের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হও।' এ কথার পর পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ দ্রোণের দিকে ধেয়ে গেলেন। মহাভারত থেকে পুনরায় উদ্ধৃত করছি: 'মহারথ দ্রোণও মরণে কৃতসংকল্প হয়ে সমাগত বীরদের দিকে সবেগে ধাবিত হলেন। তাঁর গমনবেগে এমনভাবে মাটি কেঁপে উঠল ও প্রবলবেগে বাতাস বইতে লাগল যে, সৈন্যরা ভয় পেয়ে গেল। সূর্য থেকে উল্কাবৃষ্টি হতে লাগল, তার বিদ্যুৎপ্রভায় দ্রোণাচার্যের অস্ত্রশস্ত্র ঝলসে উঠল। রথের ভীষণ শব্দ হতে লাগল, কষ্টে ঘোড়ার চোখ থেকে জল ঝরতে লাগল। তখন মহারথ দ্রোণ নিতান্ত নিস্তেজ হয়ে পড়লেন। তাঁর বাঁ-চোখ ও বাঁ-হাত কাঁপতে লাগল। তিনি সামনে ধৃষ্টদ্যুম্নকে দেখে নিতান্ত উন্মনা হলেন এবং ব্রহ্মবাদী ঋষিদের কথা স্মরণ করে ধর্মযুদ্ধ অবলম্বন করে প্রাণত্যাগ করতে মনস্থ করলেন।' পাঠক দেখবেন, এখানেও দ্রোণের প্রাণত্যাগের অভিপ্রায়ের মধ্যে অশ্বত্থামার মৃত্যুসংবাদ পরিগণিত হয়নি।

দ্রোণ তারপরও যুদ্ধ ছাড়লেন না। মহাভারতকার দশ হাজার সৈন্যধ্বংসের কম কথা বলেন না, তিনি বলেন, দ্রোণাচার্য ত্রিশ হাজার সৈন্য বিনষ্ট করলেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুনর্বার পরাজিত করলেন। এবার ভীম এগিয়ে গেলেন। তিনি দ্রোণাচার্যের রথ ধরে আছাড় মেরে ভেঙে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন, 'হে ব্রাহ্মণ, যদি স্বধর্মে অসন্তুষ্ট অস্ত্রশিক্ষিত অধম ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হন, তাহলে ক্ষত্রিয়দের কখনই ক্ষয় হয় না। পণ্ডিতেরা প্রাণিহত্যা না করাই প্রধান ধর্ম বলেছেন। সেই ধর্ম প্রতিপালন ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্তব্য; আপনি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; কিন্তু চণ্ডালের মত অজ্ঞানে অন্ধ হয়ে পুত্র-কলত্রের উপকারের জন্য অর্থের লালসায় বিভিন্ন ম্লেচ্ছজাতি ও অন্যান্য প্রাণিহত্যা করছেন। আপনি একপুত্রের জীবনরক্ষার্থে স্বধর্ম ত্যাগ করে অসংখ্য জীবন নাশ করে কেন লজ্জিত হচ্ছেন না?'

এহেন তিরস্কারে বৃদ্ধের বোধোদয় হল। তিনি ধর্মাত্মা, কিন্তু অধর্মযুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। বুঝলেন, তিনি অন্যায়ভাবে প্রাণিসংহার করে চলেছেন। তিনি নিতান্ত নিস্তেজ হয়ে পড়লেন। তবুও তিনি যুদ্ধে বিমুখ হতে পারেন না। অপটুতা এবং দুর্যোধনকে বিপৎকালে ত্যাগ করা তাঁর মত বীর ব্রাহ্মণের কাজ নয়। তাই মৃত্যুই স্থির করলেন। তিনি অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করে শমভাব অবলম্বন করে বিষ্ণুর ধ্যান করতে লাগলেন। মুখ সামান্য নামানো, বক্ষস্থল স্তিমিত– দু'চোখ বন্ধ করে বিষয়বাসনা ত্যাগ ও সাত্ত্বিকভাব অবলম্বন করে তিনি একাক্ষর বেদমন্ত্র ওঁকার এবং বারবার বাসুদেবকে স্মরণ করে সাধুজনের দুর্লভ স্বর্গলোকে গমন করলেন। ঐ সময় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তরবারি হাতে দ্রোণের দিকে ছুটে গেলেন এবং মৃতদেহের মাথা কেটে আনলেন। এভাবে দ্রোণাচার্য ধৃষ্টদ্যুম্নর বশীভূত হলে যুদ্ধক্ষেত্রে হাহাকার পড়ে গেল।

দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর সংবাদে ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ করে বলছেন, 'যখন শুনলাম যে, আচার্য দ্রোণকে ধৃষ্টদ্যুম্ন ধর্ম অতিক্রম করে রথের পরে প্রায় বসা অবস্থায় হত্যা করেছে, তখন আর জয়ে সন্দেহ করিনি।'

কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে গেলে বসুদেব তাঁর কাছে যুদ্ধবৃত্তান্ত শুনতে চাইলে কৃষ্ণ বললেন যে, দ্রোণাচার্য ও ধৃষ্টদ্যুম্নের মধ্যে পাঁচদিন যুদ্ধ হয়। পরিশেষে দ্রোণ সমরক্লান্ত হয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নর হাতে নিহত হন। যুবার সঙ্গে যুদ্ধে বৃদ্ধের শ্রান্তিই দ্রোণের যুদ্ধবিরতির প্রকৃত কারণ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

দ্রোণ নিহত হলে অর্জুন গুরুর শোকে অত্যন্ত কাতর হলেন। মিথ্যা বলে গুরুকে হত্যা করার জন্য তিনি যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার এবং ধৃষ্টদ্যুম্নর নিন্দা করলেন। যুধিষ্ঠির ভালমানুষ, কিছু উত্তর দিলেন না। কিন্তু ভীম অর্জুনকে কিছু কড়া কথা শোনালেন। ধৃষ্টদ্যুম্নও অর্জুনকে আরও কড়া কথা শোনালেন। তখন অর্জুন-শিষ্য যদুবংশীয় সাত্যকি অর্জুনের পক্ষ নিয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নকে খুব গালিগালাজ করলেন। ফলে উভয়ে রেগে গিয়ে একে-অপরকে বধ করতে উদ্যত হলেন। কৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীম ও সহদেব তাদের থামালেন। মিথ্যা কথা বলে দ্রোণহত্যা উচিত কি অনুচিত– এই বিতর্কে দুই পক্ষে বাদানুবাদ চলতে লাগল। কিন্তু কেউই কৃষ্ণকে ভাল-মন্দ কিছুই বললেন না, এমনকি তাঁর নামও নিলেন না। কৃষ্ণ জড়িত থাকলে মহাভারতের কবি নিশ্চয়ই নীরব থাকতেন না।

দ্রোণের পর কর্ণ দুর্যোধনের সেনাপতি। তাঁর যুদ্ধে পাণ্ডবসেনারা অস্থির। যুধিষ্ঠির দুর্ভাগ্যবশত তাঁর সম্মুখীন হয়ে এমন তাড়া খেলেন যে ভয়ে রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে শিবিরে গিয়ে লুকালেন। এদিকে অর্জুন যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরকে না দেখে চিন্তিত হয়ে তাঁর খোঁজে শিবিরে এলেন। কর্ণ তখনও নিহত হননি। যুধিষ্ঠির যখন শুনলেন, অর্জুন এখনও কর্ণকে বধ করতে পারেননি, তখন রেগে বড় গরম হলেন। কাপুরুষের স্বভাবই এমন যে, নিজে যা পারে না, পরে তা না করে দিলে বড় চটে যায়। সুতরাং যুধিষ্ঠির অর্জুনকে কঠিন গালিগালাজ করলেন। বললেন, তুমি নিজে যখন যুদ্ধের ভয়ে পালিয়েছ, তখন তুমি কৃষ্ণকে তোমার গাণ্ডীবধনু দিয়ে দাও। গাণ্ডীব অর্জুনের ধনুকের নাম– এটি দেবদত্ত, অবিনশ্বর এবং ধনুকের মধ্যে ভয়ঙ্কর। শুনে অর্জুন রাগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে অগ্রজকে বললেন, 'ভরতনন্দন! তুমি রণস্থল থেকে এক ক্রোশ দূরে বসে আছ... আর আমি তোমার মঙ্গলের জন্য জীবন পর্যন্ত পণ করেছি!... তোমার জন্য কত মহাযোদ্ধাকে আমি সংহার করলাম, আর তুমি শঙ্কাহীন মনে দ্রৌপদীর শয্যায় স্থিত হয়ে আমাকে অপমান করছ। তুমিই করেছিলে অক্ষক্রীড়ার মত পাপাচরণ, আর এখন চাচ্ছ আমাদের সাহায্যে নিস্তার পেতে! তোমার কাছে আমরা অল্প সুখও পেয়েছি, এমন মনে পড়ে না, তোমার রাজ্যলাভ আমার ঈপ্সিত নয়।' তিনি যুধিষ্ঠিরকে কাটতে উদ্যত হলেন। কৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলেন, তরবারি দিয়ে কাকে বধ করবে? অর্জুন বললেন, 'যিনি আমাকে গাণ্ডীব ত্যাগ করতে বললেন, আমি তাঁর মাথা কাটব– এই আমার উপাংশুব্রত (গোপন প্রতিজ্ঞা)। তোমার সামনেই মহারাজ আমাকে একথা বলেছেন, কাজেই আমি ধর্মভীরু রাজাকে হত্যা করে আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করব।' রেগে বললেন বটে। কিন্তু পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠাগ্রজকে উত্তেজনাবশে হত্যা করার প্রতিজ্ঞা অতি পাষণ্ডের কাজ সন্দেহ নেই। আবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ মানে সত্যচ্যুত হওয়া। তিনি কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মতে এখন কী করা উচিত? কৃষ্ণ উত্তর দিলেন যে, এ রকম সত্যের জন্য যুধিষ্ঠিরকে বধ করা অর্জুনের পক্ষে অনুচিত।

তাহলে ধর্মেরও রকমফের আছে? যাতে সবার মঙ্গল হয়, তাই সত্য। যাতে লোকের অমঙ্গল, তাই মিথ্যা। সে-অর্থে যা লৌকিক সত্য তা ধর্মত মিথ্যা হতে পারে; এবং যা লৌকিক মিথ্যা, তা ধর্মত সত্য হতে পারে। এ রকম ক্ষেত্রে মিথ্যাই সত্য, সত্যই মিথ্যা।

কৃষ্ণ উদাহরণ দিয়ে অর্জুনকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, যদি কেউ কাউকে হত্যা করার জন্য কারো কাছে খোঁজ করে, তাহলে

জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির মৌনতা অবলম্বন করাই উচিত। যদি একান্তই বলতে হয়, তবে সে ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা কর্তব্য। এ রকম ক্ষেত্রে মিথ্যাই সত্যস্বরূপ।

এরপর কৃষ্ণ অর্জুনকে কৌশিকের উপাখ্যান শোনালেন। উপাখ্যানটি এই: 'কৌশিক নামে এক সর্বজনবিদিত তপস্বী ব্রাহ্মণ গ্রামের প্রান্তে নদীসমূহের সঙ্গমস্থলে বাস করতেন। ঐ ব্রাহ্মণ সবসময় সত্য কথা বলতেন বলে সবাই তাঁকে সত্যবাদী বলে জানত। একদিন কিছু লোক দস্যুর ভয়ে ভীত হয়ে বনে ঢোকে, দস্যুরাও বনে ঢুকে তাদের খুঁজতে থাকতে। এক পর্যায়ে তারা সত্যবাদী কৌশিকের কাছে এসে জিজ্ঞেস করে কতকগুলো লোক বনে ঢুকেছিল, তারা কোন্ পথে গেছে, তিনি জানেন কিনা। কৌশিক সত্য কথাই বললেন। তখন সেই দস্যুরা তাদের খুঁজে পেয়ে হত্যা করল। সত্যবাদী কৌশিক সেই সত্য কথার পাপে নরকে নিপতিত হলেন।' সত্য যেখানে মানুষের হিত করে, সেখানে ধর্ম, যেখানে মানুষের হিত করে না, সেখানে অধর্ম। দান, তপ, শৌচ, সারল্য, সত্য প্রভৃতি কাজকে ধর্ম বলা যায়। এর সবই সাধারণত ধর্ম, আবার সবই অবস্থাবিশেষে অধর্ম। অনুপযুক্ত প্রয়োগ বা ব্যবহারই অধর্ম। কৃষ্ণ বললেন, সামর্থ্য থাকলেও চোরকে ধন দান করা উচিত নয়। পাপীকে ধন দান করলে অধর্মাচরণের জন্য দাতাকেও নিপীড়িত হতে হয়। তিনি অর্জুনকে বললেন, ধর্ম প্রাণিদের ধারণ করে বলে ধর্ম নামে নির্দিষ্ট হয়েছে। অতএব যার দ্বারা প্রাণিকুলের রক্ষা হয়, তাই-ই ধর্ম। তিনি আবার বললেন, যেখানে মিথ্যা শপথ দ্বারাও চোরদের সংসর্গ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, সেখানে মিথ্যা কথা বলাই শ্রেয়। সে মিথ্যা সত্যস্বরূপ।

অর্জুন কৃষ্ণের কথা বুঝলেন, কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয়, প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য ব্যাকুল। অতএব যাতে দুই দিক রক্ষা হয়, কৃষ্ণকে তার উপায় করতে বললেন।

কৃষ্ণ বললেন, অপমান মানী ব্যক্তির মৃত্যুস্বরূপ। তুমি যুধিষ্ঠিরকে অপমানসূচক একটা কথা বল, তাহলেই তাঁকে বধ করার সমান হবে। অর্জুন তখন যুধিষ্ঠিরকে অপমানসূচক ভর্ৎসনা করলেন। কিন্তু কৃষ্ণকে আবার এক বিপদে ফেললেন। বললেন, আমি বড় ভাইকে অপমান করে গুরুতর পাপ করেছি, আমি আত্মহত্যা করব। এই বলে তিনি খাপ থেকে তরবারি বের করলেন। কৃষ্ণ তাঁর মৃত্যুরও সহজপথ বাৎলে দিলেন। বললেন, নিজেই নিজের প্রশংসা করা সজ্জনের মৃত্যুস্বরূপ। তুমি নিজের প্রশংসা কর, তাতেই তোমার মৃত্যু হবে। অর্জুন তাই করলেন। সব গোল মিটে গেল।

কর্ণবধ পর্ব

কৃষ্ণ অর্জুনের সারথি। যেমন অর্জুনের অশ্বের পরিচালক, তেমনি তাঁর জীবনের নিয়ন্তা। কখনও অর্জুনের আজ্ঞায় কৃষ্ণ রথ চালান। কখনও কৃষ্ণের আজ্ঞায় অর্জুন চলেন। এখন কৃষ্ণ অর্জুনকে কর্ণবধে নিযুক্ত করলেন।

কর্ণবধ মহাভারতের একটি প্রধান ঘটনা। বহুকাল আগে থেকেই এ বিরোধের সূত্রপাত। কর্ণই অর্জুনের প্রতিযোদ্ধা। ভীম-অর্জুন-নকুল-সহদেব চারজন যুধিষ্ঠিরের জন্য দিগ্বিজয় করেছিলেন, কর্ণ একাই দুর্যোধনের জন্য দিগ্বিজয় করেছিলেন। অর্জুন দ্রোণের শিষ্য, কর্ণ দ্রোণগুরু পরশুরামের শিষ্য। অর্জুনের যেমন গাণ্ডীব ধনু, কর্ণের তার চেয়েও উৎকৃষ্ট বিজয় ধনু ছিল। অর্জুনের সারথি কৃষ্ণ, কর্ণের সারথি মহাবীর শল্য– দু'জনেই দিব্য-অস্ত্রে শিক্ষিত। উভয়েই একে-অপরকে হত্যা করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। অর্জুন ভীষ্ম-দ্রোণবধে কিছুমাত্র যত্নশীল ছিলেন না, কর্ণবধে তাঁর যত্ন দৃঢ়। কুন্তী যখন কর্ণকে তাঁর জন্মবৃত্তান্ত শুনিয়ে পঞ্চপাণ্ডবের প্রাণভিক্ষা চেয়েছিলেন, তখন কর্ণ মাকে যুধিষ্ঠির-ভীম-নকুল-সহদেবের প্রাণভিক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু কিছুতেই অর্জুনের প্রাণভিক্ষা দেননি। তাঁকে বধ করবেন, না হয় তাঁর হাতে নিহত হবেন, কুন্তীকে তিনি নিশ্চিত করে জানিয়েছিলেন।

আজ সেই মহাযুদ্ধে কৃষ্ণ অর্জুনকে নিয়ে এলেন। এই মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতেই তিনি অর্জুনকে যুধিষ্ঠিরের শিবিরে নিয়ে এসেছিলেন। ভীম অর্জুনকে যুধিষ্ঠিরের সন্ধানে যেতে বলেছিলেন বটে, কিন্তু যুদ্ধ শেষ না করে তাঁর আসার ইচ্ছা ছিল না। কৃষ্ণ জেদ করে তাঁকে নিয়ে এলেন। তাঁর ইচ্ছা যে, কর্ণ ক্রমাগত যুদ্ধ করে পরিশ্রান্ত হোন, অর্জুন ততক্ষণে বিশ্রাম নিয়ে শক্তি সঞ্চার করুন। এখন যুদ্ধে নিয়ে যাবার সময় অর্জুনের তেজবৃদ্ধির জন্য তাঁর বীরত্বের প্রশংসা করলেন এবং তাঁর দুর্ধর্ষ কাজের ইতিবৃত্ত একে একে স্মরণ করিয়ে দিলেন। দ্রৌপদীর অপমান, অভিমন্যুকে অন্যায়যুদ্ধে হত্যা, পাণ্ডবদের ক্ষতিসাধনে কর্ণের করা সব কাজের বৃত্তান্ত তুলে ধরলেন। এরপর কৃষ্ণ বলছেন, 'পূর্বে বিষ্ণু যেমন দানবদের বিনাশ করেছিলেন, তুমি তেমনি কর্ণকে বধ কর।' 'পূর্বে বিষ্ণু যেমন দানবদের বিনাশ করেছিলেন' এই বাক্যে বোঝা যায়, কৃষ্ণ তখনও নিজেকে বিষ্ণুর অবতার বলে পরিচয় দিচ্ছেন না।

কর্ণ-অর্জুনে যুদ্ধ শুরু হল। কর্ণের সর্পবাণ অর্জুন নিবারণ করতে পারেননি, কৃষ্ণ পদাঘাতে অর্জুনের রথ মাটিতে কিছুটা বসিয়ে দিলেন, ঘোড়াগুলো হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। অর্জুনের মাথা বেঁচে গেল বটে, তবে কিরীট কাটা পড়ল।

যুদ্ধের শেষভাগে কর্ণের রথের চাকা মাটিতে বসে যায়। কর্ণ তা তোলার জন্য অর্জুনের কাছে সময়ভিক্ষা করে বললেন, 'অসহায়কে বধ করা বীরের ধর্ম নয়।'

কৃষ্ণ কথাটা ধরলেন। বললেন, 'সূতপুত্র! তুমি এখন বিপদে পড়ে ধর্ম স্মরণ করছ। নীচাশয়রা দুঃখে পড়ে প্রায়ই দৈবের নিন্দা করে; নিজের অপকর্মের প্রতি দৃক্‌পাত করে না। দুর্যোধন দুঃশাসন ও শকুনি যখন তোমার মত নিয়ে একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে কৌরবসভায় নিয়ে এসেছিল, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন দুষ্ট শকুনি দুরভিসন্ধিমূলকভাবে তোমার মত নিয়ে পাশা খেলায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠিরকে হারিয়ে দিয়েছিলেন, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন রাজা দুর্যোধন তোমার মত নিয়ে ভীমসেনকে বিষমিশ্রিত ভাত খেতে দিয়েছিল, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি বারণাবত নগরে জতুগৃহে ঘুমন্ত পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার জন্য আগুন দিয়েছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? তুমি সভামধ্যে দুঃশাসনের হাতে নিগৃহীত রজস্বলা দ্রৌপদীকে 'পাণ্ডবরা বিনষ্ট হয়ে শাশ্বত নগরে গমন করেছে, এখন তুমি অন্য কাউকে পতিত্বে বরণ কর' বলে উপহাস করেছিলে এবং অনার্য ব্যক্তিরা তাঁকে বিনা অপরাধে নির্যাতন করেছিল, তুমি তা উপেক্ষা করেছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি রাজ্যলোভে শকুনির সঙ্গে পাণ্ডবদের পাশা খেলায় আহ্বান জানিয়েছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি মহারথ পরিবেষ্টিত হয়ে বালক অভিমন্যুকে হত্যা করেছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? তুমি তখন একের পর এক অধর্মানুষ্ঠান করেছ, আর এখন অর্জুনকে ধর্মজ্ঞান দিচ্ছ। তুমি এখন ধর্মপরায়ণ হলেও জীবনসত্ত্বে মুক্তিলাভ

করতে পারবে, এমন ভেব না। পূর্বে নিষধ দেশের রাজা নল যেমন পুষ্কর দিয়ে পাশা খেলায় হেরে গিয়ে আবার রাজ্যলাভ করেছিলেন, এখনও তেমনি ধর্মপরায়ণ পাণ্ডবেরা বাহুবলে শত্রুদের বিনাশ করে রাজ্যলাভ করবেন। ধৃতরাষ্ট্রপুত্ররা অবশ্যই ধর্মরক্ষক পাণ্ডবদের হাতে নিহত হবে।'

কৃষ্ণের কথা শুনে কর্ণ লজ্জায় মাথা নত করলেন। ততক্ষণে তাঁর রথের চাকা তোলা হয়ে গেছে। তিনি আবার রথে উঠে আগের মত যুদ্ধ করতে লাগলেন এবং এক সময় অর্জুনের বাণে তাঁর মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'শরতের আকাশ থেকে স্খলিত সূর্যের মত' মাটিতে পড়ে গেল।

কর্ণ মারা গেলে দুর্যোধন শল্যকে সেনাপতি করলেন। আগের দিনের যুদ্ধে যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় হয়েও কাপুরুষের মত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ক্ষত্রিয়কুলের কলংক বলে চারদিকে ঢিঢি পড়ে গিয়েছিল। আজ সেই কলংক মোচনে সর্বদর্শী কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে শল্যবধে নিযুক্ত করলেন। তিনি সাহস করে শল্যর সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁকে হত্যা করলেন।

সেদিন সমস্ত কৌরবসেনা পাণ্ডবদের হাতে নিহত হল। অশ্বত্থামা ও কৃপ দুই ব্রাহ্মণ, যদুবংশীয় কৃতবর্মা আর দুর্যোধনমাত্র জীবিত রইলেন। অবসন্ন বিক্ষত নিঃসহায় বিশ্রামপ্রার্থী দুর্যোধন পালিয়ে গিয়ে দ্বৈপায়ন হ্রদের জলে গা ডুবিয়ে আত্মগোপন করে রইলেন। পাণ্ডবেরা খুঁজে সেখানে গিয়ে তাকে ধরল। কিন্তু বিনা যুদ্ধে তাকে মারল না।

যুধিষ্ঠিরের চিরকাল স্থূলবুদ্ধি, সেই স্থূলবুদ্ধির জন্যই পাণ্ডবদের এত কষ্ট। তিনি সে-সময়ে এক অপূর্ব বুদ্ধির পরিচয় দিলেন। তিনি দুর্যোধনকে বললেন, 'তুমি ইচ্ছানুরূপ অস্ত্র গ্রহণ করে আমাদের মধ্যে যে-কোন বীরের সঙ্গে এসে যুদ্ধ কর। আমরা সবাই রণস্থলে অবস্থানপূর্বক যুদ্ধ নিরীক্ষণ করব। আমি বলছি, তুমি আমাদের মধ্যে একজনকে বিনাশ করতে পারলেই সমুদয় রাজ্য তোমার হবে।' দুর্যোধন বললেন, 'আমি গদাযুদ্ধ করব।' কৃষ্ণ জানতেন, গদাযুদ্ধে ভীম ছাড়া কোন পাণ্ডবই দুর্যোধনের সমকক্ষ নয়। দুর্যোধন অন্য কোন পাণ্ডবকে যুদ্ধে আহত করলে পাণ্ডবদের আবার ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে হবে। কেউ কিছু বললেন না, সবাই বলদৃপ্ত; যুধিষ্ঠিরকে ভর্ৎসনার ভার কৃষ্ণই নিলেন। সে কাজ তিনি চমৎকারভাবে পালন করলেন।

দুর্যোধনও অতিশয় বলদৃপ্ত, সেই দর্পে যুধিষ্ঠিরের বুদ্ধির দোষ সংশোধন হল। দুর্যোধন বললেন, 'যার ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে গদাযুদ্ধে এস। সবাইকে বধ করব।' তখন ভীমই গদা নিয়ে যুদ্ধে অগ্রসর হলেন।

আঠার দিন যুদ্ধ হয়েছে। ভীম ও দুর্যোধনের মধ্যেই সবসময় যুদ্ধ হয়েছে। গদাযুদ্ধও অনেকবার হয়েছে এবং বরাবরই দুর্যোধন গদাযুদ্ধে ভীমের কাছে পরাজিত হয়েছেন। সভাপর্বে যখন পাশা খেলায় দুর্যোধন দ্রৌপদীকে জিতে নিলেন, তখন দুঃশাসন একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদীর চুল ধরে সভামধ্যে টেনে এনে বিবস্ত্রা করছিল, সে-সময় ভীম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আমি দুঃশাসনকে হত্যা করে তার বুক চিরে রক্ত খাব। ভীম মহাশ্মশানের মত বিকট রণক্ষেত্রে দুঃশাসনকে হত্যা করে রক্তপান করে বলেছিলেন, 'আমি অমৃত পান করলাম।' দুর্যোধন সেই সভামধ্যে হাসতে হাসতে দ্রৌপদীর দিকে চেয়ে কাপড় তুলে অশ্লীলভাবে নিজের উরু দেখিয়েছিলেন। তখন ভীম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, 'আমি মহাযুদ্ধে গদাঘাতে ঐ উরু যদি না ভাঙি, তবে যেন নরকে যাই।'

কিন্তু গদাযুদ্ধের নিয়ম এই যে, নাভীর নিচে আঘাত করা যাবে না। কিন্তু ভীম প্রবল আক্রোশে গদার আঘাতে দুর্যোধনের উরু ভেঙে তাকে মাটিতে ফেলে দিলেন।

যুদ্ধকালে দর্শকদের মাঝে বলরাম উপস্থিত ছিলেন। ভীম ও দুর্যোধন উভয়েই গদাযুদ্ধে তাঁর শিষ্য। তবে দুর্যোধনই প্রিয়তর। অন্যায়যুদ্ধে দুর্যোধনকে নিপাতিত হতে দেখে তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে লাঙল উঁচিয়ে ভীমকে মারতে গেলেন। কৃষ্ণ অনুনয়-বিনয় করে তাঁকে নিরস্ত করলেন। বলরাম কৃষ্ণের কথায় সন্তুষ্ট হলেন না। রাগ করে সেখান থেকে চলে গেলেন।

ভীম নিপাতিত দুর্যোধনের মাথায় লাথি মারছিলেন। যুধিষ্ঠিরের বারণ সত্ত্বেও ভীম ক্রমাগত লাথি মেরেই চলছিলেন। তখন কৃষ্ণ ভীমকে না ঠেকানোর জন্য যুধিষ্ঠিরকে ভর্ৎসনা করলেন। এদিকে, পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ দুর্যোধনের নিপাতে তার নিন্দা এবং ভীমের প্রশংসা করতে লাগলেন। কৃষ্ণ তাতে বিরক্ত হয়ে বললেন, 'মৃতকল্প শত্রুর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করা উচিত নয়।' দুর্যোধনের প্রাণবায়ু তখনও নির্গত হয়নি। এ সময় অশ্বত্থামা তাকে দেখতে এলেন। কাতর দুর্যোধন তাঁকে বললেন, 'আমি অমিততেজা বাসুদেবের মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত। তিনি আমাকে ক্ষত্রিয়ধর্ম থেকে বিচ্যুত করেননি। আমার জন্য শোক কোরো না।' তিনি অশ্বত্থামাকে পরবর্তী সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। তখন কৌরবসেনার মধ্যে আছেন কেবল অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য আর কৃতবর্মা। অশ্বত্থামা চোরের মত নিশীথকালে পাণ্ডবদের শিবিরে ঢুকে নিদ্রিত ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডি, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং সেনা ও সেনাপতিদের সঙ্গে পাঞ্চালদের বধ করলেন। পঞ্চপাণ্ডব ও কৃষ্ণ ছাড়া পাণ্ডবপক্ষে আর কেউ রইলেন না। বস্তুত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কুরু-পাঞ্চালের যুদ্ধ। কাজেই পাঞ্চালরা নির্বংশ হলে যুদ্ধ শেষ হল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ২৪ হাজার সৈন্য পালিয়ে গিয়েছিল। অনেক যোদ্ধা এসেছিল সুদূর চিন, কম্বোজ, বাহ্লীক দেশ থেকে, কুরু-পাণ্ডবযুদ্ধে যাদের ব্যক্তিগত কোনও স্বার্থ ছিল না।

অন্যায় যুদ্ধে দুর্যোধন নিহত হয়েছেন বলে যুধিষ্ঠিরের ভয় হল, মহাতপা গান্ধারী শুনে না পাণ্ডবদের ভস্ম করে ফেলেন! তিনি কৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন হস্তিনায় গিয়ে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে শান্ত করে আসেন। কৃষ্ণ হস্তিনায় গিয়ে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে সান্ত্বনা দিলেন। বিপুল শোকে উন্মাদিনীপ্রায় গান্ধারী সবকিছুর জন্যে কৃষ্ণকেই দায়ী করলেন। অভিশাপ দিলেন যাদবকুল বিনাশের।

যুদ্ধ শেষে পাণ্ডবগণ মহাসমারোহে হস্তিনায় প্রবেশ করলেন। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যাভিষিক্ত করলেন। এদিকে কৌরবশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান, তীব্র যন্ত্রণায় কাতর, উত্তরায়ণের প্রতীক্ষায় দীর্ঘ ছাপ্পান্ন দিন প্রাণ ধারণ করে আছেন। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির প্রমুখকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

ভীষ্ম সর্বধর্মবেত্তা। কৃষ্ণ তাঁর কাছ থেকে জ্ঞানলাভের জন্য যুধিষ্ঠিরকে পরামর্শ দিলেন। তারপর ভীষ্মকে বললেন, 'আপনি বয়োবৃদ্ধ এবং শাস্ত্রজ্ঞান এবং শুদ্ধাচারসম্পন্ন। রাজধর্ম ও অন্যান্য পালনীয় ধর্ম– আপনি সবই জানেন। জন্মাবধি আপনার কোন দোষ পরিলক্ষিত হয়নি। নরপতিরা আপনাকে সর্বধর্মবেত্তা বলে উল্লেখ করেন। অতএব পিতার মত আপনি এদের নীতি উপদেশ প্রদান করুন। আপনি প্রতিনিয়ত ঋষি ও দেবতাদের উপাসনা করেছেন।

এখন এই ভূপতিরা আপনার কাছে ধর্মবৃত্তান্ত শুনতে আগ্রহী। অতএব আপনাকে সমস্ত ধর্মকথা শোনাতে হবে। পণ্ডিতদের মতে ধর্মোপদেশ প্রদান করা বিদ্বান ব্যক্তিরই কর্তব্য।'

ধার্মিক ব্যক্তিকে রাজা নিযুক্ত করলেই ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, এমন নয়। আজ ধার্মিক যুধিষ্ঠির রাজা ধর্মাত্মা; কাল তাঁর উত্তরাধিকারী পাপাত্মা হতে পারেন। এজন্য ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করে, তার রক্ষার জন্য ধর্মানুযায়ী ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করা চাই। যুদ্ধজয় রাজ্যস্থাপনের প্রথম কাজ মাত্র; তার শাসনের জন্য বিধিব্যবস্থাই প্রধান কাজ। ভীষ্ম আদর্শ নীতিজ্ঞ। সুতরাং তাঁর উচিত উত্তরপুরুষের প্রতি কিছু অনুশাসন প্রদান করা। যতদূর সম্ভব পাণ্ডবদের নানা হিতোপদেশ দান করে ভীষ্ম দেবতাদের জয়কার-ধ্বনিত আকাশের তলায় তনুত্যাগ করলেন।

ভীষ্মের স্বর্গারোহণের পর যুধিষ্ঠির কেঁদেকেটে বনে যাবার বাহানা তুললেন। তাঁকে অনেকে অনেক রকম বোঝালেন কিন্তু তিনি শোনেন না। শেষে কৃষ্ণ তাঁর কান্নাকাটির প্রকৃত কারণ নির্ণয় করলেন। যুধিষ্ঠিরের প্রকৃত রোগ অহঙ্কার। 'আমি এসব করছি', 'এ আমার', 'এ আমার সুখ', 'এ আমার দুঃখ' ইত্যাদি ভাবনাই অহংকার। এই-ই যুধিষ্ঠিরের দুঃখের কারণ। আমি এ পাপ করেছি– আমার এ শোক উপস্থিত; আমাকে নিয়েই সব, অতএব আমি বনে যাব ইত্যাদি আত্মাভিমানই যুধিষ্ঠিরের এ কান্নাকাটির মূলে। অতএব সেই মূলে কুঠারাঘাত করলেন কৃষ্ণ। তিনি পুরুষবাক্যে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'আপনার তাবৎ শত্রুর বিনাশ হয়নি। কিছু শত্রু এখনও অবশিষ্ট আছে। আপনার শরীরের ভেতর অহংকার নামে যে দুর্জয় শত্রু আছে, আপনি কি তা দেখতে পাচ্ছেন না?' এই বলে শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে কীভাবে অহংকার বিনাশ করা যায় সে সম্পর্কে যুধিষ্ঠিরকে একটি রূপক শুনালেন। তারপর যুধিষ্ঠিরকে অতি উৎকৃষ্ট জ্ঞানোপদেশ দিয়ে বললেন, 'ধর্মরাজ! ব্যাধি দু'প্রকারের– শারীরিক ও মানসিক। এই দুই প্রকার ব্যাধি একে-অপরের সাহায্যে উৎপন্ন হয়ে থাকে। শরীরে যে ব্যাধি হয়, তাকে শারীরিক এবং মনে যে ব্যাধি তৈরি হয়, তাকে মানসিক ব্যাধি বলে। কফ, পিত্ত, বায়ু এই তিনটি শরীরের গুণ, যখন এ তিনটি সমানভাবে বিদ্যমান থাকে, তখন শরীরকে সুস্থ এবং যখন ঐ তিনটি গুণের মধ্যে গরমিল দেখা দেয়, তখনই শরীরকে অসুস্থ বলা হয়।

'পিত্তের আধিক্য ঘটলে কফের হ্রাস ও কফের আধিক্য হলে পিত্তের হ্রাস হয়ে থাকে। শরীরের মত আত্মারও তিনটি গুণ আছে। এ তিনটি গুণের নাম সত্ত্ব, রজ ও তম। ঐ গুণ তিনটি সমানভাবে বিদ্যমান থাকলে আত্মা সুস্থ থাকে। ঐ গুণ তিনটির মধ্যে একটির আধিক্য হলে অপরটির হ্রাস হয়। হর্ষ উপস্থিত হলে শোক এবং শোক উপস্থিত হলে হর্ষ তিরোহিত হয়। দুঃখের সময় কি কেউ সুখ অনুভব করে এবং সুখের সময় কী কারও দুঃখের অনুভব হয়? যা হোক, এখন সুখ-দুঃখ উভয়ই আপনার স্মরণ করা উচিত নয়। সুখ-দুঃখের অতীত পরমব্রহ্মকে স্মরণ করাই আপনার বিধেয়।... আগে ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতির সঙ্গে আপনার যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়েছিল, এখন অহংকারের সঙ্গে আপনাকে তার চেয়ে অধিক সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে। আপনার সে যুদ্ধের সম্মুখীন হওয়া অবশ্য কর্তব্য।

'যোগ ও অনুরূপ কার্যসমুদয় অবলম্বন করলেই এ যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবেন। এ যুদ্ধে তীর নিক্ষেপ, বন্ধু বা ভৃত্যের কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই; একমাত্র মনকে সহায় করে এ সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে। এ যুদ্ধে জয়লাভ না করতে পারলে দুঃখের পরিসীমা থাকবে না। অতএব আপনি আমার উপদেশ মেনে শিগগিরই অহংকারকে পরাজিত করে শোক পরিত্যাগ করে সুস্থ মনে পৈতৃক রাজ্য প্রতিপালন করুন। হে ধর্মরাজ! কেবল রাজ্য পরিত্যাগ করে কখনও সিদ্ধিলাভ করা যায় না। ইন্দ্রিয়সমূহকে পরাজিত করতে পারলেও সিদ্ধিলাভ হয় কিনা সন্দেহ।

'যারা রাজ্য প্রভৃতি বিষয়সমুদয় পরিত্যাগ করেও মনে মনে বিষয়ভোগের বাসনা করে, তাদের ধর্ম ও সুখ আপনার শত্রুরা লাভ করুক। মমতা সংসার-প্রাপ্তির ও নির্মমতা ব্রহ্মলাভের উপায় বলে চিহ্নিত হয়ে থাকে। ঐ বিরুদ্ধ ধর্মগুণসম্পন্ন মমতা ও নির্মমতা মানুষের মনে সবার অলক্ষ্যে অবস্থান করে একে-অপরকে আক্রমণ ও পরাজিত করে থাকে।

'যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বের অবিনশ্বরতার জন্য জগতের অস্তিত্ব অবিনশ্বর বলে বিশ্বাস করেন, প্রাণিদের হত্যা করলেও তাঁকে হিংসার পাপে লিপ্ত হতে হয় না; যে ব্যক্তি জীব-জড়সংবলিত সমুদয় জগতের আধিপত্য লাভ করেও মমতা ত্যাগ করতে পারেন, তাঁকে কখনও সংসারপাপে আবদ্ধ হতে হয় না। আর যে ব্যক্তি বনে ফলমূল খেয়ে জীবিকানির্বাহ করেও বিষয়বাসনা ত্যাগ করতে পারে না, তাকে নিশ্চয়ই সংসারজালে জড়িত হতে হয়। কাজেই ইন্দ্রিয় ও বিষয়সমুদয় মায়াময় বলে জানবেন। যে ব্যক্তি এসবের প্রতি কিছুমাত্র মমতা করেন না, তিনি নিশ্চয়ই সংসার থেকে মুক্তিলাভ করতে সমর্থ হন।

'কামনাপরায়ণ মূঢ় ব্যক্তিরা কখনও প্রশংসাভাজন হতে পারে না। কামনা মন থেকে উৎপন্ন হয়; এটি যাবতীয় প্রবৃত্তির মূল কারণ। যে-সব মহাত্মা বহু জন্মের অভ্যাসবশে কামনাকে অধর্ম জেনে ফললাভের বাসনায় দান, বেদ অধ্যয়ন, তপস্যা, ব্রত, যজ্ঞ, বিবিধ নিয়ম, ধ্যানমার্গ ও যোগমার্গ আশ্রয় না করেন, তাঁরাই এক সময় কামনাকে পরাজিত করতে সমর্থ হন। সন্দেহ নেই, কামনানিগ্রহই যথার্থ ধর্ম ও মোক্ষের বীজস্বরূপ।

'পুরাবিদ পণ্ডিতেরা যে কামগীতা কীর্তন করে থাকেন, আমি এখন তা আপনার কাছে বলছি, শুনুন। কামনা নিজেই বলে যে, নির্মমতা ও যোগাভ্যাস ছাড়া কেউ আমাকে পরাজিত করতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি জপতপ করে আমাকে জয় করার চেষ্টা করে, আমি তার মনে অভিমানরূপে আবির্ভূত হয়ে তার কাজ বিফল করে থাকি। যে ব্যক্তি বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করে আমাকে পরাজিত করার চেষ্টা করে, আমি তার মধ্যে অবস্থিত জীবাত্মার মত ব্যক্তরূপে উদিত হই। যে ব্যক্তি বেদান্ত সমালোচনা করে আমাকে শাসন করার চেষ্টা করে, আমি তার মনে অচেতন জড়ের মধ্যে অবস্থিত জীবাত্মার মত অব্যক্তরূপে অবস্থান করি। যে ব্যক্তি ধৈর্য দিয়ে আমাকে জয় করতে চেষ্টা করে, আমি কখনই তার মন থেকে দূরীভূত হই না। যে ব্যক্তি তপস্যা দিয়ে আমাকে পরাজিত করার চেষ্টা করে, আমি তার তপস্যাতেই আবির্ভূত হই এবং যে ব্যক্তি মোক্ষ অভিলাসী হয়ে আমাকে জয় করার বাসনা করে, আমি তাকে লক্ষ্য করে নৃত্য ও উপহাস করে থাকি। পণ্ডিতেরা আমাকে সর্বভূতের অবধ্য ও সনাতন বলে উল্লেখ করে থাকেন।

'হে ধর্মরাজ! আমি আপনাকে কামগীতা সবিস্তারে বর্ণনা করলাম। মনে রাখবেন কামনাকে পরাজিত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। আপনি বিধিমত অশ্বমেধ ও অন্যান্য সুসমৃদ্ধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে কামনাকে ধর্মপথে আনুন। বারবার বন্ধুবিয়োগে অভিভূত হওয়া

আপনার পক্ষে নিতান্ত অনুচিত। আপনি অনুতাপ করে কখনও তাঁদের পুনরায় দেখতে পাবেন না। অতএব এখন মহাসমারোহে সুসমৃদ্ধ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করুন, তাহলে ইহলোকে অতুল কীর্তি ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করতে সমর্থ হবেন।'

মহাভারতের মহারণ শেষ হল। যুধিষ্ঠিরের ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল। এবার বিদায়ের পালা। সখা অর্জুনকে নানা বিষয়ে উপদেশ-পরামর্শ দিয়ে কৃষ্ণ পাণ্ডবদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দ্বারকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। দ্বারকায় গিয়ে কৃষ্ণ বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মিলিত হলে বসুদেব তাঁর কাছে যুদ্ধবৃত্তান্ত শুনতে চাইলেন। কৃষ্ণ সংক্ষেপে যুদ্ধবৃত্তান্ত পিতাকে শোনালেন। কেবল অভিমন্যু বধের কথা গোপন করলেন। কিন্তু সুভদ্রা তাঁর সঙ্গে দ্বারকায় গিয়েছিলেন, তিনি অভিমন্যুবধের প্রসঙ্গ নিজে ওঠালেন। কৃষ্ণ তখন সে বৃত্তান্তও সবিস্তারে বললেন।

এদিকে কৃষ্ণের বিদায়কালে যুধিষ্ঠির তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন যে, অশ্বমেধ যজ্ঞকালে আবার আসতে হবে। এখন সেই যজ্ঞের সময় হয়েছে। কাজেই তিনি যাদবদের নিয়ে পুনরায় হস্তিনায় গমন করলেন।

হস্তিনায় এলে অভিমন্যুর স্ত্রী উত্তরা একটি মৃত সন্তান প্রসব করলেন। কৃষ্ণ তাকে পুনরুজ্জীবিত করলেন। এর মধ্যে কোনও ঐশী শক্তির প্রয়োগ ছিল, এমন নাও হতে পারে। এখনকার অনেক চিকিৎসকই মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তাকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারেন এবং করে থাকেন এবং কীভাবে করে থাকেন, তা আমরা অনেকেই জানি। এ ঘটনায় প্রমাণ হয়, তখনকার লোক জানতেন না, এমন অনেক জিনিস কৃষ্ণের জানা ছিল। তিনি আদর্শ মানুষ, এজন্য সব ধরনের বিদ্যা ও জ্ঞান তাঁর অধিকারে ছিল। উত্তরার এই সন্তানই পরীক্ষিৎ। পরীক্ষিতের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জনমেজয় সম্রাট হন। জনমেজয় একদা ব্রহ্মহত্যাজনিত মহাপাপ খণ্ডনের জন্য ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়নের কাছে বেদব্যাস রচিত মহাভারতের কাহিনি শ্রবণ করেন। সেই কাহিনিই পরে উগ্রশ্রবা সৌতি নৈমিষারণ্যে শৌনক প্রভৃতি ঋষিদের কাছে কীর্তন করেন।

যা হোক, মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল। যজ্ঞ সমাপনে কৃষ্ণ আবার দ্বারকায় ফিরে গেলেন। তারপর পাণ্ডবদের সঙ্গে তাঁর আর দেখা হয়নি।

ষষ্ঠ অধ্যায়
প্রভাস

যোহসৌ যুগসহস্রান্তে প্রদীপ্তার্চির্বিভাবসুঃ।
সংভক্ষয়তি ভূতানি তস্মৈ ঘোরাত্মনে নমঃ ॥
– মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৪৭ অধ্যায়।

যদুবংশধ্বংস

মমহারণের পর ছত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কুরুক্ষেত্রে ভারতের ক্ষত্রিয়কুলের প্রায় সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। অবশিষ্ট ছিল যাদবগণ, এরা কৃষ্ণের স্বজন। কিন্তু এরা নিতান্ত কুক্রিয়াসক্ত ও দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠেছিলেন। এরা এতদূর পর্যন্ত পানাসক্ত হয়ে উঠেছিলেন যে, কৃষ্ণ-বলরাম ঘোষণা করেছিলেন যে, দ্বারকায় যে মদ তৈরি করবে, তাকে শূলে চড়ানো হবে। বৃষ্ণি, ভোজ, অন্ধক প্রভৃতি বিভিন্ন বংশজাত যাদবেরা পরস্পরের প্রতি ঘোরতর বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ে উঠলেন। তাঁরা সমস্ত ধর্ম ত্যাগ করলেন। কৃষ্ণের শতাধিক বছর বয়স হয়েছে। এদের সংযত করা কৃষ্ণেরও সাধ্য ছিল না। কৃষ্ণ যাদবদের 'বিনাশ বাসনা'য় তাদের প্রভাসতীর্থে যাত্রা করতে বললেন।

উৎসব চলছে। প্রভাসতীর্থ মারাত্মক প্রমোদে মুখর– যাদবেরা আকণ্ঠ ডুবে গেছেন মদিরায়। হঠাৎ কুরুক্ষেত্রের মহারথী সাত্যকি তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠলেন, 'হার্দিক্য, তুমি ছাড়া এমন নিষ্ঠুর আর কে আছে যে নিদ্রিতকে বধ করতে পারে?' সেই কুখ্যাত নৈশ অভিযান, কৌরবপক্ষের শেষ দারুণ প্রতিহিংসা– তার নিন্দা শুনে সরোষে উত্তর দিলেন কৃতবর্মা,'শৈনেয়! মনে নেই তুমি ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবার শিরোচ্ছেদ করেছিলে? তুমি নৃশংস নও?' তিক্ত, আরও তিক্ত হয়ে উঠল কলহ, আরও অনেক পুরনো ক্ষোভ উন্মথিত হল নতুন করে, সাত্যকি খড়্গের আঘাতে কৃতবর্মাকে ভূরিশ্রবার পথে পাঠিয়ে দিলেন। ছড়িয়ে পড়ল জন থেকে জনে অসংবরণীয় জিঘাংসা, ভোজ ও অন্ধকদের হাতে প্রাণ হারালেন সাত্যকি ও প্রদ্যুম্ন। বেদনায় মন ভরে যায়! আমাদের মনে পড়ে রৈবতক উৎসবের সেই দৃশ্যটি, যেখানে এই ভোজ, অন্ধক, বৃষ্ণিরা প্রায় একইভাবে তাদের নারী ও সুরাপাত্র নিয়ে গোষ্ঠীসুখে মেতেছিলেন এবং যেখানে অর্জুন-সুভদ্রার বিবাহের এবং পাণ্ডব-যাদবের সেই মৈত্রীর সূত্রপাত হয়েছিল, যার ফলে যুদ্ধে জয়লাভ করলেন পাণ্ডবেরা, আজ তার শেষ হল– উৎসন্ন হল যদুবংশ। যুদ্ধাবশিষ্ট দশজনের মধ্যে পাণ্ডবপক্ষে পাণ্ডবেরা পাঁচভাই, সাত্যকি আর কৃষ্ণ এবং কৌরবপক্ষে কৃতবর্মা– কী দুর্ভাগ্য এঁদের, এঁরা ক্ষত্রোচিত-গরীয়ানভাবে প্রাণ দিতে পারলেন না; যুদ্ধের হাজার বিপদ থেকে বাঁচিয়ে মৃত্যু এঁদের হাতে রেখে দিয়েছিল এমন এক অবসান, যা বিলাপবেদনার ন্যূনতম উচ্চারণের যোগ্য নয়।

মহাযুদ্ধের অন্তিম দিনে, শল্যের মৃত্যুর পরে কুরুক্ষেত্রেও নেমে এসেছিল মত্ততা। আর ছিল না কোনও সামরিক শৃঙ্খলা বা প্রকল্প, ছিল না কোনও সুচিন্তিত আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা। যুদ্ধ হয়ে উঠেছিল এক নির্বোধ ও নির্বিচার হত্যাকাণ্ড– কে আত্মপক্ষ আর কে-ই বা পরপক্ষ তাও বোধগম্য হয়নি; যোদ্ধারা রক্তের গন্ধে মাতাল হয়ে হাতের কাছে পাওয়ামাত্র বধ করেছেন শত্রুকে এবং মিত্রকেও। তেমনি ব্যাপক ও ভীষণ মত্ততা যদুবংশকে আচ্ছন্ন করে দিল– শুধু কোনও কীর্তিমান অভিজাত-গৃহের অবক্ষয় নয়, কোনও একটি মহৎ বংশের বিলুপ্তিও নয় শুধু– একটি সম্পূর্ণ সভ্যতার ধ্বংস, মানুষিক বুদ্ধি ও চেতনার সার্বিক ও প্রতিকারহীন নির্বাপণ। প্রথমে নামল এক ভ্রান্তি, যাতে সুসংস্কৃত অন্নের মধ্যে দৃষ্ট হয় অগণন কীট, অনুভূত হয় সুখশয়ান সুপ্তির মধ্যে মুষিকদংশন, ছাগ ডাকলে শৃগালের চীৎকার শ্রুত হয়– আর তারপর ঐসব দুর্লক্ষণ পিছনে ফেলে যাদবেরা চলে এলেন সেই সমুদ্রের তীওে, যার জলে শাম্ব-প্রসূত মুষলটি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। প্রচুর মদ ও মাংস, নারী ও ভোগসামগ্রী– এইসব নিয়ে পূর্বদৃষ্ট দুঃস্বপ্নগুলিকে ভুলে থাকার মরীয়া চেষ্টায়, এক উৎকট উল্লাসে তাঁরা গা ঢেলে দিলেন। স্ত্রী ও পুরুষ লিপ্ত হল নির্লজ্জ ব্যভিচারে, মদ্য শুধু পান করা হল না, বানরদের মধ্যে বিলানো হল; যেন যমুনাতীরবর্তী অন্য এক অতীত প্রমোদের অনুকরণে ঘটনাস্থল ধ্বনিত হতে লাগল সুরাবিহ্বল নৃত্যে-গীতে-বিতণ্ডায়– সবই কৃষ্ণের সামনে। এতক্ষণ নিষ্ক্রিয় ছিলেন তিনি, অবিচল ও তুষ্ণিভূত এক দর্শকমাত্র, কিন্তু সাত্যকি ও প্রদ্যুম্নর মৃত্যুর পর তিনি প্রতিশ্রুত ও পূর্বজ্ঞাত সংহারলীলায় মেতে উঠলেন। এখন তিনি রথারূঢ় নন, তাঁর হাতে নেই গদা বা কশা বা সুদর্শনচক্র, তাঁর

চিত্ত এখন বীতরাগ ও বীতমন্যু– পুনরাবৃত্ত তরঙ্গের মত প্রাণোচ্ছ্বাস তিনি পেরিয়ে এসেছেন। আর তাই, মনে মনে 'কালপর্যায়' বুঝে নিয়ে হাতের মৃদুতম ভঙ্গিতে তুলে নিলেন সেই ঈশিকা তৃণ (শর বা কাশ), পাণ্ডবদের ধ্বংসের জন্য সৌপ্তিকপর্বে অশ্বত্থামা যা নিক্ষেপ করেছিলেন। সে-যাত্রায় পাণ্ডুপুত্রদের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন কৃষ্ণ, কিন্তু তাঁর জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে তিনি দয়া করলেন না। তাঁর হাতে প্রতিটি তৃণ অপ্রতিরোধ্য মুষল হয়ে উঠল। তাঁর দেখাদেখি অন্যরাও হাতে তুলে নিল তৃণ– কয়েক মুহূর্তের মধ্যে শ্মশানভূমিতে পরিণত হল রঙ্গাভূমি। পিতা পুত্রের, পুত্র পিতার মস্তকচূর্ণনে নিযুক্ত। একজন ছিলেন বভ্রু, এই উন্মত্ততা যাঁকে স্পর্শ করেনি। যাদব বভ্রু কৃষ্ণকে বললেন, 'জনার্দন! আপনি অনেক লোকের প্রাণ সংহার করেছেন। এখন চলুন আমরা মহাত্মা বলভদ্রের কাছে যাই।' কুলধ্বংস হবার পর বভ্রুও এক আকস্মিক মুষলের আঘাতে নিহত হলেন– যেমন হয়েছিলেন, ঘোষিত যুদ্ধ থেমে যাবার পরে, অতর্কিতে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও ধৃষ্টদ্যুম্ন। শুধু রইলেন প্রধানতম দুই বার্ষ্ণেয় পুরুষ– কিন্তু তাঁরাও আর বেশিক্ষণ থাকবেন না।

তিনি চেয়েছিলেন যদুবংশের ধ্বংস এবং তা সচেতনভাবে সাধন করেছিলেন– গান্ধারী ও নারদ-কণ্বের অভিশাপ প্রতীকী। আবার ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করলেন– অদ্ভুতভাবে রূপান্তরিত এক ঈশ্বর, যিনি দিব্যবসনে মাল্যে কিরীটে অলংকৃত নন, নন সহস্র সূর্যেও চেয়েও দীপ্তিশালী তেজঃপুঞ্জ, অনেক বাহুবক্ত্র নেত্রসম্পন্ন জগৎব্যাপী আর নন– কিন্তু এক ভূষণহীন জীবনক্লান্ত পুরুষ, যিনি তাঁর ঈশ্বরত্বের লক্ষণস্বরূপ গ্রহণ করেছেন প্রকট মরত্ব– যথাসময়ে, স্বেচ্ছায়। এখনও তিনি লোকক্ষয়কারী, কিন্তু তার কালাগ্নিসদৃশ রূপ এখন নির্বাপিত, তাঁর সংহারকর্মেও তিনি অনুগ্র ও উদাসীন। যেন নিজের সঙ্গে গোপন একটা চুক্তি ছিল তাঁর, কৌরব-পাণ্ডবদেও উপলক্ষ করে এতদিন ধওে তা-ই তিনি পূরণ করলেন; তাঁর সেই কর্মপরায়ণ মানুষিক ভূমিকার এবার অবসান ঘটল। যুদ্ধকালে অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'ত্রিলোকে আমার কোনও কর্তব্য নেই, তবু আমি কর্মে ব্যাপৃত আছ। যদি আমি কর্ম না করি তাহলে লোকেরা কর্মত্যাগ করবে।... লোকসংগ্রহের জন্য– সৃষ্টিরক্ষার জন্যই– কর্ম করণীয়'। কিন্তু কৃষ্ণ জানেন যে, বিরতিরও প্রয়োজন ঘটে মাঝে-মাঝে, মাঝে-মাঝে সন্ধিক্ষণ আসে যখন কালের ঘূর্ণন যেন মুহূর্তের জন্য থেমে যায়– যখন সমস্ত যুদ্ধ সমাপ্ত, সব উদ্যম নিঃশেষ, পৃথিবীর বীরবংশ লুপ্ত অথবা লুপ্তপ্রায়, কোথাও নেই কোনও সংকট বা সংঘর্ষ এবং নেই কোনও সূচনারও ইঙ্গিত। এমন সময় আসে, যখন 'সংগ্রহ' ও সংহার সমার্থক হয়ে ওঠে, পূর্ণ হয় কোনও বৃত্ত, বিশ্বসংসারে শৃঙ্খলা ও ভারসাম্য রক্ষার জন্যই প্রয়োজন হয় ধ্বংসের। আর সে-রকম সময়ে বুঝি ঈশ্বরও অপসৃত হন– অন্তত ইতিহাস থেকে, প্রপঞ্চময় সংসার থেকে। যে-বিশাল প্রয়াসের জালে কৃষ্ণ স্বেচ্ছায় বন্দী হয়েছিলেন এবং সমগ্র ক্ষত্রকুলকে বন্দী করেছিলেন, সেটি অনেক আগে থেকেই আস্তে আস্তে গুটিয়ে আনছিলেন তিনি, এবার তাঁকেও ফিরে যেতে হবে, তিনি প্রস্তুত।

তিনি প্রয়োগ করেছিলেন সাংখ্য যোগ বেদান্ত থেকে প্রতিটি সম্ভবপর প্রতিটি যুক্তি, নিখিলজ্ঞানের উপর তাঁর কর্মবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, দেখিয়েছিলেন অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপ; – কত কল্পনার দ্যুতি, কত চিত্রকল্পের ঐশ্বর্য, জীবন-মৃত্যুর কত রহস্যের কত উদ্ঘাটন; আর তবু, যেন অর্জুনের মন থেকে শেষ সংশয়বিন্দুটি বিমোচনের জন্য তিনি ঘোষণা করেছিলেন সেই মাভৈ-বাণী– অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ। 'ধর্মক্ষেত্র' কুরুক্ষেত্রে তিনি পাপের পর পাপে লিপ্ত করেছিলেন অর্জুন, ভীম, যুধিষ্ঠিরকে কিন্তু তিনি ছিলেন অব্যাকুল ও অব্যথিত, আদ্যন্ত একইভাবে ক্ষমতাপন্ন ও ক্ষমতার ব্যবহারকারী; যে ভীষ্ম তাঁর প্রধানতম বন্দনাকারী, তাঁর জন্য কোনও বেদনা তিনি প্রকাশ করেননি; যে-কর্ণের সঙ্গে একবার তিনি মর্ম-কথা বিনিময় করেছিলেন– বন্ধুর মত, প্রীতিস্নিগ্ধভাবে, সেই কর্ণের হত্যায় তিনি ছিলেন অনুকম্পাহীন। আর এখন এই ভয়াবহ ঘটনাপর্যায়ে– মনে হয় তাঁর প্রতিটি আবেগবিন্দু নিষ্কাশিত হয়ে গেছে, অনাচারমত্ত যাদবদের প্রতি তাঁর ক্রোধের উদ্রেক পর্যন্ত হল না, ওষ্ঠ থেকে নিঃসৃত হল না কোনও তিরস্কার– যেন নিষ্পলক চোখে চেয়ে দেখলেন সব, মুখের একটি পেশী কুঞ্চিত না করে– যেন গাছ থেকে খসে-পড়া শুকনো পাতার চেয়েও তাঁর আত্মীয়-ভ্রাতা-পুত্রের জীবন মূল্যহীন। এই-ই তাঁর প্রক্ষালন ও প্রতিদান, এই হল তাঁর প্রায়শ্চিত্ত– তাঁর স্বকৃত এবং কুরুবংশের সব পাপের জন্য– যুধিষ্ঠিরের ধরনে নয়, বিলাপের উচ্ছ্বাসে নয় (কেন না তিনি শোক ও মনস্তাপের অতীত)– এক প্রত্যক্ষ ও চরম উপায়ে, স্বহস্তে তাঁর স্ববংশকে সংহার করে। এখন তাঁর একটিমাত্র কৃত্য অবশিষ্ট আছে– কিন্তু সেটা আসলে তাঁর কোনও কর্ম নয়, সেটা কর্মেও নিরসন, ঘটনা থেকে প্রস্থান।

সারথি দারুককে কৃষ্ণ হস্তিনায় অর্জুনের কাছে পাঠালেন। অর্জুন এসে যাদব কুলকামিনীদের হস্তিনায় নিয়ে যাবেন, কৃষ্ণ এমন আজ্ঞা করলেন। বিপর্যস্ত ক্লান্তক্লিষ্ট যদুপতি পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, 'যতক্ষণ অর্জুন এসে না পৌঁছন, আপনি এখানে পুরস্ত্রীদের রক্ষা করুন; বলরাম বনের মধ্যে আমার প্রতীক্ষায় আছেন, আমি তাঁর কাছে যাই। বহু কুরুবীর নিধনকাণ্ড আমি দেখেছি, আজ যদুকুলের বিনষ্টিও দেখলাম। এখন আমি বলরামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তপস্যা করব।'

বলরাম বেজায় মদ্যপান করেছিলেন। সেই অবস্থায় যোগাসনে বসলেন। ধীরে ধীরে তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত হল। তাঁর প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তাঁর মুখ থেকে সহস্রফণা এক বিশাল সর্প নিঃসৃত হয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল সমুদ্রে। বিষ্ণুপুরাণে কবি এমন চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। হয়তো তাঁর মুখ থেকে মদের ধারা নানামুখে নির্গত হচ্ছিল। তা দেখে কৃষ্ণও মর্ত্যলোক ছাড়ার বাসনায় মহাযোগ অবলম্বন করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। অপ্রহার্য অপতনীয় পুরুষ কৃষ্ণ– স্বাস্থ্য শক্তি যৌবনের এক অফুরন্ত উৎস: তিনি প্রাণত্যাগ করলেন বনের মধ্যে ভূমিশয়নে জরা নামে এক ব্যাধের নিক্ষিপ্ত একটিমাত্র বাণের আঘাতে– তাও কোনও মর্মস্থলে নয়, পদতলে! কৃষ্ণ প্রয়াত হলেন। এই আশ্চর্য ঘটনায় যেন সম্পূর্ণ হল মহাভারতে কৃষ্ণের অলোকসামান্য ভূমিকা। ভগবদ্গীতায় যত উঁচুতে তিনি উঠেছিলেন, এবারে ঠিক তত নিচেই তাঁর অবতরণ ঘটল। এই মৃত্যু– মানবেতিহাসের হীনতম এই মৃত্যু– এও তাঁর ঈশ্বরত্বেরই একটি ব্যঞ্জনা; ভীষ্মেও বা বলরামের মত কোনও মহিমান্বিত অবসান অশোভন হত তাঁর পক্ষে, এমনকি ঠিক রুচিসম্মত হত না; এমন একটি লৌকিক অথবা জান্তব মৃত্যুর ফলে তিনি আমাদের হৃদয়ের কাছে বিশ্বাস্য ও বাস্তব দেবতা হয়ে উঠলেন: যিনি 'লোকসংগ্রহে'র জন্য কর্ম করে থাকেন, তিনিই 'লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ কাল'– গীতায় উক্ত এই সূত্রটি আমাদের সামনে দর্শনীয় হল। ছায়াছবির মত মিলিয়ে গেল তাঁর যদুবংশ, ঈশ্বরের অন্তর্ধান ঘটল।

অর্জুন দ্বারকায় এসে বসুদেবের সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি

ছিলেন তাঁর বার্ধক্যের বিশ্রাম-লালসা নিয়ে অন্তঃপুরে। সমুদ্রতীরে তার পুত্রগণ পরস্পরকে হত্যা করছে, বলরামের সর্পরূপী প্রাণ বহির্গত হল, কৃষ্ণ অরণ্যে মৃত্যুশয়ন পেতেছেন; তাঁর শ্রেষ্ঠ পুত্রদ্বয় যে মৃত, তাও বসুদেব জেনেছিলেন কিনা সন্দেহ। অর্জুনের আগমন পর্যন্ত কষ্টে-সৃষ্টে বেঁচে থাকার মত প্রাণশক্তি শুধু অবশিষ্ট ছিল তাঁর। অর্জুনকে বললেন, 'তিনি (কৃষ্ণ) আমাকে বালকদের সঙ্গে এখানে রেখে যে কোথায় গেলেন তাও আমি জানি না।' অর্জুনের অপেক্ষাতেই যেন তিনি প্রাণধারণ করে ছিলেন।

কৃষ্ণ-বলরামের পারলৌকিক কর্ম সম্পাদন করে যাদব কুলকামিনীদের নিয়ে হস্তিনায় রওনা হলেন। পথিমধ্যে একদল দস্যু লগুড় হাতে তাঁদের আক্রমণ করল। অর্জুনের চোখের সামনেই যাদবরমণীদের হরণ করে নিল দস্যুরা– মহাবীর তাঁর দিব্যাস্ত্রসমূহের ব্যবহার বিস্মৃত হলেন। তিনি গাণ্ডীবে শরযোজনা করতে পারলেন না, তাঁর অক্ষয় তূণ নিঃশেষিত হল। যে-পীতবসন দ্যুতিমান পুরুষ তাঁর রথের আগে ছুটে-ছুটে শত্রুসৈন্যকে দগ্ধ করতেন, তিনি আর তাঁকে দেখতে পেলেন না; যে কৃষ্ণ সবই বিনষ্ট করতেন, সেই কৃষ্ণের অদর্শনে তিনি এখন অবসন্ন। তাঁর সবদিক শূন্য হয়ে গেল। তাঁর হৃদয়ের শান্তি অন্তর্হিত হল। অনেক কুলনারী স্বেচ্ছায় দস্যুদের হাতে আত্মদান করল। বেলাতিক্রান্ত সমুদ্র গ্রাস করে নিল দ্বারকাপুরীকে। পরাস্ত ও বিধ্বস্ত অর্জুন নতশিরে এসে দাঁড়ালেন ব্যাসদেবের সামনে।

কৃষ্ণ যদুবংশের ধ্বংস নিবারণে কোনও উদ্যোগ নেননি। তিনি মানবকুলের আদর্শ। তাঁর কাছে আত্মীয়-অনাত্মীয় নেই। তিনি ধর্মের রক্ষক। অধর্মের পক্ষাবলম্বন তিনি কখনই করতে পারেন না। যদুবংশীয়রা তখন অধার্মিক হয়ে উঠেছিল, কাজেই আত্মীয় হলেও তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা কৃষ্ণ করতে পারেন না।

কৃষ্ণের দেহত্যাগের কারণ কতকটা অনিশ্চিত থেকে গেল। তিনি যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করেছিলেন বলেই মনে হয়। যারা যোগাভ্যাসকালে নিঃশ্বাস অবরুদ্ধ করার অভ্যাস করেছেন, তাঁরা নিশ্বাস বন্ধ করে নিজের মৃত্যু সম্পাদন করতে পারেন না, এমন কথা আমি সাহস করে বলতে পারি না। প্রাচীন বয়সে জীবনের সব কাজ শেষ হলে ঈশ্বরে লীন হবার জন্য মনোমধ্যে তন্ময় হয়ে শ্বাসরোধ করাকে আমি 'ঈশ্বরপ্রাপ্তি' বলেই মনে করি। এ সময় কৃষ্ণের বয়স শতবর্ষের অধিক হয়েছিল। জরা ব্যাধের শরাঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল বলে বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে। এ জরাব্যাধ, জরাব্যাধি নয় তো? এটি হয়তো সাধারণ জৈব বার্ধক্যের একটি রূপকমাত্র।

কৃষ্ণের মৃত্যু উপরোক্ত যে-কোনও কারণে হতে পারে। যারা কৃষ্ণকে মানুষমাত্র বিবেচনা করে তাঁর ঈশ্বরত্ব স্বীকার করেন না, তারা এসব কারণের যে কোনটি গ্রহণ করতে পারেন। তবে আমি কৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার বলে স্বীকার করি। অতএব আমি বলি, কৃষ্ণের ইচ্ছাই কৃষ্ণের দেহত্যাগের কারণ। জগতে মানুষ্যত্বের আদর্শ প্রচার করা তাঁর অভিপ্রায় এবং সেই অভিপ্রায়েই তিনি মানুষী শক্তির দ্বারা সকল কাজ নির্বাহ করেন। কিন্তু তা বললেও, ঈশ্বরাবতারের জন্ম-মৃত্যু তাঁর ইচ্ছাধীনমাত্র। অতএব আমি বলি, কৃষ্ণের ইচ্ছাই কৃষ্ণের দেহত্যাগের একমাত্র কারণ। কৃষ্ণের মহাপ্রয়াণে একটি মহাযুগের অবসান হল।

যদুকুল ধ্বংসের সময় কৃষ্ণের বয়স শতবর্ষ অতিক্রম করেছিল, একথা বিষ্ণুপুরাণেও উল্লেখিত আছে। কৌরবপক্ষের প্রথম সেনাপতি পদে পিতামহ ভীষ্ম যে-সময়ে বৃত হয়েছিলেন, তখন তাঁর বয়স অন্তত নব্বই থেকে একশো বছরের মধ্যে। মৃত্যুকালে দ্রোণের বয়স ছিল পঁচাশি, এ-কথা মহাভারতেই উক্ত হয়েছে। এদিকে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের গণনা অনুসারে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় তিন কৌন্তেয়র বয়স হয়েছিল যথাক্রমে বাহাত্তর, একাত্তর ও সত্তর, আর মাদ্রীতনয়দ্বয়ের ঊনসত্তর।

উপসংহার

সবশেষে আমাদের দেখা উচিত, যতটুকু সত্য পুরাণেতিহাসে পাওয়া যায়, তার আলোকে কৃষ্ণচরিত্র কেমন প্রতিপন্ন হল। দেখেছি, শৈশবে কৃষ্ণ শারীরিক বলে অতিশয় বলবান। তাঁর অমিত বলপ্রভাবে বৃন্দাবনে হিংস্র জীবজন্তু পরাভূত হত– কংসের মল্ল প্রভৃতিও নিহত হয়েছিল। গোচারণকালে খেলাধূলা ও ব্যায়াম করায় তিনি শারীরিক বলে বলীয়ান হয়ে উঠেছিলেন। দ্রুতগমনে তিনি কালযবনকেও পরাভূত করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁর রথচালনার বিশেষ প্রশংসা দেখা যায়।

প্রশিক্ষিত শারীরিক বলে তিনি সে-সময়ের ক্ষত্রিয়সমাজে সর্বপ্রধান অস্ত্রবিদ বলে গণ্য হয়েছিলেন। কেউ তাঁকে হারাতে পারেননি। তিনি কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি সে-সময়ের প্রধান প্রধান যোদ্ধা এবং অন্যান্য বহুতর রাজাদের সঙ্গে– কাশী, কলিঙ্গ, পৌণ্ড্রক, গান্ধার প্রভৃতি রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত হয়ে তাঁদের সবাইকেই পরাভূত করেন। তাঁর যুদ্ধশিষ্যরা, যেমন সাত্যকি ও অভিমন্যু যুদ্ধে প্রায় অপরাজেয় হয়ে উঠেছিলেন। স্বয়ং অর্জুনও তাঁর কাছে কোনও কোনও বিষয়ে যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁর শিষ্যত্ব স্বীকার করেছিলেন।

কেবল শারীরিক বল ও শিক্ষার ওপর যে রণনৈপুণ্য নির্ভর করে, পুরাণেতিহাসে তারই প্রশংসা দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু সে ধরনের রণনৈপুণ্য একজন সামান্য সৈনিকেরও থাকতে পারে। সেনাপতিত্বই যোদ্ধার প্রকৃত গুণ। এই সেনাপতিত্বে সে-সময়ের যোদ্ধারা তেমন পটু ছিলেন না। কৃষ্ণের সেনাপতিত্বের বিশেষ গুণ প্রথম জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধে পরিলক্ষিত হয়। তাঁর সেনাপতিত্বের গুণে ক্ষুদ্র যাদবসেনারা জরাসন্ধের সংখ্যাতীত সেনাকে মথুরা থেকে ফিরে যেতে বাধ্য করেছিল। সেই অগণনীয় সেনার ক্ষয় যাদবদের পক্ষে অসাধ্য জেনে কৃষ্ণের মথুরা পরিত্যাগ করে নতুন নগরী নির্মাণের জন্য সাগরদ্বীপ দ্বারকার নির্বাচন এবং তার সামনে অবস্থিত রৈবতক পর্বতমালায় দুর্ভেদ্য দুর্গশ্রেণী নির্মাণে যে রণনীতিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়, তেমন পরিচয় পুরাণেতিহাসে আর কোনও ক্ষত্রিয়েরই পাওয়া যায় না। পুরাণকার ঋষিরাও তা জানতেন না, এতেই প্রমাণিত হয় কৃষ্ণেতিহাস তাঁদের কল্পনাপ্রসূত নয়।

কৃষ্ণের জ্ঞানার্জনী বৃত্তির প্রভূত পরিচয় আমরা পেয়েছি। তিনি অদ্বিতীয় বেদজ্ঞ, এটিই ভীষ্ম তাঁর অর্ঘপ্রাপ্তির অন্যতম কারণ বলে জানিয়েছিলেন। শিশুপাল সে-কথার কোনও উত্তর দেননি, কেবল বলেছিলেন, তবে বেদব্যাস থাকতে কৃষ্ণের পূজা কেন?

কৃষ্ণের জ্ঞানার্জনী বৃত্তির চরম উৎকর্ষতার পরিচয় শ্রীশ্রী গীতা। এখানে তিনি এক অতুল্য ধর্মকথার প্রবর্তন করেছেন। তবে এই ধর্মকথা যে শুধু গীতাতেই পাওয়া যায়, এমন নয়, মহাভারতের অন্য স্থানেও পাওয়া গেছে। কৃষ্ণ-কথিত ধর্মের চেয়ে উন্নত, সর্বলোকের পক্ষে মঙ্গলকর, সর্বজনের আচরণীয় ধর্ম পৃথিবীতে আর কখনও প্রচারিত হয়নি। এই ধর্মে যে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, তা প্রায় মনুষ্যাতীত। কৃষ্ণ মানুষী শক্তির দ্বারা সব কাজ করেছেন, আমি তা বারবার বলেছি, প্রমাণ করেছি। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত জ্ঞানের আশ্রয়

নিয়েছেন।

সর্বজনীন ধর্মপ্রচারের পর রাজধর্ম বা রাজনীতিতেও তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সম্ভ্রান্ত রাজনীতিজ্ঞ বলেই যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবের পরামর্শ পেয়েও কৃষ্ণের পরামর্শ ব্যতীত রাজসূয় যজ্ঞে হাত দেননি। অবাধ্য যাদবেরা এবং বাধ্য পাণ্ডবেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা না করে কোনও কাজ করতেন না। জরাসন্ধকে হত্যা করে কারারুদ্ধ রাজাদের মুক্ত করা উন্নত রাজনীতির উৎকৃষ্ট উদাহরণ– সাম্রাজ্য স্থাপনের অল্প আয়াসসাধ্য অথচ পরম ধর্মসিদ্ধ উপায়। ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের পর ধর্মরাজ্য শাসনের জন্য রাজধর্ম নিয়োগে ভীষ্মের দ্বারা রাজব্যবস্থা সংস্থাপন করানো, রাজনীতিজ্ঞতার দ্বিতীয় উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

কৃষ্ণের বুদ্ধি লোকাতীত– তা সর্বব্যাপী, সর্বদর্শী, সকল প্রকার উপায়ের উদ্ভাবিনী। মনুষ্য শরীর ধারণ করে যতদূর সর্বজ্ঞ হওয়া যায়, কৃষ্ণ ততদূর সর্বজ্ঞ। অপূর্ব অধ্যাত্মতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব, যার উপরে আজও মানুষের বুদ্ধি যায়নি, তা থেকে চিকিৎসাবিদ্যা, সংগীতবিদ্যা, এমনকি অশ্বপরিচর্যা পর্যন্ত তাঁর আয়ত্ত ছিল। উত্তরার মৃত পুত্রের পুনর্জীবন এর প্রথম উদাহরণ; বিখ্যাত বংশীবিদ্যা দ্বিতীয় এবং জয়দ্রথবধের দিন অশ্বের শরীরে বেঁধা তীর-উদ্ধার তৃতীয় উদাহরণ।

কৃষ্ণের কার্যকারিণী বৃত্তিসমূহের তুলনা চলে না। তাঁর সাহস, ক্ষিপ্রতা এবং সকল কাজে তৎপরতার অনেক পরিচয় দিয়েছি। তাঁর ধর্ম ও সত্য যে অবিচলিত, এ বইয়ে তার অনেক প্রমাণ দেখেছি। সর্বজনে দয়া এবং প্রীতি এ জীবনালেখ্যে পরিস্ফুট হয়েছে। বলবানদের চেয়ে বলবান্ হয়েও মানুষের কল্যাণে তিনি শান্তির জন্য দৃঢ়যত্ন ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি সকলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, শুধু মানুষ নয়, ইতর প্রাণির প্রতিও তাঁর অসামান্য দয়া। গিরিযজ্ঞে তা পরিস্ফুট। তিনি আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর কেমন হিতৈষী, তা দেখেছি, আবার এও দেখেছি, আত্মীয় পাপাচারী হলে তিনি তার শত্রু। তাঁর অপরিসীম ক্ষমাগুণ দেখেছি, আবার এও দেখেছি, কার্যকালে লৌহহৃদয়ে অকুণ্ঠিতভাবে তিনি দণ্ড বিধান করেন। তিনি স্বজনপ্রিয়, কিন্তু মানুষের কল্যাণে স্বজনের বিনাশেও তিনি কুণ্ঠিত নন। কংস মাতুল, পাণ্ডবেরা যা, শিশুপালও তা– উভয়েই পিসির পুত্র; উভয়কেই দণ্ডিত করলেন; তারপর, পরিশেষে স্বয়ং যাদবেরা সুরাপায়ী ও দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠলে তিনি তাদেরকেও রক্ষা করলেন না।

এসব শ্রেষ্ঠ বৃত্তি কৃষ্ণচরিত্রে চরমভাবে বিকশিত হয়েছিল বলে, লোকচিত্তরঞ্জিণী বৃত্তির অনুশীলনে তিনি অমনোযোগী ছিলেন, এমন নয়। যে-জন্য বাল্যে বৃন্দাবনে ব্রজলীলা, পরিণত বয়সে সেই উদ্দেশ্যে সমুদ্রবিহার, যমুনাবিহার, রৈবতক বিহার।

কেবল একটা কথা এখনও বাকি আছে। আমার ধর্মতত্ত্ব নামক বইয়ে বলেছি, ভক্তিই মানুষের প্রধান বৃত্তি। কৃষ্ণ আদর্শ মানুষ, মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচারের জন্য তিনি অবতীর্ণ– তাঁর ভক্তির প্রকাশ তেমন দেখলাম কই? যদি তিনি ঈশ্বরাবতার হন, তবে তাঁর এই ভক্তির পাত্র কে? তিনি নিজে! নিজের প্রতি যে ভক্তি, সে কেবল নিজেকে পরমাত্মা থেকে অভিন্ন ভাবলেই আসে। এই ভাবনা জ্ঞানমার্গের চরম। একে আত্মরতি বলে। ছান্দোগ্য উপনিষদে যেমন বলা হয়েছে, 'য এবং পশ্যন্বেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড় ভবতীতি।' অর্থাৎ 'যে এ দেখে, এ ভেবে এ জেনে আত্মায় রত হয়, আত্মাতেই ক্রীড়াশীল হয়, আত্মাই যার মিথুন (সহচর), আত্মাই যার আনন্দ, সে স্বরাট্।'
এই কথাই গীতায় কীর্তিত হয়েছে, কৃষ্ণ আত্মারাম; আত্মা জগন্ময়; তিনি সেই জগতে প্রীতিবিশিষ্ট।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, কৃষ্ণ সব জায়গায় সব সময় সবরকম গুণের অভিব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল। তিনি অপরাজেয়, অপরাজিত, বিশুদ্ধ, পুণ্যময়, প্রীতিময়, দয়াময়, অনুষ্ঠেয় কাজে সদা তৎপর– ধর্মাত্মা, বেদজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, ধর্মজ্ঞ, লোকহিতৈষী, ন্যায়নিষ্ঠ, ক্ষমাশীল, নিরপেক্ষ, শাস্তিদাতা, নির্মম, নিরহংকার, যোগযুক্ত, তপস্বী। তিনি মানুষী শক্তি দিয়ে কার্যনির্বাহ করেন, কিন্তু তাঁর চরিত্র মনুষ্যাতীত। এ রকম মানুষী শক্তির দ্বারা অতিমানবীয় চরিত্রের বিকাশ থেকে তাঁর মনুষ্যত্ব বা ঈশ্বরত্ব অনুমান করা উচিত কিনা, তা পাঠক নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুসারে স্থির করুন। যিনি মীমাংসা করবেন কৃষ্ণ মানুষ ছিলেন মাত্র, তিনি স্বীকার করবেন, কৃষ্ণ হিন্দুদের মধ্যে পরম জ্ঞানী এবং মহত্তম ছিলেন। আর যিনি বুঝবেন, এই কৃষ্ণচরিত্রে ঈশ্বরের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়, তিনি এই বই পাঠ কওে দুই হাত জোড় করে বিনীতভাবে আমার সঙ্গে বলুন–

নাকারণাৎ কারণাদ্বা কারণাকারণান্ন চ।
শরীরগ্রহণং বাপি ধর্মত্রাণায় তে পরম্ ॥

• সমাপ্ত

সহজপাঠ **নান্টু রায়**

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

উনিশ শতকের ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২৭ জুন ১৮৩৮-৮ এপ্রিল ১৮৯৪) বাংলা গদ্য ও উপন্যাসের বিকাশে অসীম অবদানের জন্যে অমরত্ব লাভ করেছেন। তাঁকে প্রথম আধুনিক বাংলা ঔপন্যাসিক হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে গীতার ব্যাখ্যাতা ও সাহিত্য সমালোচক হিসেবেও তিনি খ্যাতিলাভ করেন। জীবিকাসূত্রে ব্রিটিশরাজের কর্মকর্তা বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষার আদি সাহিত্যপত্র *বঙ্গদর্শনের* প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। তাঁর ছদ্মনাম ছিল কমলাকান্ত। তিনি বাংলা উপন্যাসের জনক– সাহিত্য সম্রাট হিসেবে খ্যাত। *দুর্গেশনন্দিনী* বাংলাভাষার প্রথম সার্থক উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্রের মোট উপন্যাসের সংখ্যা ১৫টি, এর মধ্যে একটি ছিল ইংরেজি ভাষায়। তাঁর রচনা 'বঙ্কিমী শৈলী' বা 'বঙ্কিমী রীতি' নামে বিশিষ্ট। *দুর্গেশনন্দিনী*, *কপালকুণ্ডলা*, *বিষবৃক্ষ*, *চন্দ্রশেখর*, *কৃষ্ণকান্তের উইল*, *রাজসিংহ*, *আনন্দমঠ*, *দেবী চৌধুরানী* প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। *কৃষ্ণচরিত্র*, *ধর্মতত্ত্ব*, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* তাঁর ধর্মীয় অনুসন্ধিৎসার ফসল।

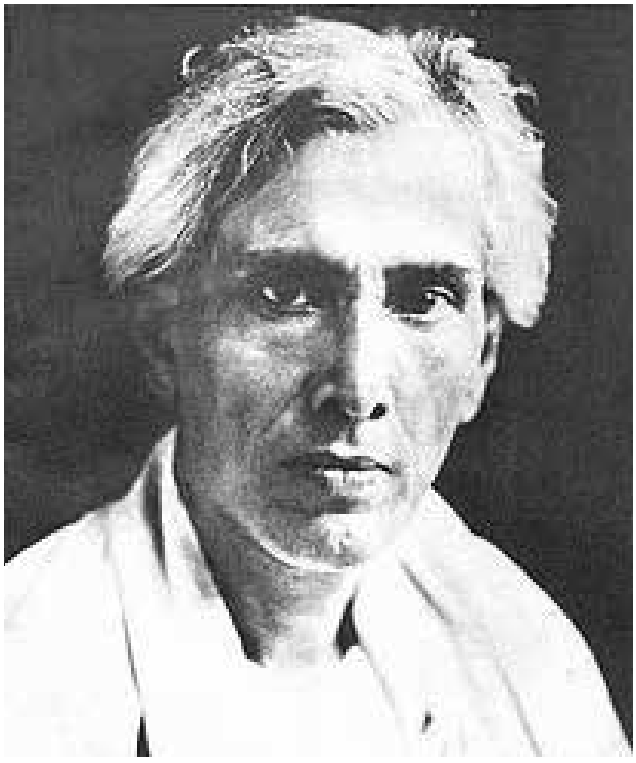

স্মরণ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাংলা ভাষার জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে। তার পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ও মাতা ভুবনমোহিনী দেবী। পাঁচ ভাই আর বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। শরৎচন্দ্রের ডাকনাম ছিল ন্যাড়া। দারিদ্র্যের কারণে মতিলাল স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে ভাগলপুরে শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন।

শরৎচন্দ্রের পাঁচ বছর বয়সকালে মতিলাল তাকে দেবানন্দপুরের প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি করে দেন। ১৮৮৭ সালে শরৎচন্দ্র ভাগলপুর জেলা স্কুলে ভর্তি হন। পরে ভর্তি হন হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলে কিন্তু ১৮৯২ সালে স্কুলের ফি দিতে না-পারায় তাকে এ বিদ্যালয়ও ত্যাগ করতে হয়। এ-সময় তিনি *কাশীনাথ* ও *ব্রহ্মদৈত্য* নামে দুটি গল্প লেখেন। তারপর তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৮৯৪ সালে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে এনট্রান্স পরীক্ষা পাস করে তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে ভর্তি হন কিন্তু পরীক্ষার ফি দিতে না-পারায় পরীক্ষায় বসতে পারেননি।

কলেজ ত্যাগের পর শরৎচন্দ্র প্রতিবেশী বিভূতিভূষণ ভট্টের বাড়িতে আয়োজিত সাহিত্যসভায় নিয়মিত যেতেন, যার ফলশ্রুতিতে তিনি *বড়দিদি*, *দেবদাস*, *চন্দ্রনাথ*, *শুভদা* ইত্যাদি উপন্যাস এবং *অনুপমার প্রেম*, *আলো ও ছায়া*, *বোঝা*, *হরিচরণ* ইত্যাদি গল্প রচনা করেন। এসময় তিনি কিছুদিন সন্ন্যাসবৃত্তি অবলম্বন করেন, কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর পিতৃশ্রাদ্ধান্তে কলকাতা যান। সেখানে উচ্চ আদালতের উকিল লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে হিন্দি বইয়ের ইংরেজি তর্জমা করার চাকরি নেন। এসময় তিনি *মন্দির* নামে একটি গল্প লিখে কুন্তলীন পুরস্কার লাভ করেন।

১৯০৩ সালের জানুয়ারি মাসে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে লালমোহনের ভগ্নিপতি উকিল অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে চলে যান। অঘোরনাথ তাকে বর্মা রেলওয়ের অডিট অফিসে একটি অস্থায়ী চাকরির ব্যবস্থা করে দেন। দু'বছর পর তিনি তার বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে পেগু চলে যান ও সেখানে অবিনাশ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন। ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে বর্মার পাবলিক ওয়ার্কস অ্যাকাউন্টস অফিসে চাকরিলাভ করেন এবং পরবর্তী দশবছর তিনি এখানেই চাকরি করেন।

১৯১২ সালের অক্টোবর মাসে শরৎচন্দ্র এক মাসের ছুটি নিয়ে দেশে ফিরলে *যমুনা* পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল তাকে লেখা পাঠাতে অনুরোধ করেন। রেঙ্গুনে ফিরে শরৎচন্দ্র *রামের সুমতি* নামে একটি গল্প পাঠান, ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়। এরপর তিনি *ভারতবর্ষ* পত্রিকার জন্যেও লেখা পাঠাতে শুরু করেন। ফণীন্দ্রনাথ পাল তার *বড়দিদি* উপন্যাস পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এমসি সরকার অ্যান্ড সন্স ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স তার উপন্যাসগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।

রেঙ্গুনে থাকাকালে শরৎচন্দ্র বোটাটং পোজনডং অঞ্চলে কলকারখানার মিস্ত্রিদের পল্লিতে বসবাস করতেন। সে-বাসার নিচে শান্তি দেবী নামে এক ব্রাহ্মণ মিস্ত্রির কন্যা বসবাস করতেন। তার পিতা তার সঙ্গে এক মদ্যপের বিয়ের ঠিক করলে শান্তি দেবী শরৎচন্দ্রকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে অনুরোধ করায় শরৎচন্দ্র তাকে বিয়ে করতে বাধ্য হন। তাদের এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়, কিন্তু রেঙ্গুনের প্লেগে আক্রান্ত হয়ে শান্তি দেবী ও তার সন্তানের মৃত্যু হয়। এর অনেকদিন পরে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে কৃষ্ণদাস অধিকারী নামে এক ভাগ্যান্বেষী ব্যক্তির অনুরোধে তার ১৪ বছরের কন্যা মোক্ষদাকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর তার নাম রাখা হয় হিরন্ময়ী দেবী। তারা নিঃসন্তান ছিলেন। ১৯১৬ সালে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণে শরৎচন্দ্র বাংলায় ফিরে আসেন।

শরৎচন্দ্র রূপনারায়ণ নদের তীরে সামতাবেড়ের পানিত্রাস গ্রামে একটি মাটির বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। পরে তিনি শিবপুরেও থাকতেন। শিবপুর ব্যাতাইতলা বাজার থেকে চ্যাটার্জিহাট পর্যন্ত রাস্তা শরৎচন্দ্রের নামে নামাঙ্কিত হয়েছে। ১৯৩৭ সালে শরৎচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য দেওঘরে তিন-চার মাস কাটিয়ে কলকাতা ফিরে এসে তিনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সময় তার যকৃতের ক্যান্সার ধরা পড়ে, যা পাকস্থলী পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। বিধানচন্দ্র রায়, কুমুদশঙ্কর রায় প্রমুখ চিকিৎসক তার অস্ত্রোপচারের পক্ষে মত দেন। ১৯৩৮ সালের ১২ জানুয়ারি ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তার দেহে অস্ত্রোপচার করেন, কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। চারদিন পর ১৬ জানুয়ারি সকাল দশটায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শরৎচন্দ্রের অনেক উপন্যাস ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। *বড়দিদি* (১৯১৩), *পল্লীসমাজ* (১৯১৬), *দেবদাস* (১৯১৭), *চরিত্রহীন* (১৯১৭), *শ্রীকান্ত* (চারখণ্ডে ১৯১৭-১৯৩৩), *দত্তা* (১৯১৮), *গৃহদাহ* (১৯২০), *পথের দাবী* (১৯২৬), *পরিণীতা* (১৯১৪), *শেষ প্রশ্ন* (১৯৩১) ইত্যাদি তার বিখ্যাত উপন্যাস। তুমুল জনপ্রিয়তার জন্য তাকে 'অপরাজেয় কথাশিল্পী' বলা হত। ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে 'ডিলিট' উপাধি প্রদান করে।

• সংকলিত

স্মৃতিচারণ

দনুজদলনী দুর্গা ও আমার ছেলেবেলা

শামস্ হক

মনতরীটা বড় অশান্ত ও গতিশীল। এই শরৎ-সকালের নীল আকাশের তুলোপেজা সাদা সাদা মেঘগুলো যেভাবে উড়ে উড়ে যাচ্ছে তেমনি করেই আমার উড়ুউড়ু মনটা চলে গেল পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকের শারদীয়ার সেই দিনগুলিতে। যতদূর মনে পড়ে, তখন আমরা চতুর্থ বা পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। পুজোর ছুটি আসছে, কী যেন একটা মহাপ্রাপ্তি সামনে। পুজোর আগে আগে স্কুল ছুটি হলে বাড়িতে ফিরে বই-খাতাগুলো রেখে কোনওরকম একটু কিছু মুখে দিয়েই সটান চলে যেতাম পূজো মণ্ডপগুলোতে। তখনও প্রতিমা গড়ার কাজ প্রাথমিক পর্যায়ে।

বাঁশ, খড়, সুতলি দিয়ে অবকাঠামো তৈরি হচ্ছে মাত্র। কোনও মণ্ডপে দুর্গা, কার্তিক, গণেশ-এর প্রাথমিক কাজটা হয়েছে আবার কোনও মণ্ডপে দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী পর্যন্ত। ঘুরে ঘুরে সব মণ্ডপে যেতাম কতদূর হল সেটা দেখার জন্যে, কবে খড়মাটির কাজ শেষ হয়, তারপর মাটির প্রলেপ এরপর রঙের কাজ তারপর পরিধান ও জরির কাজ ইত্যাদি।

বলে রাখা দরকার, আমার শৈশব-কৈশোর কেটেছে মহেশপুরে– তৎকালে যশোর জেলা, বর্তমানে ঝিনাইদহ জেলাধীন। এককালে এই মহেশপুরে ছিল বারো জমিদারের বাস। দেশবিভাগের ফলে তাদের সবাই বলতে গেলে চলে গিয়েছিলেন ভারতে। সেই সময়টায় এখানে দুর্গা পূজা কেমন হত তা মনে পড়ে না, তবে তারা চলে যাবার পর হিন্দু সম্প্রদায়ের যারা এ অঞ্চলে ছিলেন তাদের উদ্যেগে মহেশপুর শহরে অন্তত তিনটি মণ্ডপে দুর্গাপূজা হত। তার মধ্যে তপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলির (জমিদার পরিবার) বাড়ির পূজা, রাধাবল্লভ বাড়ির সার্বজনীন পূজা এবং মহেশপুর শহর থেকে একটু দূরে নাটিমা গ্রামের পূজা। শুধু ঠাকুর দেখা নয়। সেকালের পূজা মানে একটা রমরমা, চনমনে, হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার ছিল। যে উৎসব এবং অনুষ্ঠানগুলো আমরা দলবেধে মনপ্রাণ ভরে উপভোগ করতাম। আমাদের দলে আমিসহ নান্টু, সোহরাব, রবি, সাহিদ, বিশে, শ্যামল, নিরঞ্জন, পরিমলদা (আমাদের এক ক্লাস উপরে পড়তেন) আরও অনেকে ছিল, এই মুহূর্তে সবার নাম মনে পড়ছে না।

পুজোর অনুষ্ঠানগুলো ছিল বড়ই মনলোভা ও উপভোগ্য। তারমধ্যে 'মহালয়া' (দেবীর অকালবোধনের পূর্বলগ্ন) যেটা আমরা কম পেতাম, কেন-না রেডিও সে-সময় সবার বাড়িতে ছিল না। পরে অবশ্য পুনঃপ্রচারিত হলে শুনে নিতে পারতাম বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সেই দরাজ কণ্ঠের মন্ত্রপাঠ ও স্তুতি– মনে হয় এখনও কানে লেগে আছে। যদিও তার অনেকাংশই বুঝতাম না তবুও ওই যে সুরটা 'ইয়া দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণঃ....'।

এরপর ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এবং সর্বশেষ বিজয়া দশমী। প্রতিটা দিনের পূজা প্রক্রিয়া ও প্রকরণ ভিন্ন। সেটা কখনও কখনও দেখতাম কিন্তু লোভনীয় বিষয় ছিল এই একেক দিনের একেক শ্রেণীর খাবারের আয়োজনে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে হিন্দু প্রতিবেশীদের দাওয়াত বা নিমন্ত্রণ– লুচি, তরকারি, মোহন ভোগ, রসগোল্লা, সন্দেশ ইত্যাদি। তবে নবমীর রাতের খাওয়া ভালই হত, লুচির সঙ্গে মাংসও থাকত। বিজয়া দশমীর দিন মিষ্টি। বিসর্জনের দিনে সুরমা ঠাকুরানির কান্না এখনও মনে করিয়ে দেয় কতটা ভক্তি সহকারে তিনি পুজো করতেন। বিজয় দশমীর দিন মেলা বসত। জিলেপি, রসগোল্লা ও নানা মিষ্টান্ন বিক্রি হত। কাঠের পুতুল, ঘোড়া গাড়ি, কুলো, ভেপু বাঁশি, কাঠের পিঁড়ি, দা-বটি সব পাওয়া যেত এই মেলায়।

পুজোর ক'দিনে ঢাকের শব্দ তো থাকতই, তার সঙ্গে গভীর রাত পর্যন্ত মাইকে গান ভেসে আসত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, সনৎ সিংহ, অপরেশ লাহিড়ী প্রমুখ শিল্পীর গান। সেইসব গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তাম। উল্লেখ্য যে, এইসব গান-বাজনায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এতটুকু হানি হত না। আযান বা নামাজের সময় মাইক ও ঢাকের শব্দ বন্ধ রাখা হত বা নিম্নস্বরে বাজত।

পুজোর দিনগুলোতে আমাদের মহেশপুরের লোভনীয় বিষয় ছিল 'নাটক' ও 'যাত্রাপালা'। তপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলির বাড়ির সম্মুখভাগেই ছিল ছোট্ট একটি মাঠ। সেই মাঠে হত যাত্রাপালা। তবে বাইরে থেকে যাত্রাপার্টি এলে (যেমন অমলেন্দু বিশ্বাস-জ্যোৎস্না রানীর মত নামি-দামী শিল্পীরা) স্কুলের মাঠে যাত্রাপালা হত সারারাত ধরে। এদিকে রাধাবল্লভ বাড়িতে মঞ্চ তৈরি করে অভিনীত হত নাটক। সেই নাটকে স্থানীয় শিল্পীরা অভিনয় করতেন। এখানে হিন্দু-মুসলমান সব ধর্মের শিল্পীরা অভিনয় করতেন যদিও এদের কেউই পেশাদার শিল্পী

খড়মাটির কাজ শেষ হলে মাটির প্রলেপ, তারপর রঙের কাজ... তারপর পরিধান ও জরির কাজ...

ছিলেন না কিন্তু তাদের অভিনয়শৈলী ছিল অত্যন্ত চমৎকার। সেইসব শিল্পীদের কথা আমার আজও মনে পড়ে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অভিনেতা ও পরিচালক ছিলেন চৌধুরী আলী আকবর, শিবুপদ পাল, সামসুল হুদা, সন্তোষ দাঁ, মহিতোষ পাল প্রমুখ।

আমি তখন বেশ ছোট– তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র হব হয়তো। রাধাবল্লভ বাড়িতে 'টিপু সুলতান' নাটক অভিনীত হবে। আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সিরাজও অভিনয় করবেন। এ দৃশ্যের গল্প আমার ভাইয়ের কাছে শুনেছি এবং মহড়ার সময়ও কখনও কখনও উপস্থিত থেকেছি। যাহোক, আমি বায়না ধরলাম নাটক দেখতে যাব কিন্তু বাড়ি থেকে অনুমতি পেলাম না। আমি নাছোড়বান্দা। অনেক কান্নাকাটি করেও কোন লাভ হল না। সিদ্ধান্ত নিলাম নাটক তো শুরু হতে হতে রাত নয়-দশটা বাজবে, ততক্ষণে মা ঘুমিয়ে যাবে। আমি দরজা খুলে পালাব। ঠিক তাই করলাম রাত্রি দশটা সাড়ে দশটার দিকে মায়ের নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলাম। হারিকেনটা খুবই মিটি করে জ্বলছে। আমি আস্তে আস্তে উঠে অতি সন্তর্পণে দরজায় খিল খুলে বাইরে এসে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এক দৌড়ে চলে গেলাম রাধাবল্লভ বাড়ি। নাটক তখন অনেকদূর এগিয়ে গেছে। মেঝেতে ত্রিপল পাতা ছিল– বসলাম এক কোনায়। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য, ভাইয়ের সেই জুতো ছোড়ার দৃশ্যটা আর দেখতে পেলাম না। সে দৃশ্য নাকি আগেই পার হয়ে গেছে। যাহোক নাটক দেখে গভীর রাতে বাড়ি ফিরলাম। সে রাতে কপালে বেশ উত্তমমধ্যম জুটেছিল। রাতে ঘুমলাম। সকালে উঠলাম কিন্তু নাটকের দৃশ্যগুলো কিছুতেই মন ও মগজ থেকে সরছে না! টিপু সুলতান, মশিয়েল আলী, আর একজন ইংরেজ চরিত্র এদের অভিনয় মনের মধ্যে ভাসতে লাগল। ইংরেজের চরিত্রে যিনি অভিনয় করলেন তার নাম শিবুপদ পাল। পেশায় পানচাষী, পানের বরজে কাজ করেন। আমরা শিবুকাকা বলে ডাকতাম। ভদ্রলোক ছিলেন একেবারেই নিরক্ষর। রিহার্সেলের সময় প্রম্‌ফটার যা পড়ে শোনাতেন তা হুবহু মনে রাখতেন এবং চমৎকার অভিনয় করতেন। বড় হয়েও (যখন বিএ ক্লাসে পড়ি) তার অভিনয় দেখেছি। ভদ্রলোক প্রায় ছ'ফুট লম্বা, রঙ ফর্শা, দশাসই চেহারা। নবাব সিরাজুদ্দৌলা নাটকে ওয়ার্টস-এর ভূমিকায় অভিনয় করার সময় দর্শক হা করে তার অভিনয় দেখত। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, লেখা পড়া না জানলেও তার ইংরেজি উচ্চারণ শুনলে মনে হত খোদ ইংরেজের কণ্ঠ থেকেই শব্দগুলো বেরিয়ে আসছে।

আরেকজনের কথা উল্লেখ না করেই পারছি না– তিনি হলেন, চৌধুরী আলী আকবর। আমরা চৌধুরীচাচা বলে জানতাম। মহেশপুর পৌরসভার সেক্রেটারি পদে চাকরি করতেন। সুন্দরপুরের জমিদারবংশের ছেলে। সম্ভবত এন্ট্রান্স পাশ ছিলেন। যা হোক, তিনি ছিলেন নাট্য পরিচালক এবং অভিনেতা। মহেশপুর কমিউনিটি সেন্টারে একটা নাটকের মহড়া হচ্ছে। নাটকটির নাম মনে নেই তবে তারিখটা স্পষ্ট মনে আছে, ১৪ই নভেম্বর ১৯৬৪। আমি তখন নবম শ্রেণীর ছাত্র। ঐদিন সর্বপ্রথম মহেশপুরে টেলিফোন সংযোগ পেলে মহেশপুর থেকে কোটচাঁদপুর এক্সচেঞ্জ অফিসের সঙ্গে কথা বলে সন্ধ্যার দিকে চৌধুরীচাচা মহড়ায় এলেন। চেয়ারে বসে সিগারেট টানছেন আর মহড়া দেখছেন। তৎকালীন সময়ের মহেশপুর থানার ওসি আব্দুল লতিফ (পরবর্তীকালে ডিএসপি) সাহেব একটি চরিত্রে অভিনয় করছেন। দৃশ্যপটটা এমন যে, একজন গরীব অবসরপ্রাপ্ত কলেজের প্রফেসর মাঝে মাঝে নেশা-টেশা করেন। ভদ্রলোক এতটাই গরীব যে পরনের স্যুটটাতে তালি দিতে দিতে মূল কাপড় যে কোনটা তা বোঝা মুশকিল। রাত্রি গভীর। প্রফেসর সাহেব টল্‌তে টল্‌তে নিজ বাড়ির দরজায় টোকা দিয়ে বলছেন, শর্মিলী মা দরজা খুলে দে। শর্মিলী দরজা খুলে দিতেই ঘরে ঢুকে প্রফেসর সাহেব বলছেন, 'আলো জ্বেলে দে'। শর্মিলী উত্তরে বলল, 'বাবা তুমি জানো না বিদ্যুৎ বিল বাকি পড়ায় লাইন কেটে দিয়ে গেছে?' উত্তরে প্রফেসর জড়িত কণ্ঠে বললেন, 'কেন আমি রক্ত বিক্রি করেছি তা দিয়ে মদ খেয়েছি এবং তোর জন্যে নিয়ে এসেছি ব্রেড এন্ড মিল্ক। আলো জ্বেলে দে, মানি ইজ দা সুইচ অফ লাইভ'। কথাগুলো বলেই হা...হা...হা... করে একটা হাসি দেবেন। লতিফসাহেব পার্ট শেষ করলেন, চৌধুরীচাচা বললেন, হচ্ছে না! কিচ্ছু হচ্ছে না। বুঝছেন না কেন? আপনি এমন একটা চরিত্রে অভিনয় করছেন যিনি জীবনে ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত, তার ব্যর্থতার সেই প্রকাশ আপনার অভিনয়ে আসছে না, হাসিটা হচ্ছে না, বলেই চৌধুরীচাচা মঞ্চে উঠে ডায়ালগগুলো শেষ করেই একটা হা হা হা হাসি দিলেন এবং ওখানেই পড়ে গেলেন। ডাক্তার ডাকা হল, বললেন, 'হি ইজ নো মোর'।

এতসব গল্পের অবতারণা করলাম এই জন্যে যে, তৎকালীন সময়ে এইসব মানুষ সবাইকে নিয়ে একটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক নিয়ে একে-অপরের সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করতেন। এটা শুধু আমার অঞ্চলে নয়, গোটা বাংলাদেশেরই ছিল এটা ছাপচিত্র। এখনও যে নেই তা নয়, দু'একটা ঘটনা ছাড়া বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির কথা দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়। সেই সময় বাড়িতে-বাড়িতে বৈঠকী গানের আসর, ফুটবল প্রতিযোগিতা, নৌকা বাইচ, লাঠি খেলা, নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান– এগুলো আমাদের উদীপ্ত করত। একে অপরকে ভালবাসতে শেখাত। শুধু পুজোর সময়ই নয়, ঈদ, বড়দিন, মহররম এবং অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবেও সব সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রিত হত– প্রাণভরে উপভোগ করত সে-সব অনুষ্ঠান।

হীনতা, নীচতা, পঙ্কিলতা, ঔদ্ধত্য দমনে মা দুর্গা অসুরকে বধ করেছিলেন। একজন মুসলমান তার মনের কালিমা বিদ্বেষ পঙ্কিলতা ও পশুত্বকে দূর করার জন্যেই পশু কোরবানি দিয়ে খোদার নৈকট্যলাভের চেষ্টা করেন। হিন্দুরা নর-নারায়ণ আর মুসলমানেরা ইনসানিয়্যাৎ বা মানবতার কথা বলেন। বৌদ্ধরা বলেন, অহিংসা পরম ধর্ম। তেমনি করে খ্রিস্টান ইহুদি জৈন এবং সব ধর্মের মানুষেরই মূলমন্ত্র হচ্ছে মানবতা ও সৌভ্রাতৃত্ব। এই শারদীয়া আমাদের তথা গোটা মানবজাতিকে সুন্দর ও সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে অটুট রাখুক– এই কামনা।

শামস্ হক ব্যবহারজীবী, ছোটগল্পকার

উপন্যাস

চন্দ্রমুখী জানালা

ভজন সরকার

ক'দিন আগেই তো পূর্ণিমা গেল। বিছানা থেকে উঠে পুবদিকের জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন বাবা। এক তীব্র আলোতে তাঁর সারা শরীর যেন মুহূর্তেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। খুব ইচ্ছে হল এই জ্যোছনার জোয়ারে ভাসতে। হাতের ঘড়ির কাঁটায় তখন মধ্যরাত। জ্যোস্না উপভোগ করতে এই দুপুর রাতে বাইরে বেরোনো একটুও শোভন দেখাবে না এই অজানা জায়গায়।

জানালার ফাঁক গলে বাইরের ভুবন আলো-করা চাঁদের আলো গায়ে এসে পড়তে লাগলো। বাবা আর বাইরে বের হলেন না। চাঁদের আলোর উজ্জ্বলতা ছাপিয়ে মুহূর্তেই এক অজানা আশঙ্কা বাবার মনকে ভারী করে তুললো। বাবা ভাবতে লাগলেন, সদ্য স্বাধীন জয়বাংলা তবে কি আজকের এই চাঁদের আলো! যে আলো তার মত মানুষদের সারাজীবন চন্দ্রমুখী জানালা দিয়েই উপভোগ করতে হবে। কখনওই দুয়ার খুলে বাইরে বেরিয়ে স্বাধীনতার আলো গায়ে মাখতে পারবে না!

এক.

ত্রিশ বছর পরে

স্বাধীনতার এত বছর পরে পড়ন্ত বেলায় বাবাকে স্বাধীন জয়বাংলা ছেড়ে কেন যেতে হবে? এ প্রশ্নে উত্তর তাঁকে কেউ দিতে পারছে না।

বাবা কবে ভারত গিয়েছিলেন আমার মনে নেই। শুনেছি দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে একবার ইন্ডিয়া গিয়েছিলেন আমার মাতৃকুলের সবাইকে জানান দিতে যে, তিনি বেঁচে আছেন। পাকিস্তানি হানাদার কিংবা দেশীয় রাজাকারের হাতে তাঁর অপমৃত্যু হয়নি। এ কথা নাকি লোকমুখে সুদূর কলকাতাতেও চাওড় হয়ে গিয়েছিল যে, মানিকগঞ্জের এক অজ পাড়াগাঁয়ের বটগাছে পাকিস্তানি মিলিটারিরা এক জনকে ঝুলিয়ে রেখেছে। কালো চেহারার ছয় ফুট মানুষটির ক্ষতবিক্ষত দেহ প্রথমে গুলি করে ঝাঁঝরা করা হয়েছে। তারপর বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আরও বীভৎস করার চেষ্টা হলেও ঝুলিয়ে রাখা মানুষটিকে এলাকার সবাই চিনেছে। মৃত্যুর কথা যেমন হু হু বাতাসের বেগে চারিদিকে ছড়ায়, বাবার মৃত্যুসংবাদটিও তেমনি কলকাতা অব্দি ছড়িয়েছিল তখন।

এ মুক্তিযোদ্ধাটি নিজের জীবন বিপন্ন করে সদ্য জন্ম নেয়া তার কন্যা সন্তানকে দেখতেই নাকি রাতের অন্ধকারে গ্রামে এসেছিলেন। যদিও তাঁর জানা ছিল পাকিস্তানি মিলিটারি ও তাদের সহযোদ্ধা আল-বদর আল-শামসের এলাকায় আনাগোনা। তবুও বড় এক অপারেশনের আগে সদ্য ভূমিষ্ট হওয়া কন্যা সন্তানকে দেখার ইচ্ছে অবদমিত করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই বর্ষাকালের থই থই জল পেরিয়ে বিলাঞ্চলের গ্রামটিতে এসে তিনি নাকি তার কন্যা সন্তানটির দেখাও পেয়েছিলেন। মাত্র কয়েক সপ্তাহের শিশুটির মাথায় হাত রেখে তিনি বলেছিলেন, 'আর একটু পরে এলেই তো স্বাধীন একটি দেশে জন্ম নিতে পারতিস, পাকিস্তানে জন্ম নেবার কলঙ্ক মাথায় নিতে হত না তোকে।'

এটা থেকে ধরে নেওয়া যায়, নিহত মুক্তিযোদ্ধাটি আগস্ট কিংবা সেপ্টেম্বর মাসের কোনও এক রাতে তাঁর সন্তানকে দেখতে এসেছিলেন। কন্যা সন্তানটিকে দেখার কিছুক্ষণ পরেই তিনি বাড়ি থেকে বের হন এবং বিলের শেষ মাথায় রাজাকার ও পাকিস্তানি মিলিটারির প্রতিরোধের মুখে পড়ে আহত হন। পরে মৃত্যুবরণ করেন।

এ সংবাদটি কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছিল তখন। আমার ছোট বোনটির জন্মও সে বছরই আগস্ট মাসে। মায়ের সন্তান সম্ভাবনার কথা কলকাতার সবাই জানতেন। তাই আনন্দবাজারের সংবাদটি পড়ে বাবার মৃত্যুর ব্যাপারে আমার মামাবাড়ির সবাই নিশ্চিত হয়েছিলেন। আমার মায়ের আত্মীয়-স্বজনেরা গয়ায় গিয়ে নাকি পিণ্ড দানও করে এসেছিলেন বাবার আত্মার সদগতির উদ্দেশ্যে?

স্বাধীনতার মাস ক'য়েক পরে বাবা বেঁচে আছেন যে কথাটি জানানোর জন্যেই কলকাতা গিয়েছিলেন তখন। আমার দাদু বাবার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে গয়ায় গিয়ে যে পিণ্ডদান করেছিলেন, সে দানের দক্ষিণা ফেরত না-চাইলেও বাবার জন্য ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসেই নদীয়া জেলার তারকনগরের এক প্রতিষ্ঠিত হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাবার ধমনীতে তখন সদ্য-স্বাধীনতার রক্ত। বাবা নাকি আমার দাদুকে উল্টো প্রস্তাব দিয়েছিলেন, 'আপনিই বরং ফিরে চলুন। '৬৫-তে দাঙ্গার সময়ে ফেলে আসা পুরনো ঢাকার বনেদী পগোজ হাইস্কুলের সেকেন্ড মাস্টারের চাকরিটাই আপনাকে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা যাবে!'

'উদ্ধত ব্যবহারই বটে ছোকড়ার', স্বাধীনতার প্রায় তিন দশক পরে বুড়োর সঙ্গে দেখা হলে তিনি কলকাতার বাড়িতে বসে আমাকে একথা বলেছিলেন। আমি প্রতিবার যেমন হই এবারও বাবার দেশ প্রেমের চেতনায় গর্বিত হয়ে হেসেছিলাম। যদিও তখন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কিয়দংশমাত্র অবশিষ্ট ছিল।

সে বছর বাবা কলকাতা থেকে অনেক কিছু এনেছিলেন বাড়ির সবার জন্য। আমার জন্য এনেছিলেন ছোট্ট এক জোড়া পিওর লেদারের জুতো। যুদ্ধ চলাকালীন ৯ মাস না-দেখা আমি যে আর ছোটটি নেই, মুক্তিযোদ্ধা বাবা সেকথা বেমালুম ভুলে ছিলেন। তাই ছোট পিওর লেদারের জুতোজোড়া আমার আর পায়ে দেওয়া হয়নি কোনওদিন। প্রথম পাওয়া বিদেশী জিনিস ব্যবহার করতে না পারার সে আক্ষেপ এখনও আমার আছে।

একেবারেই শিশুর মাপে বানানো সুন্দর জুতা জোড়া আমি সযত্নে রেখেছি অনেকদিন। বাবার ব্রাশ নিয়ে বাবার মত করে পালিশ করে ঝকঝকে তকতকে করে জুতোজোড়াটিকে তাকে তুলে রেখেছি বহুদিন। জুতোজোড়া যেন তখন আমার কাছে না-দেখা কলকাতার প্রতিচ্ছবি। শিশু বয়সে শোনা মুক্তিযুদ্ধের অসংখ্য রোমাঞ্চকর কাহিনির মতই ওই জুতোজোড়াও তখন আমার এক শিহরিত সম্পদ। বাবা যখন বলতেন মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন একটি দেশের কথা, আমি তখন ভাবতাম আমার জীবনের প্রথম পাওয়া সে জুতোজোড়ার কথা। যদিও অর্জন আর পাওয়ার মধ্যে যে পার্থক্যটি আছে তা আমি তখনও বুঝিনি। দীর্ঘদিন পরে এসেও যে সঠিক বুঝেছি সেটাও বলা যাবে না।

কাকতালীয়ভাবেই ১৯৭৫-এর পরে বাবার কেনা সে ছোট্ট জুতোজোড়া আমি আর খুঁজে পাইনি। না, কোথাও পাইনি না! বাড়ির আনাচে কানাচে, উঠোনের খানাখন্দে, এমনকি মায়ের গয়নার বাক্সেও। কোথাও পাওয়া যায়নি এক মুক্তিযোদ্ধার কেনা এক জোড়া ছোট্ট পিওর লেদারের জুতো। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মত মুক্তিযোদ্ধার কেনা সে জুতোজোড়াও যেন হারিয়ে গিয়েছিল একই সময়ে। কিন্তু ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসের বাবার ভারতযাত্রার সে কথাকাহিনি আজও পুবের জানালা দিয়ে চাঁদের আলোর মত আমাকে উদ্ভাসিত করে।

দুই.

কলকাতার রিফিউজি

কলোনিতে বাবা কলকাতায় গেলেন স্বাধীনতার কয়েক মাস পরে। তখন সবে মাত্র ভারতীয় কংগ্রেস মার্চ মাসের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে। জাতীয় কংগ্রেস নেত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিশ্বস্ত এবং কেন্দ্রের শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্বপ্রাপ্ত সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে মুখ্যমন্ত্রী করা হয়েছে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে তেমন সিদ্ধহস্ত সেটা নয়। কিন্তু ভারতীয় কংগ্রেস বিশেষ করে ইন্দিরা গান্ধী চাইছিলেন, তাঁর আস্থাভাজন কেউ রাজ্যের সংকট মোকাবেলা করুক। রাজনৈতিক সমাধানের চেয়ে প্রশাসনিক সমাধানের দিকেই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জোর দিচ্ছিলেন বেশি। বিশেষত নকশাল আন্দোলন দমনের ক্ষেত্রে তো অবশ্যই।

১৯৬৭ সালের নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ

আসন লাভে ব্যর্থ হল। যদিও অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে বাংলা কংগ্রেসও সরকার গঠনের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেলো না। ফলে বামপন্থীদের সঙ্গে কোয়ালেশন গঠন করলো বাংলা কংগ্রেস। অজয় মুখার্জি হলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী।

বামপন্থীদের মধ্যেও দেখা দিলো প্রচণ্ড মতানৈক্য। কেউ কেউ যুক্তি দেখালেন, পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা মানেই সারা ভারতের ক্ষমতা নয়। কারো যুক্তি যেহেতু বামপন্থীদের সংগঠন পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও ত্রিপুরা, অন্ধপ্রদেশ, কেরালা, উড়িষ্যাসহ অন্যান্য রাজ্যে শক্তিশালী হচ্ছে তাই পশ্চিমবঙ্গের এ সাফল্যকে খাটো করে দেখা ঠিক হবে না। তাছাড়া সারা ভারতেই জাতীয় কংগ্রেস বুর্জোয়ানীতির কারণে খেটে খাওয়া কৃষক-শ্রমিকের জন্য তেমন কিছু করতে পারছে না। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বেও সংকট চলছে। জওহরলাল নেহরু ও লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু পরবর্তীসময়ে নেহরুকন্যা ইন্দিরা গান্ধী এখনও পরিপক্ক রাজনীতিবিদ হয়ে উঠতে পারেননি। তাই এ সুযোগ বামপন্থীদের হাতছাড়া করা উচিত হবে না।

এ যুক্তিতে বামপন্থীরা বাংলা কংগ্রেসের কাছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চাইলো। যদিও ভারতীয় সাংবিধানিক কাঠামোয় কিছু উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ণ ছাড়া রাজ্যের কাছে তেমন কোন ক্ষমতাও নেই। তবু বাংলা কংগ্রেস স্পর্শকাতর এ মন্ত্রণালয় দিতে রাজি হল না। পরবর্তীকালে উপ-মুখ্যমন্ত্রী নামে একটি নতুন পদবি সৃষ্টি করে বামদলগুলোর মোর্চাকে দেওয়া হল। পরিকল্পনাবিহীনভাবে ক্ষমতার এ রকম লোভ বামদলগুলোর একটি অংশ কিছুতেই মেনে নিতে পারলো না, বিশেষত মার্ক্সবাদী কমিউনিস্টদের একটি অংশ। কৃষক শ্রমিক এবং ভূমিহীন মানুষের পাশে থাকারই সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা রাজ্যক্ষমতার বাইরে থাকার সিদ্ধান্ত নিলো। সে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সংগঠিত করতে সভাসমিতির কাজ জোরদার করতে লাগলো।

এ অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি মহকুমার একটি থানা নকশালবাড়িতে ঘটে গেল প্রথম বিদ্রোহ। বেনামী জায়গা ভূমিহীন কৃষকের দখলে নিতে কৃষকেরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। স্থানীয় জোতদার এবং পুলিশও মরিয়া হয়ে শুরু করলো বন্দুক হাতে প্রতিরোধ। নিহত আহত মানুষের সংখ্যাও বেড়ে যেতে লাগলো। সেই সাথে বেদখল হতে লাগলো জোতদারের দখল করে রাখা ভূমি। ১৯৬৭ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে শুরু হওয়া এ বিস্ফোরণ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়লো। যেহেতু নকশালবাড়ি থেকেই এর সূত্রপাত, তাই সারা দেশে এ বিস্ফোরণ নকশাল আন্দোলন নামেই প্রচার পেলো।

১৯৬৭ সালে প্রথম ধাক্কাতা পেলো জাতীয় কংগ্রেস নির্বাচনে হেরে গিয়ে। যদিও দেশবিভাগের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে তাদেরই একচ্ছত্র আধিপত্য। কিন্তু '৬৭ সালেই প্রথম বোঝা গেল জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি বিশেষত দেশবিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু বাঙালিদের মোহভঙ্গ ঘটে গেছে।

কিন্তু পাকিস্তানকে ভেঙে দু'টুকরো করে দিতে সহায়তা এবং দু'কোটি শরণার্থীদের সমস্যার সমাধানের আশায় আবারও কংগ্রেসকে ভোট দিলেন তারা। ফলে যে বামপন্থী কম্যুনিষ্ট বিশেষত সিপিআই এবং সিপিআইএম আস্তে আস্তে উদ্বাস্তু-অধ্যুষিত শহর ও শহরতলীতে নিজেদের শক্ত ঘাঁটি গড়ে তুলছিল, সেখানেও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস জয়যুক্ত হল সে বারের নির্বাচনে।

অথচ '৪৭-এর দেশবিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্য থাকাই স্বাভাবিক ছিল। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, '৬০-এর দশকের শেষ অব্দি সে আনুগত্য অটুটও ছিল যথারীতি। কিন্তু '৫০ থেকে '৬০ দশকে ক্রমান্বয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলো। এ উদ্বাস্তুদের একশো শতাংশ আবার হিন্দু। পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক দাংগা এবং বাঙালীদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানীদের চরম বৈষম্য উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বাড়িয়েই দিল দিনের পর দিন। ফলে পূর্ববঙ্গে কংগ্রেসকে সমর্থন করলেও পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু হয়ে এসে অনেকেই দেখলেন কংগ্রেসের আচরণ তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল নয়। এ সুযোগই খুঁজছিল একদা অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি এবং পরবর্তীকালে সিপিআইএম এবং প্রধানত সিপিআই।

মূলত কংগ্রেসের প্রতি মোহভঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু কলোনিগুলিতে গঠিত হল ইউনাইটেড কাউন্সিল অফ রিফিউজি কলোনিজ বা ইউসিআরসি। ইউসিআরসি-র সাথে সংযুক্তদের অনেকেই পূর্ববঙ্গ থেকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত এবং রাজনৈতিকভাবেও সচতন। অথচ উদ্বাস্তু হওয়ার ফলে তাদেরকে শ্রমিকশ্রেনীর মত মানবেতর পেশা ও জীবন যাপন করতে হচ্ছে। ফলে এতদিন শ্রমিক শ্রেনীর মধ্যে শক্ত অবস্থান গড়তে ব্যর্থ কম্যুনিষ্টরা উদ্বাস্তুদের মধ্যে সাংগঠনিক শক্তি বাড়াতে শুরু করে দিল।

'৬৭-র নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেস এ উদ্বাস্তু কলোনিগুলোতে ভাল ফলাফল করতে পারলো না। অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে বাংলা কংগ্রেস ও কম্যুনিস্টদের যুক্তফ্রন্ট স্বল্প সংখ্যক মেজরিটি নিয়ে সরকার গঠন করলো।

অথচ ১৯৭২-এর নির্বাচনে ঘটলো তার বিপরীত। আবার জাতীয় কংগ্রেস ক্ষমতায় এলো মূলত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে সদ্য জন্ম নেয়া বাংলাদেশকে সহায়তা দান, দু'কোটি শরণার্থী সমস্যার সমাধান এবং নকশাল আন্দোলনের প্রতি জনবিমুখতার কারণেই। যদিও সাংগঠনিকভাবে পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের একচ্ছত্র আধিপত্যের সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ তো বটেই, পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাও তখন খুব সঙীন। এ অবস্থাতেই উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে বাবা কলকাতা এলেন। প্রথমে এসে উঠলেন কলকাতার উপকণ্ঠ দমদম বারাসাত এলাকার একটু ভদ্রোচিত উদ্বাস্তু কলোনিতে। বাবার বাল্যবন্ধু অমল মণ্ডল আগে থেকেই বাস করছিলেন সেখানে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে ইতিহাসে মাস্টার্স পাশ অমলকাকু ৬০-এর দশকের প্রথম দিকে ভাগ্যের সুপ্রসন্নতায় একটি কেরাণীর চাকরি জুটিয়ে নিয়েছিলেন। দমদমের একটা উদ্বাস্তু কলোনির ঘরে বাস করছিলেন একা একা বেশ স্বচ্ছলভাবেই। সেই সাথে যুক্ত হয়েছিলেন সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিকভাবেও কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে।

কিন্তু অমলকাকুর সবকিছু এলোমেলো করে দিলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। উদ্বাস্তু কলোনির এক কামরার ঘরে পূর্ব পাকিস্তান থেকে শরণার্থী হয়ে উঠে পড়লো মাসহ দুই ভাই ও তাদের পরিবার।

বাবা যখন তাঁর বাল্যবন্ধু অমলের বাসায় '৭২-এর এপ্রিল মাসে বেড়াতে এলেন, তখনও অমলকাকুর দুই ভাই সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেননি। যদিও বাংলাদেশের বয়স তখন ছয় মাস পেরিয়ে গেছে। ফেলে আসা ঘরবাড়ি-জমাজমি-ব্যবসায়-বাণিজ্য ফিরে পাবার এক অজানা আশঙ্কায় অনেক শরণার্থীর মত তারা তখনও রয়ে গেছেন পশ্চিমবঙ্গে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত ভূখণ্ডে যোগাযোগের অব্যবস্থা তো ছিলই, সেই সাথে

ছিল সমন্বয়হীন প্রশাসনিক উদ্যোগ। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের ছিল না শরণার্থীদের ফিরিয়ে এনে পূনর্বাসনের যথোপযুক্ত পরিকল্পনা ও ইচ্ছে। শরণার্থীদের অনেকেই নিজ উদ্যোগে ফিরে এসে প্রশাসনিক তেমন কোন সাহায্য সহায়তা পায়নি। অনেকেই ফিরে পায়নি যুদ্ধের সময় ফেলে যাওয়া সম্পদ-সম্পত্তিটুকুও। স্থানীয় রাজনৈতিক টাউটদের খপ্পরে পড়ে অনেকেই আবার আংশিক সম্পত্তি ফিরে পেয়েছেন; বাকি অর্ধেক চলে গেছে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে। যুদ্ধের নয় মাসের অধিকাংশ সময়েই অনেকে নিশ্চুপ ছিল। অনেকে আবার ভারতে পালিয়ে যাওয়া হিন্দুদের বাড়িঘর ও জমিজমা নিজেদের দখলে রেখেছিল এ ভরসায় যে, তারা আর কখনও ফিরে আসবে না এদেশে।

বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলে আবার হিন্দু বাড়ি দখল করে প্রথমেই একটি মসজিদ প্রতিষ্টা করা হয়েছিল। যদিও মানিকগঞ্জে তেমনটি করা সম্ভব ছিল না। কারণ, ঢাকার উপকণ্ঠে অবস্থানের জন্য মুক্তি ও মিত্রবাহিনির কাছে স্ট্যাটেজিকভাবেই এ অঞ্চলটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় থেকেই পাকিস্তানী বাহিনি এবং তাদের দোসর রাজাকারদের তেমন আনাগোনা দেখা যায়নি। এর ফলে দু'একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া হিন্দুদের বাড়িঘর-ব্যবসায়-বাণিজ্য অক্ষতই ছিল এ এলাকাতে।

এ রকম নানামুখী সংবাদে বিভ্রান্ত হয়ে অমল কাকুর ভাইয়েরা বাংলাদেশে ফিরে আসতে ভরসা পাচ্ছিলেন না তখনও। বাবার কাছে বিস্তারিত শুনে দু'দিন পরেই দুই ভাইকে পরিবারসহ বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিলেন অমল কাকু। অনেকদিন পরে যেন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা গেল।

কলকাতা তখন এক ভয়ের শহর। সদ্য ক্ষমতায় বসা জাতীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক নেতা ও কর্মীরা প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে নকশাল খতমে নেমেছে। অলিতে গলিতে পড়ে থাকছে লাশ। শ্রেণিশত্রু খতমের রাজনীতিওয়ালাদের থেতলানো লাশের ওপর দিয়ে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে ইন্দিরা কংগ্রেসের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের অভিযান তখন চলছে পুরোদমে। এক সময়ের উদ্বাস্তু আক্রান্ত কলকাতা তখন এক লাশের শহর। অমলকাকু তার ভাইদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়ে ছোটবেলার বন্ধুকে নিয়ে ত্রাসের শহর কলকাতা ঘুরে দেখাতে বের হলেন সেদিনই।

তিন.
খতম ও নকশাল

বনগাঁ থেকে শিয়ালদাগামী ট্রেনগুলোর কামরা এক রকম ফাঁকাই থাকে। অথচ শিয়ালদা থেকে বনগাঁর ট্রেনগুলো বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীতে ঠাসা। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পাকিস্তানী সেনাবাহিনি আত্মসমর্পণ করেছে। অথচ এখন এপ্রিলের প্রায় শেষ। এখনও শরণার্থীদের বাংলাদেশে ফিরে যাবার ঢল?

অমলকাকু ও বাবা বারাসাত থেকে প্রায় ফাঁকা কামরার একটা ট্রেনে চড়ে বসলেন। টিকেট কাটার ঝামেলা তেমন নেই। কারণ, শরণার্থীদের বিনেপয়সায় চলাচল করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যুদ্ধের প্রায় পুরো সময়টাতেই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শাসিত সরকার। তাই বিনেপয়সার ট্রেন ভ্রমণের সময় সিগারেটে হালকা করে সুখটান দিলেন দুইবন্ধু। পা ছড়িয়ে দখল করে বসলেন একদিকের সবক'টি আসন। ততক্ষণে বারাসাত ছেড়ে পরের স্টেশনে ট্রেন থেমেছে। উল্টো দিকের প্ল্যাটফরমে উপচে পড়া মানুষের ভিড় দেখে সহসা অমলকাকু বলে উঠলেন, 'এ কয়দিন তো ব্যস্ততার কারণে তোকে দেশের কথা জিজ্ঞেস করাই হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের কথা, কে কে বেঁচে আছে, কে মরে গেছে, কিছুই তো শোনা হল না। যদিও অনেক কিছু কানে এসেছে, কিন্তু কতটুকু সত্যি কে জানে? এই ধর না তোর কথাই। একদিন তোর এক আত্মীয়ের সাথে কলকাতায় দেখা। সে তো বলল, তুই নাকি মরে গেছিস?'

বাবা তখন প্ল্যাটফর্মের ওপার থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে বললেন, 'হ্যাঁ আমি তো সেটা শুনেই দেখা করতে এলাম। আর যুদ্ধের কথা কি আর চলতি পথে বলা যাবে? আছি তো বেশ কিছুদিন, আস্তে আস্তে শোনাবো। আর এ দু'দিন তোর কাছে বেশ কিছু লোকের আনাগোনা দেখলাম। উদ্বাস্তুদের নিয়ে কিছু পোস্টার আর বইও দেখলাম।'

'হ্যাঁ, তুই ঠিকই ধরেছিস। এখানে ইউনাইটেড কাউন্সিল অফ রিফিউজি কলোনিজ বা ইউসিআরসি নামে একটা সংগঠনের সাথে জড়িয়ে গেছি', অমলকাকু বললেন। 'দেখ না, বজ্জাত কংগ্রেস পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সাথে কী আচরণ করছে সেই নেহরুর সময় থেকেই। আসলে তো জানিস, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা ওরা তো আর্য। আর পূর্ববঙ্গের আমরা কোথাকার কোন চাষাভূসা অনার্য দ্রাবিড়। আর বেটা নেহরু তো ওদিকেরই লোক।'

অমল কাকু ব্যাগ থেকে ইউসিআরসি-র বই বের করে পাতার পর পাতা উল্টে একটি বড় চার্ট মেলে ধরলেন। অমলকাকু বললেন, 'এই দেখ। পশ্চিম আর পূর্ব্বংগের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের খতিয়ান। সংখ্যার হিসেবে পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুরা বেশি হলে কি হবে, পুনর্বাসনের দিক থেকে শতকরা দশ ভাগও এদিকে খরচ হয়নি। তারপর আবার এই পাকিস্তানযুদ্ধের শরণার্থী?'

অমল কাকুর ইউসিআরসি থেকে বের করা '৪৭-এর দেশ বিভাগের খতিয়ান পড়ে বাবা একটু অবাকই হলেন। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ ভাগ হল। হিন্দুদের দেশ ভারত। আর মুসলমানের দেশ পাকিস্তান। পাকিস্তান আবার দু'ভাগ। ভারতের পুবদিকে পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিমদিকে পশ্চিম পাকিস্তান। হিন্দু দুই পাকিস্তানেই পড়লো। পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের সবাই বাঙালি কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যারা ভারতে এলেন এদের অধিকাংশই পাঞ্জাবি, শিখ আর অবাঙালি।

অমলকাকুর কথার প্রতিধ্বনি দেখতে পেলেন বাবা বইয়ের পরিসংখ্যানে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু এসেছিল ৫২.১৪ লক্ষ এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৪৭.৪ লক্ষ। অথচ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগতদের জন্য ৯১ কোটি সরকারি অনুদান দিয়েছে, বাড়ি নির্মাণ করে দিয়েছে ২২১,০০০ মানুষকে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের কোনও সরকারী অনুদানই দেওয়া হয়নি, বাড়ি নির্মাণও করা হয়নি একটিও। প্রায় ৭০ হাজার একর জমি ও তিন লক্ষ শহরের বাড়ি, যা মুসলমানরা ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল, সেগুলোও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দুদের বরাদ্দ করা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি উদ্বাস্তুদের জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল দু'টো প্রকল্প আন্দামান ও দণ্ডকারণ্য। সেগুলোও কেন্দ্রীয় অসহযোগীতায় দায়সারাভাবে শেষ করে দোষ চাপানো হয়েছে বাংগালীদের অনিচ্ছাকে। এ তো গেল শুধু ক্ষতিপূরণের পরিসংখ্যান! প্রশাসনিক ও শিক্ষাক্ষেত্রেও পশ্চিম থেকে আগত উদ্বাস্তুরা সুযোগ সুবিধে পেয়েছেন অনেকে বেশি।

বাবার কাছে এ পরিসংখ্যানের প্রায় সবকিছুই অপরিচিত

লাগলো। নিজের কাছে একটু বেক্ষ্যাপ্পাই মনে হল অমলকে। তাছাড়া জওহরলাল নেহরু কিংবা কংগ্রেসের সম্বন্ধে এ সমস্ত নেতিবাচক কথার কোনও মানে আছে বলেও মনে হল না বাবার। নেহরু-কন্যা ইন্দিরার সাহায্য ছাড়া কি বাংলাদেশ এত সহজে স্বাধীন হত? কোটি কোটি শরণার্থীদের ভরণপোষণ ইন্দিরা গান্ধী আর কংগ্রেসের সাহায্য ছাড়া কি সম্ভব ছিল?

অমলকাকু বললেন, 'এই মাত্র তো দমদম ক্যান্টনমেন্ট ছাড়ালাম। এখন দুইদিকে দেখবি উদ্বাস্তুদের বস্তি। দেশভাগ হয়ে গেছে সেও আজ পঁচিশ বছর। অথচ কলকাতার যত কাছাকাছি যাবি পূর্ববঙ্গের বাংগালদের বস্তির সংখ্যাও তত বাড়বে। শিয়ালদা তো আরেক পূর্বপাকিস্তান। প্রথমে দেখলে কেউ কেউ ভাববে কলকাতাটাই শালা বাঙাল বাটিদের দখলে চলে গেছে। হারামি ঘটিরা সব হিন্দিঘেঁষা বিছুদ্ধ কথা কয়। ছিয়ালদাতে দাদাদের টিকিটা দেখতে পাবি না।' অমলের কথায় বিদ্রুপ আর শ্লেষ, 'অথচ দেখ এই হারামি নকশালরা সমাজতন্ত্র মারাচ্ছে জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে হারামি জোতদারদের মেরে। এত পারিস কলকাতা এসে দে শালা এই বড় বড় বিল্ডিং ভেংগে, দখল করে নে হারামি সুদখোর মাড়োয়ারীদের ব্যবসা। দেখবি পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আসা কোটিখানিক বাঙাল গামছা খুলে সমাজতন্ত্র কায়েম করতে নেমে পড়বে।'

বাবা লক্ষ্য করলেন অমল শেষের কথাগুলো একটু নিঁচু গলায় বললেন। তারপর চারদিকে তাকিয়ে বাবার কানের কাছে ফিস ফিস গলায় বললেন, 'নকশালের খতমবাজগুলো নাকি কলকাতাতেও সিঁধিয়ে গেছে? দেখি শালারা রাইটার্স ওড়াতে পারে কিনা?'

বাবা একটু ভড়কিয়ে গেলেন অমল কাকুর কথা শুনে। ইস্কুল জীবন থেকেই তো সমাজতন্ত্রের রাজনীতি করত অমল। '৬০-এর দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতির সাথেই যুক্ত থেকেছে। অমলের কাছ থেকেই বাবার প্রথম হাতেখড়ি বামপন্থি রাজনীতিতে। তারপর ইস্কুলে শিক্ষকতা শুরু করার পরেও গোপনে কম্যুনিস্ট পার্টির সাথেই যুক্ত ছিলেন। নকশাল আন্দোলন যখন পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের জেলাগুলোতে ছড়িয়ে গেল, বাবা তাঁর বামপন্থী বন্ধুদের সাথে সমান খুশী হয়েছিলেন। যদিও পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্বের কথা শোনা যাচ্ছিল, তবু বাবা ভেবেছিলেন অমল হয়তো নকশাল আন্দোলনকেই সমর্থন করছে। বন্ধু অমলের কথাতে বেশ হতাশ হলেন বাবা।

অমল হঠাৎ নিজে থেকে সাবধান হয়ে বললেন, 'চারদিকে কিন্তু খতমবাজদের খতম চলছে। কথা বার্তায় একটু সাবধান! আর পুলিশে ধরলে সোজা 'ঢাকাইয়া ভানু' মাইরা দিবি। কাদার মধ্যে পা হান্দাইয়া দিবি... যাচ্ছি খাচ্ছি বলে বিছুদ্ধ বাংলা কওনের কোন দরকার নাই, বুঝলি। তাইলে পুলিশ ভাববো, তুই শালা শরণার্থী, নকশাল না!'

প্রায় শূন্যকামরা অট্টহাসিতে ভরিয়ে তুললেন দুই বন্ধু। অনেকক্ষণ পর বাইরে তাকিয়ে দেখলেন ট্রেন ততক্ষণে উল্টোডাঙা ছাড়িয়ে কলকাতার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। অমলকাকু বললেন, 'আর একটু পরেই আমরা শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছে যাব।'

চার.
মুক্তিযুদ্ধ ছড়িয়ে গেল

সবখানে আষাঢ় মাস পর্যন্ত বেশ একটু স্বস্তিতেই কাটানো গেল। ঢাকাতে যুদ্ধ শুরু হল চৈত্রমাসের মাঝামাঝি। ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভাষণের পর থেকেই স্থানীয় আওয়ামী লিগ ও কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সংশ্লিষ্টদের প্রস্তুতি চলছিল। মার্চ মাসের শেষে ঢাকাতে রাতের আঁধারে ঢাকা শহরে সাধারণ মানুষের উপর নির্বিচারে গুলীবর্ষণ করা হয়েছে। অসংখ্য মানুষ মারা পড়েছে। জগন্নাথ হলসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে ছাত্রদের হত্যা করা হয়েছে। যে যেভাবে পারছে ঢাকা ছেড়ে গ্রামের দিকে চলে আসছে লক্ষলক্ষ মানুষ। সবাই যা ভেবেছিল, সেটিও হচ্ছে। সারা দেশে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়েছে। প্রথম দিকের মাসখানিক তো যুদ্ধের খবর গ্রামে আসতে আসতেই সময় কেটে গেছে। যদিও মুসলিম লিগের চেয়ারম্যান শওকত আলীর নেতৃত্বে আশপাশের কয়েক গ্রামে পাকিস্তান-রক্ষা কমিটি আর আলবদর গঠিত হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে করণীয় ঠিক করতে করতেই বোশেখ মাসের শেষ। মাঝে মধ্যে শুধু শওকত চেয়ারম্যান হিন্দু পাড়ায় লোক পাঠিয়ে খবর নেয় মুক্তিবাহিনি গঠিত হচ্ছে কিনা?

পুরো এলাকা জুড়েই চাষাবাদের জমি। মাঝে মধ্যে কিছু জমিতে আমন কিংবা আউশ ধান। বাকি মাঠ জুড়ে পাটের চাষ। জ্যৈষ্ঠ মাস শুরু হতেই পাট বড় হতে থাকে। ঘন বিস্তৃত পাট ক্ষেত এক গ্রামকে অন্য গ্রাম থেকে আলাদা করে রাখে। গ্রামের রাস্তা থেকে পাট ক্ষেতের ভিতর ঢুকে পড়লে কারও পক্ষে সম্ভব নয় খুঁজে বের করা। তাই মুক্তিবাহিনির ছেলেরা পাটের ভিতর দিয়ে অনায়াসে দিন দুপুরেই এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে চলে যায়। পাট ক্ষেতের ভিতর বসেই অনেকে শলা পরামর্শ করে। কখনও কখনও রেডিও শোনে।

মানিকগঞ্জ মহকুমা শহর। যোগাযোগ শুধু নৌকা আর পায়ে হাঁটার পথ। পার্শ্ববর্তী থানা দু'টোও এলাকা থেকে বেশ দূরে। তাই অনায়াসেই পাকিস্তানী মিলিটারী আসার খবর জানা যায়। তাছাড়া মুক্তিবাহিনি ইতিমধ্যেই সন্দেহভাজন মুসলিম লিগারদের পেছনে টিকটিকি লাগিয়ে রেখেছে।

শওকত চেয়ারম্যানই একমাত্র লোক যে মহকুমা সদর থেকে পাকিস্তানী মিলিটারিদের ডেকে আনতে পারে, এ আশঙ্কা থেকেই একদিন বাড়িতে মিটিং হল। শওকত চেয়ারম্যানকে ভয় দেখাতে হবে; যাতে করে পাকিস্তানী মিলিটারি আনার সাহস না পায়। মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত হল যে করেই হোক উলাইল ইউনিয়ন বোর্ডের অফিসে দিনে দুপুরে একটি পটকা ফাটানো হবে। এতে এক ঢিলে দুই পাখি মরবে। শওকত চেয়ারম্যান যেমন ভয় পাবে, ইদানিং সৃষ্টি হওয়া রাজাকারেরাও একটু দমে থাকবে।

উলাইল বোর্ড অফিসটি দৌলতপুর থানা সদর থেকে পাঁচ মাইল দূরে, একেবারে থানা সংযোগ সড়কের পাশে অবস্থিত। তিন দিকে সড়ক আর সামনের দিকে ফাঁকা মাঠ। বোর্ড অফিসের দক্ষিণ দিকের প্রায় এক মাইল দূরের গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত সে ফাঁকা মাঠে আবাদি জমি। জ্যৈষ্ঠ মাসের অর্ধেক সময় পেরিয়ে গেছে। পাট গাছ বড় হয়ে প্রায় দেড়-দু'মানুষ সমান লম্বা। তাই পাট ক্ষেতের ভিতর দিয়েই অপারেশন করতে হবে মিটিংয়ে সে রকমই সিদ্ধান্ত।

সেদিন বুধবার। চেয়ারম্যান তখন অফিসে। সাপ্তাহিক মিটিং বসেছে ইউনিয়ন বোর্ডে। মেম্বার আর মুসলিম লিগের চ্যালা চামুণ্ডারা শওকত চেয়ারম্যানের চারপাশে বসে আছে। হঠাৎ বিকট শব্দে একটা পটকা ফুটলো। কিছুক্ষণ পরপর আরও কয়েকটি। মিটিং রুমের সামনে টুলের উপর বসে ছিল আনিচ চৌকিদার। লাঠি হাতে এদিক-ওদিক দৌড়াদুড়ি শুরু করে দিলো আনিচ। শওকত চেয়ারম্যান সম্ভাব্য বিপদ আঁচ করে ক্ষিতিশ মেম্বারকে বাইরে পাঠিয়ে ঘরের

খিল আটকিয়ে দিলো। ততক্ষণে মুখে গামছা জড়িয়ে কয়েকজন ছেলে সামনের পাটের ক্ষেতে নেমে গেছে। উঁচু সড়ক থেকে দেখা যাচ্ছে পাট গাছ ভেঙে ভেঙে ওরা দূরে চলে যাচ্ছে। আনিচ চৌকিদার লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে জোরে হাঁক দিচ্ছে, 'শালারা মুক্তিবাহিনি, শালারা মালাউনের বাচ্চা।'

সন্ধেবেলায় শওকত চেয়ারম্যান এলাকার কয়েকজনকে নিয়ে গ্রামে এলেন। বাড়ির উঠোনে কাঠের চেয়ার, বেঞ্চি আর চটের বস্তা পেতে সবাই বসেছে। চেয়ারম্যানের গলার সুর নরম। দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায়, ভয় পেয়েছেন। মিটিংয়ে সবাইকে তিনি আশ্বস্ত করলেন, এ এলাকায় পাকিস্তানী মিলিটারি আসবে না। কিন্তু মুক্তিবাহিনিকেও কথা দিতে হবে আর বোমাবাজি না করার।

সদ্য গঠিত মুক্তিবাহিনির কমান্ডার কমরেড হাকিম উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। তিনি সম্মতি দিলেন। বললেন, 'শওকত ভাই, এ এলাকাটাতো আমাদের তাই না। আমরা খামোখা কেন বোমাবাজি করতে যাবো? কিন্তু আপনাকেও কথা দিতে হবে আশপাশের হিন্দু গ্রামগুলোতে যেন কোন অত্যাচার না হয়।

পাশ থেকে বাবা বললেন, 'ওপাশের পাড়া থেকে কালু নাকি রাতবিরেতে হিন্দুপাড়ায় এসে পাকিস্তানী মিলিটারির ভয় দেখায়। কাল রাতেই নাকি দিনেশকে ইন্ডিয়ায় পাঠিয়ে দেয়ারও হুমকি দিয়েছে।'

কমরেড হাকিমউদ্দিন বললেন, 'ওকে আজ থেকে সাবধান করে দেবেন শওকতভাই। শেখ সাবের ডাকে আমরা যুদ্ধ করছি। খালি হিন্দুরাই কি পাকিস্তানীদের তাড়াতে চায়? মুসলমানরা চায় না? আপনি চান না?'

বলেই তিনি শওকত চেয়ারম্যানের দিকে তাকালেন। কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে আছেন চেয়ারম্যান।

কমান্ডার হাকিমউদ্দিন আবার বলা শুরু করলেন, 'হিন্দুদের দোষটা কোথায়? কালুর সাহস থাকে তো ওকে কলিয়ার মুসলিম পাড়ায় পাঠাবেন। ও যদি আর হিন্দুদের ভয়-ভীতি দেখায় সে দায়িত্ব কিন্তু আপনাকে নিতে হবে। এলাকায় এটা আর চলবে না। আপনি আজই কালুকে ডেকে সাবধান করে দেবেন।'

কথাটি শওকত চেয়ারম্যানের ভাল লেগেছে বলে মনে হল না। কিন্তু ভয় আর শঙ্কায় কিছু না বলেই মিটিং শেষ করলেন সে রাতের মত।

সেদিনের মিটিংয়ের পর থেকে হিন্দু গ্রামগুলোতে মুসলিম লিগের লোকজনের আনাগোনা কমে গেল। কিন্তু সবার মধ্যে একটা চাপা ভয় ও আশঙ্কা তো থেকেই গেল। গ্রামে কিংবা বাড়িতে থাকলে একটু স্বস্তিতে থাকা যায়। কেউ হাট-বাজারে গেলে বাড়িতে না-ফেরা পর্যন্ত সবাই আতঙ্কে থাকে। কখন কাকে ধরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলে!

এভাবেই আষাঢ় মাস এসে গেল। চারিদিকে আউশ আর জলি ধান কাটার ধুম। সেবার নতুন জল একটু তাড়াতাড়িই চলে এলো। মাত্র দিন দু'য়েকের ব্যবধানেই গ্রামগুলো যেন এক একটা দ্বীপ। মাত্র সপ্তাহ দু'য়েক আগেই মাঠ ভরা ছিল পাটে। এখন আর কোথাও পাট গাছ নেই। বড় বড় আঁটি বেধে পাট পচানোর কাজ চলছে। নতুন আসা বর্ষার জলে বড় বড় বাঁশের সাথে পাটের আঁটিগুলো আটকিয়ে কচুরিপানা কিংবা কলাগাছ দিয়ে পাট ডুবিয়ে রাখা হয়েছে জলের নিচে। মাসখানেক পরেই বাঁশের মাচা বানিয়ে জলের ওপরেই পাটের আঁশ ছাড়ানো হবে। তারপর আঁশ ও পাটখড়ি দু'টোই বাড়িতে কিংবা উঁচু সড়কে এনে রোদে শুকানো হবে। উঁচু সড়কের দু'পাশ দিয়ে মাইলের পর মাইল বাঁশ টাঙিয়ে পাটখড়ি শুকানোর এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য।

বর্ষার জল আর্থিক স্বচ্ছলতা নিয়ে এলেও আরেক বিপদ নিয়ে এলো। নৌকা করে সহজেই গ্রামগুলোতে যাতায়াত করা যায়। লুকানোর জায়গাও আর থাকলো না বললেই চলে। হঠাৎ করেই এক বিকেলে পাশের গ্রামে বাবার বন্ধু অমল কাকুদের বাড়িতে বিরাট এক ঘাসি নৌকা করে কিছু রাজাকার এসে লুটপাট করে চলে গেল। অমলকাকু তো আগেই ইন্ডিয়া চলে গেছেন। বাড়িতে দুই ভাই তখন থানা সদরের কাপড়ের দোকানে। বউ ছেলেমেয়ে আর মা বাড়িতে শুধু। পেছনের নিমাই বিল দিয়ে এক বড় ঘাসি নৌকা করে জনাদ'শেক লোক এসে বাড়ির সোনা-দানা-ধান-চাল নিয়ে ভেগে গেছে। যাওয়ার সময় নাকি শাসিয়ে গেছে এ কথা মুক্তিবাহিনিকে বললে থানা সদরের দোকান থেকে দুই ভাইকে পাকিস্তানী মিলিটারির কাছে ধরিয়ে দেবে।

সবাই তো থ। এলাকায় এ রকম একটা ঘটনার আঁচ আগে থেকে কেউ করেনি। বর্ষার জন্য মুক্তিবাহিনির অনেক ছেলেরা একটু উঁচু এলাকায় চলে গেছে। অনেকেই ট্রেনিংয়ের জন্য বর্ডার পাড়ি দিয়ে চলে গেছে ভারতে। বাবাসহ যারা তখনও এলাকায় তারা কিছু বুঝে ওঠার আগেই এ ঘটনা ঘটে গেল।

এলাকার মুক্তিবাহিনির কমান্ডার হাকিমউদ্দিনও তখন এলাকা ছেড়ে ভারতে। মানিকগঞ্জ সদরে হালিম ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে একটা গ্রুপ যুদ্ধ করছে। পাশের থানা ঘিওরেও কমান্ডার মনসুরসহ আরও কয়েকটি গ্রুপ সক্রিয়। টাঙ্গাইলে কাদেরিয়াবাহিনির কথা মাঝেমাঝে শোনা যায়। কিন্তু কেউ চারিদিকের থই থই জল পেরিয়ে এ বিল এলাকায় অপারেশনে আসবে না। তাছাড়া পাকিস্তানি মিলিটারিরা যে জলে ভয় পায় তখন সবাই এ সংবাদ জেনে গেছে। তাই বড় কোনও অপারেশনের ঝুঁকি এ সমস্ত এলাকায় নেই জেনে মুক্তিবাহিনির টার্গেট তখন থানা আর মহকুমা শহর।

শওকত চেয়ারম্যানের প্রতিশ্রুতি আর কাজে আসবে না ভেবে আশপাশের হিন্দু গ্রামগুলোতে উৎকণ্ঠা। আর সে সুযোগেই কালু রাজাকারের বাড়বাড়ন্ত। দু'দিন পরেই পাশের আরেকটা হিন্দু বাড়িতে লুটপাট হল। অথচ মাস খানিক আগেই এলাকা ছিল একেবারে নিরাপদ। এখন মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামঘেঁষা পাড়াগুলোতে রাত নামার সাথে সাথেই এক অজানা আতঙ্ক নেমে আসে। অনেকে আবার যুবতী মেয়েদের আরও একটু ভিতরে হিন্দু এলাকার কোনও আত্মীয় বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছে। কিছুদিন পরেই শোনা গেল রাতের অন্ধকারে কয়েকটি পরিবার পালিয়ে ভারতে চলে গেছে। গুজব এমন সংক্রামক যে, তিলকে তাল করে ফেলে। মাসখানিকের মধ্যেই পাশাপাশি তিন-চারটে হিন্দু গ্রামে এক ভয়ের রাজত্ব চেপে বসলো।

অনেকদিন পরে বাড়িতে গোপন মিটিং। যে করেই হোক এর একটা সমাধান করতে হবে। সিদ্ধান্ত হল এখনই কোন অপারেশনে যাওয়া যাবে না। শওকত চেয়ারম্যানের মাধ্যমেই সবাইকে আবারও আশ্বস্ত করতে হবে। ভারতে পালিয়ে যাওয়ার যে হিড়িক পড়ে গেছে সেটা আগে বন্ধ করতে হবে। তারপর না হয় সুযোগ বুঝে করা যাবে নতুন করে অপারেশন! আপাতত সিদ্ধান্ত সে-রকমই।

পাঁচ.
পাকিস্তানী মিলিটারির টার্গেট হিন্দুসমাজ

আষাঢ় মাসেই আরও কয়েকটি হত্যাযজ্ঞ ঘটালো পাকিস্তানী

মিলিটারি। ততদিনে মহকুমা সদর থেকে থানা পর্যায়ে পাকিস্তানী মিলিটারি চলে এসেছে। সে সুযোগে স্থানীয় চেয়ারম্যান মেম্বারেরা ইউনিয়নে ইউনিয়নে শান্তি ও পাকিস্তান রক্ষার নামে পিস কমিটি গঠন করছে। শান্তি রক্ষা তো নামে মাত্র। পিস কমিটির সদস্যদের প্রধান কাজই হল পাকিস্তানী মিলিটারির নামে হিন্দু এলাকায় ভয়ভীতি দেখিয়ে জমি-বাড়ি, টাকা-পয়সা লুটপাট করা।

ঘিওর থানা সদরের রথযাত্রা উৎসব মানিকগঞ্জ মহকুমায় খুব বিখ্যাত। ধামরাইয়ের পরেই ঘিওরের রথযাত্রা। এলাকায় প্রচলিত আছে যে, বালিয়াটির জমিদার ঢাকা জেলার সব এলাকা থেকে শতাধিক কাঠমিস্ত্রী ডেকে এনে এক বছরেরও অধিক সময় ধরে ধামরাইয়ের রথ তৈরি করান। ৬০ ফুট উঁচু, ৪৫ ফুট চওড়া তিন তলা বিশিষ্ট বিশাল এ রথে ৩২টি বিশাল বিশাল কাঠের চাকা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলার চতুষ্কোণে সুসজ্জিত কামরা বা নবরত্ন। রথের সামনে ও চারপাশে কাঠে খোদাই করা দেবদেবীর চিত্র। ধামরাইয়ের প্রায় সব রাস্তায় তখন এ রথ টানা হত। আর ভক্তরা রাস্তার দুই দিকে দাঁড়িয়ে উলুধ্বনির সাথে সাথে বাতাসা-কলা-চাল ছিটিয়ে দিত।

ধামরাইয়ের রথ আগে ছিল বাঁশের তৈরি। কাঠের এই নতুন রথ উদ্বোধনের সময় বালিয়াটির জমিদারবাহাদূর এলাকার ব্রাহ্মণ ও আশপাশের জমিদারদের নিমন্ত্রণ করলেন। নিমন্ত্রণের ত্রুটির জন্য তেরশ্রীর জমিদার কালীনারায়ণ রায়চৌধুরী ক্ষুব্ধ হয়ে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন। পরের বছরই তেরশ্রীর কাছে ঘিওরের থানা সদরে আরেকটি জগন্নাথের রথ তৈরি করালেন। সীমিত অর্থের জন্য তিনি ধামরাইয়ের রথকে অতিক্রম করতে তো পারলেনই না; এমনকি ঘিওরের রথ উচ্চতা ও আয়তনে ধামরাই রথের সমানও হল না। কিন্তু তিনি ধামরাই রথযাত্রার দিনেই ঘিওরের রথের চাকাও টানাতেন, যেন তার প্রজারা ধামরাই রথ দর্শনে না যেতে পারে।

সেবার রথ যাত্রার দিন সন্ধ্যাবেলায় পাকিস্তানী মিলিটারি ঘিওর বাজারের হিন্দুদের দোকানপাটে হামলা করলো। সাহা পট্টি পুড়িয়ে দিলো। দূর-দূরান্ত থেকে রথ যাত্রায় আগত পুণ্যার্থীরা কোন রকমে পালিয়ে বাঁচল। কিন্তু পরের দিন ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে পাকিস্তানী মিলিটারি ও রাজাকারদের নৃশংসতার খবর জেনে সবাই শিহরিত। ঘিওরের সাহা পট্টিতে আগুন দিয়ে ফেরার পথে রাজাকার-আলবদরের লোকেরা নিতাই সাহাসহ আরও কয়েকজনকে ধরে নিয়ে পাকিস্তানী মিলিটারির হাতে তুলে দেয়। পরে থানার সামনে খালপাড়ে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে এরকম দশজনকে হত্যা করলো।

ঘিওর থানা সদর থেকে বিশ-পঁচিশটি পরিবার আশ্রয় নিল আমাদের বিল এলাকার গ্রামগুলোতে। সবাই তখন এক ভয়ানক আতঙ্কে। থানা সদরে পাকিস্তানী মিলিটারি আসবে এটা অনেকেই বিশ্বাস করেনি। তাই একরকম স্বস্তির সঙ্গেই সবাই বাস করছিল। শুধু রাজাকার ও শান্তিরক্ষা কমিটির লোকদের থেকে একটু সাবধানে চলা ফেরা। কিন্তু ঘিওরে পাকিস্তানী মিলিটারি এট্যাকের খবরে মুক্তিবাহিনিও হতচকিত হয়ে গেছে। ক্যাপ্টেন হালিম ও কমান্ডার মনসুরের নেতৃত্বে মানিকগঞ্জ সদরের উপকণ্ঠে তরাঘাটে একটা ব্যর্থ অপারেশন হয়েছে। বাবা সবার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু কমান্ডার হাকিমউদ্দিন তথা বাবার প্রিয় হাকিমভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। যে সীমিত অস্ত্র ও স্বল্প প্রশিক্ষণ তাতে থানা সদরে পাকিস্তানী মিলিটারির সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। তাই শওকত চেয়ারম্যান ও রাজাকার কালুকে চোখে চোখে রাখাই এলাকার মুক্তিবাহিনির কাজ।

একদিন সন্ধ্যায় বাবা ফিরলেন ইস্কুল থেকে। ক্লাশ নেই, ছাত্র ছাত্রীরাও কেউ ইস্কুলে যায় না। তবুও ইস্কুলে যাবার নাম করে বাবা তাঁর ইস্কুলে সদ্য নিয়োগ পাওয়া অনিল শিকদারকে নিয়ে নৌকা করে সকালে বের হোন। যদিও একজন মাইনে করে রাখা আছে সারা বর্ষাকালের জন্য। প্রতিদিন নৌকা চালিয়ে বাবাকে ইস্কুলে নিয়ে যাওয়াই তার কাজ। মফস্বলে শিক্ষকতায় এক ধরণের বনেদিপনা থাকে। ইস্কুল কলেজের শিক্ষকেরা তাই কেউ নৌকা চালিয়ে কোথাও যান না। সমূহ বিপদে পড়লেও না। একাএকা কখনও কখনও নৌকা বাওয়া যায় কিন্তু কাউকে নৌকায় যাত্রী হিসেবে বসিয়ে নৌকা চালালে সেটা বিরাট এক অসম্মানজনক কাজ। কিন্তু এ যুদ্ধের দিনে জীবন বাঁচানোই আগে জরুরি। তাই অনিল শিকদারকে ডিঙি নৌকার পেছনের গলুইয়ে বৈঠা দিয়ে বসিয়ে বাবা সামনের গলুইয়ে আরেক বৈঠা নিয়ে প্রতিদিন সকালে বের হয়ে যান।

পূর্বপাশে আমাদের গ্রাম লাগোয়া একটি গ্রাম। জুগিন্দা। শওকত চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে মুসলিম লিগের শক্ত ঘাঁটি আগে থেকেই সে গ্রামটিতে। জুগিন্দার পাশ দিয়েই একটি খাল চলে গিয়ে নিমাই বিলে পড়েছে। প্রায় আধা মাইল প্রস্থ নিমাই বিলটি পার হলেই আরেকটি গ্রাম। প্রায় চার পাঁচ হাজার লোকের বাস সেখানে। মুসলমান প্রধান এ গ্রামটিই মুক্তিবাহিনির ঘাঁটি। এ গ্রামের পরেই তেরশ্রীর জমিদার বাড়ি। বাবার কর্ম ও আড্ডার স্থল সেখানেই।

সেদিন সন্ধ্যায় বাড়িতে ফিরেই থমথমে মেজাজ বাবার। ঘটনা বোঝা গেল আরেকটু রাত বাড়লে। বাড়ির সামনে বৈঠক ঘর। সেখানে গোল হয়ে বসে বিবিসি ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শোনে প্রতিরাতে পাড়ার অনেকেই। সেই সঙ্গে আকাশবাণীর সংবাদ দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায় আর নীলিমা স্যান্নালের কণ্ঠের সংবাদ শুনতেও আগ্রহ সবার। সেদিন রাতে বিবিসি ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শোনা বন্ধ। গলার স্বরও সবার নিচু।

অনিল মাস্টার শুরু করলেন, 'কালুর এত বড় সাহস, দাদাকে সে বলেছে, স্যার আর কতদিন এ দেশে থাকবেন? এবার ইন্ডিয়া কেটে পড়েন'।

দাদা মানে বাবাকে ইন্ডিয়া যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে কালু রাজাকার। বাবাও নাকি কালুকে আচ্ছামত ধমক দিয়ে শাসিয়ে এসেছেন। বলেছেন, 'তুই নিজের পথ দেখ কালু। আমার পথ তোকে বাতলে দিতে হবে না।'

কালু রাজাকার নাকি রাগে গরগর করতে করতে চলে গেছে। সবার মনে আশঙ্কা কালু যে কোন অঘটন ঘটাতে পারে এ পাড়ায়। সমূহ বিপদের প্রস্তুতির জন্যই সেদিনে রাতে বসা। অনেকে পরামর্শ দিলো পাড়ার বউদের ছেলেমেয়েসহ অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিতে। কেউ কেউ মুক্তিবাহিনির প্রতি হতাশ হয়ে বলল, 'আর এ দেশে থাকা যাবে না। চলো আপাতত ইন্ডিয়া কিংবা কোনও মুসলিম বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেই'। মন্টু পাশ থেকে বললো, 'সব রসুনের গোড়া এক। পাশের গ্রাম বহেরাতলির সবাইতো শেখ মুজিবের আওয়ামী লিগ করে। ওদের কিন্তু রাজাকারেরা কিছু বলে না। আমরা হিন্দুদেররই যত দোষ। দেশটা স্বাধীন হলে মনে হয় এ দেশে শুধু হিন্দুরাই থাকবো। ওরা মুসলমানেরা সব পাকিস্তানে চলে যাবে। কাকা, আপনি আর মুক্তিবাহিনি মুক্তিবাহিনি করবেন না তো? টিকিটি দেখছি না মুক্তিবাহিনির। ব্যাটারা ইন্ডিয়া গেছে ট্রেনিং নিতে। এদিকে আমরা মরে ভুত হয়ে যাই তারপর ওনারা আসবেন। আমি

আর ইউনিয়ন বোর্ডে পটকা-ফটকা ফাটাতে পারব না, কাকা। আমি বলে দিলাম স্পষ্ট করে।'

সবাই বাবার দিকে তাকিয়ে। ভাবছিলেন বাবা মন্টুকে একটা জোরে ধমক লাগাবেন। বাবা চুপ করে থাকলেন। বললেন, 'কী করা যায় এখন? শওকত ভাই আসলে কোন কথাই রাখছেন না। কালু মনে হয় মিলিটারি না হলেও রাজাকার নিয়ে আসবে দু একদিনের মধ্যেই। রাতে রাতে গ্রামে পাহারা বসাতে হবে। মিলিটারি কিংবা রাজাকার আসলেও যেন কেউ কেউ পালিয়ে বাঁচতে পারে। আর আমি বহেরাতলিতে আমার যারা যারা ছাত্র আছে সবাইকে বলে রাখি, যদি ওরা কয়েকটা দিন আমাদের গ্রামে নজর রাখতে পারে'।

অনিলমাস্টার একটু ফোড়ন কাটল বাবার কথায়, 'শিয়ালের কাছে মুরগি জমা রাখার মত কথা বললেন দাদা'।

'এটার মানে কী দাঁড়াল অনিল?', বাবা বললেন।

অনিলমাস্টার একটু সাহসে ভর করে বলে, 'রথযাত্রার দিন ঘিওরের ম্যাসাকারের পর অখিলঠাকুরের পরিবার নিরাপদ ভেবে মজিদ মাস্টারের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। দু'সপ্তাহ যেতেই মজিদমাস্টার ঘরে জোয়ান বউ আর ছেলেমেয়ে থাকতেও অখিলঠাকুরের কলেজে পড়া বোনকে প্রথমে ইজ্জতহরণ করে পরে জোর করে বিয়ে করেছে, সে খবর জানেন?'

মন্টু অনিলের কথায় একটু জোর পেল, 'অখিলঠাকুরের বোনকেই শুধু বিয়ে করে নাই, অখিলঠাকুরের বউ-মাসহ পুরো পরিবারকে মুসলমান বানিয়েছে। কাকা, আর যাই করেন, ওদের আর বিশ্বাস নেই।'

এবার বাবা ধমক লাগালেন মন্টুকে, 'তোদের কথায় মনে হচ্ছে মুসলমান সবাই খারাপ, তাই না? সব মুসলমান খারাপ হলে শেখ মুজিবও খারাপ? কমান্ডার হাকিমভাই, আফসারস্যার সবাই খারাপ? এই যে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ করে মরে যাচ্ছে, ওদের কয়জন আর হিন্দু। সবাই তো মুসলমান। এবার বল ওদের সবাই খারাপ। সবাই মজিদমাস্টারের মত বদমাইশ। কালুর মত সবাই হলে তো এই চার মাসে হিন্দু পাড়া আর থাকত না, সবাই মেরে কেটে লুট-পাট করে নিয়ে যেত।'

অনিলমাস্টার মন্টুর কথায় সায় দিয়ে বললো, 'কিন্তু দাদা এই পুরো মানিকগঞ্জে শুনেছেন একটাও মুসলমান বাড়ি লুট হয়েছে? একটাও মুসলমানের দোকান পুড়িয়ে দিয়েছে? একজন মুসলমানকেও পাকিস্তানী মিলিটারি বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছে? মুক্তিযুদ্ধও করছে অধিকাংশ মুসলমান, দেশ স্বাধীন হলেও মুসলমানের দেশই তো হবে এটা। খামাখা আমাদের উপর অত্যাচার কেন? এর চেয়ে আমাদের ইন্ডিয়াতে সরকারিভাবে পাঠিয়ে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।'

বাবা বললেন, 'অনিল তুমি শেষে যা বললে, এটাই তো পশ্চিম পাকিস্তান সরকার চাচ্ছে। সেই সঙ্গে তাল মেলাচ্ছেন পূর্ব-পাকিস্তানের কিছু মুসলিম লিগার। শেখ মুজিব, আওয়ামী লিগ আর মস্কোপন্থী বামপার্টিগুলো পাকিস্তানের এ চক্রান্ত মানবে না বলেই তো এ যুদ্ধ। আমরা তো এদেশেরই মানুষ। ইন্ডিয়াতে যাব কোন্ দুঃখে? গেলে তো '৪৭-এর দেশ বিভাগের সময়েই যেতাম। দেশ ছেড়ে কোথাও যাব না। আর সে জন্যই আমাদের মুক্তিবাহিনির সাথে থাকতে হবে।'

বাবার উচ্চকণ্ঠে ভিতর বাড়ি থেকে মা, জেঠীমা সবাই বাইরের উঠোনে চলে এসেছে। মাকে দেখে বাবা বললেন, 'তুমি আবার উঠে এসেছ কেন? ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকো।'

ছয়.

মৃত্যুরও তর সয় না যুদ্ধকালে

মা তখন সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা। দেশে যুদ্ধ চলছে। বর্ষাকাল। যোগাযোগ ব্যবস্থার বেহাল অবস্থা। বিপদে আপদে হাসপাতাল কিংবা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া খুব কঠিন। গ্রামের হোমিওপ্যাথ জিতেন ডাক্তারই অগত্যার ভরসা। কিংবা তেরশ্রীর এলএমএফ ডাক্তার লোকমান হাকিম। তাছাড়া ঠাকুমায়েরও অগাধ সাহস এবং অভিজ্ঞতা। বাবাসহ নয় সন্তানের জন্ম দিয়েছেন ঠাকুমা। তারপরে সাত-সাতটি ছেলের বউদের সন্তান তো হচ্ছেই বাড়িতে প্রতি বছরই দু'একজন করে। বাবা তাই তাঁর মা ও বৌদিদের উপর ভরসা করেই একরকম নির্ভাবনায় থাকেন। রাতে ঘুমের সময় একবার হয়ত জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো? ডাক্তার লোকমানভাইকে একবার নৌকা পাঠিয়ে নিয়ে আসি?'

মা সারাদিন কাটিয়ে দেন বই পড়ে আর রেডিও শুনে। অসুবিধে থাকলেও মুখ বুজে সব সহ্য করেন। বাবার কথার উত্তরে বলেন, 'না, দিদিরা তো আছে। তাছাড়া মাকেও মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করি খারাপ লাগলে।'

একান্নবর্তী পরিবার। ছেলেমেয়েসহ মোট ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জনের খাবারের যোগাড়আত্তি করতে হয় প্রতিবেলা। এক জেঠিমার ভাই তার দু'জন সোমত্ত মেয়েকে নিরাপদ ভেবে পাঠিয়ে দিয়েছে এখানে। বাবার এক চিরকুমার কাকা তখন মরণাপন্ন। তাছাড়া একান্নবর্তী পরিবারের নানাবিধ সাংসারিক জটিলতা তো আছেই। সেবার আউশ ও পাটের ফলনও হয়েছিল খুব ভাল। যুদ্ধের ফলে জ্যাঠামশাইদের ব্যবসায়ের টানটান অবস্থা জমিতে ভাল ফলনের জন্য পুষিয়ে গেল। তাই অন্যান্য বছর বর্ষাকালে সংসার নির্বাহের যে চিন্তা থাকে এবারে সেটা আর নেই। জলেও মাছ পাওয়া যাচ্ছে প্রচুর। বাড়ির সামনের খালে প্রতি বছরের মত সেবারও কার্তিক হালদার ভেসাল জাল দিয়েছে। প্রতিদিন বিকেলেই বাড়ি যাওয়ার আগে বাড়িতে একটু থামে আর জেঠাদের বলে, 'দাদা, এবার এত মাছ ভগবান দিয়েছে যে ভাবতে পারিনা। এবার মাছের দাম একটু কম। কিন্ত যে মাছ পাচ্ছি, সেটাতে দাম পুষিয়ে যাচ্ছে।

নৌকার তলা দেখিয়ে বলে, 'মাঝে মাঝে এমন একটা ঝাঁক আসে যে, পা দিয়ে ঠেলে জাল উপরে ওঠাতে পারি না। আর মাছের এত তেল আগে কখনও দেখিনি, দাদা। থাকবেই না কেন, ধলেশ্বরী দিয়ে তো কলাগাছের মত মানুষের লাশ ভেসে যায়। মরা মানুষের চর্বি আর পচা লাশ খেয়ে খেয়ে মাছের যে বিশাল সাইজ এবার!

শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহে বাবার ছোট কাকা, মানে ছোট দাদু মারা গেলেন। ছোট বেলায় রোগে পা দু'টো শুকিয়ে কাঠির মত হয়ে গিয়েছিল ছোটদাদুর। সারাজীবন লাঠির উপর ভর দিয়েই চলাফেরা করে গেলেন। বিয়ে-থা করলেন না। ভাতিজাদের সংসারেই সারাটা জীবন কাটিয়ে দিলেন। বাড়ির দক্ষিণ দিকে নারকেল আর কড়ুই গাছের মাঝখানে জলের পুরনো টিউবওয়েল। টিউবওয়েলের গা লাগোয়া বৈঠক ঘর, যাকে কাছারি ঘর বলে সবাই। সে বিশাল কাছারী ঘরের এক পাশে ছোট দাদুর ঘর। শেষদিকে আর চলাফেরা বিশেষ করতে পারতেন না। ধরে ধরে পায়খানা-প্রস্রাব করাতে হোত। মুখে তুলে খাইয়ে দিতে হোত। বিছানার পাশে থাকা

লাঠিটাই এক সময়ে সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিল ছোট দাদুর। একদিন সকালে সব কিছুর মায়া ত্যাগ করে চলে গেলেন।

চারদিকে থমথমে অবস্থা। সকাল-সন্ধ্যা-রাত সব সময় এক উৎকণ্ঠায় কাটে। সবার চোখ প্রায় সময়েই থাকে দক্ষিণ দিকে। নিমাই বিলে কোনও বড় নৌকা দেখলেই সবাই ভয়ে আঁতকে ওঠে। এই বুঝি পাকিস্তানী মিলিটারিকে গ্রামে নিয়ে এলো রাজাকারেরা। বর্ষা এসেছে মাত্র মাসখানেকের বেশি হল। তাই লঞ্চ নিয়ে এখনও মিলিটারি আসবে না; যদি লঞ্চের প্রোপেলার কোন কিছুতে আটকে যায় সে ভয়ে? তাই ভয় শুধু বড় বড় ছইওয়ালা নৌকায়।

ছোটদাদুর মৃত্যুতে বাড়িতে সবাই শোকে মূহ্যমান কিন্তু কান্নার রোল নেই। অনেকে আবার হাঁফ ছাড়লেন এ ভেবে যে, বাড়িতে মিলিটারি আগুন দিলে সবাই পালাতে পারলেও ছোট দাদু কোথায় যাবেন? তাকে হয়তো বা ঘরের মধ্যেই পুড়ে মরতে হত। তার চেয়ে ভগবান নিজ হাতে নিয়ে নিলেন সেটাই ভাল হল!

ছোটদাদুর মরদেহ নিয়ে মুশকিলে পড়া গেল। গ্রামের শ্মশানটা জলে প্রায় তলিয়ে গেছে। একটু ঠিবির মত জায়গা তখনও জেগে আছে। কিন্তু যুদ্ধের এ অবস্থায় ছোট দাদুকে সৎকার করতে কেউ সাহসী হল না। চিতার আগুন যদি পাকিস্তানী মিলিটারিকে হিন্দুগ্রাম চিনিয়ে দেয়?

বাবা মৃদু আপত্তি করলেন, 'পাকিস্তানী মিলিটারি কী আর চিতার আগুন দেখে চিনবে কোনটা হিন্দু গ্রাম? শুনেছি শওকত চেয়ারম্যান থানায় গিয়ে হিন্দু গ্রামগুলোর নাম-ঠিকানা দিয়ে এসেছে। কোন্ বাড়ির ছেলেরা মুক্তিবাহিনিতে গেছে, কোন্ বাড়িতে যুবতী বউ-ঝি আছে সব তথ্য এখন থানায়। যাই হোক, তোমরা পুড়াতে না চাইলে, না পুড়াবে। তবে কাকার মৃতদেহকে তো কোথাও পুঁতে রাখতে হবে?'

বড় জেঠামশাই বললেন, 'নৌকা করে ধলেশ্বরীতে নামিয়ে রেখে আসি কাকাকে। গঙ্গামার শরীরেই বিলীন হয়ে থাকুক।'

পাটের চটের বস্তায় বড় একটা মশলা বাটার পাথরের পাটা ভরে লম্বা গলুইওয়ালা ছিপ নৌকায় তোলা হল। শাস্ত্রমতে বাড়ির ঘাটে বড় জেঠা মুখাগ্নি করলেন ছোটদাদুর। তারপর চাঁটাই দিয়ে মুড়িয়ে নৌকার পাটাতনের নীচে লম্বা করে শুইয়ে দেওয়া হল। উপরে কাঠের পাটাতন বিছিয়ে কয়েকটা পাটের গাঁইটও তোলা হল। যেন সবাই ভাবে, বেপারী নৌকা তরা হাটে যাচ্ছে পাট বেচতে। ছোট দাদুর মৃতদেহ ধলেশ্বরী নদীতে চটের বস্তার সঙ্গে বেঁধে নামিয়ে দেওয়া হল স্রোত দেখে মাঝ নদীতে। মরদেহ জলে নামানোর আগে মাথার দিকটা পূর্বদিক করে প্রথমে জলের সমান্তরাল করে রাখা হল। তারপর ভারি চটের বস্তাটা জলের মধ্যে ছেড়ে দিল মন্টু। বাঁশের চাটাইয়ে জড়ানো ছোটদাদুর দেহ ধলেশ্বরীর জলে সোজা তলিয়ে গেল। বাঁশের চাটাই থেকে কয়েকটা জলের বুদবুদ উঠে ঢেউয়ের সঙ্গে মিলিয়ে গেল নিমিষেই।

মেঝজ্যেঠা তার আদরের কাকাকে মাঝ নদীতে ছেড়ে দেওয়ার সময় হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। বাকি সবাই ক্ষীণস্বরে 'হরিবোল হরিবোল, বলো হরি, বলো হরি' করতে করতে নৌকা গ্রামের দিকে নিয়ে এলো। প্রায় নিরবেই ছোটদাদুর অস্তিত্ব সংসার থেকে নেই হয়ে গেল সেদিন। পাড়ার কিছু মানুষ ছাড়া গ্রামের অধিকাংশ মানুষই জানলোই না, বাড়ির ল্যাংড়া-খোড়া সে বুড়োটা আর নেই।

সাত.

বাড়িতে পাকবাহিনি এলো

ত্রিশ দিনের অশৌচ পালন করা হল বৈশ্য মতে। ছোট দাদু ছেলের মত ভালবাসতেন মেঝজ্যেঠাকে। তাই তিনিই ছেলের মত নিয়ম মেনে অশৌচ পালন করতে চাইলেন। পারিবারিক ব্রাহ্মণ বললেন যেহেতু বড়জ্যেঠা মুখাগ্নি করেছেন, তাই বড়জ্যেঠাকেই এক কাপড়ে একমাস ছেলের ব্রত পালন করতে হবে। মেঝজ্যেঠার মন খারাপ। কিন্তু মন খারাপের সময় নেই এ যুদ্ধের খারাপ সময়ে। বড়জ্যেঠা আর বড়জ্যেঠিমাই ছোটদাদুর ছেলে আর ছেলে-বউয়ের নিয়মে শাস্ত্র মেনে মৃতের আত্মার সদগতির জন্য সদাকর্ম করতে লাগলেন।

বাড়ির সবার জন্য অল্প তেলে নিরামিষ রান্না হলেও মায়ের জন্য আলাদা রান্না হয় অনেকের অগোচরেই। মায়ের প্রসবের তখন আর মাস দেড়েক বাকি। তাই বড়মা অর্থ্যাৎ সেজো জেঠিমা বাবার সঙ্গে যুক্তি করে মায়ের জন্য আমিষের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। কার্তিক জেলের কাছ থেকে গোপনে মাছ চলে আসত বড়মার কাছে। দুপুরে সবাই যখন বাড়ির অন্য কাজে ব্যস্ত, বড়মা তখন পাশের বাড়ি থেকে মাছের ঝোল রেঁধে নিয়ে আসেন মায়ের জন্য।

মা একবার মৃদু আপত্তি করলে বড়মা ধমকে উঠে বললেন, 'ওই মেয়ে, তুই সন্তানের মর্ম বুঝবি কি করে লো? তোর তো দু'বছর পর পর বাচ্চা হচ্ছে; হতিস আমার মত বাঝা তখন বুঝতিস? বিশ বছরে এই পেটে একটা সন্তানও ধরতে পারিনি। আমি বুঝি সন্তান পেটে ধরা কী জিনিস। যে গেছে তার জন্য শোক না করে, যে আসবে তার জন্য ব্যবস্থা কর।'

বাবার বয়স যখন পাঁচ বছর তখন বড়মা সংসারে আসেন। বড়মারই বা কত বয়স তখন? বড়জোর বারো তেরো হবে। তারপর থেকে নিঃসন্তান বড়মা সন্তান হিসেবে মানুষ করেছেন বাবাকে। বিয়ের পর এ সংসারে এলে বড়মাই মাকে আগলে রেখেছে কখনও বড় দিদি, কখনও বা মায়ের মমতায়। মায়ের প্রথম সন্তান হওয়ার মাস দুয়েকের মধ্যেই মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা, দু'মাসের সে শিশু সন্তানকে নিয়ে মহকুমা শহরে গিয়ে পরীক্ষা দেয়া সেও তো সম্ভব ছিল বড়মার জন্যই। তার বছর দেড়েকের মধ্যেই আরেক কন্যা সন্তান। কিন্তু বড়মাই মায়ের লেখাপড়ায় বন্ধ করতে দেননি। বাড়িতে পড়েই মা তখন ইন্টারমিডিয়েটে প্রথম শ্রেণি পান প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে। সব কিছুরই পেছনে বড়মা। বাবাও বড়মার কথার বাইরে কিছুই করেন না। তাছাড়া সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে অনেক রাতে বাড়ি ফেরার অভ্যেস বাবার। এখন তো ইস্কুলে যাওয়ার কথা বলে সারাদিন মুক্তিবাহিনিতে রিক্রুট করা নিয়েই সারা এলাকা ঘুরে বেড়ান। বড়মার ভয় সেখানেই। বারবার বাবাকে বলছেন, 'শোন তুই ইন্ডিয়া চলে যা। তোর শ্বশুরবাড়িতে কিছুদিন থেকে আয়। ছোট বউয়ের দায়িত্ব আমি নেব।

বাবা জানেন বড়মাকে কোন কথায় বশে আনা যাবে। বাবা বলেন, 'ঠিক আছে বৌদি, তুমি যখন বলছ ইন্ডিয়াতেই যাই। কিন্তু ছেলে আর স্ত্রীকেও নিয়ে যাবো সঙ্গে। ওদের রেখে আমি যেতে পারবো না।

বড়মা এবার পিছু হটেন। ছেলেকে অর্থাৎ আমাকে সারাক্ষণ বুকে-পিঠে করে রাখেন বড়মা। চোখের দূরে আমাকে নিয়ে যাবে শুনে বড়মা আঁতকে ওঠেন। কথা ঘুরিয়ে বলেন, 'বালাই-ষাট! আমাদের এ বিল এলাকায় মিলিটারি আসবে কোন সাহসে? শুনেছি ওই খানসেনারা নাকি সাঁতারই জানে না? ওদের জীবনের মায়া আছে না?

কিন্তু তার এক সপ্তাহ পরেই বড়মার কথা মিথ্যে প্রমাণিত হল। সকাল গড়িয়ে সবেমাত্র দুপুর। বাবার সেদিন বেরোতে একটু দেরী হয়েছে। উত্তর দিকের বাঁশের ঝাড়ের কাছে রান্না ঘর আমাদের। বাবাসহ কয়েকজন রান্না ঘরের বারান্দায় কাঠের পিঁড়ি পেতে দুপুরের ভাত খাচ্ছেন। হঠাৎ করে কেউ একজন চিৎকার করে উঠলো, 'নিমাই বিলের মাঝ দিয়ে দৌলতপুর থানা থেকে দুই নৌকা মিলিটারি নাকি পূর্বদিকে অর্থাৎ আমাদের গ্রামের দিকে আসছে।'

কোথায় রইল ভাতের থালা? কোথায় খাবার-দাবার? সবাই যে যার মত বাবাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। সবাই জানে গ্রামে মিলিটারি আসলে এ বাড়িতেই আসবে এবং টার্গেট বাবা। কয়েকদিন আগেই কালু রাজাকারের সঙ্গে বাবার কথা কাটাকাটি হয়েছে। বাবা নির্বিকার রইলেন। আস্তে করে হাতটা ধুঁয়ে বললেন, 'কেউ চিৎকার-চেঁচামেচি করবে না। আমি আগে দেখি আসলেই মিলিটারির নৌকা কিনা?'

বাবা ভিতর বাড়ি থেকে বাইরের উঠোনে এলেন। তারপর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের কড়ুই গাছের নিচে ধানের খড়ের পালার আড়াল থেকে দেখলেন, দু'টো বড় বড় ছইওয়ালা নৌকা গ্রামের পশ্চিম-দক্ষিণ দিকের বটগাছের পাশ দিয়ে দেখা যাচ্ছে। নৌকার সাইজ ও ছইয়ের ওপর মানুষজনের নড়াচড়া দেখে বুঝলেন এগুলো পাকিস্তানী মিলিটারির নৌকা।

বাবা বড়মাকে বললেন, 'বৌদি তুমি ছেলে আর ছোট বউকে নিয়ে বহেরাতলির মুসলিম পাড়ায় চলে যাও। আর বাড়ির মেয়ে আর অন্য বউদেরকেও পারলে অন্য কোথাও পালাতে বলো। মনে হয় রাজাকারের পাকিস্তানী মিলিটারি নিয়েই আসছে এদিকে।'

বড়মা বললেন, 'তুই কী করবি? তোরই তো আগে পালানো উচিত। তুইও চল আমাদের সাথে।'

বাবা বললেন, 'আমি তো আর একা মিলিটারির সাথে লড়তে পারবো না। তাছাড়া এ বাড়িতে আমরা যত লোকজন অস্ত্র ছাড়া হয়তো কেউ ঢুকতে পারবে না। কিন্তু লাঠি নিয়ে তো আর অস্ত্রের সাথে যুদ্ধ করা যাবে না। তাছাড়া বর্ষার দিন, পালানোর জায়গাও নেই। তাক করে করে গুলি করবে ওরা। তাই আমাকেও পালাতে হবে। তবে তুমি আগে যাও ছোট বউকে আর ছেলেকে নিয়ে।'

বাবা অন্য সবার মত মাকে ছোটবউ বলতেন সবার সামনে। মাকে ডেকে বললেন, 'পুবদিকের ঘাটে ছোট ডিঙি নৌকাটা আছে। তুমি ছেলেকে নিয়ে তাড়াতাড়ি মুসলিম পাড়ায় যাও। বৌদি আর ভাস্তেদের কাউকে সাথে নিও নৌকা তো চালাতে হবে। দেরি করো না, তাড়াতাড়ি কর।'

মা কিছু বলতে চাচ্ছিলেন। বাবার ধমকে মায়ের সে কথাটা আর স্পষ্ট করে বলা হল না। বড়মা আমাকে কোলে নিয়ে মায়ের হাত ধরে পুবদিকের নৌকা ঘাটের দিকে দৌড় দিলেন।

নৌকায় ওঠার পর মায়ের মনে হল মেয়েকে তো আনা হয়নি? আমার দু'বছরের বোন হয়তো কোন জেঠাতো বোনের কোলে ছিল। ওকে নিয়েই হয়তো জেঠাতো বোনটি আমাদের বিরাট বাড়ির কোন ঝোপজংগলে কিংবা ঘরের মধ্যে পালিয়েছে। মা তাঁর দু'বছরের মেয়েকে রেখে পালাতে হচ্ছে বলে কেঁদে উঠলেন।

ছোট ডিঙি নৌকায় তখন আমি, মা, বড়মা আর নয়-দশ বছরের আরেক জেঠাতো ভাই বীরেন। কে নৌকা চালাবে? নৌকা সোজা করেই বা রাখবে কে? এত সব কিছুই মনে না করে বাবা তখন ঘাট থেকে নৌকা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়ে নিজে বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন। আমি বড়মাকে জোরে জড়িয়ে ধওে 'বাবা, বাবা' বলে কেঁদে উঠলাম। বড়মা আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে নৌকার মাঝখানের গুঁড়ার কাঠের মধ্যে জোর করে বসিয়ে দিল। বড়মা বীরেনকে একটা বৈঠা দিয়ে বললো, বাবা, তুই পেছনের গলুইয়ে গিয়ে নাও সোজা করে রাখতে পারবি না? নয়-দশ বছরের বীরেন তখনই বৈঠা চালাতে শিখে গেছে। বীরেন তাড়াতাড়ি পেছনের গলুইয়ে গিয়ে বৈঠা নামালো। বড়মা আরেকটা বৈঠা নিয়ে সামনের গলুইয়ে গিয়ে সামনের দিকে বৈঠা দিয়ে জল কাটতে শুরু করে দিলেন। মা আমার পাশে বসে অসহায়ের মত বাড়ির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমাদের বাড়িটি গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে। তার পাশ দিয়েই একটি ছোট খাল গিয়ে মিশেছে নিমাই বিলে। খাল দিয়ে সিকি মাইলের মত গেলেই আরেকটি মুসলিম পাড়া। জুগিন্দা। খালের গা-লাগোয়াই রহিমুদ্দিন খলিফার বাড়ি। রহিমুদ্দিন চাচার কাছে লুঙ্গি সেলাই থেকে শুরু করে ছোট খাঁটো জামা-কাপড় বানায় সবাই। আমাদের বাবা-জেঠাদের সঙ্গেও রহিমুদ্দিন চাচা ও চাচীর ভাল সম্পর্ক। সে কথা চিন্তা করেই বড়মা বীরেনকে বললেন, 'নৌকা খলিফা বাড়ির দিকে ধরে রাখ।

খালের জলে তখন তেমন স্রোত নেই। কিছু কচুরিপানার থে াকথোক ঝাঁক নৌকাকে মাঝে মাঝে থামিয়ে দিচ্ছে। বড়মা তার অনভ্যস্ত হাতে যত জোরে পারেন নৌকা সামনের দিকে চালাচ্ছেন। পেছন থেকে বীরেন বারবার বলে উঠছে, 'জেঠি আর পারি না তো!'

'আর একটু সোজা করে রাখ বাবা। এই তো একটু গেলেই খলিফা বাড়ি।'

বীরেন তার ছোট্ট হাতের দক্ষতায় বৈঠা দিয়ে জল কেটে কেটে বড়মাকে সাহায্য করছে। মা এক হাতে আমাকে, অন্য হাতে তলপেট শক্ত করে ধরে আছেন।

নৌকা রহিমুদ্দিন খলিফার বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেছে তখন। হঠাৎ দেখা গেল রহিমুদ্দিন চাচার ছেলে বাঁশের বড় একটা লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘাটে নৌকা ভিড়ানোর আগেই জোরে জোরে বলছে, 'মালাউনের কোন জায়গা নেই আমাদের বাড়িতে। যা অন্য বাড়িতে যা।'

বড়মা বলছে, 'দিলু তোরা এই বিপদের দিনে এমন করছিস কেন? আমাদের একটু আশ্রয় দে, মিলিটারি গেলেই তো আমরা চলে যাবো। ও বুজি, তুমি দিলুরে একটু থামাও না।'

বুজি অর্থাৎ রহিমুদ্দিন খলিফার বউ বড়মার কথা না শোনার ভাণ করে অন্য দিকে সরে গেল। দিলু জলের আরও কাছাকাছি নেমে এসে লাঠি দিয়ে জলে আঘাত করতে লাগলো। একেবারে ঘাটের কাছাকাছি নৌকা চলে এসেছে দেখে দিলু আরও চিৎকার করে বলতে লাগলো, 'নাও ঘাটে ভিড়ালে কিন্তু লাঠি দিয়ে মাথায় মারবো, মালাউনের বাচ্চারা।'

বীরেন দিলুর লাঠি দেখে ভয় পেয়ে হাতের বৈঠা ছেড়ে দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগলো। মা পেটে হাত দিয়ে ব্যথায় কঁকিয়ে উঠলো। বড়মাকে বললো, 'দিদি চল বাড়ির দিকে যাই। আমি আর পারছি না।'

বীরেনের হাতে আর নৌকার হাল নেই। বড়মার শত কাকুতি মিনতিতেও দিলুদের মন একটুও নরম হল না। রহিমুদ্দিন চাচা কিংবা তার স্ত্রীকেও আর বাড়িতে দেখা গেল না। কিছুতেই নৌকা রহিমুদ্দিন খলিফার ঘাটে ভিড়ানো গেল না। নৌকা তখন খাল পেরিয়ে প্রায় নিমাই বিলের মুখে চলে এসেছে। মায়ের চিৎকারে আমি আর বীরেন

হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগলাম। বড়মা আবার শক্ত হাতে সবকিছু সামলানোর চেষ্টা করলেন। বীরেনকে আবার বললেন, 'বাবা, আর একটু সময় নৌকাটা সোজা করে রাখ। মাত্র একটু তো বিল। পাড়ি দিলেই বহেরাতলী। নুরুদের বাড়ি ওই দেখা যাচ্ছে। ধর একটু বাবা।'

বীরেন আবার নৌকায় তুলে রাখা বৈঠা জলে নামালো। বড়মা সামনে দিকে নৌকা চালাতে লাগলেন। আধামাইলের মত নিমাই বিল তখন যেন এক মহাসমুদ্র। এদিক দিয়েই তো মিলিটারির নৌকা আসবে। তাই যত তাড়াতাড়ি বিলের ওদিকে ধান খেতের কাছে পৌঁছতেই হবে।

অনেক কষ্টে নিমাই বিল পাড়ি দিয়ে ওপারে যেতেই দেখা গেল বহেরাতলী থেকে কয়েকজন একটা নৌকা নিয়ে এদিকে আসছে। বড়মা একটু সাহসে বুক বাঁধলেন। কিছুক্ষণ পরে নৌকাটা কাছে আসতে দেখা গেল নুরু আর আরশাদ কয়েকজনকে নিয়ে এগিয়ে আসছে। নুরু আরেকজনকে নিয়ে আমাদের নৌকায় এসে সজোরে বৈঠা চালিয়ে বহেরাতলীর তমিজদের বাড়িতে নৌকা ভিড়ালো। বড়মা মাকে হাতে ধরে নৌকা থেকে নামাতেই বড়মার গলা ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন মা। ততক্ষণে তমিজের বউ মাকে ধরে বাড়ির উঠোনে বসিয়েছে। তমিজদের নৌকা ঘাটের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল পাকিস্তানী মিলিটারির নৌকা আমাদের বাড়ির ঘাটে ভিড়ে গেছে ।

আট.
শেখ মুজিবের কলকাতায় ভাষণ

শ্রেনীশত্রু খতমের নামে কলকাতায় তখন এক ভয়ের পরিবেশ। নকশাল আন্দোলনের পুরোধা চারু মজুমদার তখনও পালিয়ে। শেষ পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সামরিকবাহিনি দিয়ে নকশাল দমনের পরিকল্পনা করলেন। একদিন সেনাবাহিনি প্রধান জেনারেল মানেকশা মেজর জেনারেল জ্যাকবকে তাঁর রুমে ডেকে পাঠালেন। আগে থেকেই মেজর জেনারেল জ্যাকব আঁচ করতে পেরেছিলেন। তার অনুমানই সত্য প্রমাণিত হল। ইন্দিরা গান্ধীর সরাসরি নির্দেশ, জ্যাকবকে পূর্বাঞ্চলের কমান্ডার হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের নকশাল দমনে কাজে লাগাতে চান।

জাতিতে ইহুদি মেজর জেনারেল জ্যাকবের পুরানাম জ্যাকব ফারজ রাফায়েল জ্যাকব। জন্ম কলকাতায়। বাবা বনেদি ব্যবসায়ী। পূর্বপুরুষ ইরাক থেকে ব্রিটিশ ভারতের কলকাতায় বসতি গেড়েছেন। জন্ম কলকাতায় হলেও লেখাপড়া করেছেন দার্জিলিঙের কাছে কার্সিয়াঙে। তাই পশ্চিমবঙ্গ বিশেষত উত্তরবঙ্গ সম্পর্কে তাঁর ভালই জানাশুনো আছে। সে ভেবেই হয়তো প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী এ গুরু দায়িত্ব মেজর জেনারেল জ্যাকবকেই দিতে ইচ্ছুক।

মেজর জেনারেল জ্যাকবের সামনে তখন সেনাবাহিনি প্রধান জেনারেল মানেকশ' বসে আছেন। পাশে সামরিক সচিব গোবিন্দ নারায়ণ। কিঞ্চিৎ ভেবে মেজর জেনারেল জ্যাকব বললেন, তিনি দায়িত্ব নিতে রাজি কিন্তু তাঁকে আরও কয়েক ডিভিশন সেনা দিতে হবে। এককথায় রাজি হলেন জেনারেল মানেকশ'।

বিশ ডিভিশন তখনই উত্তরবঙ্গে নিয়োজিত ছিল অশান্ত পূর্ব-পাকিস্তানে সামরিক অভিযানের আশঙ্কায়। সেই সঙ্গে যোগ হল আরও দুই ডিভিশন। উপরি আরও পঞ্চাশ প্যারা-ব্রিগেড নিয়োগ দেয়া হল নকশাল দমনের জন্য লে. জেনারেল জেএফআর জ্যাকবের অধীনে। মেজর জেনারেল জ্যাকব তাঁর প্রধানমন্ত্রীকে নিরাশ করেননি। নকশাল দমন তো হচ্ছেই, সেই সঙ্গে অল্প সময়ের মধ্যেই পূর্ব-সীমান্তে স্বাধীনতাকামী মুক্তিবাহিনির সঙ্গে মিলে এক সফল যুদ্ধ পরিচালনা করলেন। পাকিস্তানের ৯০ হাজার সুসংগঠিত বাহিনিকে আত্মসমর্পণ করিয়ে এক স্বাধীন দেশের অভ্যুদয়ে সহায়তা করলেন।

এবার আরও এক বাড়তি দায়িত্ব পড়ল পূর্বাঞ্চলের কমান্ডারের হাতে। নকশাল আন্দোলনের ফলে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদে বিভক্ত এই প্রদেশে একটি প্রাদেশিক নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বও দেয়া হল সেনাবাহিনিকে। মার্চ মাসেই একরকম বিনে ঝামেলায় শান্তিপূর্ণভাবে বিধানসভার নির্বাচন সম্পন্ন হল। জাতীয় কংগ্রেস বিধান সভায় একাই পেল ২১৬টি। ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি বা সিপিআই জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচন করে পেল ৩৫টি আসন। সিপিএম-এর মাত্র ১৪টি আসন। ফলে আগের নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেস যার নেত্রী ইন্দিরা গান্ধী একাই রাজ্য ক্ষমতায় এলো। কিন্ত নকশাল তথা চারু মজুমদারের দলের সশস্ত্র আন্দোলন তখন তুংগে।প্রস্তুত ইন্দিরা গান্ধীর প্যারামিলিটারি বাহিনিও, যার পূর্বাঞ্চলের দায়িত্বে লে. জেনারেল জ্যাকব।

নকশাল দমনের নামে কলকাতা তখন এক নিত্য হানাহানির শহর। একদিকে পুলিশ, সঙ্গে কংগ্রেসের গুণ্ডাবাহিনি। অন্যদিকে নকশাল আন্দোলনের মরিয়া কর্মিবাহিনি। কলকাতার পাড়া-মহল্লায় তখন বোমাগুলি আর পড়ে থাকা লাশ। কোনদিন বোমাগুলি না হলে একজন অন্যকে বলে, দাদা কি হল আজ? আজকে যে এখনও ধূঁপ-ধুনো পড়ল না?

আগে মাত্র একবার কলকাতায় এসেছিলেন বাবা। সেও অনেকদিন আগে। তাই কলকাতা নিয়ে নানা উৎসাহ উদ্দীপনা থাকলেও কলকাতা ভাল করে ঘুরে দেখা হয়নি বাবার। তাই বাল্যবন্ধুকে পেয়ে কলকাতা ঘুরে দেখার ভীষণ ইচ্ছে বাবার। বিশেষকরে বালিগঞ্জ এবং প্যারেড গ্রাউন্ড। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডেই থাকতেন স্বাধীন বাংলাদেশের রাস্ট্রপতি ও অন্যান্যরা। ৫৭/৫৮ নম্বরের দোতলা বাড়িটির এক কক্ষেই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম সম্প্রচার শুরু হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় সবাই জানে, এই বেতার কেন্দ্রের গান এবং সংবাদ মুক্তিযোদ্ধাদের কিভাবে প্রেরণা যুগিয়েছে। নিজে একজন মুক্তিযোদ্ধা হয়ে বাবা এ ভবনটি দেখবেন না, সেটি কল্পনারও অতীত। যদিও অমলের এ নিয়ে আগ্রহ নিতান্তই কম।

বাবার আরেকটি উদ্যান দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। কলকাতার প্যারেড গ্রাউন্ড।

ক'মাস আগে বিশ্বের স্বাধীনতাকামী নেতা এবং জনগণের চাপে পাকিস্তান শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। কথা ছিল লন্ডন হয়ে প্রথমে দিল্লি এবং একই দিনে কলকাতা হয়ে শেখ মুজিব ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরবেন। দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। পরে কলকাতায় নেমে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে ধন্যবাদ জানানো। দীর্ঘ ন'মাস এক-দেড় কোটি মানুষকে আশ্রয় দেওয়া বিশাল এক ব্যাপার। তাই কলকাতায় নেমে পাশের দেশের বাংগালিদের কাছে ঋণ স্বীকার করবেন।

১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লন্ডন থেকে দিল্লিতে যাত্রাবিরতি করে ঢাকা ফিরেন সেদিনই। প্রাথমিকভাবে কথা ছিল দিল্লি থেকে ঢাকা আসার পথে কলকাতায় আরেকবার যাত্রা বিরতি করে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাবেন

বঙ্গবন্ধু। কলকাতার দমদম বিমান বন্দরসহ অন্যান্য প্রটোকলও প্রস্তুত রাখাই ছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু আকাশপথ থেকেই বার্তা দিলেন, তিনি ঢাকাতেই ফিরবেন। ফলে ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ এ পশ্চিমবঙ্গে আর নামা হয়নি তাঁর।

কিন্তু দেশে ফিরে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয়ভার গ্রহণ করার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম বিদেশ সফর করেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গে। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি ৬ তারিখ থেকে শুরু করা ৩ দিনের সফরে বঙ্গবন্ধু ও ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন। প্যারেড গ্রাউণ্ডের সে জনসমুদ্রে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী গরদের শাড়ি পড়ে তাঁর ভাষণের অনেকখানিই বাংলায় করেছিলেন সেদিন।

আকাশবাণী ও দূরদর্শন থেকে বঙ্গবন্ধু-ইন্দিরার জনসভার ধারাবিবরণীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল মহালয়া-পাঠখ্যাত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও পঙ্কজ সাহা এই তিনজনকে। কবি, ধারাভাষ্যকার ও গণমাধ্যমব্যক্তিত্ব পঙ্কজ সাহা এক সাক্ষাৎকারের সেদিনের সে জনসভার বর্ণনায় পঙ্কজ রায় বলেছেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ভাষণের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা উদ্ধৃতি দিলেন। তারপর জনতার সে বিশাল স্রোতের মধ্যে থেকে একটু পরপর আরও কবিতা পড়ার অনুরোধ করা হচ্ছিল শেখ মুজিবকে। শেখ মুজিব জনতার সে অনুরোধে একের পর এক রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে কিছু কিছু অংশ পাঠ করে শোনাতে লাগলেন। আমরা সবাই আশ্চর্য হয়ে শেখ মুজিবের রবীন্দ্র কবিতাপ্রীতি দেখে বিস্মিত হচ্ছিলাম। কলকাতা ব্রিগেড প্যারাড গ্রাউন্ডের সে ঐতিহাসিক জনসভা নিয়ে অনেক কিছু লেখা হয়েছে কিন্তু রবীন্দ্রভক্ত শেখ মুজিবের কথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি।'

তাই বাবার ইচ্ছে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের সেই দোতলা বাড়ি এবং প্যারেড গ্রাউন্ড দেখা। বন্ধু অমল অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছোটবেলার বন্ধুর এ ইচ্ছেটা পুরো করল ।

শরণার্থীদের ভিড়ে ঠাসা কলকাতা রাত নামলেই নিরব হয়ে যায়। মানুষ নকশালদের ভয়ে ঘরে ফেরে আলো থাকতেই। দোকানপাটের ঝাপি বন্ধ হয়ে যায় সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গেই। চিরকুমার অমল কাকুও তার বন্ধুকে নিয়ে সন্ধ্যা নামার আগেই বাড়িতে ফেরেন।

এভাবে বাল্যবন্ধু অমলের সঙ্গে আরও ক'দিন কলকাতায় থেকে বাবা এবার তারকনগরের দিকে রওনা হলেন। নদীয়া জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রাম এই তারকনগর। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাছাকাছি। দাদু '৬৫-এর দাঙ্গায় পুরনো ঢাকা থেকে এক রাতে পালিয়ে এসে এখানেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। শিয়ালদা স্টেশন থেকে রাণাঘাটের ট্রেনে চাপলেন প্রথমে। শিয়ালদা-বনগাঁ ট্রেনের মত শিয়ালদা-রাণাঘাটের ট্রেনে অতটা ভিড় নেই। অধিকাংশই ধোপদূরস্ত ভদ্রলোকের পোষাকের যাত্রী ট্রেনের কামরায়। কিন্তু ট্রেনের বাইরে তাকালেই চোখে পড়ে শীর্ণ চেহারার বস্তি ঘর। সকালের রান্নার ধোঁয়া। এপ্রিল মাসের বৃষ্টি ভেজা সকালে প্রকৃতির স্নিগ্ধতা যেন ম্লান হয় গেছে ঘিঞ্জি বস্তির কারণে। ট্রেনের ভিতর আর বাহিরের বৈসাদৃশ্য সঙ্গে করেই এক সময় ট্রেন রাণাঘাট স্টেশনে থামলো।

রাণাঘাটে নেমেই বাবা টের পেলেন গেদের লোকাল ট্রেনটি ভরে যাবে পূর্ববঙ্গের শরণার্থীতে। ট্রেন স্টেশনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শরণার্থীদের গিজগিজে ভিড়। প্রায় বছরখানিকের এ শরণার্থী সময়ে কুড়িয়ে কুড়িয়ে হলেও তো জমেছিল অনেক কিছু। তাই এক অনিশ্চয়তা থেকে আরেক অনিশ্চয়তার দিকে যাত্রার সময়ে সেই সব খুঁটে পাওয়া সঞ্চয়টুকুও কেউ ফেলে যেতে রাজী নয়।

প্রত্যেকের হাতে তাই হাঁড়ি-পাতিল ভরা চটের বস্তা। ইউনিসেফের কম্বল। কেউ কেউ মোটা দড়িতে বেধে খাঁটিয়ে থাকা তাঁবুটিও নিয়েছে। জীর্ণ-শীর্ণ পোষাক প্রায় সকলেরই। কেউ ধুতি-লুঙ্গি। অনেকেই আবার ময়লা প্যান্ট কিংবা পায়জামা। মহিলাদের শরীরেও ছেঁড়া কাপড়। জামা ও ব্লাউজহীন শরীর ফেঁটে যেন বেরিয়ে আসছে খুঁজলি-পাঁচড়ার দগদগে ঘা। সঙ্গে থাকা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের চিতকার চেঁচামেচিতে এক অস্বস্তিকর পরিবেশ রাণাঘাটের ট্রেন স্টেশনে।

ঘণ্টাদুয়েক পর রাণাঘাট-গেদের লোকাল ট্রেনটি প্ল্যাটফরমে এসে থামল।

নয়.
গেদের লোকাল ট্রেনে শরণার্থী দল

দুপুর গড়িয়ে বিকেল পড়তে তখনও অনেক বাকি। প্ল্যাটফরমে দাঁড়ানো লোকাল ট্রেনে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে অপেক্ষমান যাত্রীরা। অধিকাংশই সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশে ফেরত যাওয়া শরণার্থী। শরণার্থী জীবনের এ বছরাধিক সময় দয়াদাক্ষিণ্য ও অন্যের কৃপায় বেঁচেবর্তে থাকতে হয়েছে এদের অনেককেই।

জন্ম-নেয়া দেশ, সংসার, ব্যবসায় বানিজ্য সব কিছু ফেলে শুধু প্রাণটা নিয়ে চলে আসতে হয়েছে এদের। তাই প্রায় প্রত্যেকেই যেন ডাংগা থেকে অথই জলে পড়েছে শরণার্থী হয়ে। বাসস্থান নেই। খাবার নেই। পরিধেয় বস্ত্র নেই। অন্যের কাছে হাত পাততে প্রথম প্রথম একটু সঙ্কোচ হলেও পরে আর লজ্জা-শরমের বালাই ছিল না বেঁচে থাকার প্রয়োজনে। রিলিফের লাইনে শৃঙ্খলা মেনে দেখা গেছে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পর আর কোন রিলিফই মেলেনি ভাগ্যে। অনেকে হয়তো জীবনে এই প্রথম সাহায্যের হাতটুকু বাড়িয়েছে। শরণার্থীদের অনেকেই মফস্বল শহরের ব্যবসা-বাণিজ্য ফেলে শূন্যহাতে এসেছে। অনেক পরিবারের মেয়ে-বউ বাইরেই যায়নি কোনওদিন। অথচ খোলা আকাশের নিচে বসবাস করতে হচ্ছে এখন। রিলিফের চাল পেলে রান্না হবে, নইলে উপোস থাকতে সবে গুষ্ঠিশুদ্ধ। প্রথমে প্রথম একটু লজ্জা হলেও প্রয়োজন এমনি এক অপরিহার্য ব্যাপার যে, বিশৃঙ্খলাই নিত্যদিনের সংগী হয়ে উঠেছে এই দীর্ঘ শরণার্থী জীবনে। তাই শৃঙ্খলা ব্যাপারটাই পলাতক এদের অনেকের কাছেই।

লাইন ভাঙার সে অভ্যেসটুকু এদের এখনও তেমনি আছে, লক্ষ্য করলেন বাবা। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে যে যার মত ট্রেনে উঠে পড়ছে। সেই সঙ্গে জানালা দিয়ে যে যেমন পারে জিনিস পত্র ছুঁড়ে দিচ্ছে। প্রথমে চরম বিরক্তি লাগলেও মুহূর্তেই এক অজানা আত্মতৃপ্তিতে ভরে উঠলো বাবার মন। এই লক্ষলক্ষ মানুষগুলোর জন্যই তো এত কষ্ট, এত রক্তপাত, এত যুদ্ধ। স্বল্প পরিসরে হলেও সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারার আনন্দ বাবা আজ বাস্তবিকই অনুভব করতে পেরেছেন, এটা ভেবেই সান্ত্বনা খুঁজে পেলেন।

কোনও রকমে একটা কামরায় উঠে পড়লেন শেষমেষ। প্যান্ট-শার্ট পড়া এক ভদ্রলোককে দেখে একজন সমীহ নিয়ে একটু জায়গা দিলেন বাবাকে। কোন রকমে ট্রেনের বেঞ্চে ঠাসাঠাসি করে বসলেন। মুখোমুখি বেঞ্চের মাঝখানের জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল আরও জনাপাঁচেক মানুষ। ভিতরের এক ভ্যাপসা গরমে দম আটকে যাবার

অবস্থা।

একটু পরে ট্রেনের হুইসেঁল বেজে ওঠলো। পাশে বসা লোকটি তার পরিবারের সবাই উঠেছে কিনা নিশ্চিত হতে শেষবারের মত স্ত্রীর দিকে সজোরে হাঁক দিল, 'হ্যাগো শুনছ নিমাইয়ের মা, পুলাপান সব উঠতি পেরেছে তো? না তুমি তোমার পোটলার দিকেই নজর রেখেছ?'

বাবা বুঝতে পারলেন ভদ্রলোক নিশ্চয় কুষ্টিয়া কিংবা রাজবাড়ির লোক। কুষ্টিয়া সরকারী কলেজে ইন্টারমেডিয়েট পড়েছেন দুই বছর। তাই এ অঞ্চলের ভাষা শুনেই বোঝা যায়। নিমাইয়ের মা মাথাগুনতি করে নিশ্চিত হয়ে নিমাইয়ের বাবাকে নিশ্চিত করলেন। চলন্ত ট্রেনের জানালা দিয়ে মানুষের ভিড় ঠেলে এক পশলা মিহি বাতাস পরিবেশকে একটু শীতল করেছে তখন।

বাবা পাশের ভদ্রলোককে বললেন, 'দাদা তো ফেরত যাইতাছেন, তা রাজবাড়ী, না কুষ্টিয়া?'

ইচ্ছে করেই পূর্ববঙ্গের ভাষা বললেন। নিমাইয়ের বাবাও পূর্ববঙ্গের ভাষা শুনে আলাপ শুরু করলেন, 'আমার বাড়ি ছিল গোয়ালন্দ, কানাইপুর। তা বাড়ি যাইতেছি আর বলি কী করে? বাড়ি কি আর আছে? সব দখল কইরা নিছে কিনা কে জানে? তবু যাইতাছি নিজের বাপের ভিটা। জন্মভূমি। এই শরণার্থী জীবন থ্যাইকা তো ভাল? তা দাদার সঙ্গে ফ্যামিলি দেখতাছি না?'

বাবা বললেন, 'আসলে আমি জয়বাংলা থেকে এলাম এই সপ্তাহখানেক আগেই। কলকাতায় উঠেছিলাম বন্ধুর বাড়িতে। এখন এদিকে যাচ্ছি আত্মীয় বাড়িতে। নেমে যাব আর কিছুক্ষণ গেলেই।'

জয়বাংলা মানে সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে এসেছে শুনে নিমাইয়ের বাবা আরও একটু ঘেষে বসলেন। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোও যেন এদিকে মুখ ফিরে তাকালেন। সবাই জয়বাংলার খবর জানতে চায়।

'দাদা, আপনি কোথায় থাকেন? বাড়ি কোথায়? যুদ্ধের সময় কিভাবে বেঁচে থাকলেন? জয়বাংলার খবর কী? শেখ সাব কি ক্ষমতা বুঝে নিয়েছেন? রাজাকার আলবদরেরা এখনও বেঁচে আছে? ইন্ডিয়ান আর্মি কি চলে এসেছে জয়বাংলা থেকে?'

এক সঙ্গে হাজারটা প্রশ্ন চারদিক থেকে।

মুহূর্তের মধ্যেই প্রচণ্ড ভীড়ে ঠাসা ট্রেনের কামরায় সবার মধ্যমণি হয়ে উঠলেন বাবা। অনেকদিন পর যেন একান্ত আপনজনকে কাছে পাবার আনন্দ সবার চোখে মুখে। মুক্তিযুদ্ধের গল্পকথায় রাণাঘাট-গেদের লোকাল ট্রেনের কামরা তখন যেন বুদ হয়ে আছে।

অত্যন্ত ধীর গতিতে চলা ট্রেনটি এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশন পার করতেই অনেক সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের গল্পের মৌতাত শেষ হতেই বাবা একটু বাইরে তাকালেন। বনগাঁ বেনাপোলের গ্রামের চেয়ে অনেক পার্থক্য নদীয়া জেলার এ গ্রামগুলোর। অনেকটা পূর্ববঙ্গের মতই। টিনের চালা ঘর। কাঠ কিংবা পাটখড়ির বেড়া। কোথাও কোথাও টালির ঘর। গাছপালা, মাটির রঙ সে সবেও এক আশ্চর্য মিল।

ট্রেনের ভিড়ের মধ্যেই টুকটাক গল্প করছেন বাবা। কানাইপুরের নিমাইয়ের বাবাও তার সুখ-দুঃখের নানা কথা বাবাকে অকপটে বলে একটু হালকা হচ্ছেন। গোয়ালন্দ ঘাটে পাটের আড়ত ছিল ভদ্রলোকের। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হতেই পাকিস্তানী মিলিটারিরা সে গুদাম ঘর পুড়িয়ে দেয়। তবুও আশায় বুক বেঁধে ছিলেন। সব কিছু হয়তো এক সময় ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু পরের মাসেই রাজাকার-আলবদরেরা কানাইপুরের বাড়ি লুট করল এক রাতে। কোন রকমে নিজের বাড়ির মেয়ে-বউদের ইজ্জত রক্ষা করতে পারলেও পাশের বাড়ির যুবতী মেয়েটিকে তুলে নিয়ে গেল গ্রামেরই রাজাকারেরা। পরের দিন সকালে গোয়ালন্দ-ফরিদপুর সড়কের পাশে খাদের মধ্যে মেয়েটির ক্ষতবিক্ষত লাশ পাওয়া গেল। সেদিন রাতেই গেদে বর্ডার দিয়ে রাণাঘাট শরণার্থী শিবিরে চলে এলেন তিনি।

কানাইপুরের ভদ্রলোকের দীর্ঘশ্বাসে ছেদ পড়ল চলতি ট্রেনের ব্রেকের শব্দে।

'দাদা, মনে হয় বাগুলি এসে পৌঁছলাম এতক্ষণে। আপনার তারকনগর আরও কয়েকটা স্টেশন।' বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন ভদ্রলোক।

বাবা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন, দিন থাকতে পৌঁছতে পারলেই হল। শুনেছি স্টেশন থেকে বেশি দূরে নয়। তাছাড়া শ্বশুরমশাই ইস্কুলের টিচার। সবাই চেনেন তাঁকে। জিজ্ঞেস করলেও হয়তো বলে দেবে সবাই।

একথা বলতেই সামনে দাঁড়িয়ে খাকি পোশাকের এক মিলিটারি জওয়ান বাংলায় জিজ্ঞেস করছে বাবাকে, 'এই যে, তুমি কি কলকাতা থেকে এলে?'

হঠাৎ করে অপরিচিত কাউকে তুমি করে সম্বোধনে বাবা একটু হকচকিয়ে গেলেন। বিরক্তও হলেন খানিকটা। তবুও ইন্ডিয়ান আর্মির লোক দেখে একটু সমীহ সহকারে উত্তর দিলেন, 'জ্বী, কলকাতা থেকেই তো।'

একটু মাঝবয়সী জওয়ান বাবার উত্তর শুনে হঠাত করে পেছন ঘুরে দাঁড়াল। কামরা ভর্তি প্যাসেঞ্জারের মধ্যে দিয়ে দূরে দাঁড়ানো কাউকে হিন্দিতে এদিকে আসতে বললেন তাড়াতাড়ি।

আরও কয়েকজন জওয়ান মুহূর্তের মধ্যেই অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে বাবার সামনে এসে দাঁড়াল। কামরার অন্যান্য যাত্রীদের থেকে একেবারে পৃথক করে ফেলল এদিকের মুখোমুখি অবস্থিত বেঞ্চ দু'টিকে।

মুহূর্তের মধ্যেই পরিবেশটা কেমন এক ভয়াবহ আকার ধারণ করল। হঠাৎ করে বাবার মাথায় এলো বন্ধু অমলের সাবধান বাণী। এখন তো নকশালীদের খতম চলছে সারা পশ্চিমবঙ্গে। তবে তাকেও কি নকশাল ভেবেই এতসব করছে মিলিটারি জওয়ানেরা?

এরপর হিন্দি আর বাংলায় শুরু হল জেরা। বাবা প্রথমে শুদ্ধ বাংলায় উত্তর দিলেও পরে ঢাকাইয়া ভাষায় সব প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন। হিন্দি একদমই বলতে অভ্যস্ত নন। কিন্তু হিন্দিটা বোঝা যায় পুরোটাই। বাবা বুঝলেন, অফিসার মত দেখতে বাঙালী লোকটা বাবাকে পরীক্ষা করছেন আসলেই তিনি পূর্ববঙ্গের, নাকি উত্তরবঙ্গের ছদ্মবেশী নকশাল?

কিছুতেই মিলিটারি জওয়ানদের বিশ্বাস করানো যাচ্ছে না যে, বাবা সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে এসেছেন আত্মীয়স্বজনের খোঁজ নিতে। প্রায় মিনিট কুঁড়ি জেরার পরও যখন ওরা সন্তুষ্ট হচ্ছে না, তখন বাবা আসলেই ভয় পেয়ে গেলেন। যদি নামিয়ে নিয়ে যায় তাঁকে, তবে কে তাকে রক্ষা করবে? হয়ত পরে প্রমাণিত হবে তিনি আসলে নকশাল আন্দোলনের কেউ নন। কিন্তু তার আগেই তো বেঘোরে প্রাণটা চলে যাবে।

দূরে দাঁড়িয়ে জওয়ানেরা নিচুস্বরে হিন্দিতে শলাপরামর্শ করতে লাগলেন। তারপর কাছে এসে অফিসার মত দেখতে বাঙালি

ভদ্রলোক হাত ইশারা দিয়ে বললেন, 'এই তোকে আমাদের সাথে যেতে হবে। নেমে আয়?'

এতক্ষণের সে আশঙ্কাই যে বাস্তব প্রমাণিত হবে, তা দেখে বাবা ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। বললেন, 'দেখেন আমি তো আপনাদের বারবার বলতাছি, আমি জয়বাংলার মানুষ। এপারে আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজ নিতে আইছি।'

'হ্যাঁ তোকে আত্মীয় বাড়িতেই পৌঁছে দেব। বললি না শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিস। তোকে জামাইআদরে শ্বশুরবাড়ি পাঠাব। নেমে আয়, চটজলদি।'

এক ঘণ্টা ধরে এ কামরাতে শরণার্থীদের কাছে বাবাই হয়ে উঠেছিলেন মধ্যমণি। অথচ সেই ভদ্রলোককেই মিলিটারি জওয়ানেরা নামিয়ে নিতে চাচ্ছে দেখে সবাই আশ্চর্য হয়ে গেছে। কামরা জুড়ে নিস্তব্ধতা। এ ওর দিকে তাকাচ্ছে কিন্তু কিছুই বলতে সাহসী হচ্ছে না কেউ।

হঠাৎ করে পাশে বসা কানাইপুরের ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, 'আরে কি হইতাছে এতক্ষণ? আমি এতক্ষণ ধইর‍্যা শুনতাছি। কিছুই কইতাছি না। কি পাইছোস তোরা? ইচ্ছা হইলেই যে কাউরে নকশাল বানাইয়া খতম কইরা দিবি? ও তো আমাগো গ্রামের পোলা। আমাগো লইতে আইছে। ওরে নামাইয়া নিলে আমরাও নাইম্যা যামু ট্রেন থনে। ওই নিমাই, ও বলাই তোর কাকারে ওরা নামাইয়া নিব। নামতো দেহি কোথায় নিতে চায়?'

মুহূর্তের মধ্যেই কামরা শুদ্ধ জয়বাংলার শরণার্থীরা প্রতিবাদ করে উঠলো। বাবা তখনও বেঞ্চিতে বসে আছেন। সবার সমস্বরে প্রতিবাদ দেখে ইণ্ডিয়ান মিলিটারির জওয়ানেরা একটু পিছু হটলো মনে হল। আবার নিজেরা হিন্দিতে কিছুক্ষণ শলাপরামর্শ করে ভিড় ঠেলে ট্রেন থেকে জওয়ানেরা যখন নেমে গেল, ট্রেন তখনি চলতে আরম্ভ করেছে।

এক ঘোরতর বিপদের মুখে পড়েও অলৌলিকভাবে রক্ষা পেয়ে বাবা পাথরের মত নিশ্চল বসে আছেন। কানাইপুরের ভদ্রলোক বাবার ঘাড়ে হাত রেখে বললেন, 'দাদা দিনকাল এখানে খুউব খারাপ। শালারা মানুষ মারছে পাখির মত। আপনাদের মত যুবক দেখলে তো রক্ষা নেই। নকশাল মনে কইরা কত নিরীহ মেধাবী ছেলেগুলোরা যে মারছে এখন। সামনের কয়েক স্টেশন পরেই মনে হয় তারকনগর।'

বাবা শক্ত করে ভদ্রলোকের হাত ধরে আছেন অনেকক্ষণ। হঠাৎ মুখে এক নোনতা স্বাদ পেতেই বুঝলেন চোখ থেকে অঝোর ধারায় জল গড়িয়ে পড়ছে।

দশ.
বাড়িতে পাকবাহিনি এলো

থানা সদর থেকে আসা দু'টি নৌকার একটি নিমাই বিল দিয়ে সোজা ভবানীপুরের দিকে চলে গেল। অন্য নৌকা হঠাৎ করে মোড় ঘুরে নিমাই বিল থেকে যে খালটি আমাদের গ্রামের এসে পড়েছে সেখানে ঢুকল। তারপর সোজা গিয়ে ভিড়লো বাড়ির ঘাটে। বাড়ির সামনের পুরনো কয়েকটি নারকেল গাছের পাশেই নৌকা ঘাট। বন্যা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এলাকার বাড়িগুলো বেশ উঁচু। শুকনো মরশুমে তাই বাঁশ কিংবা কাঠ দিয়ে ধাপে ধাপে অনেকগুলো সিঁড়ি বেয়ে বাড়িতে উঠতে হয়। বর্ষাকালেও তাই একেবারে বন্যা না হলে ঘাটে নৌকা ভিড়লেও বেশ কয়েক ফুট উচ্চতা ধাপ বেয়ে বেয়ে উঠতে হয়।

বিল এলাকায় গ্রামের বাড়িগুলো বর্ষাকালে যেন এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ির মাঝখানে ছোট নিচু খাঁড়ি। আঞ্চলিক ভাষায় এ খাঁড়িগুলোকে 'জোলা' বলে। জোলা শব্দটি জল থেকে হয়তো এসেছে। শুকনো মরশুম বাদে আষাঢ় থেকে কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত প্রতিটি বাড়ি এ জোলা দিয়েই বিচ্ছিন্ন থাকে।

গ্রামের পূর্বপাড়ার প্রায় ২০টির মত বাড়ির মাঝখানে কমবেশি প্রশস্তের জোলা। বর্ষাকালে বাঁশ আড়াআড়ি পেতে সাঁকো বানিয়ে এই ২০টি বাড়ির সংযোগ করা হয়। একেবারে পূর্বদিকের আমাদের বাড়ির জোলাটি অনেকটা প্রশস্থ। এই দীর্ঘ দূরত্বকে সাঁকো দিয়ে জুড়ে দিতে যে পরিশ্রম করা দরকার তার তাগিদ ও মানসিকতা কারো নেই। একে তো যুদ্ধ চলছে। তার উপর ছোটদাদুর মৃত্যু। তাই বাঁশের সাঁকোটি বানায়নি কেউ। আর সেটাই এদিন শাপেবর হয়ে দেখা দিল।

মিলিটারি বোঝাই নৌকা গ্রামের দিকে আসতে দেখেই সাত-আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা মাকে বড়মার সঙ্গে নৌকায় তুলে দিয়ে বাবা বাড়ির অন্যান্যদের নিয়ে শলাপরামর্শ করলেন কিভাবে বাড়ির বউ-ঝি ও অন্যান্যদের রক্ষা করবেন।

সব মিলিয়ে তখন বাড়িতে ছয়-সাত জন যুবক আর পূর্ণবয়স্ক মানুষ। পারিবারিক গড়নের জন্যই সবাই বিশাল দেহের অধিকারী। শক্তিশালী ও সাহসী। তাই এক জ্যেঠা বললেন, 'বউদের ছেলেমেয়েসহ জোলা পার করে পাশের পাড়াতে পাঠিয়ে দিয়ে আমরা ছ'জন লাঠি-বল্লম নিয়ে দাঁড়াব। নৌকা থেকে নামার সাথে সাথে এক একজনকে গেঁথে ফেলবো মাছ ধরার টেটা আর কোজ দিয়ে।' লোহার শিক বাঁকা করে বাঁশের সঙ্গে গেথে টেটা এবং কোজ তৈরি করা হয়। বর্ষার জল আসার সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় মাছ নতুন জলের সঙ্গে চলে আসে। খাল বা নালার উপরে তৈরি করা বাঁশের চং বা বেঞ্চিতে বসে রাতের বেলা টেটা এবং কোজ দিয়ে বিশাল সাইজের সব বোয়াল এবং রুই মাছ ধরা হয়।

বাবা আগাগোড়াই খুব ধীরস্থির-ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। বাবা বললেন, 'শুধু রাজাকার আসলে কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু আমরা তো জানি না, সাথে মিলিটারি আছে কিনা। তাছাড়া বাড়িতে কোন বন্দুক-রাইফেলও নেই যে, অস্ত্রের সামনে লড়াই করা যাবে। বউ-ছেলেমেয়েদের পাশের পাড়ায় পাঠিয়ে দাও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আমি একটু চিন্তা করে নেই। আর লক্ষ্য রেখো নিমাইবিলের ওপার থেকে কোনও নৌকা এদিকে আসে কিনা। বহেরাতলিতে মুক্তিবাহিনির একটি গ্রুপ আছে। বুদ্ধি করে যদি ওরা এদিকে আসে তবেই আমরা লড়াই শুরু করবো।'

সে মতেই ডিঙি নৌকায় করে কয়েক জোলা পার করে বেশ দূরত্বে জেঠিমাদের সঙ্গে ছোট ছেলেমেয়েদের নামিয়ে দেয়া হল। ঠাকুমা কিছুতেই ছেলে আর নাতিদের রেখে বাড়ি ছেড়ে যাবেন না। বাবা শতবার বুঝিয়েও তাঁর মাকে পাঠাতে পারলেন না। মাত্র দিন দুই আগেই এক পিসিমার বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে রাজাকারেরা। পিসিমা তাঁর বিবাহযোগ্যা দুই মেয়েকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে। মেয়েদের পাঠিয়ে পিসিমাও ঠাকুমার সঙ্গে রয়ে গেলেন বাড়িতে। তিন জেঠাতো ভাই ও তিন জেঠা মাছ মারার জন্য প্রস্তুত করে রাখা টেটা আর কুছের মাথায় লোহার ধারালো আংটাগুলো প্রস্তুত করে বৈঠকখানার পাশে জমা করতে লাগলেন।

বাবা তাকিয়ে আছেন মিলিটারি নৌকার দিকে। বহেরাতলি থেকে মুক্তিবাহিনির কোনও গ্রুপ এদিকে আসে কিনা সেদিকেও খেয়াল। একটি নৌকা নিমাইবিল থেকে খালে ঢুকতেই এক অজানা আশঙ্কায় বাড়ির সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে গেলেন। ঠাকুমা আর পিসিমা অহেতুক চিৎকার করে বাড়িতে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করতে লাগলেন।

নিঃসন্তান সেজো জেঠামশাই বাবাকে নিজের ছেলের মতই ভালবাসেন। বাবাও তাঁর এই ভাইয়ের কথাকে কখনওই অমান্য করেন না। সেজো জেঠামশাই বাবাকে বললেন, 'দেখ এ বাড়িতে মিলিটারি আসবে শুধু তোকে মারার জন্য। বাড়ির অন্য সবাই মরে গেলেও যদি তুই বেঁচে থাকিস তবে পরিবারটা ভবিষ্যতে হয়ত বেঁচে থাকবে। তাই তুই পালিয়ে যা। আমরা মরার আগে যতটুকু পারি লড়াই করতে পারবো। কিন্তু তুই থাকলে সবাই তোকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে তাই প্রতিরোধটা ঠিকমত করা যাবে না।'

বাবা বললেন, 'এটা কি বলো! আমি সবাইকে ছেড়ে স্বার্থপরের মত পালিয়ে যাব। তাছাড়া এই বর্ষাকালে পালাবই বা কোথায়? তার চেয়ে চল সবাই মরলে এক সাথে মরি। আর যদি বাঁচি তবে সবাই একসাথে।'

সেজো জেঠামশাই বাবার মাথায় হাত দিয়ে বলল, 'দেখ মিলিটারি এলে সবাইকে মেরে ফেলবে কোন প্রতিরোধ ছাড়াই। আর যদি রাজাকার আসে তবে ওরা তোকে শুধু মারবে। তোকে না পেলে বাড়িতে লুট করবে এর বেশি কিছু না। রাজাকারেরা আমাদের মারবে না বোধহয়। তাই পাগলামি করিস না ভাই। তুই পেছনের বাঁশঝাড়ের মধ্যে দিয়ে পুকুরের ওপারে জলের মধ্যে কচুরিপানার ভিতর লুকিয়ে থাক মাথা জাগিয়ে। এখনই যা। যত তাড়াতাড়ি যাবি তত দূরে সাঁতরে যেতে পারবি। মিলিটারি আসলে ফাঁকা গুলিও করতে পারে। তাই নিরাপদে একটি জায়গায় চুপ করে লুকিয়ে থাকা চাই তোর। যা আর তর্ক করিস না।'

বাবার কোন প্রতিরোধই সেজো জেঠামশাইর কাছে ধোপে টিকলো না। বাবাকে প্রায় জোর করেই ঠাকুমা-পিসিমার অলক্ষ্যে রান্না ঘরের পেছন দিয়ে ঘন লম্বা কচুরিপানা মধ্যে ডোবার জলে নামিয়ে দিলেন। বর্ষাকালে চারদিকে বাঁশ দিয়ে বেড়ি দিয়ে কচুরিপানা চাষ করা হয় গরুর খাবারের জন্য। বাবা সে কচুরিপানার ভিতর ডুব দিয়ে দিয়ে চলে গেলেন অনেক ভিতরে। পেছনের ডোবার ওপাশে আমন ধানের ক্ষেত। বর্ষাকালে জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধানও বেড়ে ওঠে। তাই কচুরিপানার ডোবার সঙ্গে আমন ধান খেতের সংযোগে সহজেই অনেক দূরে চলে যাওয়া যায় সন্তর্পণে সাঁতার কেটে কেটে। এককালের দক্ষ সাঁতারু বাবা তাই বাড়ির নাগাল থেকে অনেক দূর চলে গেলেন। সেজো জেঠামশাই বাঁশঝাড়ের ঝোঁপের আড়াল থেকে লক্ষ্য করলেন, বাবা অনেক দূরে চলে গিয়ে ডোবার একেবারে শেষমাথায় একটি বাঁশের বেড়া ধরে আমন ধান আর কচুরিপানার মধ্যে একটু মাথা বের করে আছেন।

ততক্ষণে মিলিটারির নৌকা বাড়ির ঘাটে ভিড়ে গেছে। বড় জেঠামশাই একা কলতলায় নারকেল গাছের কাছে এগিয়ে গেলেন। দেখা গেল হাতে কাঠের রাইফেল নিয়ে পাশের গ্রামের কালু রাজাকার নৌকার ছইয়ের ভিতর থেকে মাথা বের করে বাড়ির ঘাটের কাঠের পাটাতনের সিঁড়িতে নামলো। পেছনে আরও আট থেকে দশজন অচেনা লোক। এদের কয়েক জনের হাতে দোনালা কাঠের বন্দুক। চেহারা দেখে এদের কাউকেই পশ্চিম পাকিস্তানী মিলিটারি মনে হল না।

এগার.
রাজাকার বাহিনির হানা

কালু রাজাকারের নেতৃত্বে দোনলা বন্দুক হাতে অচেনা চেহারার লোকগুলো বাড়িতে ঢুকেই বাবাকে খুঁজতে আরম্ভ করলো। বড় ও সেজো জেঠামশাই দু'জনে তখনও বাইরের বাড়িতে দাঁড়িয়ে। কালু রাজাকারের দিকে তাকিয়ে অচেনা লোকেরা বুঝলো, এদের দু'জনের কেউ-ই মাস্টারমশাই নন, যাকে ধরে নিতেই তারা এ বাড়িতে এসেছে।

একজন বলে উঠলো, 'শালা মালাউনের বাচ্চাটা কোথায়?'

সেজো জেঠামশাই কালুর দিকে তাকিয়ে বললো, 'তোমরা কাকে খুঁজছ?'

কালু রাজাকার আমতা আমতা করে উত্তর দিল, 'স্যার কোথায়?'

সেজো জেঠামশাই বললো, 'তোমরা যে এ বাড়িতে এসেছ শওকত ভাই জানেন?'

শওকত ভাই মানে ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান শওকত আলীর কথা বোঝালেন সেজো জেঠামশাই। কালুর পাশ থেকে একজন হঠাৎ বলে উঠলো, 'শালা মালাউনের বাচ্চার বেজায় সাহস হয়েছে বোঝা যাচ্ছে। হিন্দু বাড়িতে আসতে শওকত চেয়ারম্যানের কাছ থেকে পারমিশন নিতে হবে? তোদের চোদ্দগোষ্ঠীর ভাগ্য যে পাকিস্তানি মিলিটারি সাথে আনি নাই ।'

বলেই সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সেজো জেঠামশাইকে কাঠের বন্দুক দিয়ে আঘাত করতে উদ্যত হল। প্রায় ছ'ফুটের বিশাল দেহের সেজো জেঠামশাই হাত দিয়ে বন্ধুকের সামনের অংশ ধরে আবার ছেড়ে দিলেন।

বড় জেঠামশাই পরিস্থিতি হালকা করতে কালু রাজাকারকে বললেন, 'কালু তুমি আমাদের পরিচিত। কতদিন আমাদের বাড়িতে এসেছ। তোমার স্যারকে দরকার, তুমি কিংবা শওকত খবর পাঠালেই তো হত। রাজাকার নিয়ে বাড়িতে আসার প্রয়োজন ছিল কি?'

কালু রাজাকার কোন উত্তর না দিয়ে বাড়ির ভিতরের দিকে চলে যেতে সবাইকে নির্দেশ দিল। অচেনা রাজাকারগুলোও কয়েকভাগে বিভক্ত হয়ে সবগুলো ঘরে খোঁজাখুজি আরম্ভ করে দিল।

ইতিমধ্যে বাড়িতে থাকা আরেক জেঠামশাই আর তিন জেঠাতো ভাই ঘরের ভিতর থেকে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। বড় জেঠামশাইর দিকে চোখাচোখা করছেন, তিনি কোন নির্দেশ দেন কিনা জানার জন্য। বড় জেঠামশাই প্রতিরোধের কোন ইঙ্গিতই দিলেন না।

সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও বাবাকে না পেয়ে সবাই আবার বাইরের উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। একজন বললো, 'শালা ভেগে গেছে।'

আরেকজন কালু রাজাকারের সঙ্গে দূরে গিয়ে একটু শলাপরামর্শ করে সবচেয়ে ছোট জেঠাতো ভাই ফণীন্দ্রকে করে জাপটে ধরে বেঁধে ফেললো। ক্লাশ টেনের ছাত্র ফণীন্দ্র একটু বাধা দিতেই কাঠের বন্দুক দিয়ে মুখে এমন জোরে মারলো যে ফণীন্দ্রের নাক ফেটে দরদর করে রক্ত পড়তে আরম্ভ করল।

সেজো জেঠামশাই ধুতির আঁচল দিয়ে ফণীন্দ্রর মুখের

রক্ত মুছিয়ে দিতেই আরেকজন সেজো জেঠামশাইকেও মাথায় মারলো। দাঁড়িয়ে থাকা অন্য রাজাকারেরা মুহূর্তেই পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট জেঠামশাই ও অন্য দুই জেঠাতো ভাইকে পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেলল কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই। সবাই বড় জেঠামশাইর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে অথচ নির্বিকার বড় জেঠামশাই রাজাকারদেরকে প্রতিরোধ করার কোন নির্দেশই দিলেন না।

প্রায় বিনা প্রতিরোধেই সবল সক্ষম পাঁচজন মানুষকে ওরা বন্দুকের বাট আর লাথি মেরে মেরে হাত-পা বেঁধে মাটিতে শুইয়ে দিল। বাড়িতে থাকা ঠাকুরমা ও পিসিমা সবার চিৎকারে আর ঘরে লুকিয়ে থাকতে না পেরে বাড়ির উঠোনে চলে এলেন। আহত পাঁচজনের গোঙানির সঙ্গে ঠাকুরমা ও পিসিমার চিৎকার এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করলো।

বড় জেঠামশাই তখনও কালুর সঙ্গে দেনদরবার করছেন যাতে ওরা আর কিছু না করে এখান থেকে চলে যায়। কালু কিছুতেই বাবাকে ছাড়া যাবে না। কালু বললো, 'স্যার বাড়িতেই লুকিয়ে আছে। আপনি মিথ্যে কথা বলছেন।'

বড় জেঠামশাই বললেন, 'বাড়িতে থাকলে কি এতগুলো মানুষের আর্তচিৎকারের পরেও ও সামনে না এসে পারে? তুমি তোমার স্যারকে তো চেনো।'

কালু রাজাকার কিছুতেই বাবাকে না ধরে এমনি এমনি চলে যেতে রাজি না। অবশেষে বললো, 'আপনাকে ও এদের পাঁচজনকে ইউনিয়ন বোর্ডে নিয়ে যাব। মিলিটারি ভবানিপুর গেছে, আসতে সন্ধ্যা হবে। এর মধ্যে স্যার যদি ইউনিয়ন বোর্ড অফিসে না যায়, তবে আপনাদের সবাইকে মিলিটারির হাতে তুলে দেব।'

একথা বলেই কালু রাজাকার চোখ ইশারায় সবাইকে নৌকায় ওঠাতে নির্দেশ দিল। কালুর কথার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য রাজাকারেরা টেনে হিচড়ে সবাইকে নৌকায় তুলতে লাগল।

ঠাকুরমা-পিসিমা কালুর কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা ভিক্ষা করছে। কিন্তু কালু রাজাকারের মন কিছুতেই নরম হল না। ঠাকুরমা তার তিন ছেলে ও তিন নাতিকে বাঁচাতে ঘরের যা কিছু আছে সব কালুকে দিতে চাইলেও সেদিকে ওদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। এদিকে একে একে আহত সবাইকে টেনে হিঁচড়ে নৌকায় তোলা হল। সবার শেষে বড় জেঠামশাই নিজে হেঁটে হেঁটেই নৌকার দিকে এগিয়ে গেল।

সবচেয়ে আহত ফণীন্দ্র 'জল খাব' বলে কাতরস্বরে গোঙাচ্ছে। একজন রাজাকারের দয়া হল। কাছেই টিউবওয়েল থেকে নৌকায় থাকা মাটির পাত্র ভরে জল নিয়ে মুখে ঢেলে দিল।

ষাটোর্ধ বয়সের ঠাকুরমা ছেলে ও নাতিদেরকে রক্ষা করতে শেষ চেষ্টায় নিজেও নৌকায় উঠে বসলো। এক রাজাকার জোর করে ঠেলে-ধাক্কে বুড়িকে নৌকা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল কাদাজলের ভিতর। নৌকাটি সবাইকে নিয়ে বাড়ির ঘাট থেকে দূরে চলে যেতে লাগলো।

এদিকে আহত পাঁচজনের মধ্যে ফণীন্দ্রের অবস্থা খুবই খারাপ। ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়ে নৌকার পাটাতন ভেসে যাচ্ছে। অন্য চার জনের অবস্থাও ভাল মনে হল না। নৌকার ভিতর এক নারকীয় অবস্থা। কালু রাজাকারের সঙ্গে আসা অচেনা লোকগুলো নৌকার ছইয়ের উপরে পজিশন নিয়ে আছে যদি বাবার নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনি আক্রমণ করে বসে এ আশঙ্কায়। অথচ কোথাও কাউকে দেখা গেল না। ভরা বর্ষাকালের দুপুরের নিস্তব্ধতা বাড়ি থেকে ভেসে আসা ঠাকুরমা-পিসিমার কান্নায় ভারী হয়ে উঠলো।

নৌকা আস্তে আস্তে দূরে চলে যাচ্ছে। একটি পরিবারের এতগুলো মানুষের সমূহ মৃত্যু চিন্তায় বড় জেঠামশাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়েও শেষ চেষ্টা করতে লাগলেন।

বড় জেঠামশাই কালুকে বললো, 'আর একটু পরেই হয়ত আমার ভাই-ভাতিজাদের অনেকেই মওে যাবে। কালু তুমি তো আমাকে জানো, শওকত চেয়ারম্যান আর আমি খুব ছোটবেলার বন্ধু। এক সঙ্গে ইস্কুলে পড়েছি। শওকত আমার সাথে অন্তত এতখানি বিশ্বাসঘাতকতা করবে আমার বিশ্বাস হয় না। জানি না শওকত তোমাদের এ অপারেশনের কথা জানে কিনা? জানলে আমাদের বাড়ির পাঁচজন মানুষকে মেরে ফেলার জন্য তোমাদের পাঠাত বলে আমার মনে হয় না।'

কালু রাজাকার বড় জেঠামশাইয়ের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলো। বড় জেঠামশাই আবার বলতে শুরু করলেন, 'তার চেয়ে তুমি আমাদের ছেড়ে দাও। আমি কথা দিচ্ছি তুমি টাকা-পয়সা যা চাও, আমি একা একা তোমাকে দিয়ে আসবো। 'তোমার স্যার' জানবে না। আর ও যাতে থানায় গিয়ে দেখা করে সে ব্যবস্থা আমি করবো।'

কালু অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলো। ততক্ষণে নৌকা গ্রামের পুবদিকের খালের প্রায় মাঝামাঝি চলে এসেছে। আর একটু পরেই নিমাইবিলে পড়বে। কালু নৌকার পেছনের মাঝিকে ইশারা করলো। নৌকাটি আবার আমাদের বাড়ির ঘাটের দিকে রওনা হল।

নৌকা ঘাটে ভিড়তেই আহত পাঁচজনকে চ্যাংদোলা করে নৌকা থেকে নামিয়ে দিয়ে নৌকাটি আবার খাল পেরিয়ে নিমাইবিলের দিকে চলে গেল।

বাড়িতে তখন আহত সবাইকে বাঁচিয়ে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। বাবাও কচুরিপানার জঙ্গল থেকে ভেজা শরীরে বাড়িতে উঠে এসেছে। ঠাকুরমা-পিসিমা ঘরে শুকিয়ে রাখা সাদা ধুতি ছিঁড়ে সবার ক্ষতস্থান জড়িয়ে দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। বাবা ও বড় জেঠামশাই সবাইকে বাঁচিয়ে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন।

পাঁচজন আহত মানুষের আর্তচিৎকারে বাতাস ভারী হয়ে উঠল। ভরা বর্ষার থই থই জলে কান্নার প্রতিধ্বনি যেন ভাদ্রমাসের গুমোট গরমকে আরও অসহ্য করে তুললো। রাজাকারের নৌকা চলে যেতে দেখে অনেকেই সাহায্যের হাত বাড়াতে এগিয়ে এলো। বহেরাতলি থেকে যে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের হাত বাড়াতে এগিয়ে আসার কথা ছিল বাবা ওদের না দেখে বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। জেঠামশাইয়ের বোকামির জন্যই যে প্রতিরোধ করা গেল না, সে কথাই আহত সবাই কান্নার সঙ্গে সঙ্গে বলতে লাগলেন। বাবাও নিজের পালিয়ে যাবার সিদ্ধান্তকে কিছুতেই মানতে পারছেন না।

এভাবেই দুপুর গড়িয়ে বিকেল। সন্ধ্যের দিকে বহেরাতলির মুসলমান পাড়া থেকে বড়মাসহ আমরা সবাই চলে এলাম। থানা সদরে আহতদের নেয়ার সাহসও কারো নেই। গ্রামের হোমিওপাথি ডাক্তার জিতেন বাবুর চিকিৎসার উপর নির্ভর করেই সেদিন রাত্রি কাটিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হল।

বারো.
মুক্তিবাহিনির প্রতিরোধ

বাড়িতে রাজাকারের আক্রমণের পর বাবা যেন বদলে গেলেন। এক সময় পরিবারের সবাইকে বাঁচাতে কোনও কোনও দুর্বল মুহূর্তে ভারতে চলে যাওয়ার কথা ভাবতেন। এবার সে চিন্তা মন থেকে সরিয়ে ফেললেন। এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করতে আরম্ভ করলেন। মুক্তিবাহিনির ক্যাম্পে পাকাপাকিভাবে অবস্থান করেই এসব করতে লাগলেন যেন, পরিবারের চাপটা আর না থাকে।

আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি মায়ের কন্যা সন্তান জন্ম নিলো। এক ছেলে এবং মেয়ের পরে আবারও কন্যা সন্তান। বাড়ির অনেকেই খুশি না হলেও বাবা-মায়ের এ নিয়ে কোনও আক্ষেপ নেই। এক অনিশ্চিয়তার মধ্যে গোটা দেশ। কখন কোথায় পালিয়ে যেতে হয়। সে চিন্তায় নিয়ে দিন-রাত্রি হয়। একেকটি দিন যেন পার হয় ঘাম দিয়ে জ্বর ছোটার মত করেই। রাতে তেমন চিন্তা নেই, কারণ বিল এলাকায় এ সময়টিতে না-চলে নৌকা , না-থাকে পায়ে চলার অবস্থা। এমন অবস্থায় পাকিস্তানী মিলিটারি এলাকায় আসার সম্ভাবনা নাই বললেই চলে। তবুও একজন সন্তান-সম্ভবা মহিলাকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া তো প্রায় অসম্ভবই। তাই মায়ের কন্যা সন্তান জন্ম দেয়ার মনোকষ্টটুকু কেউই বাইরে প্রকাশ করেনি।অনেকেই বললো, কন্যা তো মায়ের জাতি, আর দেশও মায়ের মতই। এ কন্যা সন্তানটিই হয়ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইংগিতবাহী।

রাজাকারেরা যে আমাদের বাড়ি আক্রমণ করেছে, সে খবর মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পৌঁছে গেছে। সবাই একটু আশ্চর্যই হয়েছেন, শওকত চেয়ারম্যান কথা দিয়ে কথা রাখলো না। লোক মুখে শোনা যাচ্ছে, শওকত চেয়ারম্যানকে কিংবা শান্তি কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ না করেই নাকি কালু রাজাকার আমাদের বাড়িতে সেদিন এ অভিযানে এসেছিল। বাবাকে ধরে নিয়ে যাওয়া কিংবা মেরে ফেলাই যে উদ্দেশ্য সেটা কারও বুঝতে আর বাকি রইল না।

একান্নবর্তী গার্হস্থ পরিবারের আর সব বাড়ির মতই আমাদের বাড়িতেও দু'টো উঠোন। একেবারে সামনের সারিতে গরুর ঘর এবং বসার ঘর, যাকে কাছারি ঘরই বলা হয়। তারপরে বিরাট উঠোন, যেখানে ধান মাড়াই, ধান শুকনোসহ নানা সাংসারিক কাজ করা হয়। একে বলা হয় বাহির বাড়ি। তারপরেই এক সারি টিনের ঘর। এ ঘরগুলোতেই সবার থাকার ব্যবস্থা। দু'ঘরের মাঝখান দিয়ে ভিতরের উঠোনে যাবার রাস্তা। এ ভিতরের উঠোনকে বলা হয় ভিতর বাড়ি। এ ভিতর বাড়ির পেছনের সারিতে রান্না এবং খাবারঘর। দু'পাশে আরও কয়েক ঘর। রান্না ঘরের পেছনে বিশাল বাঁশ ঝাড়, তারপরে পুকুর।

বিরাট একান্নবর্তী পরিবারে বছরে প্রায় দু'একজনের সন্তান প্রসব হয়। তাই সন্তান জন্মের জন্য একটি বিকল্প ব্যবস্থা রাখা আছে। সন্তান জন্মের প্রথম মাসটিতে অশৌচ পালন করে মাসহ সন্তানকে পৃথক করে রাখার ব্যবস্থা। যুদ্ধের জন্য বাবার পরামর্শে সেবার আর সন্তানজন্মের ঘরটিকে বাহির বাড়ি রাখা হল না। সকল সংস্কারের উর্ধ্বে উঠে নিজেদের নিরাপদ রাখতেই সে ব্যবস্থা করা হল ভিতর বাড়িতে।

সন্তান জন্মের পরে কিছু পারিবারিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করা হয়। সন্তান জন্মের ছ'দিনের দিন সন্ধ্যাবেলায় পাড়ার সবাইকে ডেকে বাতাসা-মিষ্টি বিতরণ করা হয়। এর নাম 'ছয়ষষ্ঠি'। উলুধ্বনি এবং সন্তানের মংগল কামনাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। এখানেও ছেলে এবং মেয়ে সন্তানের জন্য আয়োজনে এবং উলুধ্বনিতেও তারতম্য আছে। ছেলে সন্তান হলে বেশি উলুধ্বনির ব্যবস্থা। মেয়ে সন্তানের জন্য তার অর্ধেক।

সেবার আমাদের বাড়িতে কোনও আয়োজনের ব্যবস্থাই হল না। 'ছয়ষষ্ঠি'-র দিন উলুধ্বনির ব্যবস্থা করা হল, সেটিও খুব ক্ষীণস্বরে, যেন শব্দ বাড়ির বাইরে না যায়। কোনও রকমে একমাসের অশৌচ পার করে ঘরে তোলা হল মেয়েকে। ততদিনে কার্তিক মাস প্রায় শেষ হতে চলেছে। জল প্রায় শুকিয়ে গেছে। মাঠের পর মাঠে আমন ধানের শীষ জেগে উঠছে। জল প্রায় শুকিয়ে গিয়ে মাঠগুলোতে শুধু আধা হলুদ আর আধা সবুজ রঙয়ের সমারোহ। মাঠের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে যে জমিতে পাটের চাষাবাদ করা হয়েছিল, সে ফাঁকা মাঠে নানা রঙের শাপলা এবং জলজ ফুল ফুটে আছে।

বিল এলাকার আমন ধান জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ে। ফলে কোনও কোনও বছর আমন ধানের ডগা বিশ-ত্রিশ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়ে ওঠে। জল নামার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ আমনের ডগা আশপাশের জমিতেও নুয়ে পড়ে। ফলে ধান কাটার আগে জমির আইল চিনে নিয়ে পায়ে চলাচলের পথ তৈরি করাও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে অসম্ভব মাঠের ভিতর দিয়ে যাতায়াত করা।

তাই গ্রামের সঙ্গে থানা সদরের যোগাযোগ প্রায় অসম্ভবই এখন। গ্রামের খালগুলোর নাব্যতাও প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে জলের অভাবে। নদীর সঙ্গে সংযুক্ত বড় খালে তখন প্রচণ্ড ভাটির টান। থানা সদর থেকে খাল দিয়ে উজান স্রোত বেয়ে শুধু মাত্র গুন টেনেই কেবল নৌকা চলাচল সম্ভব।

তাই এত ঝক্কিঝামেলা পোহায়ে এলাকায় আনাগোনা ঝুকিপূর্ণ চিন্তা করেই হয়ত কালু রাজাকার এলাকা ছেড়ে থানা সদরে আস্তানা গেড়েছে। ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান শওকত আলীও এখন আর বাড়িতে থাকেন না। থানা সদরে মিলিটারির কাছাকাছিই চলে গেছেন। অন্য রাজাকারেরাও সঙ্গীসাথীর অভাবে একেবারে নিষ্ক্রিয়। মুক্তিবাহিনির ছেলেরা মাঝেমধ্যে থানা সদরের আশপাশে ছোটখাট অপারেশন চালাতে লাগল এ সুযোগে।

থানা সদরকে এড়িয়ে চলে অনায়াসে মুক্তাঞ্চলে চলাচল করা যায়। এ সুযোগে এলাকায় মুক্তিবাহিনিতে আরও রিক্রুট করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আওয়ামী লীগ ও বামপন্থী দলের নেতারা। হাইকমাণ্ড থেকে খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে চূড়ান্ত যুদ্ধ বেশি দেরী নয়। তাই সবার প্রস্তুতি যেন সেদিকেই।

মানিকগঞ্জ মহকুমা সদরে হালিম ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনির একটি দল বেশ তৎপর। ঘিওর-তেরশ্রী এলাকাতেও মুক্তিবাহিনির অনেকগুলো কমান্ড সক্রিয়। বাবা ও তাঁর ইস্কুল-কলেজের শিক্ষকবন্ধুরা ছাত্রদের নিয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন নিয়মিত। মুক্তিবাহিনি ও স্থানীয় মানুষের সহযোগিতায় ঘিওর-দৌলতপুর একরকমের অঘোষিত মুক্তাঞ্চলের মতই হয়ে গেছে এখন। পাকিস্তানি মিলিটারিরা থানা সদরে ক্যাম্প করেই কাটাতে লাগল। রাজাকারদের উৎপাতের খবরও তেমন নেই কোথাও। গ্রামের অনেকে ধরেই নিচ্ছে যুদ্ধ শেষ হতে আর দেরী নেই।

ঘিওর থানা সদর থেকে কয়েক মাইল দূরে ঝিটকা হাটে পাকিস্তানি মিলিটারি আক্রমণ বসল এক বৃহস্পতিবার। এলোপাথাড়ি গুলিতে প্রাণ হারাল হাটে ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে আসা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অনেক মানুষ। যারা ধরা পড়ল তাদেরকে হিন্দু কিনা পরীক্ষা করে প্রথমে আলাদা করা হল। রাজাকারেরা পাকিস্তান মিলিটারির তদারকিতে লুঙ্গি খুলে খুলে প্রায় শ'খানেক মানুষকে আলাদা করে নদীর পাড়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাল। তারপর

মিলিটারিরা গুলি এবং ব্রাশফায়ার করে মারল।

মৃতদেহগুলো পাশের নদীতে যখন ফেলে দিল তখন সন্ধ্যে পেরিয়ে গেছে। কেউ বেঁচে রইল কিনা সন্ধ্যার অন্ধকারে জানার উপায় নেই। হাত ও পা ধরে ধরে নিথর দেহগুলো নদীর কিনার থেকে রাজাকারেরা ছুঁড়ে ফেলছে নদীর জলে। আলো-আঁধারের অস্পষ্টতায় লাশগুলোর জলে পড়ার শব্দটুকুই কেবল ভেসে আসছে। সেই সঙ্গে পাকিস্তানী মিলিটারিদের উন্মত্ত অট্টহাসি।

দুপুরেই মুক্তিবাহিনির কাছে খবর পৌঁছে গেছে যে, পাকিস্তানি মিলিটারি ঝিটকা হাটে আক্রমণ করেছে। ঘিওর থানার কমাণ্ডার মুনসুর আলীর নেতৃত্বে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কয়েকটি গ্রুপ সংগঠিত হয়ে প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নিল তখনই। সিদ্ধান্ত হল ঝিটকা থেকে ঘিওর থানা সদরে মিলিটারির লঞ্চ ফিরে আসার পথে আক্রমণ করা হবে।

করজোনা গ্রামের কাছে যেখানে খাল নদীতে এসে পড়েছে তার থেকে একমাইল দূরে খালের দু'পাশ থেকে আক্রমণের সিদ্ধান্ত হল। দুপুরের পর থেকেই ছোট ছোট দলে মুক্তিযোদ্ধারা বাজারের থলিতে অস্ত্র-শস্ত্র গোলাবারুদ নিয়ে জমা করতে লাগল। বেশ কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে অল্প সময়ের প্রস্তুতিতে মুক্তিবাহিনি একটি ব্যাপক প্রতিরোধের পরিকল্পনায় অপেক্ষা করতে লাগলো করজোনা খালের দুইপাড়ে।

রাত আটটার দিকেই শুরু হল যুদ্ধ। পাকিস্তানি মিলিটারির দু'টি লঞ্চ করজোনার খালে ঢুকে পড়তেই মুক্তিবাহিনির অগ্রবর্তী প্রথম দলটি আক্রমণ করে বসল। লঞ্চ ততক্ষণে খালের ভিতরে মাইল খানিক চলে এসেছে। লঞ্চ দু'টি পাড়ে ভিড়িয়ে পাকিস্তানি মিলিটারিরা লঞ্চের সার্চ লাইট ঘুরাচ্ছে আর গুলি করছে। খালের অন্য পাড় থেকে মুক্তিবাহিনির অন্য দলটি গুলি শুরু করতেই পাকিস্তানি মিলিটারি বুঝে গেছে এক শক্ত আক্রমণের মুখে পড়েছে আজ।

ভারি অস্ত্রের গুলির শব্দে রাত্রির আকাশে তখন রোশনাই আলো। গুলি পাল্টা গুলি চলতে লাগলো প্রায় ঘন্টাখানিক। এর মধ্যে মিলিটারির দু'টি লঞ্চের একটির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বোঝা গেল। কয়েকজন চিৎকার দিয়ে লঞ্চ থেকে নদীতে পড়ে গেছে সে শব্দও খালের একটু দূরে বাঙ্কারের ভিতর থেকে শোনা গেল। এভাবে আরও এক ঘন্টা গোলাগুলীর পর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মিলিটারির লঞ্চ দু'টি চারদিকে গুলি করতে করতে একসময় ভরা খালের ভিতর দিয়ে তীব্র বেগে মুক্তিবাহিনির অস্ত্রের আওতার বাইরে চলে গেল। গোটাদশেক পাকিস্তানি সেনা খালের পানিতে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। লঞ্চের ভিতরেও হতাহত অনেক। বলা যায়, এক প্রকার পালিয়ে বাঁচলো পাকিস্তানি মিলিটারির আরও প্রায় অর্ধশত সৈন্য।

এক সময় লঞ্চের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল; সেই সঙ্গে গুলির শব্দও। তখন খালের দুইপাড় থেকে মুক্তিবাহিনির দু'টি দল রাত্রির অন্ধকার কাঁপিয়ে দিগন্ত মাতিয়ে শ্লোগান দিতে দিতে বের হল 'জয় বাংলা, জয় বাংলা'। নিজেদের পক্ষে কোন হতাহত ছাড়াই একটি সফল অপারেশনের খবর সে রাতেই সবখানে ছড়িয়ে গেল। সেই সঙ্গে ঝিটকার হাটে শত শত মানুষকে হত্যা করার খবরও।

আনন্দ বেদনার এক মিশ্র আবহে গোটা এলাকাজুড়ে এক থমথমে অবস্থা। পাশের গ্রামগুলো থেকে ঝিটকার হাটের গণহত্যায় নিহতদের খবর আসতে লাগল পরের দিন। লাশের খোঁজে অনেকেই এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। বাবার সঙ্গে বাড়ির যোগাযোগ নেই প্রায় সপ্তাহ দু'য়েক। করজোনা অপারেশনের খবর শোনার পর বাড়িতে সবাই নিশ্চিত হল যে, বাবা কাছাকাছিই আছেন।

তের.
তেরশ্রীর গণহত্যা

একদিন খুব ভোরে দক্ষিণের আকাশ লাল আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সামনের গ্রামের এক মাথা থেকে অন্য মাথা জুড়ে আগুনের শিখা। কাক ভোরেও প্রায় মাইলখানিক দূরের গ্রামের বাড়িগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। গ্রামের কারো আর বুঝতে বাকি রইল না যে, হিন্দু-অধ্যুষিত গ্রাম তেরশ্রীতে মিলিটারিরা আগুন দিয়েছে। তেরশ্রীর উত্তর দিকে পর পর দু'টি গ্রামে মুসলিম বসতি। তার উত্তর দিকের গ্রামটিই আমাদের। এরপর বেশক'টি গ্রামে হিন্দুদের বাস।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই তেরশ্রীতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে জমিদার রায়চৌধুরীদেও পৃষ্ঠপোষকতায়। পশ্চিম মানিকগঞ্জের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূতিকাগার হিসেবে পরিচিত এ তেরশ্রীর সঙ্গে তাই অত্র এলাকার শিক্ষিত মানুষজনের নাড়ির টান। দেশভাগ থেকে ভাষা আন্দোলন, আইয়ুববিরোধী আন্দোলন, ছয় দফা, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান সব কিছুতেই এ এলাকার অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। এর পেছনের ইতিহাস অনেক পুরনো। তার ধারাবাহিকতায় অত্র এলাকায় গড়ে উঠেছে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি বিরাট দুর্গ।

এতদিন তেরশ্রীতে নৌপথে আক্রমণের সাহস পায়নি পাকিস্তানি মিলিটারি ও তাদের এ দেশীয় দালালেরা। বিশেষ করে করজোনা যুদ্ধে পাকিস্তানি মিলিটারির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি তাদের মনোবল ভেঙে দিয়েছিল। তাই জল নেমে যেতেই থানাসদর থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরের এ তেরশ্রীতে আক্রমণ।

ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়তে না পড়তেই দক্ষিণ দিকের মুসলিম গ্রাম ছাড়িয়ে এদিকে চলে আসা শ' শ' নারী-পুরুষ-আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার লাইন চোখে পড়ল। সবাই যে যেভাবে ছিল সেভাবেই ঘুম থেকে উঠে পালিয়ে এসেছে। পরণের কাপড়টুকু ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসতে পারেনি। আমাদের গ্রামের বটগাছ ছাড়িয়ে কাঁচা হালটে উঠতেই ভোরের আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সবাইকে।

তেরশ্রী সেনবাড়ি থেকেই এসেছে প্রথমে পালিয়ে আসা এ মানুষগুলো। বাবার সঙ্গে সেনবাড়ির সম্পর্ক অনেকদিনের। বাবার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু কৃষ্ণ সেন। আমাদের পরিবারের অতি আপনজন কেষ্টকাকা। স্থানীয় একটি ইস্কুলের শিক্ষক। জন্মের পরেই পোলিও-তে আক্রান্ত হয়ে কেষ্টকাকার একটি পায়ে জোর নেই। তাই লাঠিতে ভর করেই হাঁটেন। প্রতিকূলতাকে জয় করার কথা উঠলেই বাবা সব সময় কেষ্টকাকার উদাহরণ টানেন। এত দৃঢ় ও প্রত্যয়ী মনোবল খুব কম লোকেরই দেখেছি, যা আছে কেষ্ট কাকার মধ্যে। যাত্রা-থিয়েটার খেলাধূলা সব কিছুতেই নিজের উপস্থিতি জানান দিতেই ভালবাসেন কেষ্ট কাকা। তাই সবকিছুতেই কেষ্ট কাকা যেন অনিবার্য।

বাবা তেরশ্রী আক্রমণের কথা শুনে প্রথমেই ভেবেছিলেন কেষ্ট কাকা ও তাঁর পরিবারের কথা। লাঠিতে ভর করে একজন মানুষকে ওই পালিয়ে আসা মানুষগুলোর মাঝে দেখতে পেয়ে বাবা আস্বস্থ হলেন যে কেষ্ট জীবন নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছে। ভোরের আলোতে বন্ধুকে স্পষ্ট দেখতে পেয়ে বাবা এগিয়ে গিয়ে কেষ্ট কাকাকে জড়িয়ে ধরলেন। কেষ্টকাকা, কাকিমা ও তাঁর দু'সন্তান পাশে দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। বাবা বন্ধুর হাত থেকে লাঠখানি

নিজের হাতে নিয়ে ডান বাহুটা বাড়িয়ে দিয়ে কেষ্টকাকাকে ধরে নিয়ে এগুতে থাকলেন বাড়ির দিকে। তখন পুবদিকে ভোরের আলোর উজ্জ্বল উপস্থিতি, দক্ষিণে আদিগন্ত আগুনের লেলিহান আভায় রাঙা। তখনও পালিয়ে আসা মানুষের ঢল পিঁপড়ের মত এদিকেই আসছে। গ্রামের সবাই যার যার পরিচিত মানুষজনকে নিজেদের বাড়িতে এনে আশ্রয় দিলেন। তেরশ্রী ও তার আশপাশের গ্রাম থেকে পালিয়ে আসা মানুষের এক জন-অরণ্যে পরিণত হল আমাদের এ ছোট্ট গ্রামটি। সেদিন তেরশ্রী ও তার আশপাশের গ্রামের হত্যাযজ্ঞের খবরে সবাই শিওরে উঠলো। কিছু রাজাকার অনেকদিন থেকেই সুযোগের সন্ধানে ছিল কখন মিলিটারি এনে তেরশ্রীর জমিদার বাড়ি, কলেজের অধ্যক্ষ-অধ্যাপকদের বাসভবন ও হিন্দু পাড়ায় আক্রমণ করানো যায়। মাঠ থেকে বর্ষার জল নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা এ সুযোগটি কাজে লাগিয়েছে। গভীর রাতে কয়েকশো পাকিস্থানি মিলিটারি জেলা ও থানাসদর থেকে এসে ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ হয়ে এ নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় আক্রমণ করেছে।

একটি দল জমিদার সিদ্ধেশ্বরপ্রসাদ রায়চৌধুরীর বাড়ির প্রাচীরের চারদিকে অবস্থান নিয়ে ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ার আগেই আক্রমণ শুরু করে। বিশাল প্রাচীর ঘেরা বাড়িটির অসংখ্য ঘর ও কুঠুরির খোঁজ অত সহজ কাজ নয়। তাই প্রথমেই মালী ও দারোয়ানদের বেঁধে ফেলে জমিদার ও তাঁর পরিবার কোন দিকে বাস করেন সে তথ্য নেয় স্থানীয় কিছু রাজাকার। তারপর দোতলার একটি ঘর থেকে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের সামনে থেকেই জমিদার সিদ্ধেশ্বরপ্রসাদ রায়চৌধুরীকে নিচে নামিয়ে নিয়ে আসে পরিচিত এক রাজাকার। পাকিস্তানি মিলিটারি জমিদার সিদ্ধেশ্বরপ্রসাদ রায়চৌধুরীকে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখে দক্ষিণ দিকের সিংহদরজার সামনে।

তখন চারদিকে সুনসান নীরবতা। এক বিশ্বস্ত মালী প্রতিবাদ করতেই তাকে মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি করে মেরে ফেলা হল। ভয়ার্ত মানুষের আহাজারিতে তখন জমিদার বাড়ির পরিবেশ ভারী। জমিদার বাড়ির দক্ষিণ দিকের চাতালের পরেই বিরাট দিঘি। দিঘির পশ্চিমাংশে তেরশ্রী বাজারের অনেকগুলো দোকান ঘর। দক্ষিণ দিকে তেরশ্রী ডিগ্রি কলেজ। পাশেই কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের কোয়ার্টার। বাজারের দোকান ঘরগুলোতে তখন আগুন দেয়া হয়েছে। কলেজ ও শিক্ষকদের কোয়ার্টারের একাংশও আগুনে পুড়ে যাচ্ছে, সেটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। থেকে থেকে আগুনের স্ফুলিংগ ও গুলির শব্দ রাতের শেষ প্রহরকে অস্থির করে তুলেছে। ভোরের পাখিরা ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে আর্তচিৎকারে।

তেরশ্রী ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ আতোয়ার রহমান প্রগতিশীল ও সংস্কৃতিমনা মানুষ। তাই এলাকার বাম-আন্দোলনের সবকিছুতেই তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা। কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রদেরও সক্রিয় অংশগ্রহণ শেখ মুজিবের ডাকে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে। ঢাকা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে ৬ দফা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার ঢেউ এসে পড়ে তেরশ্রীতেও।

সকাল বিকেল তেরশ্রী হাইস্কুল-কলেজ ও বাজারে ৬ দফার পক্ষে মিছিল। '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানেও তার ব্যতিক্রম নেই। ৭ মার্চে রেসকোর্স মাঠে শেখ মুজিবের 'যার যা আছে তাই নিয়েই প্রস্তুত থাকবা। এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যন্ত তেরশ্রীতেও যেন প্রস্তুতির ছোঁয়া। আর এ সব কিছুর পেছনের মানুষদের অন্যতম অধ্যক্ষ আতোয়ার রহমান এবং আরও বামঘেঁষা কিছু মানুষ।

স্থানীয় রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তানি বাহিনির কাছেও সে খবর আছে। তাই তেরশ্রী আক্রমণের প্রথম প্রহরেই তেরশ্রী ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষের বাসভবনে এ আক্রমণ। জমিদারের মত অধ্যক্ষ আতোয়ার রহমানকেও মিলিটারি হাত-পা বেঁধে তাদের কাছে নিয়ে এসেছে। তারপর অধ্যক্ষের বাসভবনসহ বাজারে আগুন লাগিয়েছে।

রাজাকার ও পাকিস্তানি মিলিটারির তৃতীয় দলটি বাজারের পশ্চিম দিকে হিন্দু পাড়ায় আগুন দিয়েছে। কয়েক কিলোমিটার জুড়ে আগুনের লেলিহান শিখা, আগুনের স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে ভয়ার্ত মানুষের আর্তচিৎকার, থেমে থেমে গুলির শব্দ নভেম্বর মাসের এ রাতটি যেন অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে এলাকাবাসীর কাছে।

ভোর হওয়ার আগেই পাকিস্তানি মিলিটারি চলে যাবে। ততক্ষণে জমিদার সিদ্ধেশ্বরপ্রসাদ রায়চৌধুরীকে জমিদার বাড়ির ফটকের সামনে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বসিয়ে রাখা হয়েছে। ধবধবে ফর্সা ছ'ফুট উচ্চতার এ দীর্ঘদেহী মানুষটি হয়তো এই প্রথম কারো কাছে এমন নতজানু হয়ে বসে আছেন।

নভেম্বর মাসের শেষদিকের এ রাতটি বেশ কুয়াশা আর হাওয়া দিচ্ছে। রাত্রির পোশাকেই ধরে আনা হয়েছে জমিদারবাবুকে। তাই বাইরের হাওয়ায় আর মৃত্যুভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছেন এ দাপুটে মানুষটি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে এ প্রত্যন্ত অঞ্চলে পড়ে রয়েছেন শুধু মানুষের কথা ভেবেই। জমিদারের খাজনা প্রথাও আর অবশিষ্ট নেই। তাই একমাত্র আয়ের উৎস বিপুল সম্পত্তি, যা পৈত্রিকসূত্রে পাওয়া। সে সম্পত্তির সিংহভাগই ইস্কুল কলেজ হাট বাজার দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য দান করে দিয়েছেন। বাকি আছে কয়েক হাজার বিঘা জুড়ে অবস্থিত বিশাল জমিদার বাড়ি ও তার আশপাশের বাগান-পুকুর। সিলেটের চা বাগান থেকে যা আয় আসে, সেটা দিয়েই জমিদার বাড়ির খরচ চলে, চলে এলাকার গরীব মানুষের সাহায্য সহযোগিতাও। তেরশ্রী হাইস্কুল ও কলেজের গরীব ও ভাল ছাত্রদের শুধু বিনে বেতনে পড়াশুনা নয়, বিনে খরচে থাকা-খাওয়ারও ব্যবস্থা করে দিয়েছেন জমিদার সিদ্ধেশ্বরপ্রসাদ রায় চৌধুরী।

এলাকাবাসীর কাছে তাই সিদ্ধেশ্বরপ্রসাদ রায়চৌধুরী যেন সাক্ষাৎ দেবতা। সেই অজাতশত্রু মানুষটি একবারের জন্যেও ভাবতে পারেননি যে, তাঁর বাড়িতে মিলিটারি আসবে। তাঁকে স্ত্রী পুত্র কন্যার সামনে অপদস্থ করে এমনভাবে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় রাত্রিতে খোলা আকাশের নিচে বসিয়ে রাখা হবে। শীতে কাঁপছিলেন জমিদার সিদ্ধেশ্বরপ্রসাদ রায়চৌধুরী। এক রাজাকার দয়া করে বাড়ির ভিতর থেকে একটি কম্বল এনে তাঁর গায়ে জড়িয়ে দিয়েছে। চোখ খোলা অবস্থায় দু'হাঁটু ভেঙে পড়ে আছেন তিনি। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দেখছেন তাঁর বাড়ির ভিতর থেকে মূল্যবান সামগ্রীগুলো স্থানীয় রাজাকারেরা নিয়ে যাচ্ছে; মন্দিরের ভিতর থেকে সোনা-দানাসহ বিগ্রহের গায়ে যা পড়ানো ছিল সব কিছুই খুলে খুলে নিচ্ছে। আগুনের আলোতে তেমন কাউকে স্পষ্ট চেনা না গেলেও এরা যে স্থানীয় রাজাকারবাহিনি সেটা তিনি বুঝলেন। জটলা পাকিয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে পাকিস্তানী মিলিটারি। কমান্ডার গোছের একজন হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে পুরো অপারেশনটার নেতৃত্ব দিচ্ছে। কতক্ষণ এভাবে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকতে হয় ভাবতে ভাবতেই সেই পাকিস্তানী কমান্ডার কয়েকজন রাজাকার ও সিপাহি নিয়ে জমিদার সিদ্ধেশ্বরপ্রসাদ রায়চৌধুরীর দিকেই এগিয়ে এলো। একটু দূরে দাঁড়িয়ে হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে বোঝালো

এক রাজাকারকে। তারপর সে রাজাকার দৌঁড়ে জমিদার বাড়ির ভিতর গেল। বেশ কিছু পরে আবার ফিরে এলো। হাতে টিনের একটি পাত্র। পাত্রটি নিয়ে পাকিস্তানী মিলিটারিদের কাছে এগিয়ে গেল। কিছু একটি নির্দেশনা পেয়ে জমিদার বাবুর কাছে এগিয়ে এলো আবার। জমিদার বাবুকে যেদিকে মুখ করে বসানো হয়েছিলে তার উল্টো দিকে থেকে তরল জাতীয় কিছু জমিদারের গায়ের কম্বলে ঢেলে দিল। দাহ্য পদার্থের ঝাঁঝালো গন্ধে গা গুলিয়ে উঠলো তার। জমিদার সিদ্ধেশ্বরপ্রসাদ রায়চৌধুরী বুঝে গেলেন, বাড়ির ভেতর থেকে কেরোসিনের টিন এনে তাঁর সারা গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে দেয়া হয়েছে।

তখনও গুলির শব্দ। আগুনের তীব্রতা কমে এসেছে। যুদ্ধ পরবর্তী এক ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা চারিদিকে। অধ্যক্ষ আতোয়ার রহমানকে হাত-পা বাঁধা অবস্থাতেই অধ্যক্ষের বাসভবনের পাশে গুলি করে মারা হয়েছে। বাজারের দোকান ঘরে ঘুমন্ত অবস্থায় মারা গেছে কয়েকজন। জমিদার বাড়ির মালীকে গুলী করে মারা হয়েছে পালানোর সময়। হিন্দু পাড়ায় ২০-২৫ জন মারা গেছে গুলিতে ও আগুনে পুড়ে। পাশের মুসলমান পাড়া থেকে কয়েকজন সেন পাড়ায় আগুন লেগেছে ভেবে এগিয়ে এলে তাঁরাও মিলিটারির গুলিতে মারা পড়েছে। বেঁচে থাকা মানুষগুলো পালিয়েছে আশপাশের জঙ্গলে। কেউ কেউ রাত্রের অন্ধকারে যে দিকে পারে পালিয়ে বেঁচেছে।

অপারেশন প্রায় শেষ। পুবদিকে সূর্যের আলো উঁকি দিচ্ছে। মিলিটারি এখনই চলে যাবে। ভিন্ন ভিন্ন দলে ছড়িয়ে পড়া রাজাকার ও পাকিস্তানি মিলিটারিরা সবাই জমিদার বাড়িতে এসে জড়ো হয়েছে। জমিদার সিদ্ধেশ্বরপ্রসাদ রায়চৌধুরী তখনও গায়ে কম্বল জড়িয়ে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বসে আছেন। কম্বল কেরোসিনে ভেজা। ছিটিয়ে দেয়া কেরোসিন তেলে জমিদারের মাথার চুল ও মুখমণ্ডলও ভিজে গেছে। অপারেশন শেষে সবাইকে একত্রে পেয়ে সেই মিলিটারি কমান্ডার প্রস্তুতি নিচ্ছে চলে যেতে।

সবাই নিরাপদে ফিরে এসেছে কিনা সেটা আবারও নিশ্চিত হয়ে নিল শেষ মুহূর্তে। তারপর পাকিস্তানী মিলিটারির একজনকে ডেকে নিয়ে নির্দেশনা দিল। কমান্ডারের নির্দেশনা পেয়ে পকেটে থেকে কিছু একটা বের করে ছুঁড়ে দিল হাত-পা বাঁধা জমিদার সিদ্ধেশ্বরপ্রসাদ রায়চৌধুরীর দিকে। মুহূর্তেই আগুনের কুণ্ডলিতে পরিণত হলেন জমিদার সিদ্ধেশ্বরপ্রসাদ রায়চৌধুরী। যে মাটিকে ভালবেসে তিনি কলকাতা ছেড়ে এসেছিলেন, সেই মাটির উপরেই আগুনের লেলিহান শিখায় জ্বলে পুড়ে ছটপট করে করে অবশেষে ছাই হয়ে মাটির সঙ্গেই এক সময় মিশে গেলেন তিনি।

চোদ্দ.
স্বাধীনতার দোরগোড়ায় বাংলাদেশ

নভেম্বর মাসের ২৩ তারিখে তেরশ্রীতে এত বড় হতাহতের খবরে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ভয়ানক উত্তেজনা কাজ করছে। বিশেষকরে অধ্যক্ষ আতোয়ার রহমান ও জমিদার সিদ্ধেশ্বরপ্রসাদ রায়চৌধুরীর হত্যাকাণ্ড কিছুতেই মুক্তিযোদ্ধারা মেনে নিতে পারছে না। মাত্র মাস দুই আগে করজোনা যুদ্ধে পাকিস্তানি মিলিটারির যে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল,তার প্রতিশোধই নিল দেশীয় রাজাকারদের সহায়তায় তারা। তেরশ্রীর হত্যাযজ্ঞে সবাই হতচকিত। পুরো মানিকগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে থাকা মুক্তিযোদ্ধারা আবার প্রতিশোধ নেওয়ার অপেক্ষায় বসে আছে। যে করেই হোক ঘিওর থানা আক্রমণ করে তেরশ্রী হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতেই হবে।

পাকিস্তানী মিলিটারিরা বর্ষায় অনেকটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তাদের চলাচল সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল থানা সদরেই। থানা সদর থেকে দূরের গ্রামগুলোতে ছিচকে রাজাকার-আলবদরদের উৎপাত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপরেই বেশি চলত। কালেভাদ্রে পাকিস্তানী সেনারা বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে আক্রমণে যেত। করজোনা বাজারে পাকিস্তানী সেনাদের ক্ষয়ক্ষতিতে জেলা সদর থেকে আরও সেনা থানা সদরে জমা হয়েই তেরশ্রীর হত্যাযজ্ঞ ঘটায়।

পশ্চিম মানিকগঞ্জের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ মানিকগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় ক্যাপ্টেন হালিম চৌধুরীর নেতৃত্বে অনেকগুলো সফল অপারেশন হল। মানিকগঞ্জ মহকুমার উত্তরেই টাংগাইল জেলা। টাঙ্গাইলে কাদেরিয়াবাহিনির ঘাঁটি। টাঙ্গাইলের দক্ষিণ দিকে নাগরপুর থানা। নাগরপুরে কাদেরিয়াবাহিনির শক্ত অবস্থান কমান্ডার বাতেনের নেতৃত্বে। মধুপুর, ঘাটাইল, বাশাইলেও কাদেরিয়া বাহিনির শক্ত ঘাঁটি। মির্জাপুরের দানবীর রণদাপ্রসাদকেও তেরশ্রীর জমিদারের মতই নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাই মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বড় একটি অপারেশনের জন্য প্রস্তুতি চলছে। সে অপারেশন আর হল না। দেখতে দেখতে ডিসেম্বর মাস চলে এলো। ভারত-পাকিস্তানের বিরোধও প্রকাশ্য আকার ধারণ করেছে। যে কোন সময়ে দুই দেশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। বর্ষার জল শুকিয়ে চলাচলের ব্যবস্থাও ভাল হয়েছে অনেকটাই। ডিসেম্বরের শুরুতেই পাকিস্তানী সেনাদের গতিবিধি তেমন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। স্থানীয় রাজাকার-আলবদরসহ শান্তিকমিটির লোকদের আনাগোনাও সীমিত। থানা সদরে শান্তিকমিটির অফিস অধিকাংশ সময়েই বন্ধ থাকে। অফিসের টিনের বেড়ার পাশে বংশদণ্ডের উপরে পাকিস্তানী চাঁদতারা অঙ্কিত পতাকাটিই আছে শুধু। পতাকার রঙ রোদে-জলে পুড়ে মলিন হয়ে গেছে। বাঁশে লাগানো দড়িটিও ধুলোময়লায় পুরনো হয়ে গেছে। অফিসের বাইরে থেকেই বোঝা যায় অনেকদিন কেউ অফিসটি খুলেনি।

অথচ মাসখানিক আগেও রাজাকার-আলবদরদের নিয়মিত দেখা যেত এ অফিসে। শওকত চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের প্রেসিডেন্ট যারা পদাধিকারবলে নিজ নিজ ইউনিয়নের সভাপতি তাদের সপ্তাহে একবার হাজিরা দিতে হত। কখনও কখনও থানায় অবস্থিত পাকিস্তানী মিলিটারি ক্যাম্পেও শান্তি কমিটির সভা হত।

অথচ ডিসেম্বরের প্রথম থেকেই সব কিছুতে ভাটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মহকুমা ও থানা সদরে থাকা পাকিস্তানি মিলিটারিদের অপারেশনও প্রায় স্তিমিত হয়ে এসেছে। টাঙ্গাইল থেকে কাদেরিয়াবাহিনির সাফল্যের খবর শোনা যাচ্ছে। একদিন খবর এলো একদল পাকিস্তানি মিলিটারি টাঙ্গাইল থেকে নাগরপুর-দৌলতপুর হয়ে ঘিওরের দিকে আসবে। মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ইউনিটের কাছে সে খবর ছড়িয়ে যেতেই সবাই আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিল। দৌলতপুর থেকে ঘিওরের আসার একটি মাত্রই কাঁচা সড়ক। ঘোড়ার গাড়িই চলাচলের একমাত্র বাহন। মাঝখানের কালীগঙ্গা নদী। নদী পারাপারের একমাত্র মাধ্যম খেয়া নৌকা। চলাচলের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে আগে থেকেই এখানে দেশীয় রাজাকার-আলবদর বাহিনিকে প্রস্তত রেখেছে মিলিটারিরা। তাই এ জায়গাটি আক্রমণের তালিকা থেকে বাদ দিতেই হয়েছে।

ঘিওরে বাজারে ঢোকার আগেই একটি বিশাল গ্রাম কুস্তা। প্রায়

চার-পাঁচ কিলোমিটারের এ গ্রামটি মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। এখানেই সন্ধ্যার একটু আগে পাকিস্তানি মিলিটারিদের বিশাল একটি বহরের উপর আক্রমণ করা হল। টাংগাইলের যুদ্ধে টিকতে না পেরে একটু ঘুরপথে দৌলতপুর-ঘিওর হয়ে মানিকগঞ্জের মহকুমা সদরে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে যোগ দিতেই এ পথে আসা। আগে থেকেই দৌলতপুর ও ঘিওরের রাজাকার-আলবদরেরা পাকিস্তানিদের সোর্স হিসেবে কাজ করত।

তেরশ্রী বাজারের হত্যাকাণ্ডের পরে রাজাকারদের প্রতি সাধারণ জনগণের প্রতিরোধের ঘটনা ঘটে গেল অনেকগুলো। প্রায় দিনই শোনা যেতে লাগল, অমুক গ্রামের রাজাকারকে গনপিটুনি দেওয়া হয়েছে, অমুক গ্রামে রাজাকারকে জুতার মালা পরিয়ে বাজারে ঘোরানো হয়েছে। এ সব ঘটনায় একটি লাভ হল, ছিচকে রাজাকার-আলবদর ও শান্তিকমিটির লোকেরা এক প্রকার গা-ঢাকা দিলো। ফলে, পাকিস্তানি মিলিটারিদের সোর্স আর কেউ রইলো না।

এ সুযোগটাই কাজে লাগালো মুক্তিযোদ্ধারা। কুস্তা গ্রামের প্রবেশ পথেই সামনে থেকে অকস্মাৎ আক্রমণ করে বসলো মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল। মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ স্থল হিসেবে এমন একটি অবস্থানের জন্যেই বেশ ক'দিন যাবৎ অপেক্ষা করেছিল। একদিকে কালীগঙ্গা নদী, অন্যদিকে বিশাল কলিঙ্গ বিল। মাঝখান দিয়ে ঘিওর-দৌলতপুরের সংযোগ সড়ক। কালীগঙ্গা নদী আর কলিঙ্গ বিলের জল চলাচলের জন্যে একটি পাকা সেতু। রাজাকারদের দিয়ে এ সেতুতে পাহারা বসানো হত সারা বছরই। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ পাহারা দেওয়ার মত রাজাকার পাওয়া যাচ্ছিলো না। ঠিক এ সুযোগটিই কাজে লাগিয়েছে মুক্তিযোদ্ধারা।

দুপুরের ঠিক আগে যুদ্ধ শুরু হল। থানা সদর থেকে পাকিস্তানি মিলিটারির আরেকটি দল এসে যখন যোগ দিলো, তখন প্রায় অন্ধকার নেমে এসেছে। কয়েক ঘণ্টার যুদ্ধে পাকিস্তানি মিলিটারির পাঁচজন মারা গেল। আহত কয়েকজনকে রেখেই মিলিটারিরা পালিয়েছে ঘিওর থানা সদরের দিকে।

সে রাত্রেই মহকুমা সদর থেকে আরও বিশাল একটি বহর এসে থানা সদর থেকে সমস্ত মিলিটারিদের সরিয়ে নেয়ায় ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহেই ঘিওর এলাকাটি মুক্ত এলাকায় পরিণত হল। তখনও ইন্দিরা গান্ধী পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধ ঘোষনা করেননি।

ভারত এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে। তাই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জাতিসঙ্ঘসহ বিভিন্ন বিশ্ব ফোরামে বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে কথা বলেন। সোভিয়েট ইউনিয়ন, জাপানসহ ইউরোপিয়ান দেশগুলো পাকিস্তানের বিপক্ষে কথা বলে আসছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও চিন পাকিস্তানকে প্রচ্ছন্ন সমর্থন দিয়ে এসেছে সেই মার্চ মাস থেকেই।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী আগস্টের ৯ তারিখে যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সামরিক চুক্তি করে, তখন থেকেই সবাই আশঙ্কা করেছিল যে কোনও সময় ভারত সামরিক শক্তি প্রয়োগ করবে। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র ও চিন যদি পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে ভারত আক্রমণ করে তবে সোভিয়েত রাশিয়া ভারতে পক্ষে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে নামবে। এটাই আগস্ট মাসের ভারত-সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক চুক্তির মোদ্দা কথা।

ভারতীয় সেনাবাহিনির পূর্বাঞ্চলের কমান্ডার লে. জেনারেল জ্যাকবের পরামর্শ মতে ভারত অপেক্ষা করেছিল শুকনো মরশুমের। কারণ, এমনিতেই গাঙ্গেয় এ ব-দ্বীপ অঞ্চলে জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত বেশ বৃষ্টিপাত হয়। পূর্ব -বাংলার অধিকাংশ নদ-নদী এ সময়ে বর্ষার জলে ভরপুর থাকে। বিশেষত রাজধানী ঢাকার চারিদিকেই নদ-নদী। যমুনা ও পদ্মা নদী প্রমত্তা থাকে এ সময়ে। তাই প্রবল খরস্রোতা নদী দু'টো পারাপার হয়ে ঢাকা ও আশেপাশে সৈন্য সমাবেশ অত সহজ নয়।

মুক্তিযোদ্ধাসহ সবাই তাই ডিসেম্বরের প্রথম দিকেই ভারতের প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ গ্রহনের কথা ভেবে রেখেছিল। কিন্তু ভারত কূটনৈতিক কারণেই প্রথম আক্রমণ না করে একটি অজুহাত খুঁজছিল। ডিসেম্বরের ৩ তারিখে পাকিস্তান নিজেই ভারতের হাতে সে উপলক্ষটা তুলে দিল।

ডিসেম্বর মাসের ৩ তারিখে পাকিস্তানি বিমান ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের ১১টি বিমান ঘাঁটিতে আক্রমণ করে বসলো। বিকেল ৫টা ৪০ মিনিটে একযোগে অমৃতসর ও পাঠানকোট বিমান ঘাঁটিতে পাকিস্তানি বিমান আক্রমণ করল। ভারতের তেমন প্রস্তুতি যে ছিল না সেটা বোঝা গেল পাকিস্তান এক ঘন্টা ৫০ মিনিটের মধ্যে আম্বালা, আগ্রা, অবন্তিপুর,বিকানার,হাল্বারা, যোধপুর, জয়সালমার, ভুজ ও শ্রীনগরে বিনা প্রতিরোধেই আক্রমণ করে ফিরে যায়।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মধ্যরাতের কিছু পরে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানের বিপক্ষে যুদ্ধে নামার ঘোষণা দিলেন। সেই রাতেই বিমান, নৌ ও পদাতিক ফ্রন্টে ভারত পাকিস্তানকে আক্রমণ করে। পাকিস্তান ভেবেছিল প্রথম বিমান আক্রমণ করে ভারতের বিমান ঘাঁটির রানওয়েগুলোকে অকেজো করে দেবে। কিন্তু কার্যত হল উল্টো। ভারত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিমান ঘাঁটিগুলোকে মেরামত করে পাল্টা আক্রমণ করল। পাকিস্তানের পশ্চিম ফ্রন্টের বিমানবাহিনি কার্যত অচল হয়ে গেল ৩ তারিখ রাতেই। পূর্বাঞ্চলেও ঢাকার কুর্মিটোলা বিমানবন্দর ভারতের বিমানবাহিনির আক্রমণে তছনছ হয়ে গেল।

পদাতিক বাহিনিও পশ্চিমাঞ্চলের পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের অনেক ভিতরে ঢুকে গেছে বলে দাবি করছে। ৩ তারিখ রাত থেকে পূর্বাঞ্চলে ভারতের বিমানবাহিনি ও পদাতিক সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় দ্রুত গতিতে ঢাকার দিকে অগ্রসর হচ্ছে সে খবরে সবাই খুব উৎফুল্ল। ডিসেম্বরের ৯ তারিখ থেকেই সবাই অপেক্ষা করছে কবে পাকিস্তান যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে নেবে। ঢাকার আশপাশ ব্যতীত দেশের অধিকাংশ এলাকা মুক্তিবাহিনি ও ভারতের সেনাবাহিনি, যাকে মিত্রবাহিনি বলা হয়, তাদের দখলে। দেশের প্রতিটি জেলা ও মহকুমা সদর থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনি ঢাকার দিকে ফিরে যাচ্ছে। এতদিন রাজাকার-আলবদর ও শান্তিকমিটির সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল, তাদের আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কোথাও কোথাও মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকারদের ধরে ধরে মেরে ফেলছে সে খবরও পাওয়া যাচ্ছে।

ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। মুক্তিযোদ্ধারা স্থানীয় কমান্ডারদের নেতৃত্বেই যুদ্ধ করেছে। তখনও মানুষের মধ্যে চাপা উত্তেজনা। নিভে যাওয়ার আগে আগুনের যেমন শেষ লেলিহান ভয়ঙ্কর হয়। সবার আশঙ্কাও সেটি। রাজাকারেরা কখন শেষ কামড়টি দেয়।

এ আশঙ্কার মধ্যেই ডিসেম্বরের ১৬ তারিখ রেডিওতে শোনা গেল পাকিস্তানি বাহিনি আত্মসমর্পণ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার খবর যখন এলো তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে বেশ রাত। মার্চ মাস থেকে ডিসেম্বর, মাত্র ন'টি মাস। কিন্তু এ ন'মাসকে মনে হয়েছে

দীর্ঘ ন'টি বছর। মৃত্যুর আশঙ্কা যখন নিত্যদিন বহে নিতে হয়, তখন সেটি মৃত্যুর চেয়েও কম কিছু নয়। এই দীর্ঘ ন'মাস তাই এ অঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায় অধ্যুষিত গ্রামগুলো প্রকারান্তরে শ্মশানেই পরিণত হয়েছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সংবাদে তাই ঘাম দিয়ে জ্বর ছুটে গেল।

সেদিন রাতেই বাবা তার বন্ধুদের নিয়ে বাড়িতে এলেন। মধ্যরাত পর্যন্ত এক খুশির আবহ আমাদের বাড়িতেও। শোক, দুঃখ এবং ভিতরের জ্বালাযন্ত্রণা ভুলে সবাই এ বিজয়কে উদ্‌যাপনে ব্যস্ত। যেন কারোও তর সইছে না আর।

পনেরো.
আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি

১৭ ডিসেম্বর সকাল হতেই নানা আয়োজন। আমাদের গ্রামের বাড়ি থেকে ঘিওর থানা সদরের দূরত্ব প্রায় পাঁচ কিলোমিটার। সিদ্ধান্ত হল এই পাঁচ কিলোমিটার পথ মিছিল করে থানা সদরের বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেবে। সকাল আটটার মধ্যেই আমাদের গ্রাম থেকে পঞ্চাশ-ষাট জনের একটি দলের প্রথম মিছিল শুরু হল। আমার তখন পাঁচ বছর মাত্র। বাবা প্রথমে আপত্তি করলেও মা ও বড়মার কথায় আমাকেও সঙ্গে নিতে হল। বাবা তো আছেনই,সঙ্গে দু'জন জেঠামশাই । আরও কয়েকজন জেঠাতো দাদাও যাবে সঙ্গে। তাই হেঁটে বা কোলে বা ঘাড়ে করে আমাকে নেয়া যাবেই, সে জন্যেই হয়ত বাবা আর আপত্তি করলেন না।

আমাদের গ্রামের পরেই বহেরাতলি। ঢাকা থেকে কটি পরিবার যুদ্ধের ন'মাস এ গ্রামেই আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের মধ্যে একটি পরিবারের কয়েকজন মেয়ে ভাল গান-বাজনা করত। বাবার কথায় একটি হারমোনিয়াম কাপড়ের সঙ্গে বেধে গলায় ঝুলিয়ে নেয়া হল। সারা রাস্তায় জাতীয় সংগীত ও শ্লোগান দিতে দিতে যাবে বিজয় উৎসবের এ মিছিলটি।

'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' জাতীয় সংগীতটি তখন সবার মুখে মুখে। সেই সঙ্গে গগনবিদারী শ্লোগান, 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু', 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা'। বহেরাতলি থেকেই মিছিলটি যেন জনস্রোতে পরিণত হল। জাতীয় সংগীত ও জয় বাংলা শ্লোগান শুনে আশেপাশের গ্রামগুলো থেকেও মানুষ জড় হতে থাকলো মিছিলে। ডিসেম্বর মাস। রোদের তেমন তেজ নেই। গ্রামের পাশ দিয়ে চলা নিচু রাস্তাগুলো তখন বর্ষার জল নেমে শুকিয়ে গেছে। মিছিলের প্রথম থেকে শেষ দেখা যায় না। বাবার সঙ্গে আমিও হাঁটছি। কখনও জেঠাতো দাদাদের, কখনও বা বাবার ছাত্র-ছাত্রীদের হাত ধরে চলছি মিছিলের সঙ্গে। ক্লান্ত হলে কারো কোলে বা কাঁধে শক্ত করে বসে চলেছি ঘিওর থানা সদরের বিজয় মিছিলে।

তেরশ্রী বাজারে পৌঁছতেই জমিদার বাড়ি থেকে পাকিস্তানিদের হাতে নিহত জমিদার সিদ্ধেশ্বরপ্রসাদ রায়চৌধুরীর বিধবাপত্নী যাকে সবাই কর্ত্রীমা বলে সম্বোধন করেন, তিনি যোগ দিলেন মিছিলে। তেরশ্রী বাজার পেরিয়ে হাইস্কুলের মাঠে পৌঁছুতেই হেডমাস্টার আব্দুল হাকিমের নেতৃত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হল। ইস্কুলের পতাকার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের লাল-সবুজের পতাকাও তোলা হল। সঙ্গে জাতীয় সংগীত এবং 'জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু' শ্লোগান। অনুষ্ঠানটি সংক্ষিপ্ত করা হল ঘিওরের প্রধান অনুষ্ঠানের জন্য।

তেরশ্রী থেকে ঘিওরের দূরত্ব প্রায় দুই কিলোমিটার। একটি কাঁচা সড়ক চলে গেছে সোজাসুজি। হাজার হাজার মানুষের মিছিলটি এই দু'কিলোমিটার সড়কের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। বিশাল মিছিলটি যখন লোকে লোকারণ্য ঘিওর থানা মাঠে প্রবেশ করলো তখন দুপুর প্রায় গড়িয়ে যাচ্ছে।

এক পাশে ঘিওর কলেজ, অন্যদিকে ঘিওর থানা সদর। বিশাল এ মাঠটিতে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। বাবার সৌজন্যে আমিও প্রায় সামনের দিকে বাবার হাত ধরেই রইলাম। প্রথম থানার গেইটে পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে আগুনে পোড়ানো হল। তারপর এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। হাজার হাজার মানুষের কণ্ঠে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'।

জাতীয় সংগীতের সঙ্গে মানুষের দুর্নিবার আবেগ। যুদ্ধের ন'মাস শুধু নয়, দীর্ঘ পঁচিশ বছরব্যাপি একটি স্বাধীন দেশের জন্যে তিলতিল করে গড়ে ওঠা স্বপ্ন। সে স্বপ্নের পথে কত আত্মত্যাগ। কত রক্ত। কত জেল-জুলুম-হুলিয়া। ১৯৪৭ সালের ভারতভাগে পূর্ববঙ্গের মানুষের মতামতের কোনও স্থানই ছিল না। অথচ এ পূর্ববাংলার মানুষ তো হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে একই বাংগালি জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত। সেই জাতীয়তাবাদী চেতনাকে পুঁজি করেই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লিগ এ বাংলার মানুষকে স্বাধীকারের পথে উদ্বুদ্ধ করেছে। সঙ্গে বামরাজনীতিকেরাও ছিলেন তাঁদের অসম্প্রদায়িক চেতনা এবং বৈষম্যহীন সমাজ নির্মাণের রাজনীতি নিয়ে। আজ তাই যেন সবারই বিজয়। একটি সুদূর প্রসারী চিন্তাচেতনার দরজা খুলে গেল। পুবদিক থেকে দিনের প্রথম স্নিগ্ধ আলোর আভা গোটা বাংলাদেশের মুখে। সারা বাংলাদেশের ক্ষতবিক্ষত মলিন ধ্বংসস্তুপের উপরে পড়া আলোর কিরণ যেন আজকের আবহকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। তাই তো অঝরে কাঁদছে অনেকেই জাতীয় সংগীতের কথা ও সুরের সঙ্গে সঙ্গে। পাশে ফিরে দেখলাম বাবার চোখেও জল। কমান্ডার আব্দুল হাকিম বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলছেন, 'তোকে একদিন বলছিলাম না, এই জাতিকে কেউ দাবায়ে রাখতে পারবে না'।

৭ই মার্চের শেখ মুজিবের ভাষণে উল্লেখ করা 'বাঙ্গালিরে কেউ দাবায়া রাখতে পারবা না' কথাটি সারা বাংলাদেশে সবার মুখেমুখে।

নানা আনুষ্ঠানিকতা শেষে বিজয় দিবসের প্রথম অনুষ্ঠানটি যখন শেষ হল তখন বিকেল গড়িয়ে গেছে। দেশ স্বাধীন হলেও রাজাকার-আলবদরেরা হয়তো লুকিয়ে আছে কোথাও কোথাও, সে কথাটিও মাইকে ঘোষণা করা হল। সভাটি সন্ধ্যা হওয়ার আগেও শেষ করা হল যেন সবাই অন্ধকার নামার আগেই বাড়িতে পৌঁছতে পারে। আমরাও রাত নামার আগেই বাড়িতে ফিরে এলাম।

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশে ফিরে এলেন শেখ মুজিব ১০ই জানিয়ারি। বিভিন্ন এলাকায় তখন রাজাকার-আলবদরদের চিহ্নিত করে করে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। কাউকে কান কেটে দিয়ে, কাউকে মেরে ফেলে, আবার কেউ কেউ ক্ষমা চেয়ে প্রাণে বাঁচতে মরিয়া। যাদের কোনওদিন সম্মুখ যুদ্ধে দেখা যায়নি, স্বাধীনদেশে তারা কেউ কেউ মুক্তিযোদ্ধা সেজে বিভিন্ন রকম অপকর্ম করতে শুরু করে দিল। তখন প্রায় সবার হাতেই যুদ্ধের সময়ের সহজলভ্য অস্ত্রশস্ত্র। প্রসাশন তখন নেই বললেই চলে। বিভিন্ন স্থানে ডাকাতির ঘটনা শোনা যেতে লাগলো। যে টাঙ্গাইল জেলা থেকে এক সময় কাদেরিয়াবাহিনির যুদ্ধ-গৌরবের গাঁথার সংবাদ আসত; সেখানেই শোনা যেতে লাগলো নানারকম অপরাধের ঘটনা। বাবা ও তার বন্ধুরা এলাকাকে নিরাপদ রাখতে

সচেষ্ট হলেন। যারা রাজাকার আলবদরবাহিনিকে সহায়তা করেছিল, তাদেরকে যেন কেউ থানায় সোপর্দ না করে নিজেরা প্রতিশোধ না নেয় সে ব্যাপারে কড়া নির্দেশনা দেওয়া হল মুক্তিযোদ্ধাদের।

যুদ্ধের সময়ে জন্ম আমার ছোট বোনটিও তখন ছয় মাসের। মা অস্থির হয়ে গেলেন কলকাতায় থাকা তার আত্মীয়স্বজনের খোঁজে। খবর এসেছে ভারতে মামা বাড়িতে সবাই জেনে গেছে বাবাকে মিলিটারিরা মেরে ফেলে গ্রামের বটগাছে ঝুঁলিয়ে রেখেছে। মৃত্যুর খবর নাকি বাতাসে ছড়ায়। সে বাতাসের খবর যে ভুল সেটা প্রমান করতে অবশেষে বাবা ফেব্রুয়ারি মাসেই কলকাতা রওনা হয়ে গেলেন। প্রথমে তার ছোটবেলার বন্ধু অমলের কাছে বারাসাতে, সেখানে কিছুদিন থেকে নদীয়া জেলার চন্দননগরের তারকনগরে গ্রামে আমার দাদুর বাড়ির উদ্দেশ্যে।

ষোল.

জয় বাংলা থেকে নকশাল আন্দোলনের ভূমিতে

রাণাঘাট থেকে গেদের ট্রেনে বাগুলি স্টেশনে নেমে বাবার মনে হল যেন পূনর্জন্ম পেয়েছেন। ফরিদপুরের শরণার্থীদের যে দলটি সদ্য স্বাধীন 'জয় বাংলা'য় ফিরে যাচ্ছিলেন তাঁরা সাহস করে এগিয়ে না এলে বাবাকে নকশাল ভেবে এতক্ষণ কলকাতার জেলে পাঠিয়ে দিত ভারতের প্যারামিলিটারি বাহিনি। বারাসাতের অমল কাকুর কথারই সত্যতা টের পেলেন বাবা। কিভাবে হাজার হাজার অল্প বয়েসী ইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেগুলোকে জেলখানায় ভরে রেখেছে ইন্দিরা গান্ধীর জাতীয় কংগ্রেসের রাজ্য সরকার।

মাত্র কিছুদিন হল সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে মুখ্যমন্ত্রীত্বে বসিয়েছেন ইন্দিরা গান্ধী। বাংলা কংগ্রেস ও ক্ষমতার স্বাদ-পাওয়া কিছু বামপন্থী দলের যে কোয়ালিশন, যার নেতৃত্বে ছিলেন অজয় মুখার্জি, তাদের দ্বারাই সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হয়েছেন কানু সান্যাল-চারু মজুমদারের নকশাল সমর্থকেরা। বাবার আগেই মনে হয়েছে এ কথাটি। কমিউনিজম যদি সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্যেই হয়, তবে এই সোভিয়েতপন্থী আর চিনাপন্থীদের মধে এত হিংসাদ্বন্দ্ব কেন?

কিছুদিন আগে যে নির্বাচন হল সে নির্বাচনে আবার একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ক্ষমতায় এসেছে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে যারা ক্ষমতায় সেই জাতীয় কংগ্রেস। যদিও জাতীয় কংগ্রেসের রাজ্যক্ষমতায় আসার আগেই দমন-পীড়নের মাধ্যমে নকশাল আন্দোলনকে কোন ঠাঁসা করে ফেলা হয়েছে। আর সে কাজটি করেছে অজয় মুখার্জি আর মার্ক্সবাদী কমিউনিস্টদের কোয়ালিশন।

হাজার হাজার তরুণ-যুবককে নকশালদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে যোগসাজসের অভিযোগে জেলে ভরে রাখা হয়েছে। অনেক মেধাবী তরুণ-যুবা নকশালবাড়ির অনুপ্রেরণায় সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ নিয়ে আত্মাহুতি দিয়েছেন। পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন অনেকেই। জেলে থাকা বন্দীদের প্রায় আশি ভাগের বয়সই বিশ বছরের নিচে। ইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া এই লক্ষ-লক্ষ ছেলেমেয়েদের সবাই যে নিবিত্ত বা মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান তেমনটি নয়। মেধাবী অথচ উচ্চবিত্তের শহুরে তরুণযুবাদের একাংশেরও স্বতোঃপ্রণোদিত অংশ গ্রহণ এই নকশাল আন্দোলনে। সেটিকেও ভয়ের কারণ হিসেবে নিয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের এ আন্দোলন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়বার আশঙ্কাতেও ভীত ছিলেন ইন্দিরা কংগ্রেসের নেতারা।

তাই এ সম্ভাবনাময় শক্তিকে দূর্বল করার পরিকল্পনা করেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। আর তার প্রধান উপায় আন্দোলনকে নেতৃত্বশূন্য করা। সে ছকেই তিনি বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনিকে নামিয়েছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সহায়তা দানের জন্য অনেক আগে থেকেই পূর্বাঞ্চলে নামানো হয়েছিল এ বাহিনি। এখন এক ঢিলে দুই পাখি মারলেন ইন্দিরা গান্ধী।

মাত্র ক'মাস আগে ইতিহাসের নজিরবিহীন এক জয় পেয়েছে ভারত। পাকিস্তানের এক লক্ষের মত একটি বিশাল বাহিনি এভাবে আত্মসমর্পণ করবে সেটি অনেকের কাছেই একটু আশ্চর্য লেগেছে। হাজার পনেরো ভারতীয় সেনাও নিহত হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। পূর্বাঞ্চলের সেনাকমান্ডের মনোবল এখন তুঙ্গে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সরকার পূর্বাঞ্চলের এ সামরিক-আধাসামরিক বাহিনি দিয়েই নকশাল দমন করতে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলেই সবাই মনে করছে।

নকশালবাড়িতে শুরু হওয়া আন্দোলন অনেকটাই স্তিমিত। গ্রেফতারের ভয়ে অনেকেই পালিয়ে বাড়াচ্ছেন। অনেক কমরেডকেই রাজ্য সরকারের কোয়ালিশনের শরিক বামপন্থীদের মাধ্যমে বিভিন্ন মতবাদে ভাগ করে আন্দোলনকে বিভক্ত করে দেয়া হয়েছে। বাম-আদর্শ ও তাকে বাস্তবায়নের স্তরেও তাত্ত্বিক বিতর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন মত তৈরি করা হয়েছে। শ্রেণিশত্রু নির্মূল ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারেও সমাজতান্ত্রিক মতবাদের পরিবর্তে ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতা পাবার বিষয়টিকে সফলভাবেই গুরুত্বপূর্ণ করে দেখানো হয়েছে।

নকশালবাড়িতে শুরু হওয়া জোতদারবিরোধী ভূমি-উদ্ধারের আন্দোলন সারা ভারতে নকশালবাড়ি আন্দোলন নামে যে সাড়া জাগিয়েছিল, এ চার-পাঁচ বছরেই তা স্তিমিতপ্রায়। নেতাদের অনেকেই আত্মগোপনে। অনেক পুলিশ-মিলিটারি-প্যারামিলিটারির এনকাউন্টারে নিহত। চারু মজুমদারকেও গ্রেফতারের জন্য হন্যে হয়ে খুঁজছে ভারত সরকার।

এরকম এক সময়ে বাবা তারকনগরে গিয়ে পৌঁছলেন। বাবাকে পেয়ে দাদু বাড়ির সবাই মহাখুশি। যে মানুষটিকে মৃত ভেবে গয়াতে গিয়ে পিণ্ড দান করা হয়েছিল, তাকে দেখতে পেয়ে সবাই আনন্দে আত্মহারা। পথের সকল ক্লান্তি ভুলে বাবাও অনেকদিন পর হাফ ছাড়লেন যেন।

তারকনগর সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্ত থেকে মাত্র মাইল দু'য়েক দূরের বর্ধিষ্ণু একটি গ্রাম। প্রাইমারি ইস্কুল, হাইস্কু গ্রাম্য একটি পোস্ট অফিস আর একটি ছোট্ট বাজার এ নিয়েই কয়েকশ' বসতির এ গ্রামটি। গ্রামবাসীদের অধিকাংশই দেশভাগের পরে চলে আসা পূর্ব-বাংলার বাঙালি, যাদের অধিকাংশই মুসলমানদের সঙ্গে জমিজায়গা বদল করেই এসেছেন। কিছু মুসলমান এখনও রয়ে গেছেন। অনেক পুরনো হিন্দু পরিবারও আছে। ট্রেনে কলকাতা থেকে মাত্র ঘণ্টাতিনেক সময়ের মধ্যেই যাতায়াত করা যায়। তাই অনেক বনেদি হিন্দুদের ঘরবাড়িও আছে তারকনগরে।

'সীমান্তের কাছাকাছি বলে মাঝে মধ্যে উটকো ঝুট ঝামেলাও হয় এখানে। তাছাড়া নকশাল সমর্থক ও বিরোধী দু'টি গোষ্ঠীও আছে এখানে। তাই তুমি একটু সাবধানে চলাফেরা করো', বাবাকে দাদ স্নান সেরে খাওয়ার সময় বললেন।

বাবা একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'নকশালবাড়ির ধাক্কা এতদূরে এখানেও এসে লেগেছে?'

দাদু বললেন, 'শুধু নকশালবাড়ির ধাক্কা বলো। তোমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়েও কী কম ঝামেলা পড়তে হয়েছে এখানে? এসেছ তো, থাকো ক'টা দিন তবেই বুঝবে।'

পাশে থেকে দিদিমা বলে উঠলেন, 'এত দূর থেকে ছেলেটা এসেছে। মেয়ে-নাতিনাতিনীদের কথা জিজ্ঞাসা না করে দিচ্ছো ছেলেটাকে ঘাবড়ে। এর পরে শুরু করবে তোমাদের হাইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটির দলাদলি উৎপাত সমিতি আর দমন সমিতির কথা।'

দাদুবাড়ির বারান্দার উঠোনে বসে কাঠের পিঁড়িতে বসে ভাত মাখতে মাখতে বাবা বললেন, 'নাম দু'টো বেশ তো; উৎপাত সমিতি আর দমন সমিতি। কেউ উৎপাত করলে কাউকে না কাউকে তো দমন করতেই হবে তাই না?'

দাদুর কথাটি তেমন পছন্দ হল বলে মনে হল না। তিনি বললেন, 'ব্যাপারটি আবার উল্টোটিও তো হতে পারে। কাউকে যদি তুমি সারাক্ষণ দমন করতেই থাকো, তবে দমনের প্রতিবাদ তো একদিন তাকে করতেই হবে। কারও কারও কাছে যদিও বা তা উৎপাত বলে মনে হতে পারে।'

হাইস্কুলের অভিজ্ঞ শিক্ষক দাদু বেশ বিরক্তি নিয়েই কথাটা বলে খাওয়া শেষ করে বৈঠকখানায় গিয়ে বসলেন। দিদিমা বাবাকে চোখ টিপে ইশারা করলেন। বাবার বুঝতে বাকি রইল না যে, দাদু এই উৎপাত আর দমন সমিতির ক্যাচালে জড়িয়ে পড়েছেন।

জয় বাংলা ও ইন্ডিয়ার এ সীমান্ত এলাকাটি প্রধানত মুসলমান প্রধান। দেশ ভাগের সময় এপার-ওপার হিন্দু-মুসলিম বিনিময় হয়েছে। সীমান্তের ওপারে চলে গেছে মুসলমান আর এপারে হিন্দু। অনেকের ভিটেবাড়িটুকু পড়েছিল পাকিস্তানে কিন্তু জমিজিরাত সব ইন্ডিয়ায়। ছিল ঠিক উল্টোটাও। সে সব ক্ষেত্রেই বিনিময়টা হয়েছে বেশি। কলকাতার দাঙ্গা-হাঙ্গামার রেশ তেমন পড়েনি এখানে। ফলে পড়েনি দ্বিজাতিতত্ত্বের সে বিষবৃক্ষের ছায়াটুকুও। অনেকেই তাই নেহরু-জিন্নাহর বাতলে দেওয়া হিন্দু-মুসলমান বিরোধ সমাধানের সহজ উপায়কে বিশ্বাস করতে পারেনি।

একটু সম্পন্ন ঘরের মানুষ যারা কৃষিকাজের সঙ্গে সঙ্গে একটু আধটু ব্যবসা কিংবা ছোটখাটো চাকরির সঙ্গে জড়িত দেশভাগের প্রভাব তাদের ওপরই বেশি পড়েছে। একটু শহুরে হবার আগ্রহ অথচ সামর্থও তেমন নেই। না আছে অর্থের জোর, না আছে বিদ্যাবুদ্ধি। নেহেরু-জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের ফলে সে মধ্যবিত্তরা অনেকেই ক্ষীণ আশার আলো দেখেছে। তাই গ্রামের অধিকাংশ জোতদার মুসলমানই সদ্য গঠিত পাকিস্তানে চলে গেছে। দেশান্তরি সে মুসলমানের জায়গাজমি আর ভিটে বাড়িতে বসত গেড়েছে পাকিস্তান থেকে আসা হিন্দু জনগোষ্ঠী।

তারকনগরের প্রায় অর্ধেকই ওপার থেকে বিনিময় করে আসা হিন্দু মধ্যবিত্ত কৃষক। গ্রামের দক্ষিণ ও পুবপাশে ধানের আবাদি জমিনের কয়েক মাইল বিস্তৃত মাঠ। পশ্চিম পাশে বাড়ির সঙ্গে বাড়ি লাগোয়া পাড়া; পাড়ার পর আরেকটা পাড়া। এভাবেই মাইল দুই চলে গেছে। তারপর বাগুলি বাজার। বাজার বলতে দু'একটি মুদি দোকান। রাণাঘাট-গেদের ট্রেন লাইন চলে গেছে বাগুলি বাজার হয়ে। আপ-ডাউন দু'দিকের ট্রেনই থামে এখানে। ফলে স্টেশনের সঙ্গে বসেছে অনেকগুলো চায়ের স্টল। সকালে দুধের আড়ত বসে। সবজি আর মাছও মেলে মাঝে মাঝে সকালে এবং পড়ন্ত বিকেলে।

'৬৫ সালে দাদু এখানেই চলে আসেন ঢাকা থেকে। আগে থেকেই দাদুর এক সহকর্মী তারকনগর হাইস্কুলে চাকরি নিয়ে চলে এসেছিলেন। পূর্ববঙ্গ থেকে চলে আসা হিন্দুরাই পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে এ হাইস্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। '৬৫ সালে পুরান ঢাকায় দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়লে দাদু রাতের অন্ধকারে ভাই-বোন-পরিবার পরিজন নিয়ে চলে আসেন এই তারকনগরেই। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ধর্মীয় উগ্রবাদিতার উত্থান দাদুকে আগেই ভাবিয়ে তুলেছিল। তাই তারকনগরে চলে আসা সহকর্মীর সঙ্গে চিঠিপত্রের যোগাযোগ ছিল নিয়মিতই। আশ্বাসও ছিল তারকনগরের হাইস্কুলে চাকরির। পুরনো ঢাকার বনেদি হাইস্কুল তখন পগোজ হাইস্কুল। সেই পগোজ হাইস্কুলের নামী শিক্ষককে তারকনগরের মত এক অজগাঁয়ের হাইস্কুলে চাকরি দেওয়া তেমন অসুবিধে হবে না, এ আশ্বাসেই দাদু সোজা চলে আসেন এখানে।

দেশ ছেড়ে চলে আসার আগে মেয়ের বাড়িতে অর্থ্যাৎ আমাদের বাড়িতে বেশ ক'মাস ছিল দাদুর পরিবার। পরে হাইস্কুলের চাকরিটা পাকাপাকি হলে পরিবার নিয়ে চলে আসেন। ইস্কুলের পাশেই একটি ভিটে লিখে দেন তারকনগর হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা মজুমদারবাবুরা। সেখানেই গড়ে ওঠে জন্মভূমি থেকে চলে আসা দাদুর এক নতুন জীবন। যদিও পূর্ব-পাকিস্তানে ফেলে রেখে আসেন সদ্য বিয়ে হওয়া মেয়েকে।

সতের.
বিভক্ত নকশাল আন্দোলন

পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা শরণার্থীরা অনেকেই চলে যাচ্ছেন সদ্য স্বাধীন জয় বাংলায়। কলকাতা থেকে ছেড়ে আসা ট্রেন-বাস ভরে ভরে সীমান্তের দিকে চলেছে মানুষের ঢল। সীমান্ত বলতে যা বোঝায় তার কিছুই নেই। পাসপোর্ট-ভিসার বালাই নেই। খাতাপত্রে নাম রেজিস্ট্রি করার নামমাত্র আনুষ্ঠানিকতাটুকুও নেই। লাখ লাখ ঘরে ফেরা সহায়সম্বলহীন মানুষের মিছিল। জীবনের ভয়টুকু হয়তো নেই। কিন্তু বেঁচে থাকার অনিশ্চয়তা নিয়েই ফিরে যাচ্ছে সবাই। ঘরবাড়ি ঠিকমত আছে তো?

যাদের ফেলে এসেছিল যুদ্ধের সময়ে, তারা বেঁচে আছে তো? দেশে ফিরে গিয়ে কী করে চলবে সংসার? কী খাবে? পুড়িয়ে দেয়া ঘরবাড়ি কেমন করে আবার মেরামত করবে? এমন হাজারো দুশ্চিন্তাসঙ্কুল মানুষের মিছিল চলছে জয় বাংলায়। তারকনগর থেকেও অনেকে ফিরে গেছে। অনেকে আবার পরিবার পরিজনকে আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে রেখে জয় বাংলায় ফিরেছে পরিস্থিতি আঁচ করতে। অনেকে যুদ্ধের সময়ের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার স্মৃতি নিয়ে আর সদ্য স্বাধীন দেশে ফিরে যেতে সাহসী হচ্ছে না।

এমনি এক পরিবার বিকেলে বাবার সঙ্গে দেখা করতে এলো। সাভার এলাকা থেকে কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে চলে এসেছে পরিবারটি। কিন্তু তারা এখনও জানে না তাদের ঘরবাড়ি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর কি অবস্থা। মহল্লারই রাজাকারেরা এপ্রিলের একরাতে অনেকটা জোর করেই তাদের বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করেছিল। সেদিন বাড়ি না ছাড়লে বাড়ির বউ মেয়েদের সম্ভ্রমহানীর ভয় দেখিয়েছিল। দোকানের ক্যাশবাক্স থেকে আগের দিনের বিক্রিবাট্টার টাকাগুলোর সঙ্গে আনতে পারেনি ভদ্রলোক। এখনও সেই ভয়ঙ্কর হুমকির কথা ভেবে আঁতকে ওঠেন।

অসহায়ভাবে বাবার কাছে জানতে চান, 'ঘরবাড়ি দোকানব্যবসা সব ফিরে পাবো তো? মহল্লার রাজাকার ইউসুফ সরদার বেঁচে আছে

না, মরে গেছে? তখন শুনছিলাম, ইউসুফের এক ভাতিজা মুক্তিযুদ্ধ সাপোর্ট করে। তাকে গিয়ে হাতে পায়ে ধরেছিলাম। কিন্তু কোন সাহায্য বা আশ্বাস পাই নাই তখন। এখন যদি ওই মুক্তিযোদ্ধা ভাতিজা তার চাচাকে বাঁচিয়ে রেখে থাকে তবে তার দখলকরা সম্পত্তি কি ফিরে পাবো?'

বাবা কি আশ্বাস দেবে ভেবে পায় না। দেশ স্বাধীন হওয়ার মাস দুয়েকের মধ্যেই অনেকের মধ্যে পরিবর্তন দেখে এসেছে বাবা। অনেক মুক্তিযোদ্ধারা ভয়ভীতি দেখিয়ে রাজাকারের দখলে থাকা হিন্দু সম্পত্তি নিজেদের দখলে নিয়ে রাজাকারদের প্রাণে বাঁচিয়ে দিচ্ছে। অনেকে ভারতে আশ্রয় নেয়া হিন্দু বাড়িতে গিয়ে উঠে গেছে পরিবার পরিজন নিয়ে। এরকম অনেক ঘটনা বাবা শুনে এসেছেন। নিজের এলাকাতেও এরকম কয়েকটি ঘটনায় মধ্যস্থতা করতে হয়েছে বাবাকে।

বাবা ভদ্রলোকের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। তারপর বলেন, 'দাদা এত ভয়ের কিছু নেই। বঙ্গবন্ধু ফিরে এসেছেন কারাগার থেকে। তিনি দেশ গড়ার কথা বলেছেন। রাজাকারদের বিচারের কথা বলেছেন। আর যারা জীবন বাজি রেখে দেশ স্বাধীন করেছে, সেই মুক্তিযোদ্ধারা এমন বেইমানী করবে না। তাছাড়া এখন তো আর পাকিস্তানীরা নেই। আপনি দেশে ফিরে যান। আপনার ঘরবাড়ি দোকান ব্যবসা সব বুঝে নেবেন। জয় বাংলা তো এখন হিন্দু-মুসলমান সবারই। এত ভয় পাবার কিছু তো দেখি না। আপনার আরও আগেই দেশে ফেরা উচিত ছিল বলে আমার মনে হয়।'

ভদ্রলোক একটু সাহস পেয়ে বলেন, 'আপনি বলছেন বাবু? আমিও সে কথাই ভাবছিলাম। কিন্তু বউ আর মেয়ে দু'টো এত ভয় পেয়েছে। বলে ওদেশ জয় বাংলা হয়েছে তাতে আমাদের কী? আমরা হিন্দু এটাই আমাদের বড় পরিচয়। তা নাহলে মহল্লার প্রতিবেশী এমন করে সব কিছু কেড়ে নেয়। পালিয়ে আসার সময় একফোঁটা জলও মুখে দিতে পারি নাই। ওরা আর ফিরতে চায় না, বাবু। তবু আমি একবার নিজে গিয়ে দেখি। সব কিছু ঠিক ঠাক থাকলে না হয় সবাইকে পরে এসে নিয়ে যাব।'

সাভারের ওই ভদ্রলোক চলে যাবার পরে দাদু বাবাকে নিয়ে ঘুরতে বের হলেন। তখনও শীতকাল শেষ হয়নি। ইস্কুলের মাঠে ভলিবল খেলা চলছে। প্রায় পঞ্চাশ ষাটজন লোক ভলিবল কোর্টের চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছেন। অনেকে আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখেছেন। মাঠের পশ্চিম পাশের বাড়ির ফাঁক গলে পড়ন্ত সূর্যের আলো সারা মাঠে ছড়িয়ে পড়েছে। একটু দূরে মাঠের অন্যপ্রান্তে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গোল্লাছুট খেলছে। তার পাশেই দাড়িয়াবাঁধা খেলা চলছে। সারা মাঠ জুড়ে এক প্রাণের উচ্ছ্বাস ফুটে উঠেছে। বাবা নিজের অজান্তেই যেন ফিরে গেছে জয়বাংলায় তাঁর নিজ গ্রামে। খেলাধুলা যাত্রানাটক গান বাজনা কী ছিল না সেখানে? অথচ গত ক'বছর কিছুই হয়নি তার গ্রামে। যুদ্ধের বীভৎসতায় সব কিছু থমকে আছে কয়েক বছর থেকেই।

পশ্চিমবঙ্গের অজপাড়া গাঁ তারকনগরের এই শীতের বিকেলে বাবা স্মৃতির গলিপথ ধরে নিমিষেই ফিরে গেলেন জয়বাংলার এক গ্রামে। মনে ক্ষীণ আশার সলতেও জ্বালালেন বাবা। দেশ স্বাধীন হয়েছে। এখন তো আর কোনও দুঃশ্চিন্তা নেই কোথাও। জয়বাংলার প্রতিটি গ্রামে কি আবার ফিরে আসবে এমন আনন্দঘন বিকেল?

পাশ থেকে হঠাৎ দাদুর কণ্ঠস্বরে বাবা ফিরে এলেন বাস্তবতায়। দাদু বলছেন, 'মজুমদারবাবু, বলছিলাম না, আমার জামাই এসেছে জয়বাংলা থেকে।'

বাবা দু'হাত তুলে নমস্কার করলেন সামনে দাঁড়ানো এক ষাটোর্ধ্ব ভদ্রলোককে। ধুতি-পাঞ্জাবির ওপর ঘিয়ে রঙের চাদর জড়ানো। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। ভদ্রলোক চশমার পুরু লেন্সের ভিতর দিয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকলেন অনেকক্ষণ।

তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, তোমাদের নিয়ে ভৌমিক বাবু সারা ন'মাসই তো মহাদুঃশ্চিন্তায় ছিলেন। তারপর মাঝে এমন সব উড়োখবর এলো। তবে বাবা, যুদ্ধের সময় ওখানে থেকে যাওয়াটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। এত মানুষ পালিয়ে এলো। আর তোমাদের তো নিজের মানুষই ছিলেন এখানে। যা হোক বেঁচে আছ সেটাই বড় খবর। আমি ভৌমিকবাবুকে কিছু কথা বলেছি, তোমার সঙ্গে কি আলাপ হয়েছে এসব নিয়ে?'

দাদু একটু বিব্রতবোধ করছেন বোঝা গেল। তাই মজুমদারবাবুকে আর কথা বাড়াতে দিলেন না। বললেন, 'মজুমদারবাবু, আপনাকে বলেছি কিনা, আমার জামাই কিন্তু খুব ভাল এথলেট। ছাত্রাবস্থায় জাতীয় স্তরে টেবিল টেনিস খেলত। একবার তো পূর্ব পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়নও হয়েছিল। তাছাড়া ফুটবল, ভলিবল ও খুব ভাল খেলে।'

মজুমদারবাবু অতি-উৎসাহি হয়ে ভলিবল খেলারত একজনকে নাম ধরে ডাকলেন, 'বিনয়, তোমাদের এই গেইম শেষ হলে খেলা থামিয়ে নতুন এক অতিথিকে খেলতে নিও।'

মজুমদারবাবুর কথা মত গেইম শেষ হওয়ামাত্র বাবাকে জোর করে ভলিবল কোর্টে নামিয়ে দেয়া হল। কতদিন খেলার অভ্যেস নেই। প্রথমে একটু দ্বিধা কাজ করছিল। কিন্তু খুব ভাল ভলিবল খেলেন বাবা। নেটের কাছের পজিশনে দাঁড়ালেন বাবা। একটু সময় লাগলো খেলায় ফিরতে। কিন্তু নেটে তুলে দেওয়া বল এমনভাবে মারতে লাগলেন যে, বিপক্ষের কারও পক্ষেই তা তুলে আনা সম্ভব হচ্ছিল না। মাত্র ঘণ্টাখানিক সময়ের মধ্যেই মাঠে উপস্থিত সবার নজর কাড়লেন বাবা।

খেলার ফাঁকে ফাঁকে বাবা দেখলেন, দাদু মজুমদার বাবুসহ আরও কয়েকজনের সঙ্গে গভীর মনযোগের সঙ্গে কথা বলছেন আর মাঝে মাঝে বাবার দিকে সবাই তাকাচ্ছেন। বাবার বুঝতে বাকি রইল না যে, তাকে নিয়েই কথাবার্তা চলছে। কিন্তু তাকে নিয়ে কী এমন পরিকল্পনা যা, মজুমদারবাবু দাদুকে বলেছেন অথচ দাদু তার কাছে গোপন করে চলেছেন?

সবার প্রশংসা আর হাততালি নিয়ে খেলা শেষ হল। তখনও একটু আলো আছে খেলার মাঠে। সেই আলো আঁধারিতে অনেকেই বসে আছেন। শীতের সন্ধ্যায় একটু একটু হাওয়া দিচ্ছে পশ্চিম-উত্তর দিক থেকে। গায়ের সোয়েটারটা খুলে ফেলে বাবা শরীরের ঘাম শুকিয়ে নিচ্ছেন সবার সঙ্গে। মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই সবার মধ্যমনি হয়ে দেখা দিলেন বাবা। যাদের সঙ্গে খেলেছেন এতক্ষণ সবাই বাবাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। দাদু একটু সঙ্কোচ নিয়ে দূরে মজুমদারবাবু ও অন্যান্যদের সঙ্গে কথা বলছেন।

বাবার পাশ থেকে তারই সমান বয়সের এক ভদ্রলোক হঠাৎ বাবাকে নিচুস্বরে বলে উঠলেন, 'দাদা, আপনাকেই আমাদের চাই। আপনিই পারবেন দাদা।'

ভদ্রলোকের কথায় বাবা একটু অবাক হলেন। কি এমন করেছেন তিনি যে, তাকে নিয়েই এত উৎসাহ? তিনি কি করবেন যে, তাকেই চাই এখানে?

দাদুর সঙ্গে ফিরে এলেন বাড়িতে একটু অন্ধকার হলে। শ্বশুরের

সঙ্গে জামাইয়ের সাধারণ সম্পর্কের মতই দাদুর সঙ্গে বাবার সম্পর্ক। সেদিক থেকে দিদিমার সঙ্গে জামাইয়ের সম্পর্ক একটু সহজ। বাবা তাই ভাবলেন, দিদিমাকেই বিকেলের মাঠের এই অস্পষ্ট আভাসের কথা বিশদভাবে বলবেন।

কিন্তু অনেকদিনের অনাভ্যাসের ফলে শরীরের আর ধকল সইছে না যেন। কতদিন পরে এই ভলিবল খেলা। একসময় বাবার জন্যেই তাঁর কলেজ চ্যাম্পিয়ন ছিল। তারপর এলাকাতেও খুব সুনাম। প্রায় বছরদুই পরে আজকের এই ভলিবল খেলা। তাই খুব ক্লান্তিবোধ করলেন বাবা। রাতের খাবারের পরেই দু'চোখ আর খুলে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। সারারাজ্যের ক্লান্তি নেমে এলো যেন। প্রচণ্ড আগ্রহ সত্ত্বেও দিদিমার কাছ থেকে আর কিছুই শোনা হল না তার সেদিন।

খুব সকালেই ঘুম ভেঙে গেল বাবার। এক বছরের বেশি সময় থেকেই ঘুম বলতে যা বোঝায় সেটার কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। সারাক্ষণ এক ভয়, দুঃশ্চিন্তা, হানাদার হনন কিংবা হানাদারদের হাতে নিহত হবার শঙ্কা। শুধু মুক্তিযোদ্ধা নয়, সাত কোটি মানুষের অধিকাংশেরই ছিল না দিনরাত্রির কোন রুটিন। তাই পশ্চিমবঙ্গে এসে অনেকদিন পরে কিছুটা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে নিচ্ছেন বাবা। আজকের রাতেও তার ব্যতিক্রম ছিল না।

ঘর থেকে বাইরে এসেই দেখলেন বেলা অনেকটা হয়ে এসেছে। বাইরের ঘরে কিছু মানুষের কথাবার্তার শব্দ কানে এলো। দিদিমা বাবাকে দেখে বললেন, 'চোখমুখ ধুঁইয়ে চা খাও। সকাল হতেই তোমার অপেক্ষায় অনেকে বাইরের ঘরে বসে আছে। তুমি তো কালকে মাঠে সবাইকে যাদু করে এসেছ। আমি তো নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারিনি। মজুমদারবাবু তো আগেই বলছিলেন। আজ সকালে বিশ্বাসবাবু এসেছেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে।'

বাবা অবাক হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ কালকে মজুমদারবাবুর সাথে কথা হল। কিন্তু বিশ্বাসবাবুটি আবার কে?'

দিদিমা একটু নিচু স্বরে বললেন, 'নিখিল বিশ্বাস। উৎপাত সমিতির নেতা। এলাকার নকশালদের সাথে নাকি তার গোপন সমঝোতা আছে। পুলিশ নাকি খুঁজছে। কিন্তু এখনও পালিয়ে যাচ্ছে না। তিনি প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট পার্টির জ্যোতিবাবুদের দল করেন। কিন্তু গোপনে নাকি চারু মজুমদারের পার্টি করেন।'

বাবা একটু বিস্মিতই হলেন। বললেন, 'বাহ বেশ মজার তো।'

দিদিমা বাবাকে সতর্ক করে বললেন, 'তুমি কিন্তু বেফাঁস কিছু বলে আবার বিপদ ডেকে এনো না। এই বিশ্বাসবাবু জয়বাংলার রিফিউজিদের খুব একটা ভাল চোখে দেখে না। অনেকে বলেন, তিনি নাকি মুক্তিযুদ্ধকেই সাপোর্ট করেন না। আমি বাপু এসব হিসেব তেমন কিছু বুঝি না। তবে এ কথা বুঝি, বাঙালি হিসেবে আমাদের জয়বাংলার পাশে দাঁড়ানো উচিত।'

বাবা আর কথা না বাড়িয়ে বাইরের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। দু'হাত জোড় করে নমস্কার করে ঘরে ঢুকলেন। ভিতরে আরও চার-পাঁচ জন লোক বসে। এদের দুএকজনকে কাল বিকেলে মাঠে দেখেছেন। কিন্তু নিখিল বিশ্বাস, যাকে দিদিমা বিশ্বাসবাবু বলছেন, তাঁর সঙ্গে এই প্রথম পরিচয়। ভদ্রলোকের বয়েস পঞ্চাশের কোঠায়। বেশ সুঠাম গড়ন। চোখ দু'টোও বেশ বড় ও দৃষ্টি কাড়ে।

বিশ্বাসবাবুই নিজ থেকে পরিচিতি হলেন, 'আমি নিখিল বিশ্বাস। কালকে তো মাঠে সবাইকে জয় করে ফেলেছেন, জামাইবাবু। আমি ভৌমিকবাবুকে তাই বলছিলাম, আমাদের বাংলাদেশের ছেলেগুলো আসলেই হীরের টুকরো। এদের ঠিকমত কাজে লাগাতে পারলে মুক্তি আসবেই। জয়বাংলা এসেছে কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানকে শেষ মুহূর্তে ইন্দিরা গান্ধী কেমন করে ছিনিয়ে নিলেন। এই সব টগবগে আদর্শবান ছেলেগুলোর আদর্শকে এককথায় হাইজ্যাক করে নিলেন নিজের পুঁজিবাদী স্বার্থ আর ক্ষমতার লোভে। এটা কী ঠিক হল?'

বাবা কলকাতায় তাঁর বন্ধু অমলকাকুর কাছে যা শুনে এসেছে তার প্রতিধ্বনি পেলেন বিশ্বাসবাবুর কথায়। তাহলে ওপার বাংলা থেকে যে শুনে এসেছেন, চারু মজুমদারসহ একটি বড় অংশ মুক্তিযুদ্ধকে ভারতের স্বার্থের লড়াই বলে এসেছে, সেটা কি ঠিক?

এসব নিয়ে কথা বলতে উদ্যোত হয়েছিলেন বাবা। কিন্ত দাদু পছন্দ করেছেন না, সেটা বুঝতে পারলেন। তাছাড়া দিদিমাও নিখিল বিশ্বাসের সম্পর্কে একটু ধারণা দিয়েছিলেন। শ্বশুর-শাশুড়ির কথা মনে করে আর তেমন কথা বাড়ালেন না। সব শুনে গেলেন নিঃশব্দে-বিনা বাক্য ব্যয়ে।

চা বিস্কুট খাওয়া শেষ হল। নিখিল বিশ্বাস বললেন, 'তাহলে ভৌমিকবাবু আপনিই জামাইকে আমাদের কথা বলবেন। আমরা আপনাকে বিশ্বাস করি ও মানি। মজুমদারবাবুর সম্পর্কে আপনিও জানেন, আমরাও জানি। আপনিই আপনার জামাইকে সেটা বলবেন। আপনার জামাই পূর্ববঙ্গের মানুষ। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস আর তথাকথিত বাম আপোসকামীদের ক্যাচালের ওর মধ্যে এখনও ঢুকে নাই। এ সব চিন্তা করে আমরা কিছুটা ছাড় দিতে রাজি আছি। কিন্তু নীতি আদর্শটুকু তো ছাড় দিতে পারবো না। তাই কংগ্রেস শরণার্থীদের নিয়ে, মিলিটারি নিয়ে যে খেলাগুলো খেলছে সেটা ওকে-মানে আপনার জামাইকে জানতে হবে। আমরা চাই না তারকনগর হাইস্কুলের হেডমাস্টার কংগ্রেস কিংবা ওই তথাকথিত আপোসকামীদের লোক হোক। সে বিষয়টা আরেকটু পার্টি কমরেডদের সঙ্গে আলাপ করে নিতে হবে। দু'একদিনের মধ্যেই আমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাব। আজকে তবে আসি।'

সবাই চলে গেলেন। বাবার কাছে এখন একটু একটু করে জট খুলে যাচ্ছে। তাকে কি তারকনগর হাইস্কুলের হেডমাস্টার করার কথা বলা হচ্ছে? কিন্তু বাবা তো কখনওই এ ব্যাপারে কারও সঙ্গে আলাপ করেননি। পূর্ব পাকিস্তান যখন ছিল সে সময়েই দেশ ছাড়ার কথা ভাবেননি। যুদ্ধ করে পাকিস্তানীদের তাড়ানোর পরে এখন জয়বাংলা থেকে চলে আসবেন?

কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না বাবা। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তি ভেঙে দেওয়া হল মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে। নেহরু-জিন্নাহর ভুলের প্রায়শ্চিত্ত নিজেদের জীবন দিয়ে শোধ করলো বাংলার ত্রিশ লক্ষ মানুষ। দুই লক্ষ মা-বোন ইজ্জতের বিনিময়ে এবং এক কোটি শরণার্থী ঘরবাড়ি ছেড়ে রিফিউজি হয়ে '৪৭ সালে জিন্নাহ-নেহরু যে ভুল করেছিলেন সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করলেন। অথচ পূর্ব বাংলার অধিকাংশ মানুষের কাছে ধর্ম বড় ছিল না। বড় ছিল এক জাতিসত্তা, এক ভাষা, এক সংস্কৃতি, এক ঐতিহ্য।

হিন্দু-মুসলমান শুধু ধর্মবিশ্বাসের কারণে। কিন্ত আর সকল ক্ষেত্রেই তো মিল সবার। সংগীত, সাহিত্য সব কিছুতেই কোনও ভেদাভেদ নেই। কাজী নজরুল যেমন পূর্ববাংলার হিন্দুর, রবীন্দ্রনাথ তেমনি মুসলমানেরও।

পশ্চিম পাকিস্তানের জিন্নাহ যেমন পারেননি, তেমনি পশ্চিম ভারতীয় কাশ্মিরী নেহরুও পারেননি পূর্ববাংলার মানুষের এই

সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে চিনতে। তাই তো সোনার পাথর বাটি যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব ছিল না পূর্ব বাংলার মানুষকে পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের সঙ্গে মিশিয়ে একটি জাতিসত্তা তৈরি করা। এ সহজ অথচ সরল অনুধাবন জিন্নাহ-নেহরু না বুঝলেও শেখ মুজিবের বুঝতে কোনও অসুবিধে হয়নি। তাই তো পাকিস্তান জন্মের পরে থেকেই পূর্ব বাংলার মানুষের জন্যে একটি পৃথক আবাসভূমির স্বপ্ন শেখ মুজিব লালন করতেন। আর সে লক্ষ্যেই পঁচিশটি বছর তিলতিল করে সমস্ত পূর্ববাংলার মানুষকে সংগঠিত করেছেন তিনি। প্রথমে ছাত্র সংগঠন, তারপর আওয়ামী লীগ গঠন করেছেন। ৫২ সালের বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার সে রক্তক্ষয়ী আন্দোলনেও পূর্ব বাংলার মানুষের বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিচয় পেয়েছিলেন শেখ মুজিব। তারপরে কত সংগ্রাম, কত জেলজুলুম মেনে নিয়ে ছয় দফা, আগরতলা মামলা মোকাবেলাসহ কত আত্মত্যাগের বিনিময়ে সদ্য স্বাধীন এই জয় বাংলা।

জয়বাংলা এখন ওপার বাংলার জাতি-ধর্ম-গোষ্ঠী সকলের। স্বাধীন জয়বাংলা থেকে এখানে নদীয়ার এই অজপাড়াগাঁ তারকনগরে এসে এই কংগ্রেস-কমিউনিস্টদের ক্যাচালের মধ্যে পড়তে হবে? কিসের লোভে? কার ভয়ে? কেন-ই বা জন্মভূমি ছেড়ে বাপ-দাদার ভিটেমাটি ছেড়ে চলে আসবে অন্যদেশে? তাও এই সময়ে, যখন দেশ স্বাধীন হল? বাবা কোনও কিছুই বুঝতে পারছিলেন না।

আঠার.
চারু মজুমদার ও অন্যান্য

১৯৬৭ সালের বিধান সভা নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেস ১২৭টি আসন পেল। কিন্তু ১৪১টি আসনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল না। বাংলা কংগ্রেসের হুমায়ুন কবির-অজয় মুখার্জিরা সবগুলো বামদলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে মোট ১২টি দল নিয়ে ১৪৩টি আসন তাদের আছে সে প্রমাণ রাজ্যপালকে দিলেন। এক জগাখিচুড়ি সরকার গঠিত হল। বাংলা কংগ্রেস বাদে বাকি যে বামদলগুলো সরকারে যোগ দিল, তাদেরও নীতি-আদর্শগত কোনও ঐক্য ছিল না। বাংলা কংগ্রেসের অজয় মুখার্জি মুখ্যমন্ত্রী হলেন। স্বরাষ্ট্র বা পুলিশ মন্ত্রী হলেন সিপিএম-এর নেতা জ্যোতি বসু। কমিউনিস্টদের ক্ষমতা যাওয়া নিয়ে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল সারা রাজ্য জুড়ে। সাম্রাজ্যবাদীদের দোসর বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে ক্ষমতার ভাগাভাগিকে এক শ্রেণী আপোসকামিতা হিসেবে দেখলেন অনেক কমিউনিস্ট নেতাকর্মীরা।

অন্যদিকে সিপিএম-এর অন্য একটা গ্রুপ অতি উৎসাহী হয়ে পড়েন। জাতীয় কংগ্রেসকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি হিসেবে অভিহিত করে তাদের পরাজয়কে রাজ্যে কমিউনিস্টদের বিরাট বিজয় বলে প্রচার করা হয়। কর্মীবাহিনিকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়। ভূমি জোতদারদের জমিজিরাতকে বে-আইনি ও অধিকৃত জমি হিসেবে ঘোষণা করে তা পুনরুদ্ধারের কথাও ফলাও করে প্রচার করা হয়। ফলে অনেক এলাকায় কমরেডরা অত্যুৎসাহী হয়ে পড়েন। এর ধারাবাহিকতায় নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরের দিনই অর্থ্যাৎ ৩ মার্চ ১৯৬৭ সালে একদল কৃষক দার্জিলিংয়ের নকশাল বাড়ির কাছে আধিয়ার এলাকায় দুই জোতদারের গোলার ধান লুট করে নিয়ে যায়। তাদের মনে জোর ছিল, কমরেড জ্যোতি বসু যখন পুলিশমন্ত্রী তখন পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই নেবে না।

বাবা এসব খবর পেয়েছেন ওপার বাংলা থেকেই। তারপর কলকাতায় অমল কাকুর কাছেও অনেক কিছুই শুনেছেন। তবু নিখিল বিশ্বাসের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, এর ধারাবাহিকতাতেই কি নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলন?

বিশ্বাসবাবু বললেন, 'হ্যাঁ বলতে পারেন সে থেকেই শুরু। কিন্তু চারু মজুমদার আর কানু স্যান্নালরা কিন্তু বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালেশন করে ক্ষমতায় যাওয়াকে মেনে নিতে পারেননি।'

চারুবাবুর ইশতেহারে এভাবে ক্ষমতার ভাগাভাগির বিরোধিতাই করা হয়েছিল। সিপিএম বেশ বিপদে পড়ে গিয়েছিল তখন। সিপিএম নেতা ও মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙার ১৬ মে তারিখে দার্জিলিঙের শুকনা ফরেস্ট রেস্ট হাউজের পার্টি বৈঠকে কানু সান্যালদের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথা বললেন। অথচ ওদিন রাতেই শিলিগুড়ি এসে জোতদার ও প্রশাসনকে যে কোনও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বললেন। এর মাত্র সাত দিন পরেই ২৩ ও ২৪ মে নকশালবাড়িতে এতগুলো নিরীহ মানুষের প্রাণ গেল। সিপিএম যে প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে ভারতে বিপ্লবকে স্তিমিত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এতে কি তার প্রমাণ মেলে না? এই চার বছরে হাজার হাজার বিপ্লবীকে ইন্দিরা কংগ্রেসের পুলিশ-মিলিটারি হত্যা করলো।

এতক্ষণ বিশ্বাসবাবু বলে যাচ্ছিলেন। এক বুক দীর্ঘশ্বাস নিয়ে দারুণ হতাশা নিয়ে নিখিল বিশ্বাস স্বগোক্তি করলেনে, 'জানি না, চারুবাবুর কি অবস্থা? বেঁচে আছে নাকি ইন্দিরা গান্ধীর পুলিশ ইতিমধ্যেই মেরেই ফেলেছে।'

বাবা লক্ষ্য করলেন, চারুবাবু মানে, চারু মজুমদার কথাটি খুব ধীরে ধীরে শান্তভাবে উচ্চারণ করলেন বিশ্বাসবাবু। অথচ ইন্দিরা কংগ্রেস কথাটি বলার সময় চোখে মুখে এক ঘৃণা ও প্রতিহিংসার ছায়া খেলে গেল। বাবা নির্বিকারভাবে খুব মনোযোগ নিয়ে নিখিল বিশ্বাসের কথা শুনছেন। নিখিলবাবুও মনোযোগী কমরেডের মত করে বাবাকে এক ব্যর্থ বিপ্লবের কথা বলে যাচ্ছেন।

'একবার ভেবে দেখুন, ১৯৬৭ থেকে আজ পর্যন্ত এই মেকি কমিউনিস্টরা কী বেঈমানিটাই না করে যাচ্ছে চারুবাবুদের সাথে? অথচ উৎপল দত্ত কিংবা শিল্পী অজিত পাণ্ডেদের কথা ভেবে দেখুন। বুক ফুলিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয় বেঈমান ইন্দিরা কংগ্রেসের সাথে লড়াই করে যাচ্ছেন সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে। উৎপল দত্ত তো সেদিন বলেই দিয়েছেন, একদিকে নকশালবাড়ি অন্যদিকে বেশ্যাবাড়ি। আপনাদের ইচ্ছে কে কোথায় যাবেন? গান বেঁধে গাইছেন শিল্পীরা, 'তরাই কান্দে গো, কান্দে আমার হিয়া, নকশালবাড়ির মা কান্দে, সপ্তকন্যা লাগিয়া...।'

'তা লিখিলদা, কতজন মারা গিয়েছিল পুলিশের গুলিতে?' এই প্রথম বাবা নিখিল বিশ্বাসকে নিখিলদা বললেন। শুনে বেশ খুশিই হলেন নিখিল বিশ্বাস।

বাবার কথার প্রতিবাদ করে বলে উঠলেন, '২৪ মে তারিখে দুইজন পুলিশ জনতার হাতে খতম হয়েছিল। আর ২৫ মে তারিখে মোট ১১জন শহীদ হলেন। এর মধ্যে ৭জনই নারী, ২জন পুরুষ আর ২জন শিশু। তুমি ভেবে দেখো সোনামতি সিংকে পুলিশ সামনে থেকে গুলি করেছিল। সোনামতির বুক ভেদ করে গুলি লাগে পেছনে বাঁধা ৮মাসের শিশুটির। সেদিন শহীদ হয়েছেন, ধনেশ্বরী দেবী, সামসরী শৈবানী, গাউদ্রোউ শৈবানী, সোনামতি সিং, ফুলমতি দেবী, সুরবালা বর্মন, সীমাশ্বরী মল্লিক, নয়নশ্বরী মল্লিক, খরসিং মল্লিক আর দু'জন শিশু। জ্যোতি বসুর পুলিশ এমন নির্বিচারে গুলি চালায়

সেদিন। সেদিন কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর পুলিশ ছিল না। সিপিএমের নেতা জ্যোতিবাবু পুলিশমন্ত্রী তখন। ভেবে দেখেন, কমিউনিস্টের রক্ত কমিউনিস্টের হাতেই।"

নিখিল বিশ্বাসের কণ্ঠ ভারী হয়ে আসছে। একটু থেমে আস্তে বললেন, 'আপনি কি ভাবেন, সিপিএমকে এর শোধ দিতে হবে না? অবশ্যই হবে। সব কিছু সময়ের ব্যাপারমাত্র। শুধু চিন্তা হয় চারুবাবুকে নিয়ে? ইন্দিরা কংগ্রেসের পুলিশ চারুবাবুকে বাঁচিয়ে রাখবে বলে মনে হচ্ছে না। কানু স্যানাল, জঙ্গল সাঁওতালদের মনে হয় কিনে নিয়েছে এতদিনে। এখুন না, পার্টি চারুবাবুকেই দল থেকে বহিস্কার করলো।'

বাবা কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না, তাকেই কেন এত বিশদভাবে পার্টির ভিতরের খবর বলে যাচ্ছেন নিখিল বিশ্বাস? কিন্তু নকশালবাড়ি বিশেষ করে চারু মজুমদারের সম্পর্কে আগ্রহ ছিল অনেকদিন থেকেই। তাই বিশ্বাসবাবুর কথাগুলো শুনতে খারাপ লাগছিল না বাবার।

বিশ্বাসবাবুও একজন মনোযোগী শ্রোতা পেয়ে আবার বলতে শুরু করলেন, 'অথচ চারুবাবুর সিদ্ধান্তমতেই কিন্তু গ্রেফতার এড়িয়ে কানু স্যানালকে আরও দুইজনসহ চিনে পাঠানো হয়েছিল সেপ্টেম্বর মাসেই। যদিও চিনের বার্তাটি ঠিকমত পৌঁছতে পেরেছি কি? চিন কী বার্তা দিয়েছিল? তবে শোনা যায়, কানু স্যানালকে মা সে তুং বলে দিয়েছিলেন, আমরা যা বললাম সব ভুলে যাও। তোমাদের মত করে বিপ্লব করো। অথচ কানু স্যানাল চিন থেকে যখন ফিরে এলেন তখন অজয় মুখার্জির সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে। প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে ক্ষুদ্র একটি প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীকে ইন্দিরা কংগ্রেস বাইরে থেকে সমর্থন দিয়ে সরকার গড়িয়েছে। কিন্তু যা সর্বনাশ হবার সে তো হয়েই গিয়েছে। সিপিএম একবার ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছে। ওই দল দিয়ে কি আর বিপ্লব হয়? তাই তো বলছিলাম, এই চার বছরে ভারতের একটি বিপ্লবসম্ভাবনাকে আমাদের বামপন্থীরাই অঙ্কুরে বিনাশ করে দিল।'

বাবা তখনও আগ্রহী শ্রোতা। সন্ধ্যায় দাদু বাড়ি থেকে নিখিল বিশ্বাস বাবাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছেন। বাবাকে দিদিমা কিছুতেই একা ছাড়বেন না। দিনকাল ভাল যাচ্ছে না। নকশালের নামে পুলিশ যাকে ইচ্ছে তাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। অপরিচিত হলে তো কথাই নেই। বাবা এখনও রাণাঘাট থেকে গেদের ট্রেনে যা ঘটেছে, সে ভয়ঙ্কর ঘটনা এ বাড়ির কাউকেই বলেননি। দাদু-দিদিমা জানলে বাবাকে বাড়ি থেকেই বের হতে দেবে না, বাবা সেটা জানতেন। তবু নিখিল বিশ্বাসের সঙ্গে বাবা একরকম জোর করেই বের হয়ে এসেছেন।

নিখিলবাবুদের বাড়িতে পাকা একতলা দালান। পর পর কয়েকটি ঘর। সবগুলো ঘর আবার সামনে বাড়ানো বারান্দা দিয়ে সংযুক্ত। সবগুলো ঘরের দরজায় পর্দা ঝুলানো। একেবারে পাশের একটি ঘরে কাঠের চেয়ার টেবিল ছড়ানো। পাশেই কাঠের একটি বইয়ের আলমারি। সামনে কাঁচের ফাঁক দিয়ে অনেক বই পত্র দেখা যাচ্ছে। টেবিলের দু'পাশে দু'টো চেয়ারে বাবা আর নিখিলবাবু মুখোমুখি বসে কথা বলছেন।

সন্ধ্যা পেরিয়ে অন্ধকার একটু একটু করে ঘরের দৃশ্যমানতাকে ঢেকে দিচ্ছে। এরমধ্যেই একটি হারিকেনের বাতি দিয়ে গেল অল্প বয়সী একটি মেয়ে। মেয়েটি ঘরে ঢুকলে কথাবার্তা একটুক্ষণের জন্য থেমে থাকলো।

নিখিলবাবু আবার শুরু করলেন, 'যা বলছিলাম। বিপ্লবের এই পথটি বড় বেশি গোলমেলে। কাউকেই আপনি দীর্ঘ পথে নিরবচ্ছিন্ন বিশ্বাস করতে পারবেন না। স্বার্থ, শ্লাঘা, প্রলোভন, সংসার, কামনা-বাসনা কত কিছু সামনে এসে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। কেউ সরে যাবে। বেঈমানী করবে। আঘাত করবে পেছন থেকে। সামনের সারির কেউ পেছনে যাবে। পেছন থেকে কেউ সামনে এসে দাঁড়াবে চিরসখার মত। আপনি জানেন কিনা আমি জানি না...'

বাবার চেয়ে বয়েসে প্রায় বিশ বছরের বড় একজন ভদ্রলোক বাবাকে এতক্ষণ আপনি আপনি করে যাচ্ছেন। বাবার একটু খারাপ লাগলো। বাবা বলেলন, 'নিখিলদা, আমাকে আপনি আপনি করছেন, আমার নিজেরই একটু অস্বস্তি লাগছে।'

নিখিলবাবু এ কথাটির অপেক্ষাতেই ছিলেন বোঝা গেল। তিনি খুশি হয়ে বললেন, 'তা ঠিক। আপনি কথাটি একটু দূরের শোনায়। তাছাড়া আমাদের সীমান্ত অঞ্চলের এলাকাটিতে কিন্তু কলকাতার ঘটি সংস্কৃতি নেই। কাউকেই হঠাৎ করে তুমি তুই বলার অভ্যেস এখানেও নেই। দেখছ না, গত একটি বছর পূর্ব-পাকিস্তান থেকে হাজারে হাজারে শরণার্থী কেমন লোকালয়ে মিলে-মিশে গেছে কতাবার্তার সাদৃশ্যের কারণে। কে তাদের পৃথক করবে? জমি-জিরিতের দামও হু হু করেই বেড়ে চলেছে। অনেকে তো আর শুধু খালি হাতে আসেনি। চোরাচালানি মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যেও আছে।'

বাবা প্রথম থেকেই বুঝতে পারছেন, নিখিলবাবুর কথায় মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে একটু বক্রোক্তি আছে। বাবা প্রথমে ভেবেছিলেন, ভদ্রলোক হয়তো শরণার্থীদের নিয়ে একটু বিরক্ত। কিন্ত ক্রমশ ধারণাটা অন্য বিন্দুতে সরে যাচ্ছে।

নিখিলবাবু যেন কথার ট্রেন ছোটাচ্ছেন। বাবার ভালই লাগছে। এই ভদ্রলোকের কথা বলার মধ্যে একটা মাদকতা আছে। কথা বলার ধরন আর বাচনভঙ্গিটি এমন যে শ্রোতার আগ্রহটা কখনওই সরে যায় না।

নিখিলবাবু একজন আগ্রহী শ্রোতা পেয়ে আবার শুরু করলেন, 'যা বলছিলাম তোমাকে। তুমি জানো কিনা সেটা আমি নিশ্চিত নই, তাই বলছি। কানু স্যানালদের না জানিয়েই চারুবাবু কিন্তু সেই জুলাই মাসেই নেপালি এক কমরেডকে চিনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কৃষ্ণভক্ত শর্মা নামের প্রায় অশতিপর এক বৃদ্ধ শিলিগুড়ি থেকে মাত্র কয়েক কিলোগ্রাম চানা আর ভুট্টোর ছাতু পিঠে বেধে নেপাল হয়ে চিনে পৌঁছে যান দুর্গম পথে পায়ে হেঁটে। সাথে চারুবাবুর দেওয়া কৃষক আন্দোলন ও ইশতেহারের দলিল। টাকা দিতে চেয়েছিলেন চারুবাবু। কিন্তু কমরেড কৃষ্ণভক্ত শুধু মাত্র পঞ্চাশটি টাকা সাথে নিয়েছিলেন। মাস দুয়েক সময়ের যাত্রায় ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন, জেল খেটেছেন। তবু কিন্তু চারুবাবুর চিঠি ঠিকই চিনে মা সে তুং এর কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। ফেরতও এসেছিলেন মা সে তুং-এর ফিরতি বার্তা নিয়ে। জানি না, নকশাল আন্দোলনে হয়তো কৃষ্ণভক্ত শর্মাদের কথা সবাই ভুলেই যাবে। অথচ এই নেপালি শেরপা কমরেডের অবদান কানু স্যানালদের চেয়ে কিছু কম?'

'৭২ সালের মাত্র শুরু। এখনও চারু মজুমদার বেঁচে আছে নিশ্চিত জেনেই কমরেডদের প্রতিরোধ হচ্ছে নানা জায়গায়। কানু স্যানালের নেতৃত্বে একটি দল ইতিমধ্যেই চারু মজুমদারের নীতির বিরুদ্ধে বলা শুরু করেছে।

বাবা বুঝলেন, চারু মজুমদারের সঙ্গে কানু স্যানালদের বিভেদ অনিবার্য। নদীয়ার অজপাড়াগাঁয়ের এক অখ্যাত কমরেডের

কথাতেও তার সুস্পষ্ট লক্ষণ। বাবা এও বুঝলেন, দিদিমা যা আভাসে বলেছিলেন, পলাতক চারু মজুমদারের সঙ্গেও নিখিলবাবুদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ যোগাযোগ আছে। কিন্তু একটি কথা এখনও বাবার কাছে খুবই ঘোলাটে। বাবার কাছে নিখিল বিশ্বাসের এত কথার প্রয়োজনটাই বা কিসের? তবে কি নিখিলবাবু ভেবেছেন সদ্য স্বাধীন জয়বাংলা থেকে এই পশ্চিমবঙ্গে চলে এসে কমরেডরা চারু মজুমদারের নকশাল আন্দোলনে যোগ দেবেন?

উনিশ.
খতম ও নকশাল

'খতম' শব্দটাই কেমন অশ্লীল, কেমন অসংস্কৃত, কেমন ভয়াবহ রকমের ভয়ঙ্কর। অথচ এই কম্যুনিস্টদের পত্রিকা, যাকে ওরা বলেন মেনুফেস্ট– ওসব ডাকাতির দলিলের পাতায় পাতায় জুড়ে আছে এই 'খতম' শব্দটি। কী এক বিচ্ছিরি রকমের প্রণোদিত খুনের আহবান! আপনি-ই ভেবে দেখুন।' ভলিবল খেলার মাঠে দেখা দীপঙ্কর মজুমদার বলে চলেছেন। বাবা আগ্রহী শ্রোতা।

"চারু মজুমদারে নামের এক বিভ্রান্ত নেতা ভারতের চিরশত্রু চিন থেকে প্রেসক্রিপসন নিয়ে এসেছেন। ভারতের গণতন্ত্রকে, নেহরু -গান্ধীর গণতন্ত্রকে ধ্বংস করবেন। শ্রেণিশত্রু খতম করবেন। নকশাল আন্দোলনের নামে থানা-প্রশাসন লুট করছে, গ্রামে শহরে সমাজবিরোধী দস্যুদের দিয়ে খুন করাচ্ছে, ইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অস্ত্রাগার আর সমাজবিরোধীদের আস্তানা বানাচ্ছে। অথচ চিন সমর্থন জানাচ্ছে, এটা নাকি 'ভারতের আকাশে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ (Spring thunder over India)। আপনি-ই একবার ভেবে দেখুন।' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে মজুমদারবাবু একটু থামলেন। আবার শুরু করলেন, 'চিনের সাথে যুদ্ধ হল। ক'বছর পরেই আবার পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ। অথচ সেই চির দুই শত্রু দেশের মদদেই কমিউনিস্টরা চক্রান্ত শুরু করে দিল। '৬৫ থেকে '৬৭ পর্যন্ত এই চারুবাবু আটটি দলিল প্রকাশ করেছেন। প্রত্যেকটি দলিলেই দেশেবিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের কথা। আমি তো রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়া মানুষ। প্রত্যেকটি দলিল পড়েছি। এখানে বাস্তবতা কোথায়?

'এখানে বাস্তবতা কোথায়?' বাক্যটি বেশ জোরে আরও একবার উচ্চারণ করে একটু থামলেন মজুমদারবাবু। মাত্র ক'দিনের পরিচয়েই এমন করে বলে যাচ্ছেন দীপঙ্কর মজুমদার। কালকেই তো নিখিল বিশ্বাস পক্ষে বললেন; আজকে দীপঙ্কর মজুমদার বলছেন বিপক্ষে।

দীপঙ্কর মজুমদার আবার বলতে শুরু করেছেন, 'দুই নম্বর দলিলের কথাই বলা যাক। সেখানে আছে এলাকাভিত্তিক ক্ষমতা দখলের। কেন্দ্রীয় ক্ষমতা দখল নাকি পার্টিকে সংস্কারবাদী পার্টিতে পরিণত করে। সেখান থেকেই এই জ্যোতিবাবুদের সাথে দ্বন্দ্ব। চারুবাবু বলেছেন, অস্ত্রহীনভাবে ক্ষমতা দখলের চিন্তা করা স্বপ্নবিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ভেবে দেখুন, কত বড় স্বপ্নবিলাসিতায় বসবাস এই চারু মজুমদারদের।'

শূন্য মাঠের দিকে তাকিয়ে দীপঙ্কর মজুমদার বলেই চলেছেন, 'অথচ জয় বাংলায় শেখ মুজিবের আন্দোলন দেখুন। ২৩বছর ধাপে ধাপে জনগণকে সংগঠিত করে তবেই না সশস্ত্র আন্দোলনের ডাক। চারুবাবুদের ভাগ্য নেহরুর মত একজন জননায়কের সন্তান এই ইন্দিরা গান্ধী। নইলে চিনের মত করেই নির্মূল করতেন চারু মজুমদারের মত দেশবিরোধীদের।'

বাবা আসলেই এক মহাদুঃশ্চিন্তায় পড়েছেন। দীপঙ্কর মজুমদারের সঙ্গে সেদিন মাঠে দেখা হল। পরেরদিন ভোরেই নিখিল বিশ্বাস এসে উপস্থিত। আবার সেদিন বিকেলেই বিশ্বাসবাবুর বাড়িতে আমন্ত্রণ। পশ্চিমবঙ্গের নকশাল আন্দোলন নিয়ে আলোচনা। চারু মজুমদার আর কানু স্যানালদের বিভেদ নিয়ে এমন খোলামেলা কথা।

অথচ কলকাতাসহ সারা রাজ্য জুড়ে নতুন গঠিত জাতীয় কংগ্রেস সরকারের ধরপাকড় চলছে। প্রেসিডেন্সিসহ অনেক কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীরা নকশাল আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছে। সাংস্কৃতিক ফ্রন্টেও নামকরা শিল্পী-সাহিত্যিক-নাট্যকর্মীরা কেউ গোপনে– কেউ প্রকাশ্যে নকশাল আন্দোলনকে সাহায্য সহযোগিতা করছে। পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় কংগ্রেস,যাকে বিশ্বাসবাবু প্রতিক্রিয়াশীল ইন্দিরা কংগ্রেস বলছেন, গত মাসের বিধান সভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করেছে। ইন্দিরা গান্ধী তাঁর অতি বিশ্বস্ত সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে মুখ্যমন্ত্রী বানিয়েছেন। কিন্তু গত কয়েক বছরে দু'দু'বার কেন্দ্রীয় শাসন জারি হয়েছে। বিশ্বাসবাবুর ভাষায় ইন্দিরা গান্ধী কেন্দ্রীয় সামরিক-আধাসামরিক বাহিনি ও কংগ্রেসের পেটোয়া পুলিশবাহিনি নামিয়ে হাজার হাজার কমরেডকে হত্যা করেছে।

বাবা কলকাতায় যা দেখে এসেছেন কিংবা ট্রেনে যে পরিস্থিতিতে পড়েছিলেন, তাতে একরকমের পুলিশী রাজ্যই বলা চলে পশ্চিমবঙ্গকে। অথচ ওপার বাংলা থেকে এতদিন শুনে এসেছেন, পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট শাসন সময়ের ব্যাপার মাত্র। গত মার্চের নির্বাচনেও ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন জাতীয় কংগ্রেস বিরোধীদের উড়িয়ে দিয়েই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী হল। কিন্তু একথা বলতেই হবে, নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলন মানুষের মধ্যে ব্যাপক আলোচনার বিষয় হয়েছে। এই ব্যাপক আলোচনার কতটুকু কমিউনিস্ট আদর্শ ও নীতির প্রতি আগ্রহ আর কতটা নকশালদের ভয়ে, সেটা মাত্র কয়েকদিনের অবস্থানে কি বোঝা সম্ভব?

হয়তো এমনও হতে পারে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে চলে আসা এক কোটি শরণার্থীর প্রতি ব্যক্তি ইন্দিরা যে সহানুভূতি দেখালেন কিংবা যেভাবে চিরশত্রু পাকিস্তানকে নাকানিচুবানি খাইয়ে পাকিস্তানকে ভেংগে দিলেন, তার প্রতিদানই দিল পশ্চিমবঙ্গের মানুষ।

একদিকে নকশালদের শ্রেণিশত্রু খতমের নামে গ্রাম-বন্দর-শহর জুড়ে লুটতরাজ-হত্যা-অরাজকতা চলছে সেই ১৯৬৭ সাল থেকে। অন্যদিকে ইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে এক প্রকারের ভয়ের রাজত্ব। সারা রাজ্যজুড়ে অভিভাবকদের মহাদুঃশ্চিন্তা, কবে কার সন্তান বাড়ি থেকে চলে যায় নকশাল আন্দোলনে। কখন পুলিশ কড়ানেড়ে বাড়ি থেকে নিয়ে যায় যুবক বয়সী ছেলেকে নকশাল আন্দোলনে সংশ্লিষ্টতার অজুহাতে। এককথায় মানুষ আক্ষরিক অর্থেই বিরক্ত। হয়ত তার প্রতিফলনই মার্চ, ১৯৭১ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের এমন বিশাল বিজয়।

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই মজুমদারবাবু অর্থ্যাৎ দীপক মজুমদার দাদুবাড়িতে এসে উপস্থিত। তখন ঠিক বিকেল হয়নি। শীতকাল তখনও যাই যাই করছে। এ সময়টায় সূর্য পশ্চিম দিকে একটু হেলে পড়লেই গায়ে হালকা ঠাণ্ডার আবেশ লাগে। দুপুরের খাওয়া শেষ করে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন বাবা। ধবধবে ধুতি-পাঞ্জাবি আর গায়ে চাদর জড়িয়ে বাইরের ঘরে বসেছেন

মজুমদারবাবু। অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্বশুরমশাইয়ের ইস্কুলের কর্তাব্যক্তি দীপক মজুমদারের কাছে বসতেই হয়েছে।

দীপক মজুমদারের কথাবার্তা ও ব্যবহারে আভিজাত্য আর বনেদিপনার ছাপ। 'ভারতের আকাশে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ (Spring thunder over India) কথাটি যখন বললেন, ইংরেজি উচ্চারণ একটু অন্যরকমের। আমাদের অঞ্চলের ইংরেজি উচ্চারণের মত নয়। কথা বলার ধরনেও বোঝা যায়, ভদ্রলোক হয়তো বাংলার বাইরে ছিলেন। লেখাপড়াও হয়তো বাইরেই হবে। কিন্তু নেহরু ও গান্ধীর প্রতি সহানুভূতি দেখে মনে হচ্ছে, ইন্দিরা কংগ্রেসের লোক। ঘোরতরভাবে কমিউনিস্টবিরোধী। অথচ গতকালকেই নিখিল বিশ্বাসের সঙ্গে কমিউনিস্ট আন্দোলন নিয়ে কত কথা হল।

হঠাৎ দীপকবাবুর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলেন বাবা, 'গতকাল নিখিল বিশ্বাসের সাথে অনেক আলাপ হয়েছে শুনলাম। মুদ্রার এক পিঠ দেখে বিভ্রান্ত হতে পারেন, তাই ভাবলাম অন্য পিঠের সংবাদটুকুও জানা থাকলে সিদ্ধান্ত নিতে আপনারই সুবিধে হবে। তাছাড়া, জয় বাংলার প্রতি এ-বাংলার কমিউনিস্টদের যে কীর্তিকলাপ। ভাগ্যিস কেন্দ্রীয় শাসন ছিল, তাই জয় বাংলার এক কোটি মানুষ আশ্রয় পেয়েছে। ওই জ্যোতিবাবু কিংবা অজয় মুখুজ্জের যুক্তফ্রন্ট থাকলে কি এসব হত? আর নকশাল নেতা চারু মজুমদার তো প্রকাশ্যেই জয় বাংলার বিরোধিতা করে চিন ও আমেরিকাকে যুদ্ধে জড়াতে আহবান করেছিলেন।'

নিখিল বিশ্বাস আর দীপক মজুমদারের এই পারস্পারিক কথাবার্তায় বাবা হতবাক। কলকাতা থেকে অনেকটাই দূরে এই এলাকা। সীমান্ত ঘেষেই এর অবস্থান। অথচ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের রাজনীতির জটিলতা কেমন জাজ্বল্য এখানে। আঞ্চলিক ও বিশ্বরাজনীতির মেরুকরণের খুঁটিনাটি অনেকটাই স্পষ্ট।

অথচ একজন রাজনীতি সচেতন শিক্ষক হয়েও পূর্ব-বাংলায় বিশ্বরাজনীতি নিয়ে তেমন ভাবেননি। ভাবনার সময়টাই বা কোথায় ছিল? '৪৭-এর পর থেকে পূর্বপাকিস্তানের মানুষ তো একের পর এক আন্দোলন সংগ্রামের ভিতর দিয়েই গেছেন। ভাষার অধিকার, ভোটের অধিকার, ভাতের অধিকার, কৃষ্টি-সংস্কৃতির অধিকারসহ মৌলিক অধিকারের সংগ্রাম করতেই তো পূর্ব-বাংলার মানুষের ২৩টি বছর চলে গেছে। তারপরে এই রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ। অথচ সেই মুক্তিযুদ্ধ নিয়েও পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিবিদদের এত কূটনীতি-এত দ্বিধা-এত দ্বন্দ্ব! বাবার আবারও বিস্মিত হবার পালা।

নিজে একজন মুক্তিযোদ্ধা। কমিউনিস্ট কিভাবে হয়, কাকে কমিউনিস্ট বলে সেটা হয়ত জানেন না। কিন্তু কমিউনিস্ট আন্দোলনকে মন থেকেই সমর্থন জানিয়ে এসেছেন সারাজীবন। একজন কমিউনিস্ট-আন্দোলনঘনিষ্ঠ হিসেবেই মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করেছেন। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে যত আন্দোলন হয়েছে সে-সবেও অংশগ্রহণ করেছেন। '৭০-এর নির্বাচনেও শেখ মুজিবের দলের প্রার্থীকেই জিতিয়ে এনেছেন এলাকায়। কিন্তু কখনওই তো মনে হয়নি, জয় বাংলার যুদ্ধ কমিউনিস্ট ভাবধারার বিরোধী!

নয় মাসে অধিকাংশ সময় বাবা বাড়ি থেকে পলাতক। শুধুমাত্র মায়ের অনুরোধেই কলকাতায় এসে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে আসা। অথচ সদ্য স্বাধীন দেশে কত কাজ বাকি রয়ে গেছে। সে সব ছেড়ে এই কংগ্রেস আর নকশালদের ক্যাচালে জড়াতে বাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। তবু 'কমিউনিস্টদের জয়বাংলা-বিরোধিতা' কথাগুলো শুনেই বাবার আগ্রহ একটু বেড়ে গেল। তা না-হলে হয়তো দীপকবাবুর কাছ থেকে উঠেই আসতেন বাবা।

ততক্ষণে দিদিমা চা পাঠিয়ে দিয়েছেন বৈঠকখানায়। চা পরিবেশনের অবসরে বাবা বাইরের দিকে তাকালেন। দেখলেন, বেশ কিছু লোকের আনাগোনা। বাবার বুঝতে বাকি রইল না, দীপক মজুমদার নকশাল আন্দোলনের 'খতমের' ভয়ে লোকজন সঙ্গে নিয়েই চলাফেরা করেন।

কুড়ি.
সিদ্ধান্তহীনতার দোলাচলে বাবা

সিদ্ধান্তটি এত অকস্মাৎ নিতে হল যে, বাবা এর জন্য প্রস্তুতই ছিলেন না। না মানসিকভাবে, না পারিবারিকভাবেও। মাত্র ছয় মাসও হয়নি কনিষ্ঠ সন্তানটি জন্ম নিয়েছে। যুদ্ধের সময়ে জন্ম-নেয়া কন্যাটির মুখও ঠিক মত মনে করতে পারছেন না বাবা। পুত্র এবং আরও একটি কন্যা তো আছেই। তাদের সঙ্গেও কতদিন সময় কাটানো হয়নি। সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে রেখে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করতে বাড়ির বাইরে থাকতে হয়েছে । বাড়িতে থাকার সময়ে পরিবারের কারও প্রতি খেয়াল করতে পারেননি বাবা। ছাত্র-ছাত্রী তো আছেই। এলাকার থিয়েটারের দলটির নাটকও বন্ধ একটি বছর। যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সাহায্য সহযোগিতা করা প্রয়োজন।
ডিসেম্বরে দেশ স্বাধীন হয়েছে। এখন মার্চ মাস। মাত্র ক'টি মাসের ব্যবধান। ইতিমধ্যেই অনেক রাজাকার রঙ পাল্টে মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট নেয়া শুরু করেছে। অনেক মুক্তিযোদ্ধারা নাকি ডাকাতি-রাহাজানিতেও জড়িয়ে পড়েছে। টাঙ্গাইলের কাদেরিয়াবাহিনির নামে অনেক এলাকাতে জোরজুলুম চলছে। ঠিক এ সময়টিতে সদ্য-স্বাধীন দেশ থেকে ভারতে চলে আসতে মন সায় দিচ্ছিল না। তবুও মায়ের কান্না-কাটিতে বাবাকে আসতেই হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে।

কিন্তু এখন এক কঠিন অবস্থায় মধ্যে পড়েছেন বাবা। শ্বশুর-শাশুড়ি কিছুতেই মেয়েকে বাংলাদেশে থাকতে দিতে রাজি নন, দাদু সে কথা স্পষ্ট করে বলেই দিয়েছেন। দিদিমাও মেয়ের জন্য অস্থির। আরও দু'টো সন্তান আছে দাদু-দিদিমার। কিন্তু বড় মেয়ের প্রতি স্নেহ-মায়া-মমতা বাবা-মায়ের একটু বেশিই থাকে। এটা যেন স্বভাবজাত। বাবা-মায়ের অভিজ্ঞতা প্রথম সন্তানের জন্মের পরেই দানা বাধে। দাম্পত্য জীবনের স্বপ্নগুলোও প্রথম সন্তানের সময় থেকেই বুকের গভীরে বাবা-মা লালন করা শুরু করেন। নিজের অস্থিত্বের মধ্যে আর একটি প্রাণকে বেড়ে ওঠতে দেওয়ার কষ্ট তো আছেই। সেই কষ্টের মধ্যেও মাতৃত্বের যে অনুভূতি সেটির সুখও অভাবনীয়। সন্তান ভূমিষ্ঠকালের প্রথম অভিজ্ঞতা কোনও মা-ই ভুলতে পারেন না। তাই তো প্রথম সন্তান সব সময়ই বাবা-মায়ের কাছে বিশেষ এক স্থান করে নেয়। দাদা-দাদুও তাদের সদ্য বিয়ে দেওয়া প্রথম কন্যা সন্তানটিকে পূর্ব-পাকিস্তানে ফেলে রেখে একদিনের জন্যেও শান্তিতে থাকতে পারেননি। দিদিমার এক কথা, 'ভগবান যখন আবার সুযোগ দিয়েছেন মেয়েটিকে নিজেদের কাছাকাছি রাখার, সে সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করা যাবে না। বাবা, তুমি আর কিছুতেই না করো না'।

আজকে দুপুরেই ইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সঙ্গে নিখিল বিশ্বাস আর দীপঙ্কর মজুমদার বৈঠকে বসেছিলেন। উৎপাত ও দমন সমিতির নেতাদের এই একত্রে বৈঠকে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি অক্ষয় বসুও খুশি। ইস্কুলের প্রধান শিক্ষিক মনোময় সরকার নকশাল আর কংগ্রেস-কমিউনিস্টের সংঘাত থেকে নিজের এবং পরিবারের

প্রাণ রক্ষা করেছেন অন্যত্র সরে গিয়ে। প্রায় বছর দুই যাবৎ প্রধান শিক্ষকের পদটি খালি। শিক্ষা কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটছে। অনেক চেষ্টার পরেও কাউকেই নিয়োগ দেওয়া যায়নি। নিখিল বিশ্বাস সমর্থন করেন তো দীপঙ্কর মজুমদার বেঁকে বসেন। আবার কখনও ঘটে উল্টোটিও। দীপঙ্কর মজুমদারের পছন্দের প্রার্থীকে নিখিল বিশ্বাস নকশাল দিয়ে 'খতম' করার হুমকি দিয়ে আসেন।

কোনও এক অজ্ঞাতকারণে বাবার প্রতি দু'পক্ষেরই আনুগত্যে ইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটি একটু আশ্চর্যই হয়েছেন। তাই তো অক্ষয়বাবু বারবার দাদুকে জিজ্ঞেস করেছেন, 'ভৌমিকবাবু, আপনি জামাইয়ের সাথে কথা বলেছেন তো? এই উৎপাত আর দমন সমিতির নামে যা যা হয়েছে কিংবা হচ্ছে সব কিন্ত আপনার জানানো দরকার জামাইকে। হাজার হোক নিজের মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে তো আর লুকানোর ছাপানোর কিছু নেই। আমি চাই না একটি সদ্য স্বাধীন দেশ থেকে একটি পরিবার আবার অনিশ্চিত জীবনের মধ্যে এসে পড়ে।'

দাদু নিজেও অক্ষয় বসুকে আপনজন বলেই জানেন। ৬৫ সালের দাঙ্গার পরে যখন ঢাকার একটি বনেদী হাইস্কুলের শিক্ষকতার চাকরি ছেড়ে এখানে চলে আসেন, তখন যে ক'জন হাতেগোনা মানুষ দাদুকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন বসুবাবুর পরিবার তাদের অন্যতম। পূর্ববঙ্গের মানুষজনের প্রতি আলাদা একটি টান আছে বসুবাবুর। নিজে বিভিন্ন সময়ে সেটি করেও দেখিয়েছেন। জয়বাংলা থেকে পালিয়ে আসা শরণার্থীদের জন্য সাহায্য তুলেছেন নিজের উদ্যোগেই।

শুধু শরণার্থী নয়, এলাকাতেও বসুদের একটি নিজস্ব আভিজাত্য আছে। কী নকশাল, কী কংগ্রেস বা কমিউনিস্ট সবাই সমীহ করে চলেন অক্ষয় বসুকে। তারকনগরের হাইস্কুলটিও বসু বাবুদের পূর্বপুরুষদেরই প্রতিষ্ঠিত।

দাদু অক্ষয় বসুকে নিশ্চিত করলেন, 'হ্যাঁ আমির তো বলেছিই। আপনার বৌমাও তার জামাইয়ের সাথে এ নিয়ে কথা বলেছে। প্রথমে একটু নিমরাজি থাকলেও, পরের শাশুড়িমায়ের কথায় রাজি হয়েছে জামাই। তবুও চিন্তা তো একটু আছেই। জামাই নিজে আবার মুক্তিযোদ্ধা। এত কষ্ট করে এত আত্মত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া জয় বাংলা। সেটি ছেড়ে একেবারে চলে আসা! জামাই বেচারার জন্য একটু মায়াও হচ্ছে, দাদা। না পারছে শ্বশুর-শাশুড়ির কথা ফেলতে, না পারছে দেশপ্রেমের জন্য নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকতে।'

অক্ষয় বসু বললেন, 'ভৌমিকবাবু, এত তাড়াহুড়োর প্রয়োজন নেই। জামাইকে আরও একটু সময় দিন। এখনও তো টেলিফোন যোগাযোগ চালু হয়নি জয় বাংলার সাথে। হলে বলতাম আপনার মেয়ের মতামতটি নিতে।'

দাদু এ ব্যাপারে কিছু বললেন না। শুধু 'আমার মেয়ে আর কী মতামত দেবে। ও তো বাবা-মায়ের কাছে আসবেই।'

দাদু ফিরে এসে দিদিমাকে অক্ষয় বসুর কথাগুলো বললেন। কিন্ত দিদিমা কিছুতেই এ সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে আসতে রাজি নন।

এক নির্ঘুম রাত কাটলো বাবার। বারবার মনে পড়ছে শ্বশুরমশাইয়ের যুক্তিপূর্ণ কথা। শ্বশুরমশাইয়ের অকাট্য যুক্তি। দ্বিজাতিতত্ত্বের যে দুষ্ট চারা গাছ নেহরু-জিন্নাহ ১৯৪৭ সালে রোপণ করেছিলেন, সে বিষবৃক্ষের কাঁটার আঘাতে লক্ষলক্ষ মানুষের রক্ত ঝরেছে। সে রক্তের স্রোত এখনও শেষ হয়নি। সদ্য শেষ হওয়া মুক্তিযুদ্ধেও ত্রিশ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। এক কোটির উপর শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। দেশ থেকে বিতাড়িত হওয়া এ মানুষগুলো দীর্ঘ ছটি মাস অনাহারে-অর্ধাহারে কাটিয়েছে। অনেকে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করেছে। কিন্তু এই মানুষগুলোর কী অন্যায় ছিল? বাবা নিজেও দেখেছেন মুক্তিযুদ্ধের প্রথম ক'মাস হিন্দুধর্মীয় মানুষদের উপর বেছে বেছে অত্যাচার হয়েছে।

আত্মত্যাগও করেছে হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষই বেশি। অথচ ভারত ভাগের তত্ত্বানুসারে পূর্ব-পাকিস্তানে হিন্দুদের থাকারই কথা ছিল না। আর সে বিশ্বাস থেকেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে হিন্দু বা কাফেরদের ষড়যন্ত্র আখ্যা দিতে চেষ্টা করেছিল পশ্চিম পাকিস্তানের সরকার। শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লিগের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কাছে যদিও এ যুক্তি ধোপটেকেনি কিন্তু দেশের বিভিন্ন স্থানে অত্যাচার হিন্দুদের উপরেই বেশি হয়েছে। ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের অধিকাংশও তাই হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ। স্বাধীন জয় বাংলা তো হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান, বাঙালি-উপজাতি সকলেরই। তবে যুদ্ধের সময় কেন সংখ্যালঘু মানুষের উপরেই নেমে আসলো অত্যাচারের খড়্গ ভয়াবহ আকারে?

বাবা স্বাধীন জয়বাংলায় যে ক'মাস ছিলেন, সে ক'মাসেই মানুষের বিচিত্র কিছু পরিবর্তন দেখে এসেছেন। হঠাৎ গজিয়ে ওঠা মুক্তিযোদ্ধাদের অত্যাচারে কথা তো আছেই। সেই সঙ্গে কিছু বিভ্রান্ত বামদল ইতিমধ্যেই মুক্তিযুদ্ধকে ভারতের আধিপত্যবাদ হিসেবে অপপ্রচার চালাচ্ছে। অনেকে তো প্রকাশ্যেই বলছে, ভারত হস্তক্ষেপ করেছে ভারতের স্বার্থে। কিছু লোক আবার এক ধাপ এগিয়ে এসে বলে বেড়াচ্ছে যে, ভারতের সেনাবাহিনি জয় বাংলা স্বাধীন করে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে অনেক কিছুই লুট করে নিয়ে গেছে। অনেকে আবার হিন্দু জমিদারেরা আবার চলে আসবে বলেও গুজব রটাচ্ছে। বাবা ভাবতে লাগলেন, তবে মানুষ কি সবসময় কাউকে না কাউকে প্রতিপক্ষ বানিয়ে রাখে। এতদিন পূর্ববাংলার মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রতিপক্ষ বানিয়ে আন্দোলন করেছে, যুদ্ধ করেছে। এবার তবে কি ভারতই হবে স্বাধীন জয় বাংলার সংখ্যাগুরু মুসলমানের প্রতিপক্ষ? সেটি যদি হয়, তবে সংখ্যালঘু হিন্দুরাও কি সংখ্যাগুরু মুসলমানের শত্রু হয়ে উঠবে একদিন?

একুশ.
চন্দ্রমুখী জানালায় জয় বাংলার আলো

মার্চ মাস। শীতের প্রকোপ কমে এসে দিনের বেলায় বেশ গরম পড়ে। রাতেও তাই জানালা খুলেই রাখতে হয়। বাবা দেখলেন, পুবদিকের জানালা দিয়ে চাঁদের আলো ঘরে এসে পড়েছে। মাঠের ওপাশে জানালা দিয়ে দেখা যায় আমবাগান। বাগানের উপরে পুব আকাশে একটি গোলাকার চাকতি বিশ্বচরাচরে আলো ছড়াচ্ছে।
বাবার মনে পড়লো, ক'দিন আগেই তো পূর্ণিমা গেল। বিছানা থেকে উঠে পুবদিকের জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন বাবা। এক তীব্র আলোতে তাঁর সারা শরীর যেন মুহূর্তেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। খুব ইচ্ছে হল এই জ্যোছনার জোয়ারে ভাসতে। হাতের ঘড়ির কাঁটায় তখন মধ্যরাত। জ্যোৎস্না উপভোগ করতে এই দুপুররাতে বাইরে বেরোনো একটুও শোভন দেখাবে না এই অজানা জায়গায়।

জানালার ফাঁক গলে বাইরের ভুবনআলো-করা চাঁদের আলো গায়ে এসে পড়তে লাগলো। বাবা আর বাইরে বের হলেন না। চাঁদের আলোর উজ্জ্বলতা ছাপিয়ে মুহূর্তেই এক অজানা আশঙ্কা বাবার মনকে ভারী করে তুললো। বাবা ভাবতে লাগলেন, সদ্য স্বাধীন

জয়বাংলা তবে কি আজকের এই চাঁদের আলো! যে আলো তার মত সংখ্যালঘুদেরকে সারাজীবন চন্দ্রমুখী জানালা দিয়েই উপভোগ করতে হবে। কখনওই দুয়ার খুলে বাইরে বেরিয়ে স্বাধীনতার আলো গায়ে মাখতে পারবে না!

আবার মুহূর্তেই মনে পড়লো পশ্চিম পাকিস্তানের জেল থেকে ফিরে আসা শেখ মুজিবের কথা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তো এই সেদিন বললেন, স্বাধীন বাংলাদেশ শুধু মুসলমানের নয়। বাংলাদেশ হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান, বাঙালি-পাহাড়ি-আদিবাসী সবার। বাংলাদেশ হবে সাড়ে সাত কোটি মানুষের সোনার বাংলা। এখানে ধর্ম-জাতি-সম্প্রদায়-ধনী-গরীব-উচুঁ-নিচুতে কোনও ভেদাভেদ থাকবে না। এখন আমাদের সব কিছু ভুলে সোনার বাংলা গড়তে হবে। যে নেতা জীবনের অধিকাংশ সময় বাংলার মানুষের মুক্তির জন্য জেলে কাটাতে পারেন, যাঁর একটি তর্জনীর আদেশে লক্ষ-লক্ষ মানুষ জীবন দিতে পারে, তাঁকে বিশ্বাস করা যায়। তাঁর দেখানো পথেই গড়া যায় দেশ। শেখ মুজিবের কথা মনে আসতেই বাবার চোখে মুখে এক তীব্র আলো ঝলমল করে উঠলো, ঠিক আজকে রাতের এই চাঁদের আলোর মতই। এ ক'দিনে ঘটে যাওয়া সবকিছুর জন্যে নিজের মধ্যেই এক অপরাধবোধ কাজ করতে লাগলো। নিজে একজন মুক্তিযোদ্ধা হয়ে কেমন করে সম্ভব হল জয়বাংলা ছেড়ে চিরতরে চলে আসার মত সিদ্ধান্তে সায় দিতে। নকশাল আর কংগ্রেসের ক্যাচালে জড়ানো একটি ইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের চাকরিটি কি জয়বাংলার চেয়েও মূল্যবান? এত আত্মত্যাগ, এত সংগ্রাম, এত স্বপ্ন সব কিছু ছেড়ে এই পরের দেশে চিরতরে চলে আসা কি সম্ভব? ছিঃ ছিঃ। একটিবারের জন্যেও কেন তাঁর মনে পড়লো না তাঁর জন্মভূমিকে, তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের? দেশত্যাগের কথা চিন্তা করাও একধরণের অপরাধ। বাবাকে সেই অপরাধবোধ এখন কুরেকুরে দংশন করছে যেন। বাবা নিজের অজান্তেই হঠাৎ গুনগুন করে গেয়ে উঠলেন, আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।

কখন যে মধ্যরাত পেরিয়ে ভোরের আলোতে পুবদিক রাঙা হয়ে উঠেছে খেয়ালই করেননি বাবা। ইস্কুলমাঠের দক্ষিণ দিকের রাস্তা দিয়ে আবছা অন্ধকারে কিছু ছায়ার নড়াচড়া চোখে পড়লো। একটু খেয়াল করতেই স্পষ্ট দেখা গেল, হাতে লোটা-কম্বল-হাড়িপাতিল নিয়ে দশবারো জনের একটি শরণার্থীদল ভোরের ট্রেন ধরার উদ্দেশ্যে বাগুলি রেলস্টেশনের দিকে যাচ্ছে। বাবার বুঝতে বাকি রইল না, এই শরণার্থীদলটি সদ্য স্বাধীন জয়বাংলায় ফিরে যেতেই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের গেদের লোকাল ট্রেনটি ধরবে।

বাবা সমস্ত ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে ঘরের বাইরে বের হয়ে মাঠের পাশে দাঁড়ালেন। শরণার্থী দলটি কাছে এগুতেই বাবা খাঁটি বাঙাল উচ্চারণে জিজ্ঞেস করলেন, 'দাদারা কি গেদের ট্রেন ধরতে যাইতাছেন।'

বাঙালভাষা শুনে শরণার্থী দল থেকে একজন বললেন, 'জ্বী, ঠিকই ধরতে পারছুন। দাদাও কি জয় বাংলার?'

বাবা বলেন, 'হ্যাঁ, আমি মানিকগঞ্জের। আপনারা?'

শরণার্থী দল থেকে উত্তর এলো, 'আমরা ময়মুনসিং। বাড়িত যাইতাছি। আর কতদিন থাকবাম এই পরের দ্যাশে। শ্যাখসাব দ্যাশে ফিরছুন, আমরা আর থাকতাম কি-য়ারে? আপনি জয়বাংলায় কবে যাইতান? নাহি আর যাইত্যানই না?'

বাবা উত্তর দিলেন, 'যামু, আজকে বিকেলের ট্রেনেই জয়বাংলায় ফিরমু'। 'জয় বাংলা' শব্দ দু'টি উচ্চারণ করতেই ভোরের স্নিগ্ধ আলো বাবার চোখেমুখে এসে পড়ল। বাবা স্মৃতিমেদুরতায় ডুবে গেলেন। জয়বাংলা মানে স্বাধীনতা। জয়বাংলা মানে মুক্ত প্রাণের উচ্ছ্বাস, যে উচ্ছ্বাস প্রতিটি বাঙালিকে আপ্লুত করে। প্রতিটি বাঙালিকে উজ্জীবিত করে। জয়বাংলা মানে প্রাণের আবেগ প্রাণের মাঝে ধরে রাখতে না পারা।

ভজন সরকার প্রবাসী কথাসাহিত্যিক

লেখা আহ্বান

সনাতন কথার নিয়মিত ত্রৈমাসিক প্রকাশনার যাত্রা শিগগিরই শুরু হতে যাচ্ছে। দেশ-বিদেশের লেখক-কবি-বুদ্ধিজীবী ও ধর্মবেত্তাদের কাছ থেকে সনাতন ধর্মবিষয়ক তাত্ত্বিক প্রবন্ধ, কবিতা, ছোট গল্প আহ্বান করি। লেখা প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য হতে হবে। এমএস ওয়ার্ডে কম্পোজ ও ইউনিকোর্ডে লেখা পাঠালে ভাল হয়। অবশ্যই লেখার কপি রেখে পাঠাবেন। ছ'মাসেরর ভেতর ছাপা না হলে ধরে নিতে হবে, লেখা অমনোনীত হয়েছে। এক্ষেত্রে কোনও ধরনের অনুরোধ-উপরোধ লেখকের অযোগ্যতা বলে গণ্য হবে।

– সম্পাদক

সনাতনকথা

ছোটগল্প

গগনচিলের ডানা

রফিকুর রশীদ

চলন্ত বাসের মধ্যেও যে সমানের সিট এবং পেছনের সিট মিলিয়ে ৪/৫জনের ছোটখাটো গ্রুপ তৈরি হয়ে যেতে পারে এবং দিব্যি এ-রকম প্রাণবন্ত আলোচনাও জমে উঠতে পারে, আগে তেমন ধারণা ছিল না। আড্ডা জমানোর জন্য পূর্বপরিকল্পনা মাফিক সিট এ্যারেঞ্জ করা হয়েছে এমনও নয়। হলদিয়ার বিভিন্ন হোটেল বা লজ থেকে বিভিন্ন জন বাসে উঠে যে যার মত বসে পড়েছে। বসার পর ডানে-বামে কিংবা সামনে-পেছনে তাকিয়ে সহযাত্রীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে সচেষ্ট হয়েছে। আগে থেকেই অনেকের মধ্যে চেনাজানা আছে, সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিগত চাররাত আর তিনদিনের কাব্যসুবাসিত একত্রবাসের স্মৃতি। ফলে শেষ পর্যন্ত কেউ আর অচেনা থাকে না বললেই চলে। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলা তো আছেই, আসাম-ত্রিপুরা-মেঘালয় এমন কি আন্দামান পর্যন্ত যেখানে বাংলা ভাষায় কাব্যচর্চার চল্ আছে বছরে বছরে সে সব জায়গা থেকে কবি সাহিত্যিকেরা এসে তিনদিনের জন্য মিলিত হয় পূর্ব মেদিনীপুরের বন্দরনগরী হলদিয়ায়। সেই সঙ্গে বাংলাদেশের ২০/২৫জন অতিথি কবি। তিনদিনের কবিতা উৎসব শেষে দুটি রিজার্ভ বাসে সবাই ফিরে চলেছে।

নিকটপাল্লার অনেকে আগের দিনেই সন্ধ্যে নাগাদ কেটে পড়লেও দুটি বাস মিলিয়ে যাত্রী সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। আপাত গন্তব্য কলকাতার রবীন্দ্রসদন। তারপর ছড়িয়ে পড়বে যে-যার মত। বারো বছর ধরে এই রকমই চলে আসছে। প্রতি বছর আমন্ত্রিত কবি-সাহিত্যিকের কিছু অদল-বদল হয়, সেই সুযোগে নতুনদেরও প্রবেশ ঘটে; তাই বলে পরস্পর পরিচিত হয়ে উঠতে মোটেই সময় লাগে না। ফলে চলন্ত বাসেও শেষবেলার আড্ডা জমে ওঠে বেশ।

আমাদের সামনের সিটে বামদিকে বসেছেন কবি ভাস্বতী গোস্বামী, ফর্সা ধবধবে ছোটখাটো মানুষ। সদা হাস্যময়ী। চেনাজানা থাক বা না থাক, বাঙালি-মাত্রই তাঁর আত্মীয়। অথচ স্বামীর কর্মসূত্রে তিনি থাকেন বাংলার বাইরে, রাজধানী দিল্লিতে। তিরিশ বছর পেরিয়ে গেছে, তবু বাংলার জন্যে প্রবল টান। ছলছুতো পেলেই ছুটে আসেন কলকাতা। কবিতা উৎসব, বইমেলা, বসন্তোৎসব তো আছেই, সর্বোপরি বেলঘরিয়ার পুরনো বাড়িতে অশীতিপর শ্বশুরমশাই পথের দিকে তাকিয়ে থাকেন, বড়বউমা বাড়ি এলে তাঁর খুব আনন্দ হয়; কাজেই তাঁকে আসতেই হয় বছরে পাঁচ সাতবার। সেই মানুষ কিনা দুম করে বলে বসলেন, 'একপৃষ্ঠা কবিতা পড়ার জন্য অত দূর থেকে আর আসব নারে প্রণব।'

প্রণব বসেছে আরও দুই সিট সামনে, ডান দিকে, সেখান থেকেই উত্তর দেয়, 'কেন, তোমার কি লোকসান হয়ে যাচ্ছে?'

পাশের সিট থেকে মধ্যবয়সী এক মহিলা আলাপের মধ্যে ঢুকে পড়েন, 'এক কবিতার পেছনে তাহলে খরচ পড়ছে কত?'

প্রণব হাত উঁচিয়ে প্রতিবাদ করে, 'এটা তোমার ঠিক হল না মাধুরীদি, এখানেও হিসাব-নিকাশ!'

এই কবিতার মধ্যে মাধুরী সাহাও কম যান না, 'প্রাণজি বসাকের কথা মনে আছে? ওই যে বলেছিলেন– আয়ুর হিসেব হয় অমরত্বের নয়, কবিতা কেবলই আত্মরতি সংগোপনে শুধু পাপক্ষয়।'

একজন বয়সী কবি ঘাড়মাথা দুলিয়ে বলেন, 'কলমে জোর আছে, বড্ড ভাল লেখেন; কিন্তু এবারে তো দেখলাম না তাঁকে!'

'দিল্লির মায়া বলে কথা! রাজধানী ছাড়তে মন চায়!' ভাস্বতী সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করেন, 'তাঁর স্ত্রী অসুস্থ। একেবারে শেষবেলায় প্লেনের টিকেট ক্যান্সেল করেছেন।'

মাধুরী সাহা এ নিয়ে আর কথা বাড়ান না। প্রণব গলা বাড়িয়ে ভাস্বতী গোস্বামীর কাছে জানতে চায়, 'তোমার ফ্লাইট কখন দিদি?'

'রাত সাড়ে আটটায়।'

'আজই!' মাহমুদ হাফিজ এতক্ষণে যেন-বা আকাশ থেকে পড়ে, 'বিকেলে কলেজ স্ট্রিটে আসছেন না?'

'না ভাই, এবার আর হচ্ছে না। কাল সকালে মিটিং আছে দিল্লিতে।'

'বাংলাদেশের কবিদের সম্মানে কফি হাউসের সান্ধ্যআড্ডায় আপনাকে পাব না, এ যে ভাবতেই পারছি না দিদি!'

নজরুলের গান থেকে কোট করেন ভাস্বতী গোস্বামী, 'চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায় বন্ধু। গত বছর তো আড্ডার মাঝখানে ছিলাম আমি। এবার থাকছি না, আগেই সে-কথা জানিয়েছি শ্যামলদাকে। অসুবিধা নেই হাফিজ ভাই, আপনি তো মার্চের গোড়াতেই দিল্লি আসছেন, তখন আড্ডা হবে।'

প্রণব ফোঁড়ন কাটে, 'বাঙালির আড্ডা বাংলার বাইরে, বেশ বলেছ যা হোক।'

কবি রোকেয়া ইসলাম আছেন অনেকখানি সামনে, নিজস্ব বৃত্তে ছিলেন মশগুল, সেই বৃত্ত ভেঙে মাথা উঁচিয়ে আহ্বান জানান, 'তাহলে আপনারা ঢাকায় চলে আসুন, বাঙালির আড্ডা বাংলাদেশেই হবে কবিতা ক্যাফেতে। ফেব্রুয়ারিতেই আসুন আমাদের বইমেলাতে।'

এইবার ঢাকাইয়া বুলিতে প্রণব জানায়, 'যামু যামু। কামাল ভাইয়ের লগে কতা হইছে, আগে টাঙ্গাইল যাইয়া লই।'

মাহমুদ কামাল দু'মুখো ধারের ছুরি। যেমন তার কবিত্বশক্তি, তেমনি তার সাংগঠনিক দক্ষতা। তাঁরই নেতৃত্বে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় কবিতা উৎসব হয় ঢাকা থেকে অনেকটা দূর টাঙ্গাইলে। ভারত থেকে অন্তত তিরিশজন বাঙালি কবি সেখানে অংশ নেন কবি শ্যামলকান্তি দাশের নেতৃত্বে। তাঁরা দুজনেই আছেন অগ্রবর্তী বাসটিতে কামালের সঙ্গে। বাসের ভেতরেই হয়তো ভারতীয় বাহিনির নাম সিলেকশন হয়ে যাচ্ছে, কয়েকবার তালিকায় নাম ওঠা সত্ত্বেও ভাস্বতী গোস্বামী বাংলাদেশে আসতে পারেননি তা নিয়ে খুব দুঃখ তার। মাসে-দু'মাসে দিল্লি থেকে কলকাতা আসতে পারেন বেশ, ঢাকায় যেতে তার অসুবিধা কোথায়! বাংলাদেশ নিয়ে তার কৌতুহলও প্রবল। বাংলাদেশের কতজন কবি বন্ধুর নাম ঠিকানা যে তার সংগ্রহে আছে তা বলা মুশকিল। তার মধ্যে বেশ কজনের সঙ্গে তো হোয়াটস্অ্যাপে নিয়মিত চ্যাটিংও হয়; তবু আজও তার সীমান্তের ওপারে যাওয়া হয়নি। প্রবল বিশ্বাস– এপারে আসা তাঁর হবেই, তিতাস অথবা পদ্মা নদীতীরে তিনি খালিপায়ে হেঁটে বেড়াবেন; এইরকম বিচিত্র সব ইচ্ছে থরে থরে সাজিয়ে রেখেছেন। কবে থেকে তার এই সব ইচ্ছেপূরণের অভিযাত্রা শুরু হবে কে জানে সেই কথা! ভাস্বতীদিদের পাড়ার ছেলে প্রণব, বয়সে তরুণ, কবিতা লেখে খেটেখুটে, তার মুখে ঢাকাইয়া ভাষা শুনে তিনি প্রতিবাদ করেন, 'যামু খামু তুই কোথায় পেয়েছিস প্রণব?'

চটপট জবাব দেয়, 'ওই দেশের সবাই তো বলে শুনি। ওই যে রগুড়ে কবি আসলাম সানীর কথা শুনেছ?'

'সানী ঢাকাইয়া কবি। তার কথা আলাদা। তাই বলে সারা দেশের সবাই তো আর ওই ভাষায় কথা বলে না।'

'ওরে বাবা! বাংলাদেশ নিয়ে এত কথা জানো তুমি?'

'কুষ্টিয়া-যশোরের ভাষা শুনেছিস কখনও?'

এতক্ষণে আমার বুকের মধ্যে অব্যাখ্যেয় এক অনুভূতির ঢেউ ওঠে। আমি শেকড়ছোঁয়া টান অনুভব করি। আমাদের ওই তল্লাটের আর কোনও কবি সাহিত্যিক বর্তমান এ-দলে নেই। আমিই একা দলছুট মানুষ, মেহেরপুর থেকে দর্শনা হয়ে বর্ডার টপকে চলে আসি, আবার শেয়ালদা থেকে গেদে লোকাল ধরে ফিরে যাই একা একা। গত দু'বছরে ভাস্বতীদির সঙ্গে অনেক কথা হয়েছে, এমন কি তাঁর সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ *মেঘ বলেছে যাব যাব*'র একটি কপিতে নাম লিখে আমাকে উপহার দিয়েছেন, কিন্তু কখনও জানতে চাননি– বাংলাদেশের কোন জেলা থেকে আমি এসেছি, কোথায় আমার বাড়িঘর, অন্যদের চেয়ে আমার মুখের ভাষা একটু অন্যরকম কেন, কিছুই তিনি শুধাননি।

বাংলাদেশের মানুষ পেলেই তার সঙ্গে নানান কথায় সখ্য গড়ে তোলেন, সবাই সেটা জানে, কলকাতার অনেকে তা নিয়ে অভব্য তামাশাও করে, তিনি গায়ে মাখেন না। বরং প্রণবকে তিনি গায়ে পড়ে বাংলাদেশের ভাষা-বৈচিত্র্যের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সৌন্দর্য এবং মাধুর্য বিষয়ক ছবক দেন। বেশ পেছনের সিট থেকে কে একজন কুটুশ করে বেসুরো গলায় বলে ওঠে, 'চালাইয়া যান দিদি। চাটগাঁইয়া কিংবা সিলেটী ভাষা হুনছেননি?'

ভাস্বতী গোস্বামীর ধৈর্যের কাঁটা একচুলও নড়ে না। এমন কটাক্ষের সামনেও দিব্যি হাসিমুখে বলতে পারেন– 'আঞ্চলিকতার বৈচিত্র্য যতই থাক, ভাষা কিন্তু একটাই-বাংলা ভাষা। সত্যি ভাষা-আন্দোলন ওদেরই সাজে, আমাদের নয়।'

কবি ও কথাসাহিত্যিক নলিনী বেরা এতক্ষণ পর নড়েচড়ে বসেন। এ বছর তিনি কথাসাহিত্যে আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন, প্রগলভতা তাঁকে মানায় না। সেই তিনিও চলন্ত বাসের চলমান এই আলোচনায় ঢুকে পড়েন, 'এ নিয়ে একটি সেমিনার পেপার রেডি করে ফ্যালো তো ভাস্বতী, জীবনানন্দ সভাগৃহে হয়ে যাক সেমিনার।'

সুবোধ গাঙ্গুলি প্রস্তাব দেন, 'সামনের ফেব্রুয়ারিতেই হোক তাহলে!'

ভাস্বতী গোস্বামী উঠে দাঁড়িয়ে জোর দিয়ে জানান, 'আমি কিন্তু সিরিয়াসলি নিচ্ছি নলিনীদা। প্রবন্ধ আমি লিখব ঠিকই, আমার একটা দাবি মানতে হবে।'

'এর মধ্যে আবার দাবি কিসের?' সুবোধ গাঙ্গুলি প্রশ্ন করেন।

'বাংলাদেশ থেকে আনিসুজ্জামান স্যারকে চিফগেস্ট করে আনতে হবে।' ভাস্বতী ডানে-বামে তাকিয়ে সমর্থন খোঁজেন– 'কেমন হবে বলুন তো!'

সবার আগে প্রতিক্রিয়া জানায় প্রণব, 'আবারও সেই বাংলাদেশ! আচ্ছা বাংলাদেশের প্রতি তোমার এত পক্ষপাত কেন দিদি?'

'কথা হচ্ছে ভাষা-আন্দোলন নিয়ে, সবার আগে বাংলাদেশের নাম তো আসবেই। এখানে পক্ষপাতের কিছু নেই তো! গোটা পৃথিবীকে এরা জানিয়ে দিয়েছে-মাতৃভাষার অধিকার কাকে বলে। জন্মগত অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না, হ্যাঁ।'

নলিনী বেরা সহাস্যমুখে জানান, 'হবে। তোমার দিয়েই হবে। হাত লাগাও দেখি– প্রবন্ধটা নামিয়ে ফ্যালো তো!'

'কিন্তু আনিস স্যারের ব্যাপারটা!'

'জানো তো– ফেব্রুয়ারি এলে ওঁরা খুব ব্যস্ত থাকেন। কথা বলে দেখতে হবে– সময় দিতে পারবেন কি না।'

সুবোধ গাঙ্গুলি টিপ্পনি কাটেন, 'ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী পদ্মভূষণ দেবে, সেই তিনি আমাদের একটু সময় দেবেন না কেন!'

প্রণব আরেক কাঠি শুধরে দেয়, 'জন্মসূত্রে তিনি তো আসলে ভারতীয়ই। আমাদের ডাক ফেলবেন কী করে!'

'তুই কিন্তু সাবধান প্রণব!' ভাস্বতী সহসা ধমকে ওঠেন, 'তোর কথায় কেমন যেন এনআরসি-বিরোধী গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।'

'অ, থাকো তো দিল্লিতে, মাথার মধ্যে কিলবিল করছে এনআরসি-র পোকা!'

'দিল্লিতে থাকার খোঁটা দিস্‌নে তো ভাই। দেশের রাজধানী দিল্লি। তুইও থাকতে পারিস সেখানে! একটানা দিল্লিতে বাস করলে তবে টের পাবি– বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের প্রকৃত রহস্যটা কী!'

বলা নেই কওয়া নেই আমার পাশের সিট থেকে বাংলাদেশের তরুণ কবি ইমরান হাবিব উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে ওঠে, 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়/ওরা কথায় কথায় শিকল পরায় আমার হাতে পায়।'

সহসা বাসের ভেতরের পরিবেশটাই পাল্টে যায়। সামনে-পেছনে, ডানে-বাসে সব আড্ডা থেমে যায়। ইমরানের কবিতা কেউ মনোযোগ দিয়ে শুনুক আর না-ই শুনুক, এই এক গানে সবাইকে বুকের মধ্যে টেনে নেয়। কিন্তু খেয়ালী কবি ইমরান হাবিব কী ভেবে যেন দুম করে ব্রেক কষে, মুখের দুলাইন গেয়েই গান থামিয়ে দেয়। শ্রোতা-সাধারণ তা মানবে না, জোর দাবি জানায় গানের জন্য। ইমরান নয়, ওই গানেরই বাকি অংশ শুরু করেন সন্তোষ ঢালী। পেশায় অধ্যাপক, স্বভাবে বাউণ্ডুলে বাউল, হলদিয়ার মঞ্চেও লোকগীতি শুনিয়ে দর্শক মাতিয়েছিলেন, সেই সন্তোষদা দুই সারি যাত্রীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে ডান হাত তুলে গেয়ে ওঠেন– 'কইতো যাহা আমার দাদায়, কইছে তাহা আমার বাবায় এখন কও দেখি ভাই মোর মুখে কি অন্য ভাষা শোভা পায়?' কে বলবে ক্লাসঘরের গুরুগম্ভীর অধ্যাপক গোঁফদাড়ি আচ্ছাদিত এই মানুষটি! 'বাংলাদেশের বয়াতিরা নাইচা নাইচা কেমন গায়', তা সবার চোখের সামনে দৃশ্যমান করে তুলতে নিজেই কোমার দুলিয়ে নাচতে থাকেন!

কবি নলিনী বেরা আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠে বলেন, 'কেমন দৃঢ় প্রত্যয় দেখেছ– এই জানের বদল রাখুম্‌রে ভাই বাপদাদার জবানের মান!'

গান থামিয়ে অধ্যাপক সন্তোষ ঢালী জোর দিয়ে বলেন, 'বাপদাদার জবানের মান আমরা রেখেছি। আর সেই পথ ধরেই স্বাধীনতা পেয়েছি। এই জন্যে আমাদের একুশের সাহিত্য আছে, মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্য আছে; বাঙালি হয়েও এমন কিন্তু আপনাদের নেই দাদা।'

ভাস্বতী গোস্বামী বিতর্ক এড়াতে এগিয়ে আসেন, 'বাংলাদেশের সাহিত্য এসব ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে। আঞ্চলিক ভাষার সফল প্রয়োগ তাদের সাহিত্যে নতুন মাত্রা যোগ করেছে, সেটাও মানতে হবে।'

প্রণব আবার টিপ্পনি কাটে, 'বাংলাদেশ স্টাডিজ নিয়ে তুমি পিএইচডি করছ না কেন দিদি?'

'করব করব, বুড়ো বয়সে একটা কিছু করে ফেলব দেখিস।' ভাস্বতী বলেন, 'তখন এই দিদির কাণ্ড দেখে চোখ উল্টে তাকিয়ে থাকবি, হ্যাঁ।'

'তাই নাকি! তাহলে দেরি করছ কেন?'

'মানুষ কেন ভিটেমাটি ছেড়ে উদ্বাস্তু হয় উন্মুল হয়, তাই নিয়ে ঘাটাঘাটি করছি, বুঝেছিস?'

'ওমা তোমরাও কি তবে ঘটি ছিলে দিদি? নাকি বাঙাল?'

ভাস্বতী গোস্বামীর মন খারাপ হয়ে যায়। মুখ কালো করে বসে থাকেন। এ সময় সুধীর মিত্র বলেন, 'এ্যাদ্দিন পর ঘটি-ফটি শুনলে কান জ্বালা করে ভাই। ও সব প্রসঙ্গ থাক। আমার তো চৌদ্দপুরুষের কেউ নেই বাংলাদেশে। তবু বাঙালির দেশ বাংলাদেশ শুনলেই বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে।'

বামপাশ থেকে এক ভদ্রলোক মজা করেন বেশ, 'এ আপনার বুকের ব্যামো দাদা। সময় খারাপ। চিকিৎসা করান।'

এতক্ষণ পর নিজের সিট থেকে উঠে এসে প্রণব পাল দাঁড়ায় ভাস্বতী গোস্বামীর সামনে। হাতজোড় করে অনুনয় করে, 'দুঃখিত দিদি। তুমি কি আমার উপরে রাগ করলে?'

'নাহ।' ছোট্ট একটুখানি উত্তর দিয়ে চুপ করে থাকেন ভাস্বতী।

প্রণব জানায়, 'তুমি কাজ শুরু কর দিদি, আমি তোমার সঙ্গে আছি।'

চোখ তুলে তাকান ভাস্বতী। আস্তে করে বলেন, 'অনেকদিন থেকে আমি একটা গ্রাম খুঁজি মনে মনে।'

'বাংলাদেশের গ্রাম? কী নাম বলো তো! আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন আছে ফরিদপুরে। তারা নিশ্চয় চিনতে পারবে।'

ভাস্বতী গোস্বামীর চোখের তারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তিনি ঘোষণা

করেন, 'গ্রামের নাম কার্পাসডাঙ্গা। কিন্তু সে তো ফরিদপুরের ওদিকে নয়।'

বিকট শব্দে ভেঁপু বাজাতে বাজাতে আমাদের বাস এসে থামে রাস্তার ধারে এক সস্তা রেস্টুরেন্টের সামনে। পনের মিনিটের চা-বিরতি। অগ্রবর্তী বাসটিও সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দুই বাসের যাত্রীরা আড়মোড়া ভেঙে নেমে আসে বাস থেকে। মাত্র ঘণ্টা দেড়েকের অদর্শনেই অস্থির সবাই। কবি শ্যামলকান্তি দাশ সবার খোঁজখবর নেন। শুক্লা বউদিও আছেন তাঁর পাশে। উত্তম-সুচিত্রার জুটিকেও হার মানায়। বাঁধন কখনও আল্‌গা হয় না।

রফিকুল হক দাদুভাই। পঁচাশিতে পা দেওয়া যুবক। প্রাণের পেয়ালা তার সর্বদা উপ্‌চে পড়ে আনন্দে। দেখে মনে হয়– দুঃখ কাকে বলে তিনি তা মোটেই জানেন না। চা-বিরতির পর সেই দাদুভাই লাফিয়ে আমাদের বাসে উঠে ঘোষণা দেন– বাকি পথ তিনি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। এ-ঘোষণায় সবাই খুশি। এখন তাহলে ছড়ার ছররা চলবে। বাব্বা! বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি। ছড়ার পর ছড়া, ছড়ার ঘোড়া চলে টগ্‌বগিয়ে। কিন্তু প্রণব এবার বাধ সাধে সেই ছড়াপ্রবাহে, হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে বলে, 'দাদুভাই, আপনি তো বাংলাদেশের প্রবীণ বটবৃক্ষ, সাংবাদিকতারও দিকপাল, আপনি কি বলতে পারেন– কার্পাসডাঙ্গা গ্রামটা কোথায়?'

'কী নাম?' দাদুভাই চোখ গোল করে তাকান।

'প্রণবকুমার পাল।'

'ভারি তো জঞ্জাল, গ্রামের নামটি কী বললে?'

'কার্পাসডাঙ্গা।'

আমার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করে। ভাস্বতীদি চোখমুখ লাল করে প্রণবের দিকে তাকায়, বলেই ফ্যালে– 'কে বলেছে তোকে এই প্রশ্ন করতে?'

কার্পাসডাঙ্গা নামের গ্রামটিকে খুঁজবার প্রেক্ষাপট শুনেই দাদুভাই ওই নাম দিয়ে একটি ছড়া বলে যান গড়গড় করে। তারপর দাবি করেন, বাংলাদেশের যে-কোনও গ্রামেরই নাম হতে পারে কার্পাসডাঙ্গা। কার্পাস ফোটে না কোন গ্রামে? যে-কোনও একটি গ্রামকে ধরে নিয়ে গবেষণা শুরুর পরামর্শ দেন ভাস্বতী গোস্বামীকে।

'যে-কোনও গ্রাম!' ভাস্বতী গোস্বামী খুঁতখুঁত করে, 'পিসিমার মুখে শুনেছি সে-গ্রামে নীলচাষ হত, কবে নাকি নীলবিদ্রোহ হয়েছিল!'

আমি চিৎকার করে বলতে চাই সেই কার্পাসডাঙ্গা আমি চিনি, সেখানে আমার বন্ধুর বাড়ি; বলতে চাই, কিন্তু কণ্ঠস্বর স্ফুট হয় না। আমার আগেই সারামুখে কার্পাসফাটা হাসি ছড়িয়ে দাদুভাই বলেন, 'তাহলে তো হয়েই গেল। দীনবন্ধু মিত্রের পোস্টমাস্টারি এলাকাটা খুঁজে দ্যাখো গে ঠিক পেয়ে যাবে!'

নিজের উপরে ভয়ানক রাগ হয় আমার। ভাস্বতীদি আরও আগে আমাকে কেন যে শুধাননি! হয়তো আমার উপরে আস্থা পাননি। তাঁর এত আবেগের কার্পাসডাঙ্গার খবর আছে আমার কাছে, অথচ আমাদের ছাড়া বাংলাদেশের আরও অনেক কবির কাছেই জানতে চেয়েছেন। কী ভেবে দাদুভাই আবার ছড়া প্রসঙ্গে আসেন। 'দু'লাইনের একটি ছড়া কোনও, নীলচাষের ছড়া।'

আমরা সবাই কান খাড়া করি।

কবি বলেন, 'জমির শত্রু নীল, আর চাষীর শত্রু হিল।' আমাদের চম্‌কে দিয়ে প্রশ্ন করেন, 'কে এই হিল? কারও জানা আছে জেম্‌স হিলের নাম?'

আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করি। এরই মধ্যে ভাস্বতীদি দুম করে বলেন, 'এ ছড়া আমি পিসিমার মুখে শুনেছি অনেক আগে।'

'পিসিমা! বাড়ি কোথায় পিসিমার?'

'পিসিমার মুখেই তো কার্পাসডাঙ্গার গল্প শুনেছি। ভৈরব নদের দু'পারে নীল চাষ, চাষীদের উপরে নির্যাতন, তারপর একটি নীলকুঠিতে অগ্নিসংযোগ...'

দাদুভাই একেবারে নিশ্চিত কণ্ঠে জানান, 'অত্যাচারী জেম্‌স হিল তাহলে ওই তল্লাটেই নীলকর সাহেব ছিল।'

এতক্ষণে আমি দাঁড়িয়ে ঘোষণা করি, 'ওই তল্লাট মানে বেশি দূর নয় দাদুভাই।' শিয়ালদা থেকে গেদে লোকাল ধরে দর্শনা, তার ওপারেই কার্পাসডাঙ্গা। আমি ওই তল্লাটেরই মানুষ। আরও অনেক নীলের ছড়া প্রচলিত আছে আমাদের এলাকায় লোকজনের মুখে মুখে।'

ছড়ার মানুষ রফিকুল হক দাদুভাই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেন, 'ছড়ার কেমন শক্তি দেখেছ– ইতিহাসকেও বুকের মধ্যে ধরে রাখে।'

দাদুভাই ছড়া নিয়ে আরও অনেক কথা বলতে থাকেন। কিন্তু ভাস্বতী গোস্বামীর মনোযোগ তখন আমার দিকে। ড্যাবডেবে চোখে আমাকে নতুন করে দেখেন। এক সময় আমারই অস্বস্তি হয়, চোখ সরিয়ে নিয়ে সামনে তাকাই। কিন্তু ভাস্বতীদি ভূতগ্রস্থ মানুষের মত আমার দিকে হাত বাড়িয়ে প্রস্তাব দেন, 'তোমাকে একবার ছুঁয়ে দেখব ভাই!'

আমি ভেতরে বাইরে কেঁপে উঠি। অনুচ্চস্বরে জানাই, 'কিন্তু আমার বাড়ি তো কার্পাসডাঙ্গা নয়, আরও খানিকটা দূরে।'

'আহা, তুমি তো চেনো ঠিকই সেই সোনার কার্পাসডাঙ্গা।'

আমাকে কবুল করতেই হয়, সেই গ্রাম আমি যথেষ্ট ভাল চিনি, আমি কার্পাসডাঙ্গা স্কুলেরই ছাত্র ছিলাম। সেই গ্রামে এখনও অনেক বন্ধু আছে। রাস্তাঘাট সব আমার চেনা।

ভাস্বতীদির চোখেমুখে অপার বিস্ময়। চলন্ত বাসের মধ্যে তিনি যে দৃশ্যের অবতারণা করেন, তা অনেকের চোখে পড়ার মত। নিজের সিট ছেড়ে এসে সত্যিই আমার দু'হাত জাপ্‌টে ধরেন, আমার সিটের সহযাত্রী শুকুর খানকে তুলে দিয়ে পাশাপাশি বসে পড়েন। এইবার তার বেশ স্বস্তি হয়। আমার ডান হাতের আঙুল ধরে টান দিয়ে বলেন, 'তুমি যে আমার ভাই, সেটা মানছ তো!'

'কার্পাসডাঙ্গায় কি আপনার পূর্বপুরুষের বাস ছিল?' আমি জানতে চাই।

'চোদ্দপুরুষের বাস ছিল তাই শুনেছি। আমার জন্ম এপারেই। কিন্তু আমাকে তুমি আপনি আপনি করছ কেন? দিদিকে কেউ আপনি বলে?'

আমি আর কী বলব! আমাদের বৃত্ত ঘিরে আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে সাতচল্লিশের দেশ ভাগ, র‍্যাডক্লিপের নিষ্ঠুর ছুরি এবং বিরামহীন রক্তক্ষরণ। সবশেষে কাঁটাতারের বেড়া কীভাবে একই বাড়ির উঠোন কিংবা হেঁসেল দ্বিখণ্ডিত করেছে সেই সব দৃষ্টান্তও তুলে আনেন কেউ কেউ, হৃৎপিণ্ডের ঘাই আমি টের পাই, কিন্তু মুখের মানচিত্রে সে বেদনার ছাপ পড়তে দিই না। আমি বরং ভাস্বতীদিকে বুঝতে চেষ্টা করি।

বাইরে আলো ঝলমলে রোদ। বাসের জানালা খুলে দিতেই হাওয়া এসে ঢুকে পড়ে হুড়মুড়িয়ে। কবি ভাস্বতী গোস্বামীরও তখন বুকের কপাট হাট করে খোলা। কথার পিঠে কথা এসে ধাক্কা মারে। ভাস্বতীর পিতৃ এবং মাতৃকূলে একমাত্র পিসিমা ছাড়া আজ আর কেউ

বেঁচে নেই। মাকে হারিয়েছে তার জন্মমুহূর্তে। বালবিধবা পিসি মাতৃহারা ভ্রাতুষ্পুত্রীকে মানুষ করার সব দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেও ভাইটিকে আর সংসারী করতে পারেননি। একমাত্র সেই ভাইটি বছর তিনেক আগে আকস্মিকভাবে মারা যাবার পর থেকে তার দিবারাত্রির গাওনা হয়েছে– সে বাপের ভিটেয় চলে যাবে। এতদিন পর কে আছে সেখানে, সেই কার্পাসডাঙ্গায়? কার কাছে যাবে, কে দেখবে তাকে এই বার্ধক্যে? না, কোনও যুক্তি মানবে না, কারও কথা শুনবে না। জন্মভিটেই গিয়ে সে চোখ বুজতে চায়, এই তার অন্তিম বাসনা।

কোথায় কার্পাসডাঙ্গা, কেমন তার আকাশ-বাতাস মানুষজন, কিছুই জানা নেই ভাস্বতীর। আশৈশব শুধু গল্প শুনেছে পিসিমার মুখে। আমাকে দেখার পর সেই গল্পের সঙ্গে সবকিছু মিলিয়ে নেবার সাধ জাগে তার। কত প্রশ্ন, কত কৌতূহল, কোনওটি বাক্যে স্ফুরিত হয়, কোনওটি চোখমুখে উদ্ভাসিত হয়– মল্লিকবাড়ির শানবাঁধানো পুকুরঘাট আছে? এখনও সেখানে লালপদ্ম নীলপদ্ম ফোটে? বাড়ির দক্ষিণে জোড়া তালগাছ আছে? তার পাশে নাটমন্দির? এসব প্রশ্নের কী উত্তর দেব আমি? সত্যের ভার কতটা সইতে পারবেন এই ভদ্রমহিলা কিংবা তার পিসিমা, সে আমি নির্ণয় করতে পারি না।

ভাস্বতীদি আমার বাম হাত ছুঁয়ে প্রশ্ন করে, 'আমাকে একদিন গগনচিল চিনিয়ে দেবে ভাই?' উত্তর দিতে আমার বিলম্ব হলেও তার সহ্য হয় না। তিনি আছেন কথার ঘোরে– 'পিসিমা বলে কার্পাসডাঙ্গার আকাশে গগনচিলের উড়াউড়ি দেখা যায়, লক্ষ্মীপেঁচার ডাক শোনা যায়, সন্ধ্যেবেলা 'তুইথুলি' পক্ষী এসে ভয় দেখায়। আমাকে একদিন দ্যাখাবে এ সব?'

ঘাড়-মাথা দুলিয়ে আমি কোনও রকমে উত্তর দিই। এরইমধ্যে রবীন্দ্রসদনে এসে যে-যার মত ছড়িয়ে পড়ি। আমি শেয়ালদা এসে গেদে লোকাল ধরে সীমান্তে পৌঁছাই বিকেল নাগাদ। চেকপোস্টের নিয়মের গণ্ডি পেরিয়ে বাংলাদেশের মাটিতে যখন পা রাখি, তখন সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। কে যেন আমার ভেতর থেকে গেয়ে ওঠে– 'যদিও সন্ধ্যা নামিছে মন্দ মন্থরে...।' আমি ভয়ে ভারতীয় সীমান্তের দিকে আর তাকাতে পারি না। মনে হয় ওইখানে ওই পিলারের আড়ালে পিসিমা দাঁড়িয়ে বালিকা ভাস্বতীকে আঙুল তুলে দ্যাখাচ্ছে এপারের আকাশের গায়ে গগনচিলের ডানা ঝাপটানি। দু'জনেই ধ্যানমগ্ন ওই লক্ষ্যে। কী কাজ তাদের ধ্যান ভাঙিয়ে।

রফিকুর রশীদ শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

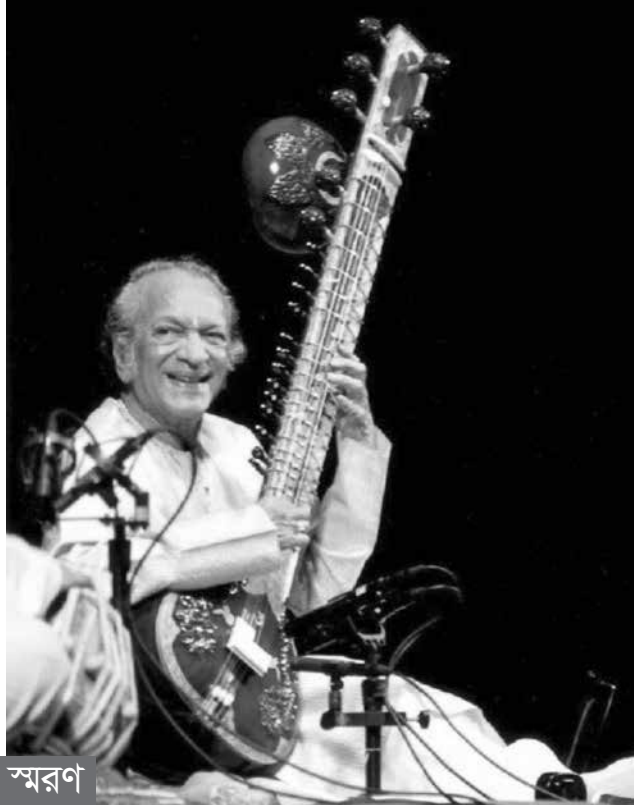

স্মরণ

রবিশঙ্কর

সেতারের অলৌকিক ঝঙ্কার

ড. মাহফুজ পারভেজ

তার নাম আর সেতারের তারগুলো একাকার মিশে আছে অলৌকিক সুর-ঝঙ্কারে। কিংবদন্তিতুল্য সেতার বাদনে বিশ্বে আর কেউ তার সমতুল্য কখন হবে, কে জানে! দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশের সুরের আকাশ থেকে বিশ্বের দিগন্তে উজ্জ্বল হয়ে আছেন তিনি, রবিশঙ্কর, যার আদি শেকড় মিশে আছে বাংলাদেশের নড়াইল জেলার কালিয়ার সুমৃত্তিকায়।

১৯২০ সালে ভারতের বেনারসে জন্ম নিয়ে ২০১২ সালের ১১ ডিসেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় মারা যান এই বাঙালি সংগীতজ্ঞ। মৃত্যুর আগে গিনেস রেকর্ড বুকে সুদীর্ঘকাল বাদনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে রেখে যান।

১৯৩৮ সালে, আঠারো বছর বয়সে রবিশঙ্কর তার বড় ভাই উদয়শঙ্করের নাচের দল ছেড়ে মাইহারে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের অমর শিল্পী আচার্য আলাউদ্দীন খান সাহেবের কাছে সেতারের দীক্ষা নিতে শুরু করেন। দীক্ষা গ্রহণকালে আচার্যের পুত্র সরোদ শিল্পী ওস্তাদ আলি আকবর খানের সংস্পর্শে আসেন। তারা পরবর্তীতে বিভিন্ন স্থানে সেতার-সরোদের যুগলবন্দী বাজিয়েছেন। গুরুগৃহে রবিশঙ্কর দীর্ঘ সাত বছর সেতারে শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষা গ্রহণ করেন। এই শিক্ষাকাল পরিব্যাপ্ত ছিল ১৯৩৮ হতে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত।

১৯৩৯ সালে মাত্র উনিশ বছর বয়সে ভারতের আহমেদাবাদ শহরে রবিশঙ্কর সর্বপ্রথম সাধারণের জন্য

উন্মুক্ত একক সেতার পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করেন। তারপর ক্রমশ নিজেকে তুলে ধরেছেন একজন সংগীতজ্ঞ, সংগীত স্রষ্টা, পারফর্মার এবং ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের মেধাবী দূত হিসেবে।

১৯৪৫ সালের মধ্যে রবিশঙ্কর সেতার বাদক হিসেবে ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী শাস্ত্রীয় সংগীতকারের স্বীকৃতি পেয়ে যান। এ সময়ে রবিশঙ্কর সাঙ্গীতিক সৃজনশীলতার অন্যান্য শাখায় পদচারণা শুরু করে সুর সৃষ্টি, ব্যালের জন্য সংগীত রচনা এবং চলচ্চিত্রের সংগীত পরিচালনার কাজে ব্যাপ্ত থাকেন। সেই সময়ের বিখ্যাত *ধরত্রী কি লাল* এবং *নীচা নগর* চলচ্চিত্র দুটির সংগীত রচনা ও সুরারোপ করেন তিনি।

১৯৫০ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত রবিশঙ্কর অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সংগীত সৃষ্টিতে ব্যাপৃত ছিলেন। এ সময়ে তার উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি সত্যজিৎ রায়ের বিশ্বখ্যাত অপুত্রয়ী অর্থাৎ *পথের পাঁচালি* (১৯৫৫), *অপরাজিত* (১৯৫৭) এবং *অপুর সংসার* (১৯৫৯) চলচ্চিত্রের সংগীত পরিচালনা। পরবর্তীকালে *চাপাকোয়া* (১৯৬৬), *চার্লি* (১৯৬৮) ও *গান্ধী* (১৯৮২)-সহ আরও বহু চলচ্চিত্রের সংগীত পরিচালনা করেন তিনি।

বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই সংগীত পরিবেশন করেছেন রবিশঙ্কর। কনসার্টে সুরের ইন্দ্রজালে অবগাহন করিয়েছেন হাজার হাজার দর্শক-শ্রোতাদের। পাশ্চাত্যের জনপ্রিয় ও উচ্চনাদ সমৃদ্ধ সংগীতের আসরে প্রাচ্যের ধ্রুপদী সুরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি এক অদ্ভুত সুরের তন্ময়তায়।

রবিশঙ্কর সমকালীন বিশ্বের প্রায়-সকল শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট শিল্পীর সঙ্গে কাজ করেছেন। একত্রে বহু অনুষ্ঠান করেছেন তাদের নিয়ে। তার অমর কীর্তির মধ্যে রয়েছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংগীতের মিলন সাধন। বিশ্ব বিখ্যাত বেহালা বাদক ইয়াহুদি মেনুহিনের সঙ্গে সেতার ও বেহালার কম্পোজিশন তার স্মরণীয় অবদান, যাতে পূর্ব ও পশ্চিম জগতের সুর ও সংগীতধারা অবিরলভাবে সমান্তরালে বয়ে চলেছে।

রবিশঙ্করের সংগীত জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও ঐতিহাসিক কীর্তি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে প্রচার, জনমত গঠন ও মানবিক সহায়তা সংগ্রহের বিষয়টি। বিশ্ব বরেণ্য সংগীত শিল্পী জর্জ হ্যারিসনের উদ্যোগে নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে আয়োজিত কনসার্ট ফর বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে সেতার বাজিয়েছিলেন তিনি, যা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে অবিস্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

সংগীত জীবনে শিখরস্পর্শী সাফল্য অর্জন করলেও রবিশঙ্করের পারিবারিক জীবন ছিল মিলন ও বিচ্ছেদে ভরপুর। একুশ বছর বয়সে রবিশঙ্কর তার গুরু, যাকে তিনি বাবা বলে ডাকতেন, সেই আচার্য আলাউদ্দীন খানের মেয়ে অন্নপূর্ণা দেবীকে বিয়ে করেন। এই দাম্পত্য জীবনে তাদের শুভেন্দ্রশঙ্কর নামে একটি পুত্র সন্তান জন্মায়। যদিও এই বিয়ে বিচ্ছেদে শেষ হয়।

পরে মার্কিন কনসার্ট উদ্যোক্তা সু জোন্স-এর সঙ্গে স্বল্প সময়ের জন্য সম্পৃক্ত হন তিনি। নোরা জোন্স নামে তাদের একজন কন্যা সন্তান জন্ম নেয়, যে কন্যা জ্যাজ, পপ, আধ্যাত্মিক সংগীত, লোকগানের বিশিষ্ট শিল্পী ও সুরকার রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

অবশেষে রবিশঙ্কর তার গুণগ্রাহী ও অনুরক্তা সুকন্যা খৈতানকে বিয়ে করেন। এই বিয়েতে তার আরেক কন্যা অনুশকা শঙ্করের জন্ম হয়। পিতার সংস্পর্শে ও শিক্ষায় তিনি সেতার বাজিয়ে হিসেবে সুনাম অর্জন করেছেন।

তার আত্মজীবনী *মাই মিউজিক মাই লাইফ*-এর পাতায় পাতায় যে বহতা জীবন ও সংগীতচর্চার যুগল স্মৃতি মূর্ত হয়ে রয়েছে।

ড. মাহফুজ পারভেজ শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক

ঐতিহ্য

শ্রীশ্রীকান্তজীউ মন্দির
স্থাপত্যশিল্পের অমর কীর্তি

চিত্ত ঘোষ

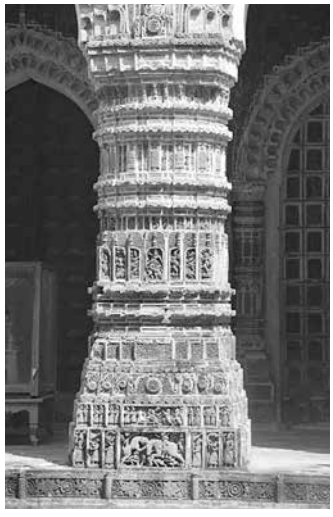

বৈচিত্র্যময় ও দৃষ্টিনন্দন কান্তজিউ মন্দির দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে আগত পর্যটকদের ভীড়ে মুখরিত এখন কান্তনগর মন্দির অঙ্গন। দেশ-বিদেশ থেকে প্রতিদিন বিপুলসংখ্যক পুণ্যার্থী-পর্যটক আসছেন ঐতিহাসিক শ্রীশ্রীকান্তজীউ মন্দির দেখতে। প্রাচীন স্থাপত্যের অনন্য এ নিদর্শন দেখে পর্যটকদের চোখে-মুখে তৃপ্তির ছাপ পরিলক্ষিত হয়। মন্দির অবকাঠামোর যে সংস্কার হয়েছে তাতে স্থাপনাকে করেছে আরও দৃষ্টিনন্দন, বৈচিত্রময় ও দর্শনীয়। রাতের আঁধার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে আলোকরশ্মি যেন মন্দিরে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। প্রাচীন আমলে নির্মিত ঐতিহাসিক মন্দিরটি তখন পুণ্যার্থী-পর্যটকদের কাছে হয়ে ওঠে এক বিস্ময়কর স্থাপত্য। দিনাজপুর জেলা সদর থেকে ২০ কিলোমিটার উত্তরে কাহারোল উপজেলা সদর থেকে ৭ কিমি দক্ষিণ-পূর্বে সুন্দরপুর ইউনিয়নে দিনাজপুর-তেঁতুলিয়া মহাসড়কের পশ্চিমে ঢেপা নদীর তীরে কান্তনগর এলাকায় অবস্থিত প্রাচীন টেরাকোটার অনন্য নিদর্শন কান্তজীউ মন্দির আমাদের ঐতিহ্যের অংশ।

প্রায় ১ মিটার (৩ ফুট) উঁচু এবং প্রায় ১৮ মিটার (৬০ ফুট) বাহু বিশিষ্ট প্রস্তর নির্মিত একটি বর্গাকার বেদীর উপর এই মন্দির নির্মিত। পাথরের ভিত্তিবেদীর উপর মন্দিরটি ইটের তৈরি। বর্গাকারে নির্মিত মন্দিরের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য প্রায় ১৬ মিটার (৫২ ফুট)। মন্দিরের চারিদিকে রয়েছে বারান্দা। প্রত্যেক বারান্দার সামনে রয়েছে ২টি করে স্তম্ভ। স্তম্ভগুলো বিরাট আকারের এবং ইটের তৈরি। স্তম্ভ ও পাশের দেওয়ালের সাহায্যে প্রত্যেক দিকে ৩টি করে বিরাট খোলা দরজা রয়েছে। বারান্দার পরেই রয়েছে মন্দিরের কামরাগুলো। একটি প্রধান কামরার চারিদিকে রয়েছে বেশ কয়েকটি ছোট কামরা। ৩-তলা বিশিষ্ট এই মন্দিরের নয়টি চূড়া বা রত্ন ছিল। এজন্য এটিকে নবরত্ন মন্দিরও বলা হয়ে থাকে। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ভূমিকম্পে মন্দিরের চূড়াগুলো ভেঙে যায়। মন্দিরের উচ্চতা ৭০ ফুট।

মন্দিরের উত্তর দিকের ভিত্তিবেদীর শিলালিপি থেকে জানা যায়, দিনাজপুরের মহারাজা প্রাণনাথ রায় (মৃত্যু ১৭২২ খ্রি.) শেষ জীবনে মন্দিরের নির্মাণ কাজ শুরু করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর আদেশ অনুসারে দত্তকপুত্র রাজা রামনাথ রায় ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরের নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ করেন। ইটের তৈরি এই মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির এসব ফলকচিত্রে উদ্ভিদ, প্রাণিকুল, জ্যামিতিক নকশা, রামায়ণ ও মহাভারতের পৌরাণিক দৃশ্যাবলী এবং তদানীন্তন সামাজিক ও অবসর বিনোদনের চমৎকার দৃশ্য খচিত রয়েছে। সে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন কাহিনি এবং মুঘল আমলের সম্রাটদের এবং সে-সময়ের কিছু চালচিত্র মন্দিরের নীচের সারিতে সংযোজিত রয়েছে। কান্তজীউ মন্দিরের মত পোড়ামাটির টেরাকোটার চিত্রফলকের এমন সুন্দর ও কারুকার্যময় কাজ বাংলার আর কোনও মন্দিরে দেখা যায় না। গোটা উপমহাদেশে কান্তজীউ মন্দির এক বিস্ময়কর স্থাপত্যশিল্প। ঐতিহাসিক বুকানন হ্যামিলটনের মতে, এটি বাংলাদেশের সুন্দরতম মন্দির।

নির্মাণকালে মন্দিরটি চারদিকে নদীবেষ্টিত ছিল। জায়গাটির নির্জনতা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ মুগ্ধ মানুষকে আরণ্যক যুগের স্নিগ্ধ তপোবনের স্মৃতিচিহ্নের কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্ত আজ সেই নিবিড় নির্জন ও তপোবনের পরিবেশ আর নেই। আছে দেশ-বিদেশে থেকে আগত অগণিত পর্যটক ভক্ত নর-নারীর অবিশ্রাম কলকাকলি। নির্জন পল্লীর নিস্তব্ধতার বদলে এখন সজীব মুখরতা। ১৯৬০ সালে সরকার কান্তনগর মন্দিরকে সংরক্ষিত প্রাচীন কীর্তি হিসেবে ঘোষণা করেন।

শ্রীশ্রীকান্তজীউ বা শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ ৯ মাস এই মন্দিরে অবস্থান করে এবং ৩ মাস দিনাজপুর শহরের রাজপরিবারের পারিবারিক মন্দিরে অবস্থান করেন। শারদীয় দুর্গোৎসব, লক্ষ্মীপূজা, শ্যামাপূজা, শ্রীশ্রী গোষ্ঠ উৎসব, অন্নকুটসহ নানা পার্বণ শেষে রাস পূর্ণিমার দু'দিন আগে পালকিতে চড়ে ভক্ত পরিবেষ্টিত শ্রীশ্রীকান্তজীউ ২০ কিলোমিটার হাঁটাপথে শহরের রাজবাড়ি মন্দির থেকে কান্তনগর মন্দিরে এসে পৌঁছন। এখানেই পূর্ণিমার রাতে রাসউৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রাসউৎসবকে কেন্দ্র করে বসে মাসব্যাপী মেলা। দেশ-বিদেশের পুণ্যার্থী-পর্যটকেরা আসেন এই মেলা এবং মন্দির দেখতে।

দীর্ঘদিন যাবৎ মন্দিরটির সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্থানীয় সংসদ সদস্য মনোরঞ্জন শীল গোপালের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে তৎকালীন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এমপির তদারকিতে ২০১৪ সালে মন্দিরটি সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রকল্প অনুযায়ী মন্দিরের বাইরের চত্বরে মিউজিয়াম, বিশ্রামাগার, শপিং সেন্টার, সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। মন্দির সংরক্ষণ ও রাতের অন্ধকারে মন্দির দর্শনের জন্য বিশেষ ধরনের আলোর ব্যবস্থা করা হয়। দিনাজপুর জেলা শহর থেকে যোগাযোগের সুবিধার্থে ১২ মাইল নামক স্থানে ঢেপা নদীর ওপর নির্মিত হয়েছে বিশাল সেতু।

মন্দির তৈরির চমকপ্রদ কাহিনি

বংশপরম্পরায় প্রবীণদের আলোচনা থেকে জানা যায়, রাজা প্রাণনাথের রাজত্বকালে কোনও একসময় একটানা অনাবৃষ্টির কারণে কয়েকবছর জমিতে ফসল আবাদ করা যায়নি। রাজ্যে দেখা দেয় চরম খাদ্যাভাব। প্রাণনাথ প্রজাদের কল্যাণের কথা ভেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। পরিস্থিতি উত্তরণে তিনি মন্ত্রীসহ উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারীদের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা করে প্রজাদের দুর্দশালাঘবের উপায় খুঁজতে থাকেন। পরিশেষে সিদ্ধান্ত হয়, জলের অভাব মেটাতে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বড় আকারের ৫টি দীঘি (পুকুর) খনন এবং খননকাজে অংশগ্রহণকারী দরিদ্র প্রজাদের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হবে। রাজকোষ থেকে সমুদয় ব্যয় নির্বাহ হবে এবং পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত প্রজাদের কাছ থেকে সব ধরনের খাজনা আদায় বন্ধ থাকবে। এভাবে প্রায় ৭ বছর কেটে যায়। এর ফলে একদিকে রাজকোষ শূন্যের কোঠায় নেমে আসে অন্যদিকে মুঘল সম্রাটের কাছে রাজ্যের দেয় কর বকেয়া হতে থাকে। দিল্লি থেকে কর পরিশোধের ঘন ঘন তাগিদ আসতে থাকে। রাজা প্রাণনাথ যারপরনাই চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েন। এ সুযোগে ষড়যন্ত্রকারীরা প্রাণনাথে বিরুদ্ধে তৎপর হয়ে ওঠেন। এ ষড়যন্ত্রে নেতৃত্ব দেন সে-সময়ের ঘোড়াঘাটের ভারপ্রাপ্ত ফৌজদার রাঘবেন্দ্র রায় নামে এক উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচারী সামন্ত। রাঘবেন্দ্র ছিলেন রাজা

প্রাণনাথের চিরশত্রু ঘোড়াঘাটের জমিদার ভান্দসী রায়ের উত্তরসূরী। স্থানীয় কয়েকজন পরশ্রীকাতর জমিদারের সহযোগিতায় ষড়যন্ত্রী রাঘবেন্দ্র মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের দরবারে মিথ্যা অভিযোগ করেন যে, গুপ্ত ঘাতকের মাধ্যমে বড় দুই ভাইকে হত্যা করে প্রাণনাথ সিংহাসন দখল করেছেন। তাছাড়া তিনি দুঃশাসক, প্রজাশোষক, মুঘল শাসকের আনুগত্য অস্বীকারকারী রাষ্ট্রদ্রোহী।

এসব অভিযোগের প্রেক্ষিতে রাজা প্রাণনাথের প্রতি দিল্লি থেকে নোটিশ জারি করা হয়। নোটিশে বলা হয়, রাজা প্রাণনাথকে সশরীরে সম্রাটের দরবারে হাজির হয়ে অভিযোগসমূহের ব্যাখ্যা দিতে হবে। নোটিশ পেয়ে প্রাণনাথ সম্মান রক্ষার ভয়ে কাতর হয়ে পড়েন। পারিষদকে নির্দেশ দিলেন দিল্লিতে যাওয়ার জন্য দ্রুত প্রস্তুতিগ্রহণ করতে। রাতে নির্ঘুম অবস্থায় মানত করলেন, তিনি যদি সসম্মানে ও সমর্যাদায় দিল্লির দরবার থেকে ফিরতে পারেন তবে রাজ্যে ফিরে শ্রীকৃষ্ণের একটি দৃষ্টিনন্দন মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন।

এদিকে দিল্লি যাত্রার দিনক্ষণ ঠিক হলে প্রস্তুত করা হয় ঘোড়াশালার স্বাস্থ্যবান ঘোড়া ও হাতির এক বিরাট বহর। রাজা প্রাণনাথ সম্রাটকে খুশি করার জন্য নানা উপঢৌকন সঙ্গে নিলেন। উপঢৌকনের মধ্যে ছিল দিনাজপুরের সুগন্ধযুক্ত কাঠারীভোগ চাল ও চিড়া, মুগী আখের সুস্বাদু গুড়, রংপুরের তাঁতের কারুকার্যখচিত শতরঞ্জি, ঢাকার বিখ্যাত মসলিন, রাজশাহীর বিখ্যাত রেশমী গরদ এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত বিবিধ ভোগ্যপণ্য, সৌখিন শিল্পদ্রব্য আর হীরা-পান্না-মণিমুক্তা। এছাড়া সম্রাটকে বিশেষভাবে উপহার দেওয়ার জন্য সঙ্গে নেন পদ্মরাগ, মরকত, নীলকান্ত ও কর্কেতন এই চারজাতীয় মহামূল্য মণিখচিত অপরূপ কারুকার্যমণ্ডিত চারটি অঙ্গুরীয়।

মুঘলসম্রাট রাজা প্রাণনাথের প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে তাঁর নেওয়া পদক্ষেপের বর্ণনা শুনে খুবই খুশি হন। মুঘলসম্রাট রাজার প্রজ্ঞা, প্রশাসনিক দক্ষতা, বাঙালিসুলভ নম্র ব্যবহার, বেশভূষা, মুঘলপ্রীতি ও আনুগত্য দেখে এবং বিচিত্র উপঢৌকন পেয়ে মুগ্ধ হন। প্রাণনাথ উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সব অভিযোগ থেকে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করেন। দিল্লির সম্রাট প্রাণনাথকে 'মহারাজা' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। দিল্লির দরবার থেকে রাজা প্রাণনাথকে সম্মানসূচক পাগড়ি ও বহুমূল্য পুরস্কার প্রদান করা হয়।

মিথ্যে অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি ও দিল্লির সম্রাটের 'মহারাজা' উপাধি পেয়ে প্রাণনাথের প্রাণ ভরে যায়। তিনি সেখান থেকে বৃন্দাবনে তীর্থে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। প্রাণনাথ ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু ও শ্রীকৃষ্ণের উপাসক। বৃন্দাবনে শ্রীরুক্মিণীকান্তের মন্দিরের বিগ্রহ দেখে রাজা খুবই মুগ্ধ হন। রাতে শায়িত অবস্থায় মহারাজা দৈববাণী শুনলেন। দৈববাণী হল: খুব ভোরে যমুনাপুলিনে স্নান করে একডুবে তাঁর হাতে উঠে আসা বিগ্রহ নিয়ে নিজরাজ্যে প্রতিষ্ঠা করবেন। মহারাজ তাই করলেন। বিগ্রহ নিয়ে এসে শয়নকক্ষে রেখে মহারাজা মেঝেতে শয্যা নিলেন। পরের রাতে তাঁর ওপর আবারও দৈববাণী নেমে এল। তাঁকে নিজ রাজ্যে ফিরে যেতে হবে নদীপথে নৌকাবহর সাজিয়ে। তাঁর রাজ্যের সীমানায় যেখানে নৌকা আটকে যাবে সেখানেই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার আয়োজন করতে হবে। এসব দৈববাণী প্রাণনাথ কাউকে বলেননি।

কৃষ্ণবিগ্রহ নিয়ে রাজা আনন্দিত মনে নৌপথে নিজ রাজ্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। নৌকা নদী স্রোতে ভাসতে ভাসতে গঙ্গার পথ বেয়ে বাংলাদেশের সীমানায় এসে পদ্মার বুকে পড়ে। তারপর মহানন্দার পথ ধরে উত্তর দিকে এসে পুনর্ভবা নদীর স্রোতধারায় পড়ে। অবশেষে নৌবহর কত গ্রাম কত প্রান্তর অতিক্রম করে ঢেপা নদীর তীরে শ্যামগড়ে এসে আটকা পড়ে। তখন শেষরাত। ভোরের আভা তখনও আকাশে ফোটেনি, ঘন অন্ধকার। নৌবহরে থাকা সৈন্য-সামন্ত রাজকর্মচারীদের চেঁচামেচিতে বজরায় অবস্থিত মহারাজার ঘুম ভেঙে যায়। তিনি নায়েবকে ডেকে পাঠান। নায়েবের কাছ থেকে নৌকা আটকে যাওয়ার কথা শুনে, সেখানেই অপেক্ষা করতে বললেন দিনের আলো না ফোটা পর্যন্ত। ভোরের আলোয় রাজ্যের নকশা পর্যালোচনা করে মহারাজা প্রাণনাথকে জানানো হল স্থানটি তাঁরই রাজ্যের অংশ। একটি পলিবাহিত ব-দ্বীপ। সব শুনে প্রাণনাথ ঘোষণা দিলেন এখানেই মন্দির নির্মিত হবে এবং তাঁর নিয়ে আসা বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করা হবে। অতঃপর দু'টি মৌজার নামকরণ করা হল কান্তনগর ও শ্যামগড়।

মহারাজা প্রাণনাথ উল্লেখিত ব-দ্বীপেই মন্দিরের নির্মাণকাজ শুরু করলেন। তবে তিনি মাঝে মাঝে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ রাজবাড়িতে নিয়ে গিয়ে পূজাঅর্চনা করার কথা ভেবেছিলেন। তাই ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি উপলক্ষে আগের দিন নদীপথে নৌকাযোগে বাদ্য-বাজনা সহকারে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ দিনাজপুর রাজবাড়ি মন্দিরে নিয়ে যেতেন এবং কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথির আগের দিন শ্রীকৃষ্ণের (কান্ত) বিগ্রহ নিজ মন্দিরে ফিরে আনা হয়। সেই চিরাচরিত নিয়ম আজও চলছে।

মহারাজা প্রাণনাথ জীবদ্দশায় মন্দিরের কাজ শেষ করে যেতে পারেননি। তাঁর দত্তকপুত্র ও একমাত্র উত্তরাধিকারী রাজা রামনাথ ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরের নির্মাণকাজ সমাপ্ত করেন।

দিনাজপুর রাজবংশের সৃষ্টি

মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বের শেষ যুগে কাশীনাথ ঠাকুর নামে এক ব্রহ্মচারী কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি রেখে যান। কাশী ঠাকুরের প্রধান শিষ্য শ্রীমন্ত ঐ দেবোত্তর সম্পত্তির সেবাইত হন। শ্রীমন্তের

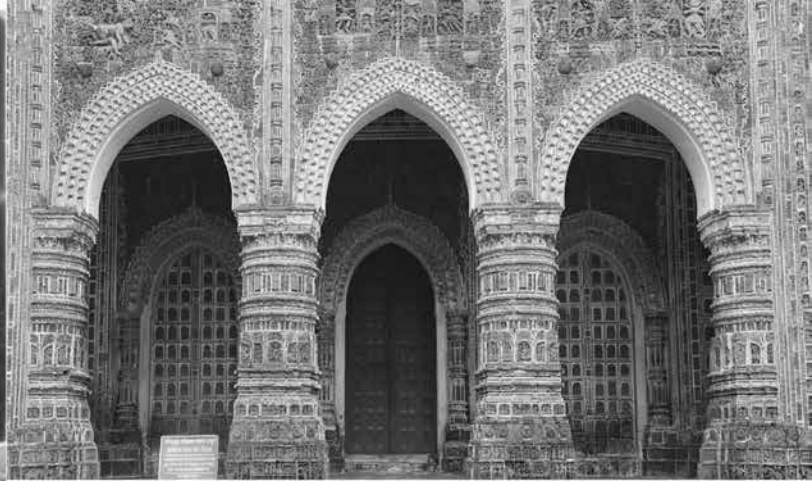

কোন পুত্র সন্তান ছিল না। শুধু লীলাবতী নামে এক কন্যা ছিল। লীলাবতীর সঙ্গে রংপুরের বর্দ্ধন কুঠিরের রাজপুত্র হরিরামের বিয়ে হয়। লীলাবতী ও হরিরামের একমাত্র পুত্র শুকদেব। ঐতিহাসিকদের মতে এই শুকদেব রায় থেকে দিনাজপুর রাজবংশের উদ্ভব।

রাজা শুকদেবের দুই স্ত্রীর মধ্যে প্রথমার গর্ভে জন্মেছিলেন রামদেব এবং জয়দেব এবং দ্বিতীয়ার গর্ভে জন্মেছিলেন প্রাণনাথ। রাজবংশের প্রচলিত নিয়মানুসারে পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র রামদেব সিংহাসনে বসেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হলে জয়দেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। দুঃখের বিষয়, কিছুদিনের মধ্যে জয়দেবও মারা যান। তাঁদের দুই ভাইয়ের রাজত্বকাল ছিল ১৬৭৭-১৬৮২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র পাঁচ বছরের।

বড় দুই ভাইয়ের মৃত্যুর পর ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রাণনাথ রায় সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং খুবই দক্ষতার সঙ্গে ৪০ বছর রাজ্য পরিচালনা করেন। তিনি শুধু দিনাজপুর রাজবংশের শ্রেষ্ঠ রাজাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন তৎকালীন বাংলার অন্যান্য রাজাদের মধ্যমণি। ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায় ১৯৫১ সাল পর্যন্ত মোট ১২জন রাজা-মহারাজা সুনামের সঙ্গে এ অঞ্চলে রাজত্ব পরিচালনা করেন। সর্বশেষ রাজা ছিলেন শ্রী জগদীশচন্দ্র রায়।

মন্দিরের নামকরণ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের মধ্যে শ্রীকান্ত (রুক্মিণীকান্ত) একটি। তাই মহারাজা প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণের 'কান্ত' নামানুসারে মন্দিরটির নাম রাখে 'কান্তজীউ মন্দির'। 'কান্ত' হচ্ছে কৃষ্ণের নাম, আর 'জীউ' হচ্ছে সম্মানসূচক 'জী'-র রূপান্তর। মন্দির প্রতিষ্ঠার পর মন্দিরের নামানুসারে গ্রামটির নাম রাখা হয় 'কান্তনগর'।

মন্দিরের শিলালিপি

প্রত্যেকটি স্থাপত্যের একটি শিলালিপি থাকে। কান্তজীউ মন্দিরেরও তেমনি ভিত্তিদেশের উত্তরদিকে একটি শিলালিপি আছে। শিলালিপির রচনাশৈলী যেমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ তেমনি রহস্যজনক। সংস্কৃত ভাষায় রচিত শিলালিপিটি এরকম:

শ্রীশ্রীকান্ত–

'শাকে বেদাব্দি কাল ক্ষিতি পরিগণিতে ভূমিপ; প্রাণনাথ;
প্রসাদাঞ্চাতিরম্য সুরচিত নবরত্নাখ্য মস্মিন্যকার্ষীৎ
রুক্মিণ্যঃ কান্ত তুষ্ঠো সমুদিত মনসা রামন্যথেন রাজা
দত্ত কান্তায় কান্তস্য তু-নিজ নগরে তাত সংকল্প সিদ্ধৌঃ॥'

বঙ্গানুবাদঃ রাজা প্রাণনাথ অতি সুন্দর প্রাসাদতুল্য সুরচিত মনোরম নয়টি বত্নচূড়াবিশিষ্ট শ্রীশ্রী কান্তজীউ মন্দিরটি নির্মাণ কাজ শুরু করেন। পিতার সংকল্প সিদ্ধির জন্য রাজা রামনাথ শ্রীকৃষ্ণের নাম নামানুসারে এই মন্দিরের নাম কান্তজীউ মন্দির রেখে সংকল্প সমাপ্ত করেন বেদ অব্দি কাল ক্ষিতি শকাব্দে।

নবরত্ন মন্দির

নয়টি চূড়াশোভিত মন্দিরকে বলা হয় নবরত্ন মন্দির। শিলালিপিতে উল্লেখ আছে 'নবরত্নাখ্য'। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রচণ্ড ভূমিকম্পে মন্দিরের রত্নচূড়াগুলো ভেঙে যায়। প্রথম তলার চার কোণে চারটি, দ্বিতীয় তলার চার কোণে চারটি এবং তৃতীয় তলার মূল চূড়াসহ মোট নয়টি চূড়া ছিল। শীর্ষ চূড়ায় সংস্থাপিত চিল একটি ধর্মপতাকা। ধর্মপতাকাটি ছিল পিতলের তৈরি যার উচ্চতা ১২ ফুট এবং ওজন প্রায় ৭ মণ।

তথ্যসূত্র:

১. দিনাজপুরের ইতিহাস (১ম-৫ম খণ্ড)– মেহেরাব আলী
২. জেলা পরিক্রমা, দিনাজপুর
৩. কান্তজীউ মন্দিরের ইতিহাস– মেহেরাব আলী
৪. বাংলাদেশের ইতিহাস– পরিতোষকুমার কুণ্ডু
৫. পথিকৃৎ পত্রিকা, দিনাজপুর
৬. নব প্রত্যাশা, দিনাজপুর।

চিত্ত ঘোষ
সম্পাদক, *দৈনিক আজকের দেশবার্তা*, দিনাজপুর

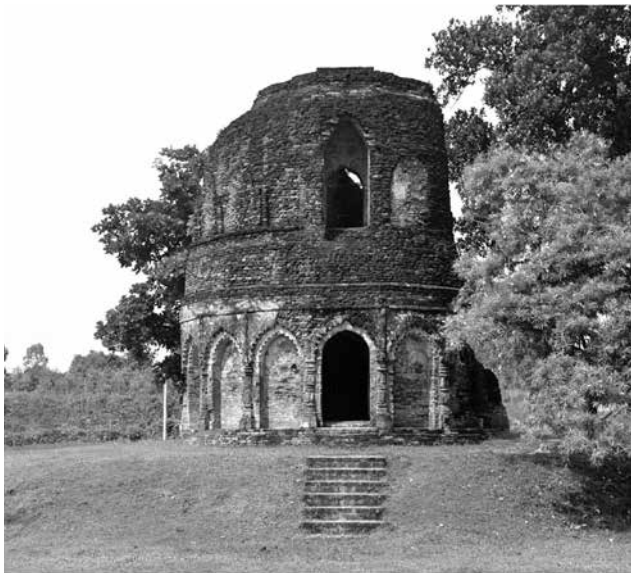

বিশেষ রচনা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

আ নু ষ্ঠা নি ক

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আনুষ্ঠানিক শ্রীশ্রী গীতার একটি অভিনব সংকলন যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা মঙ্গলানুষ্ঠানে কাজে লাগবে। আজকাল কোনও অনুষ্ঠানে গীতাপাঠের প্রয়োজন হলে দেখা যায় যিনি গীতা পাঠ করছেন, তিনি কাজটি আদৌ জানেন না, কিংবা দু'একটি শ্লোক জানেন, যা ঐ অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বহুদিন বহুমানুষ আমাকে এ ধরনের একটি 'আনুষ্ঠানিক গীতা' সংকলনের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। সংকলনটি প্রস্তুত করার পর সীমাহীন আলস্য ও আর্থিক সংকটে তা মুদ্রিত হতে পারেনি। এবার *সনাতনকথা* সম্পাদকের অনুরোধে সেটি পাঠকের হাতে পৌঁছতে পারল। বিবাহ জন্মদিন অন্নপ্রাশন বা অন্য কোনও কাজের শুভারম্ভে গীতাপাঠের প্রয়োজনে এ-সব শ্লোক বিশেষভাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

॥ শান্তি কামনায় ॥

ওঁ তৎ সৎ
শ্রীগোপালকৃষ্ণায় নমঃ
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ॥ দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্যযোগ ॥
শ্লোক ৬২, ৬৩, ৭১
শ্রীভগবান্ উবাচ–
ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গতেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥
বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহংকারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥

বাংলা সরলার্থ ॥
শ্রী ভগবান বললেন–
বিষয় চিন্তা করতে করতে মানুষের তাতে আসক্তি জন্মে, আসক্তি থেকে কামনা অর্থাৎ সেই বিষয় লাভের অভিলাষ জন্মে, সেই কামনা কোন কারণে প্রতিহত বা বাধাপ্রাপ্ত হলে প্রতিরোধকের প্রতি ক্রোধ জন্মে, ক্রোধ থেকে মোহ, মোহ থেকে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ থেকে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ থেকে বিনাশ ঘটে।
যে ব্যক্তি সমস্ত কামনা ত্যাগ করে নিঃস্পৃহ হয়ে বিচরণ করেন, যিনি মমতাশূন্য, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন।

ইতি শ্রীমদ্ভগদ্গীতা সমাপ্তম্।
॥ ওঁ তৎ সৎ শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥

॥ শোকসভায় ॥

ওঁ তৎ সৎ
শ্রীগোপালকৃষ্ণায় নমঃ
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ॥ দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্যযোগ ॥
শ্লোক ২০, ২২, ২৭
শ্রীভগবান্ উবাচ–
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥

বাংলা সরলার্থ ॥
শ্রী ভগবান বললেন–
আত্মা কখনো জন্মান না বা মরেন না। ইনি অন্যান্য জাত বস্তুর ন্যায় জন্মে অস্তিত্ব লাভ করেন না অর্থাৎ ইনি সৎরূপে নিত্য বিদ্যমান। ইনি জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরনো। শরীর হত হলেও ইনি হত হন না।
মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে অন্য নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, সে-রকম আত্মা জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে অন্য নতুন শরীর পরিগ্রহ করে।
যে জন্মে তাহার মরণ নিশ্চিত, যে মরে তার জন্ম নিশ্চিত; সুতরাং অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে তোমার শোক করা উচিত নয়।

ইতি শ্রীমদ্ভগদ্গীতা সমাপ্তম্।
॥ ওঁ তৎ সৎ শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥

॥ আত্মা প্রসঙ্গে ॥

ওঁ তৎ সৎ
শ্রীগোপালকৃষ্ণায় নমঃ
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ॥ দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্যযোগ ॥
শ্লোক ২৯
শ্রীভগবান্ উবাচ–
আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন–
মাশ্চর্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চার্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥

বাংলা সরলার্থ ॥
শ্রী ভগবান বললেন–
কেউ আত্মকে আশ্চর্যরকমের কিছু বলে বোধ করেন, কেউ একে আশ্চর্যরকমের কিছু, এ-রকম কথাই শোনেন। কিন্তু শুনেও কেউ একে জানতে পারেন না।

ইতি শ্রীমদ্ভগদ্গীতা সমাপ্ত।
॥ ওঁ তৎ সৎ শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥

॥ ধর্মযুদ্ধ প্রসঙ্গ ॥

ওঁ তৎ সৎ
শ্রীগোপালকৃষ্ণায় নমঃ
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ॥ দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্যযোগ ॥
শ্লোক ৩১, ৩২, ৩৭
শ্রীভগবান্ উবাচ–
স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥

বাংলা সরলার্থ ॥
শ্রী ভগবান বললেন–
স্বধর্মের দিকে দৃষ্টি রেখেও তোমার ভীত-কম্পিত হওয়া উচিত নয়। ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয় আর কিছু নেই।
হে পার্থ, এ যুদ্ধ নিজের থেকে উপস্থিত হয়েছে, এ মুক্ত স্বর্গদ্বার স্বরূপ। ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়েরাই এ-ধরনের যুদ্ধ লাভ করে থাকেন।
যুদ্ধে হত হলে স্বর্গ পাবে, জয়লাভ করলে পৃথিবী ভোগ করবে, সুতরাং হে কৌন্তেয়, যুদ্ধে নিশ্চিত বিজয়ী হবে ভেবে গাত্রোত্থান কর।

ইতি শ্রীমদ্ভগদ্গীতা সমাপ্ত।
॥ ওঁ তৎ সৎ শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥

॥ সকাম ও নিষ্কাম কর্ম প্রসঙ্গে ॥

ওঁ তৎ সৎ
শ্রীগোপালকৃষ্ণায় নমঃ
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ॥ দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্যযোগ ॥
শ্লোক ৪২, ৪৩, ৪৪
শ্রীভগবান্ উবাচ–
যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্চর্য্যগতিং প্রতি ॥
ভোগৈশ্চর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥

বাংলা সরলার্থ ॥
শ্রী ভগবান বললেন–
হে পার্থ, অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা বেদের কর্মকাণ্ডের স্বর্গফল ইত্যাদি প্রকাশক প্রীতিকর বাক্যে অনুরক্ত। তারা বলে, বেদোক্ত কাম্য-কর্মাত্মক ধর্ম ছাড়া আর কিছু ধর্ম নেই, তাদের চিত্ত কামনা-কলুষিত, স্বর্গই তাদের পরম পুরুষার্থ, তারা ভোগ-ঐশ্বর্য লাভের উপায় হিসেবে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের প্রশাংসাসূচক আপাতমনোরম বেদবাক্য বলে থাকে। এ-সব শ্রবণ-রমণীয় বাক্যে অপহৃতচিত্ত, ভোগ-ঐশ্বর্যে আসক্ত ব্যক্তিদের কার্যকার্য-নির্ণায়ক বুদ্ধি এক বিষয়ে স্থির থাকতে পারে না অর্থাৎ ঈশ্বরে একনিষ্ঠ হয় না।

ইতি শ্রীমদ্ভগদ্গীতা সমাপ্ত।
॥ ওঁ তৎ সৎ শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥

॥ কাজ করা প্রসঙ্গে ॥

ওঁ তৎ সৎ
শ্রীগোপালকৃষ্ণায় নমঃ
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ॥ দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্যযোগ ॥
শ্লোক ৪৭ ও ৫১
শ্রীভগবান্ উবাচ–
কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥
কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥

বাংলা সরলার্থ ॥
শ্রী ভগবান বললেন–
কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মফলে কখনও তোমার অধিকার নেই। কর্মফল লাভের জন্য যেন তুমি কোন কর্মে প্রবৃত্ত না হও, কর্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।
সমত্ব বুদ্ধিযুক্ত হয়ে কর্ম করাই কৌশল, এই-ই যোগ। সমত্ব বুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানী ব্যক্তিরা কর্ম করলেও কর্মজনিত ফলে আবদ্ধ হন না, সুতরাং তাঁরা জন্মরূপ বন্ধন অর্থাৎ সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নির্বিঘ্নে বিষ্ণুপদ বা মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন।

ইতি শ্রীমদ্ভগদ্গীতা সমাপ্ত।
॥ ওঁ তৎ সৎ শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥

॥ কাজ করা প্রসঙ্গে ॥

ওঁ তৎ সৎ
শ্রীগোপালকৃষ্ণায় নমঃ
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ॥ তৃতীয় অধ্যায় কর্মযোগ ॥
শ্লোক ৭, ৮, ৯
শ্রীভগবান্ উবাচ–
যস্তিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন ।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥
নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ ॥
যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥

বাংলা সরলার্থ ॥
শ্রী ভগবান বললেন–
যিনি মনের দ্বারা সব জ্ঞানেন্দ্রিয় সংযত করে অনাসক্ত হয়ে কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্মযোগের আরম্ভ করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ।
তুমি নিয়ত কর্ম কর; কর্মশূন্যতা অপেক্ষা কর্ম শ্রেষ্ঠ; কর্ম না করলে তোমার দেহযাত্রাও নির্বাহ হতে পারে না ।
যজ্ঞার্থ ছাড়া অন্য যে কোন কর্ম মানুষের বন্ধনের কারণ। হে কৌন্তেয়, তুমি সেই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ যজ্ঞার্থে অনাসক্ত হয়ে কর্ম কর ।

ইতি শ্রীমদ্ভগদ্গীতা সমাপ্ত ।
॥ ওঁ তৎ সৎ শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥

॥ সৎকর্ম প্রসঙ্গে ॥

ওঁ তৎ সৎ
শ্রীগোপালকৃষ্ণায় নমঃ
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ॥ অষ্টাদশ অধ্যায় ॥ মোক্ষযোগ ॥
শ্লোক ২৩, ২৪, ২৫
শ্রীভগবান্ উবাচ–
নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্ ।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যৎ তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥
যৎ তু কামেপ্সুনা কর্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্ ।
মোহাদারভ্যতে কর্ম যৎ তৎ তামসমুচ্যতে ॥

বাংলা সরলার্থ ॥
শ্রী ভগবান বললেন–
কর্মকর্তা ফলকামনা পরিত্যাগ করে রাগ-দ্বেষ বর্জন করে অনাসক্তভাবে অবশ্যকর্তব্যরূপে বিহিত যে কর্ম করেন, তাকে সাত্ত্বিক কর্ম বলা হয় ।
আর ফলাকাঙ্ক্ষা করে অথবা অহংকার সহকারে বহু আয়াস স্বীকার করে যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা রাজস কর্ম বলে কথিত ।
ভবিষ্যৎ ফল কি হবে, নিজের সামর্থ্য কতটুকু, প্রাণিহিংসাদি হবে কিনা, পরিণামে কি রকমের হানি হওয়ার আশংকা এই সব বিচার না করে মোহবশত যে কর্ম আরম্ভ করা হয়, তা তামস কর্ম বলে কথিত হয় ।

ইতি শ্রীমদ্ভগদ্গীতা সমাপ্তম্ ।
॥ ওঁ তৎ সৎ শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥

॥ আহার প্রসঙ্গে ॥

ভোজসভায়

ওঁ তৎ সৎ
শ্রীগোপালকৃষ্ণায় নমঃ
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥

শ্রীমদ্ভগদ্গীতা ॥ সপ্তদশ অধ্যায় শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগ ॥
শ্লোক ৮, ৯, ১০
শ্রীভগবান্ উবাচ–
আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য সুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ ।
আহারা রাজস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥
যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥

বাংলা সরলার্থ ॥
শ্রী ভগবান বললেন–
যা আয়ু, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, চিত্তপ্রসন্নতা ও রুচি– এসবের বর্ধনকারী এবং সরস, স্নেহযুক্ত, সারবান্ এবং প্রীতিকর এধরনের আহার সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের প্রিয় ।
অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, বিদাহী এবং দুঃখ, শোক ও রোগ উৎপাদক আহার রাজস ব্যক্তিদের প্রিয় ।
যে খাদ্য বহু আগে রান্না হয়েছে, যার রস শুকিয়ে গেছে, যা দুর্গন্ধ, পর্য্যুষিত (বাসি), উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র, তা তামস ব্যক্তিদের প্রিয় ।

ইতি শ্রীমদ্ভগদ্গীতা সমাপ্ত ।
॥ ওঁ তৎ সৎ শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥

॥ অবতার, জন্মান্তর প্রসঙ্গে ॥

ওঁ তৎ সৎ
শ্রীগোপালকৃষ্ণায় নমঃ
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥

শ্রীমদ্ভগদ্গীতা ॥ চতুর্থ অধ্যায় জ্ঞানযোগ ॥
শ্লোক ৬, ৭, ৮, ৯
শ্রীভগবান্ উবাচ–
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্ ।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥
যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥
জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

বাংলা সরলার্থ ॥
শ্রী ভগবান বললেন–
আমি জন্মরহিত, অবিনশ্বর এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হয়েও নিজের প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করে আত্মমায়ায় আবির্ভূত হই। হে ভারত এখন যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, আমি সেই সেই সময়ে নিজেকে সৃষ্টি করি। সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্টদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই ।
হে অর্জুন আমার এই দিব্য জন্ম ও কর্ম যিনি তত্ত্বত জানেন তিনি দেহত্যাগ করে পুনরায় আর জন্মগ্রহণ করেন না– তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন ।

ইতি শ্রীমদ্ভগদ্গীতা সমাপ্ত ।
॥ ওঁ তৎ সৎ শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥

॥ গুণ বা কর্মের বিভাগ প্রসঙ্গে ॥

বর্ণবিভাগ

ওঁ তৎ সৎ
শ্রীগোপালকৃষ্ণায় নমঃ
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥

শ্রীমদ্ভগদ্গীতা ॥ চতুর্থ অধ্যায় জ্ঞানযোগ ॥
শ্লোক ১৩, ১৪
শ্রীভগবান্ উবাচ–
চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩
ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪

বাংলা সরলার্থ ॥
শ্রী ভগবান বললেন–
গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমি চার বর্ণ সৃষ্টি করেছি বটে, কিন্তু আমি এর সৃষ্টিকর্তা হলেও আমাকে অকর্তা ও বিকাররহিত বলেই জেনো।
কর্মসকল আমাকে লিপ্ত করতে পারে না, কর্মফলে আমার স্পৃহা নেই, যিনি আমাকে এরকম জানেন, তিনি কর্মদ্বারা আবদ্ধ হন না।

ইতি শ্রীমদ্ভগদ্গীতা সমাপ্ত।
॥ ওঁ তৎ সৎ শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥

॥ ঈশ্বরভজনা প্রসঙ্গে ॥

ওঁ তৎ সৎ
শ্রীগোপালকৃষ্ণায় নমঃ
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥

শ্রীমদ্ভগদ্গীতা ॥ অষ্টাদশ অধ্যায় মোক্ষযোগ ॥
শ্লোক ৬৫, ৬৬
শ্রীভগবান্ উবাচ–
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

বাংলা সরলার্থ ॥
শ্রী ভগবান বললেন–
তুমি একমাত্র আমাতেই মনস্থির রাখ, আমাকে ভক্তি কর, আমাকে পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর; আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করে বলছি, তুমি আমাকেই পাবে, কেন-না তুমি আমার প্রিয়।
সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে তুমি একমাত্র আমারই শরণ নাও; আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করব, শোক কোরো না।

ইতি শ্রীমদ্ভগদ্গীতা সমাপ্ত।
॥ ওঁ তৎ সৎ শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥

॥ জ্ঞান প্রসঙ্গে ॥

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গীতা পাঠ

ওঁ তৎ সৎ
শ্রীগোপালকৃষ্ণায় নমঃ
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥

শ্রীমদ্ভগদ্গীতা ॥ অষ্টাদশ অধ্যায় মোক্ষযোগ ॥
শ্লোক ২০, ২১, ২২
শ্রীভগবান্ উবাচ–
সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে ।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥
পৃথক্‌ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্‌বিধান ।
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥
যৎ তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্যে সক্তমহৈতুকম্ ।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥

বাংলা সরলার্থ ॥
শ্রী ভগবান বললেন–
যে জ্ঞান দিয়ে পরস্পর বিভক্তভাবে প্রতীয়মান সর্বভূতে এক অদ্বয় অব্যয় বস্তু (পরমাত্মতত্ত্ব) দেখা যায়, সেই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জানবে।
যে জ্ঞান দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভূতসমূহে পৃথক পৃথক ভাবের অনুভূতি হয় তা রাজস জ্ঞান।
যা প্রকৃত তত্ত্ব তা না বুঝে, এই যা কিছু সমস্ত, এমন বুদ্ধিতে কোন একমাত্র বিষয়ে আসক্ত থাকে, সেই যুক্তিবিরুদ্ধ, অযথার্থ, তুচ্ছ জ্ঞানকে তামস জ্ঞান বলে।

ইতি শ্রীমদ্ভগদ্গীতা সমাপ্ত।
॥ ওঁ তৎসৎ শ্রীশ্রী কৃষ্ণার্পণমস্তু ॥

॥ সুখ প্রসঙ্গে ॥

ওঁ তৎ সৎ
শ্রীগোপালকৃষ্ণায় নমঃ
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥

শ্রীমদ্ভগদ্গীতা ॥ অষ্টাদশ অধ্যায় মোক্ষযোগ ॥
শ্লোক ৩৭, ৩৮, ৩৯
শ্রীভগবান্ উবাচ–
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্ ।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্ ।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥

বাংলা সরলার্থ ॥
শ্রী ভগবান বললেন–
যে সুখে ক্রমে ক্রমে অভ্যাসবশত আনন্দ লাভ হয় (হঠাৎ নহে), যা লাভ করলে দুঃখের শেষ হয়, যা আগে বিষের ন্যায়, পরিণামে অমৃততুল্য, যা আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধির প্রসন্নতা থেকে জন্মে, তাই সাত্ত্বিক সুখ।
রূপরসাদি বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সংযোগবশত যে সুখ উৎপন্ন হয় এবং যাহা আগে অমৃতের ন্যায় কিন্তু পরিণামে বিষতুল্য হয়, সেই সুখকে রাজস সুখ বলে।
যে সুখ প্রথমে এবং পরিণামেও আত্মার বা বুদ্ধির মোহজনক এবং যা নিদ্রা, আলস্য ও কর্তব্যবিস্মৃতি থেকে উৎপন্ন হয়, তাকে তামস সুখ বলে।

ইতি শ্রীমদ্ভগদ্গীতা সমাপ্ত।
॥ ওঁ তৎ সৎ শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥

॥ যে কোন কার্যারম্ভে ॥

ওঁ তৎ সৎ
শ্রীগোপালকৃষ্ণায় নমঃ
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ॥ সপ্তদশ অধ্যায় শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগ।
শ্লোক ২৩, ২৪, ২৫, ২৬
শ্রীভগবান্ উবাচ–
ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥
তস্মাদ্ওঁইত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥

বাংলা সরলার্থ ॥
শ্রী ভগবান বললেন–
শাস্ত্রে 'ওঁ তৎ সৎ' এই তিন প্রকারে পরব্রহ্মের নাম নির্দেশ করা হয়েছে। এই নির্দেশ থেকেই পূর্বকালে বেদবিদ ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্টি হয়েছে।
এজন্য ব্রহ্মবাদীদের যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি শাস্ত্রোক্ত কর্ম সব সময় 'ওঁ' উচ্চারণ করে অনুষ্ঠিত হয়।
যাঁরা মোক্ষ কামনা করেন, তাঁরা ফল কামনা ত্যাগ করে 'তৎ' এই শব্দ উচ্চারণ করে বিভিন্ন যজ্ঞ, তপস্যা এবং দান ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন।
হে পার্থ, সদ্ভাব ও সাধুভাবে অর্থাৎ কোন বস্তুর অস্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব নির্দেশ করতে 'সৎ' শব্দ প্রযুক্ত হয়; এবং বিবাহাদি মঙ্গলকর্মেও 'সৎ' শব্দ ব্যবহৃত হয়।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সমাপ্ত।
॥ ওঁ তৎ সৎ শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥

॥ অন্নভোজন প্রসঙ্গে ॥

অন্নদান / ভোজসভা

ওঁ তৎ সৎ
শ্রীগোপালকৃষ্ণায় নমঃ
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥ কর্মযোগ ॥
শ্লোক ১৩, ১৪, ১৫, ১৬
শ্রী ভগবান্ উবাচ–
যজ্ঞাশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥
কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥
বাংলা সরলার্থ ॥
শ্রী ভগবান বললেন–
যে সজ্জনগণ যজ্ঞাবশেষ অন্ন ভোজন করেন অর্থাৎ দেবতা, অতিথি প্রভৃতিকে অন্নাদি প্রদান করে অবশিষ্ট ভোজন করেন, তাঁরা সব ধরনের পাপ থেকে মুক্ত হন।
যে পাপাত্মারা কেবল আপন উদর পূরণের জন্য অন্ন পাক করে, তারা পাপরাশিই ভোজন করে।
প্রাণিসকল অন্ন থেকে উৎপন্ন হয়, মেঘ থেকে অন্ন জন্মে, যজ্ঞ থেকে মেঘ জন্মে, কর্ম থেকে যজ্ঞের উৎপত্তি, বেদ থেকে কর্ম উৎপন্ন জেনো এবং পরব্রহ্ম থেকে বেদ সমদ্ভূত; সেজন্য সর্বব্যাপী পরব্রহ্ম সদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।
যে এভাবে প্রবর্তিত যজ্ঞচক্রের অনুবর্তন না করে অর্থাৎ যে যজ্ঞাদি কর্ম দ্বারা এই সংসার-চক্র পরিচালনে সহায়তা না করে, সে ইন্দ্রিয় সুখে আসক্ত ও পাপ জীবন, হে পার্থ, সে বৃথা জীবন ধারণ করে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সমাপ্ত।
॥ ওঁ তৎ সৎ শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥

॥ জ্ঞানের সাধনা প্রসঙ্গে ॥

স্কুল-কলেজে গীতা পাঠ

ওঁ তৎ সৎ
শ্রীগোপালকৃষ্ণায় নমঃ
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥

শ্রীমদ্ভগদ্গীতা ॥ ত্রয়োদশ অধ্যায় ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগযোগ ॥
শ্লোক ৮, ৯, ১০, ১১, ১২
শ্রীভগবান্ উবাচ–
অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥

বাংলা সরলার্থ ॥
শ্রী ভগবান বললেন–
শ্লাঘা ও দম্ভহীনতা, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, গুরুসেবা, শৌচ, সৎকাজে একনিষ্ঠা, আত্মসংযম, বিষয়-বৈরাগ্য, নিরহংকারিতা, জন্মমৃত্যু-জরাব্যাধিতে দুঃখদর্শন, বিষয়ে বা কর্মে অনাসক্তি, স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদিতে মমত্ববোধের অভাব, ইষ্টানিষ্ট লাভে সমচিত্ততা, আমাতে (ভগবান বাসুদেবে) অনন্য ঐকান্তিক ভক্তি, পবিত্র নির্জন স্থানে বাস, প্রাকৃত জনসমাজে বিরক্তি, সর্বদা অধ্যাত্মজ্ঞানের অনুশীলন অর্থাৎ নিত্য আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ হওয়া, তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজনীয় আলোচনা– এসবকে জ্ঞান বলা হয়; এর বিপরীত যা তা-ই অজ্ঞান।

ইতি শ্রীমদ্ভগদ্গীতা সমাপ্ত।
॥ ওঁ তৎ সৎ শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥

॥ সদুপদেশ ॥

ওঁ তৎ সৎ
শ্রীগোপালকৃষ্ণায় নমঃ
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥

শ্রীমদ্ভগদ্গীতা ॥ ষোড়শ অধ্যায় দৈবাসুর-সম্পদ বিভাগযোগ ॥
শ্লোক ২১, ২২, ২৩, ২৪
শ্রীভগবান্ উবাচ–
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥
এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥
যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি ॥

বাংলা সরলার্থ ॥
শ্রী ভগবান বললেন–
কাম, ক্রোধ এবং লোভ এই তিনটি নরকের দ্বারস্বরূপ, এরা আত্মার বিনাশের মূল (জীবে অধোগতির কারণ)। সুতরাং এই তিনটিকে ত্যাগ করবে।
হে কৌন্তেয়, নরকের দ্বারস্বরূপ এই তিনটি (কাম, ক্রোধ ও লোভ) থেকে মুক্ত হলে মানুষ নিজের কল্যাণ সাধনপূর্বক পরম গতি প্রাপ্ত হয়।
যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে স্বেচ্ছাচারী হয়ে, কর্মে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না, তাহার শান্তি-সুখও হয় না, মোক্ষ লাভও হয় না।
অতএব কর্তব্য-কর্ম নির্ধারণে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ, সুতরাং তুমি শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থা জেনে যথাধিকার কর্ম করতে প্রবৃত্ত হও।

ইতি শ্রীমদ্ভগদ্গীতা সমাপ্ত।
॥ ওঁ তৎসৎ শ্রীশ্রী কৃষ্ণার্পণমস্তু ॥

॥ তপস্যা প্রসঙ্গে ॥

সাধুসঙ্গে

ওঁ তৎ সৎ
শ্রীগোপালকৃষ্ণায় নমঃ
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥

শ্রীমদ্ভগদ্গীতা ॥ সপ্তদশ অধ্যায় শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগ ॥
শ্লোক ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯
শ্রীভগবান্ উবাচ–
দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে ॥
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥
সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥
মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥

বাংলা সরলার্থ ॥
শ্রী ভগবান বললেন–
দেব, দ্বিজ, গুরু, বিদ্বান ব্যক্তির পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য, অহিংসা এই সকলকে শারীর তপস্যা বলে।
যা কারও জন্য উদ্বেগকর হয় না, যা সত্য, প্রিয় ও হিতকর, এরকম বাক্য এবং যথাবিধি শাস্ত্রাভ্যাস– এই সকলকে বাঙ্ময় বা বাচিক তপস্যা বলা হয়।
চিত্তের প্রসন্নতা, অক্রূরতা, বাক্-সংযম, আত্মসংযম বা মনসংযম এবং অন্যের সঙ্গে ব্যবহারে কপটতা না রাখা, এই সকলকে মানসিক তপস্যা বলে।
পূর্বোক্ত ত্রিবিধ তপস্যা যদি ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য, ঈশ্বরে একাগ্রচিত্ত ব্যক্তিরা পরম শ্রদ্ধাভরে করেন, তবে তাহাকে সাত্ত্বিক তপস্যা বলে।
সৎকার, মান ও পূজা লাভের জন্য দম্ভ সহকারে যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয় এবং ইহলোকে যার ফল অনিত্য এবং অনিশ্চিত, তাকে রাজস তপস্যা বলে।
মোহাচ্ছন্নবুদ্ধিবশে নিজের শরীর প্রভৃতিকেও পীড়া দিয়ে অথবা জারণ-মারণ প্রভৃতি অভিচার করে পরের বিনাশার্থে যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, তাকে তামস তপস্যা বলে।

ইতি শ্রীমদ্ভগদ্গীতা সমাপ্ত।
॥ ওঁ তৎ সৎ শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥

॥ দান প্রসঙ্গে ॥

পুরস্কার বিতরণী

ওঁ তৎ সৎ
শ্রীগোপালকৃষ্ণায় নমঃ
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥

শ্রীমদ্ভগদ্গীতা ॥ সপ্তদশ অধ্যায় শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগ ॥
শ্লোক ২০, ২১, ২২
শ্রীভগবান্ উবাচ–
দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥

বাংলা সরলার্থ ॥
শ্রী ভগবান বললেন–
'দান করা উচিত তাই দান করি', এরকম কর্তব্যবুদ্ধিতে উপযুক্ত দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করে অনুপকারী ব্যক্তিকে (অর্থাৎ প্রত্যুপকারের আশা না রেখে) যে দান করা হয়, তাকে সাত্ত্বিক দান বলে।
পরন্তু, প্রত্যুপকারের আশায় অথবা স্বর্গাদি ফল কামনায় অতি কষ্টের সঙ্গে যে দান করা হয়, তাকে রাজস দান বলে।
অনুপযুক্ত দেশে, অনুপযুক্ত কালে এবং অনুপযুক্ত পাত্রে যে দান এবং উপযুক্ত দেশকালপাত্রে দিলেও সৎকারশূন্য এবং অবজ্ঞাসহকারে যে দান করা হয়, তাকে তামস দান বলে।

ইতি শ্রীমদ্ভগদ্গীতা সমাপ্ত।
॥ ওঁ তৎ সৎ শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥

● সংকলক **নান্টু রায়**

বিশেষ রচনা

অষ্টাবক্র ও সুপ্রভা

সুবোধ ঘোষ

বনভূমির নিভৃতে কলস্বনা এক স্রোতস্বিনীর নিকটে রক্তপাষাণের বুকের উপর কুহেলিকালীনা প্রতি সন্ধ্যায় পল্লবিত দ্রুমবাহু হতে পুরটকণিকার মত পীতমঞ্জরীর পুঞ্জ লুটিয়ে পড়ে। নিবিড় অধরবন্ধ রচনা করে কেলিশ্রমালস মৃগদম্পতি সেই পুঞ্জীভূত কোমলতার ক্রোড়ে নিশীথের প্রহর যাপন করে। আর, প্রভাত হতেই মৃগদম্পতি যখন নবতৃণের গন্ধামোদে চঞ্চল হয়ে স্রোতস্বিনীর কূলে ছুটাছুটি করে বেড়ায়, তখন বনপথের দুই দিক হতে উৎসুক নয়ন নিয়ে কীর্ণ মঞ্জরীর কোমলতায় আবৃত সেই রক্তপাষাণের নিকটে দেখা দেয় বরযৌবনা এক ঋষিকুমারী, কণ্ঠে তার গন্ধে আকুল স্ফুটকেতকীর মালিকা, এবং মদাঞ্চিততনু এক তরুণ ঋষি, বক্ষে তার মৃগমদবাসিত কুঙ্কুমের অঙ্কন। মহর্ষি বদান্যের কন্যা সুপ্রভা ও ঋষি অষ্টাবক্র।

যেন দুর্বহ এক তৃষ্ণার বেদনা উৎসুক নয়নে বহন করে ছুটে আসে মিলনোন্মুখ দুই জীবনের যৌবনান্বিত দুই স্বপ্নভার। কিন্তু ছুটেই আসে শুধু, আর এসেই সেই ক্ষুদ্র অথচ কঠোর রক্তপাষাণের বাধায় হঠাৎ আহত হয়। নিকটে এসেও যেন এক দুরূহ সুদূরতর শাসনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ভুলতে পারে না অষ্টাবক্র, সুপ্রভাও ভোলে না, দুজনেরই একটি কঠিন অঙ্গীকার দু'জনের মাঝখানে এই ব্যবধান আজও রচনা করে রেখেছে।

দরোৎফুল্ল সরোরুহের মত সুপ্রভার বিকচ আননশোভার দিকে ঋষি অষ্টাবক্র সস্পৃহ নয়নে তাকিয়ে থাকে। আর বিমুগ্ধা বনকুরঙ্গীর মত সমুত্তান

নয়নভঙ্গীর নিবিড়সান্দ্র বিহ্বলতা নিয়ে অষ্টাবক্রের কুঙ্কুমপিঞ্জরিত বক্ষঃপটের দিকে তাকিয়ে থাকে সুপ্রভা। তরুণ ঋষির সেই মৃদুশ্বাসকম্পিত বক্ষের তরঙ্গিত আবেদনের উপর মাথা লুটিয়ে দিতে ইচ্ছা করে সুপ্রভার। এবং সুপ্রভার ফুল্ল আননের রক্তিম সুষমা অধরাশ্লেষে পান করে নিয়ে তৃপ্ত হতে ইচ্ছা করে অষ্টাবক্র, বনবিটপীর কিশলয় যেমন প্রভাতের অরুণিত মিহিরলেখার রাগসুশা পান করে তৃপ্ত হতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু এই ইচ্ছা নিতান্তই ইচ্ছা। বাসকতল্পের মত সুন্দর ঐ পুঞ্জায়িত মঞ্জরীর মদাকুল ইঙ্গিতে এই ইচ্ছা ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চলিত হয়, কিন্তু এই চলঞ্চলতা কোনক্ষণে জীবনের সেই অঙ্গীকারকে বিচলিত করতে পারে না।

অঙ্গীকার করে কঠোর এক পরীক্ষা জীবনে স্বীকার করে নিয়েছে প্রেমিক অষ্টাবক্র ও তার প্রেমিকা সুপ্রভা। কে জানে কোন্ বিশ্বাসের দুঃসাহসে মহর্ষি বদান্যের কাছে এই অঙ্গীকার নিবেদন করেছে অষ্টাবক্র ও সুপ্রভা, শুধু স্বেচ্ছার অধিকারে কখনই পরিণয় বরণ করবে না ওদের দু'জনের জীবন। যদি কোন শুভলগ্নে স্বয়ং মহর্ষি বদান্য সাগ্রহে সানন্দে ও সমন্ত্রসংস্কারে সুপ্রভাকে অষ্টাবক্রের কাছে সম্প্রদান করেন, তবেই সেই লগ্নে জগতের স্বীকৃতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাল্যবিনিময় করে মিলিত হবে ঐ কুঙ্কুম আর কেতকীর সুরভিত ইচ্ছা। তার আগে নয়, এবং জগতের কোন গোপন নিভৃতেও নয়।

তাই সুপ্রভা আর অষ্টাবক্র, দুই উৎসুক আকাঙ্ক্ষার ব্যাকুলতা প্রতি প্রভাতের জাগ্রত আলোকের পথে এক স্বপ্নাভিসারে আসে, বননিভৃতের এই কলস্বনা স্রোতস্বিনীর নিকটে এক সুরভিত সান্নিধ্যের ছায়াটুকু মাত্র অনুভব করে চলে যায়।

ঋষি অষ্টাবক্র ও কন্যা সুপ্রভার প্রণয়কলাপে বিস্মিত বিরক্ত ও ব্যথিত হয়েছেন মহর্ষি বদান্য। তিনি মনে করেন, এই প্রণয় প্রণয় নয়। বনেচর মৃগ ও মৃগীর মত নিতান্ত এক আসক্তির তাড়নাকে জীবনের প্রেম বলে বিশ্বাস করেছে এক ঋষিকুমার ও এক ঋষিকুমারী। ঐ আগ্রহ আকালিক ঝটিকার মত বিচলিত যৌবনের উদ্‌ভ্রান্তি মাত্র; দক্ষিণমলয়ের মৃদুবিধূত নিঃশ্বাসের মত স্নিগ্ধ স্থিরসৌহার্দ্যের সঞ্চার নয়। ঐ চাঞ্চল্য, লোষ্ট্রাহত সরসীসলিলের ছন্দোহীন উচ্ছলতা মাত্র; সুতরঙ্গিত ভঙ্গিমার মঞ্জুল বিঞ্জোলী নয়। দুই জনের দুই মুগ্ধ মুখচ্ছবি ও অধরবিসর্পিত রক্তোচ্ছ্বাস দুটি দাবানলদ্যুতি মাত্র; সুশান্ত জ্যোৎস্নারাগ নয়। আসক্তি সত্য হলেই পরিণয় লাভের অধিকার সত্য হয় না। এই আসক্তি প্রেম নয়, অনুরাগ নয়, দাম্পত্যের মিলনসূত্রও নয়।

স্মরণ করেন মহর্ষি বদান্য, অঙ্গীকার করেছে অষ্টাবক্র ও সুপ্রভা। কিন্তু ঐ অঙ্গীকারে কোনও সত্য নেই। মনে করেন বদান্য, ঐ অঙ্গীকার হঠামোদে উদ্ধত দুই যৌবনের কৌতুকরঙ্গ মাত্র, মহর্ষি বদান্যের রোষ প্রশমিত করবার জন্য যৌবনচটুল দুই অভিসন্ধির চাটুভাষিত স্তুতি। বিশ্বাস হয় না, যে দুই আকাঙ্ক্ষা প্রতি প্রভাতে বননিভৃতের ক্রোড়ে গোপনাভিসারে এসে সান্নিধ্য লাভ করে, সেই দুই আকাঙ্ক্ষা কখনও কোন সংযমের অঙ্গীকারকে শ্রদ্ধা করতে পারে। আসক্তি কেমন করে পাবে এই শক্তি? সন্দেহ করেন মহর্ষি বদান্য, কপট অঙ্গীকারের অন্তরালে কৌতুকমদে মদায়িত এক ঋষিকুমারী এবং এক তরুণ ঋষির দেহ ক্ষণপুলকিত উদ্‌ভ্রান্তির অনাচারকলুষে ক্লিন্ন হয়েছে। লোকসমাজের আশীর্ববাদের জন্য সেই দুই অবিধিপ্রগলভ আসক্তির প্রাণে কোনও মোহ আর শ্রদ্ধা নেই।

অভিশাপ বর্ষণের জন্য মহর্ষি বদান্যের কোপপীড়িত দুই চক্ষু, খর দৃষ্টিবর্ষণ করতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ দেখতে পেয়ে বিস্মিত হন বদান্য, তাঁর আশ্রমভবনের দ্বারোপান্তে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে তরুণ ঋষি অষ্টাবক্র।

মহর্ষি বদান্য বলেন– আমি জানি, তুমি কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছ অষ্টাবক্র কিন্তু শুনে যাও, সুপ্রভার পাণি প্রার্থনা করবারও অধিকার তোমার নেই।

অষ্টাবক্র– কেন মহর্ষি?

বদান্য– কেতকীগন্ধবাসিত একটি কণ্ঠের আর কুঙ্কুমাঙ্কিত একটি বক্ষের আসক্তিময় প্রগল্‌ভতা আমার আশীর্বাদ পেতে পারে না

অষ্টাবক্র– প্রগল্‌ভতা বলে ধারণা করছেন কেন, মহর্ষি?

অষ্টাবক্রের প্রশ্নে আরও কুপিত হয়ে শ্লেষাক্ত স্বরে উত্তর দেন মহর্ষি বদান্য। – শিলাখণ্ড যেমন তরল হতে পারে না, শিশিরবিন্দু যেমন কঠিন হতে পারে না, আসক্তিও তেমনি কখনও অপ্রগল্‌ভ হতে পারে না।

অষ্টাবক্র– কিন্তু আপনারই ইচ্ছাকে সম্মানিত করে আমরা দু'জনে যে অঙ্গীকার জীবনে গ্রহণ করেছি, সেই অঙ্গীকার কোন মুহূর্তেও আমাদের আচরণে অসম্মানিত হয়নি।

চমকে ওঠেন মহর্ষি বদান্য, তাঁর সন্দেহ ও বিশ্বাসের কঠিন হৃৎপিণ্ডের উপর যেন এক উদ্ধতের হঠভাষিত গর্বের আঘাত পড়েছে।

বদান্য বলেন– কিন্তু আমি জানি, একদিন না একদিন তোমাদের উদ্‌ভ্রান্ত আসক্তির কাছে তোমাদের অঙ্গীকার মিথ্যা হয়ে যাবে।

অষ্টাবক্র– কখনই হবে না।

তীব্রতর উষ্মায় তপ্ত হয়ে ওঠে বদান্যের কণ্ঠস্বর। – তবে শোন অষ্টাবক্র, বৎসরকাল পূর্ণ হবার পর আজিকার মত এমনই এক প্রভাতে আমার কাছে এসে যদি এই সত্য ঘোষণা করতে পারো যে, তোমাদের অঙ্গীকার ঐ বননিভৃতের ভৃঙ্গগীতগুঞ্জরিত কোন মুহূর্তেও বিচলিত হয়নি, তবেই আমি বিশ্বাস করব, সুপ্রভার পাণি প্রার্থনা করবার অধিকার তুমি পেয়েছ।

অষ্টাবক্র– তারপর?

মহর্ষি– তারপর, আমি বিচার করব, সুপ্রভারর পাণি গ্রহণের অধিকার তোমার আছে কি না।

অষ্টাবক্র– আপনার ইচ্ছাকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্বীকার করে নিলাম।

হ্যাঁ, সত্যই আসক্তি। মনে মনে স্বীকার করে অষ্টাবক্র ও সুপ্রভা, মহর্ষি বদান্যের অনুমানে কোনও ভুল নেই। কুমারী সুপ্রভা তার উষ্ণ নিঃশ্বাসবায়ুর চঞ্চলতার মধ্যে বক্ষের গভীর হতে উৎসারিত এক তৃষ্ণার মর্মররোল শুনতে পায়। যেন তার শোণিতে সঞ্চারিত এক স্বপ্নের প্রাণ দোহদবেদনা বরণের জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছে। বিশ্বাস করে সুপ্রভা, পিতা বদান্যের অভিযোগ মিথ্যা নয়। স্ফুট প্রসূণের নবপরাগের মত এক সুরভিত মোহ তার সকলক্ষণের ভাবনাকে অবশ করে রেখেছে। উদ্দলকুসুম সুরভির মত কি-এক বাসনার শিহর তার অধরপুটে ক্ষণে ক্ষণে দূরন্ত প্রলোভ সঞ্চারিত করে যায়। বিশ্বাস করে সুপ্রভা, এই তৃষ্ণার পরম তৃপ্তি দাঁড়িয়ে আছে তারই সম্মুখে, যার নাম অষ্টাবক্র, তরুণতরুর মত স্নিগ্ধদর্শন যে ঋষির কণ্ঠে কেতকীমালিকা অর্পণের জন্য সুপ্রভার মন তার স্বপ্ন জাগর ও সুষুপ্তিরও প্রতিক্ষণে উৎসুক হয়ে রয়েছে।

অষ্টাবক্রও সুপ্রভার কাছে অকপট ভাষায় নিবেদন করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে না– হ্যাঁ ঋষিনন্দিনী, ঐ বনমৃগদম্পতির জীবনের প্রতি সন্ধ্যার উৎসবের মত **অবরবন্ধ** রচনার জন্য আমার

ধমনীধারায় এক স্বপ্নাতুর আকাঙ্ক্ষা ছুটাছুটি করে। আমি জানি, আমার সেই আকাঙ্ক্ষার সকল তৃপ্তির আঁধার তোমার ঐ সুন্দর অধর। পরিমলগ্রাহিণী সমীরিকা তুমি, আমার যৌবনোত্থ বাসনার সৌরভভার তোমারই সমাদরে ধন্য হতে চায়। এই ক্ষিতিতলের এক নিভৃতের স্নেহে লালিত স্নিগ্ধ কেকা তুমি, আমার প্রাণের সকল তৃষ্ণার নীলাঞ্জন তোমারই আহ্বান অন্বেষণ করে বেড়ায়। নিবিড়সলিল নিকুঞ্জসরিৎ তুমি, আমার সকল আনন্দের হিল্লোল তোমারই কান্তিসুধারসের অভিষেক নিতে চায়। স্বীকার করি সুপ্রভা, আমার বক্ষের কুঙ্কুমে আমার আসক্তিরই প্রাণ ছড়িয়ে রয়েছে।

কুণ্ঠাহত স্বরে প্রশ্ন করে সুপ্রভা। – কিন্তু এই কি প্রেম?

বিস্মিত হয় অষ্টাবক্র। – জানি না, প্রেম নামে কোন্ আকাশসম্ভব আকাঙ্ক্ষার কথা তুমি বলছ, ঋষিতনয়া।

সুপ্রভা– ক্ষমা করবেন ঋষি, আমি পিতা বদান্যের দুর্বহ এক চিন্তার প্রশ্ন আপনাকে নিবেদন করছি। শুধু তাই নয়, এই প্রশ্ন আমার নিজেরই জীবনের প্রতি আমার সংশয়কাতর মনের প্রশ্ন। বলাকার প্রাণ যে আকাঙ্ক্ষায় বিদ্যুন্ময় জীমূতের ধ্বনিত শিহর নিজ দেহের শোণিতধারায় বরণ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে, আমার প্রাণ সেই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আপনার দীপ্ত যৌবনের হর্ষ বরণ করতে চায়। কোন সন্দেহ করি না ঋষি, আমার কণ্ঠমালিকার কেতকীতে আমার আসক্তিই সুরভিত হয়ে রয়েছে। কিন্তু এই আসক্তি কি জীবনেরর কোন সুন্দর আকাঙ্ক্ষা?

অষ্টাবক্র– সুন্দর আসক্তি অবশ্যই জীবনের সুন্দর আকাঙ্ক্ষা।

সুপ্রভা বিস্মিত হয়। – সুন্দর আসক্তি?

অষ্টাবক্র– হ্যাঁ, সে আসক্তি দেহজ বাসনারই প্রসূত প্রসূন, কিন্তু দেহজ বাসনার নিঃশ্রীক উল্লাস নয়। সে আসক্তি কখনও প্রগল্‌ভ হয় না। মহর্ষি বদান্য বৃথাই বিশ্বাস করেছেন, আমাদের কামনা ক্ষণোদভ্রান্ত হয়ে আমাদের অঙ্গীকারের গৌরব নাশ করে দেবে।

বুঝতে না পেরে প্রশ্নাকুল দৃষ্টি তুলে নীরবে শুধু তাকিয়ে থাকে সুপ্রভা।

অষ্টাবক্র বলে– ভুলে যাও কেন কুমারী, তোমাকে আজও আমি স্পর্শ করিনি? এইখানে কতবার ক্ষণে ক্ষণে বনসমীরণ উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছে, কিন্তু তোমার চিরঘনসঙ্কাশ চিকুরের সুচারু স্তবক আর নিবিড় নীবিতটের নবীনাংশুক মেখলা কখনও উদ্‌ভ্রান্ত হয়নি। যেন শতকুম্ভের কান্তি দিয়ে রচিত দুটি কুম্ভ, পুষ্পাহারের সলজ্জ শাসন তুচ্ছ করে ললিত লাবণ্যভঙ্গে স্তবকিত হয়ে রয়েছে, তোমার অভিরাম উরজশোভার বিহ্বলতা। তবু আমার লুব্ধ বক্ষ ও বাহু দস্যু হয়ে উঠতে পারে না সুপ্রভা। এই সংযম বরণ করেই তোমার ও আমার আসক্তি সুন্দর হতে পেরেছে।

সুপ্রভা– আপনি এই যুক্তি দিয়ে কোন্ সত্য প্রমাণ করতে চাইছেন ঋষি?

অষ্টাবক্র– তুমি আমার এবং আমি তোমার; আমার ও তোমার জীবন পরিণয়ে মিলিত হবার অধিকার পেয়েছে।

অষ্টাবক্রের ভাষণে সুপ্রভা যেন তার জীবনের এক মধুর বিশ্বাসের জয়ধ্বনি শুনতে পায়। তবু, এই বিশ্বাসের আনন্দ অনুভব করতে গিয়েও হঠাৎ আর-এক ক্ষীণ সংশয়ের বেদনা সুপ্রভার আয়ত নয়নের কোনও বাষ্পায়িত হয়ে ওঠে। – সুপ্রভা ব্যথিত স্বরে বলে– তবু সংশয় হয়।

অষ্টাবক্র– বল, কিসের সংশয়?

সুপ্রভা–বদান্যতনয়া সুপ্রভার চেয়ে সুন্দরতর অধরের নারী এই জগতে কতই তো আছে।

অষ্টাবক্র– আছে, অস্বীকার করি না সুপ্রভা।

সুপ্রভা– ভয় হয় ঋষি, আপনার এই সুন্দর আসক্তি, আপনার বাসনাবিহ্বল দুই চক্ষু যে-কোন ক্ষণে যে-কোন বিম্বাধরার মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ ও লুব্ধ হয়ে উঠতে পারে।

অষ্টাবক্র– পারে, অস্বীকার করি না প্রিয়া।

সুপ্রভা- সবচেয়ে বড় ভয় ঋষি, আপনারই প্রিয়াতিপ্রিয়া এই সুপ্রভার মনও ঠিক এই ভুল করে ফেলতে পারে।

অষ্টাবক্র– অসম্ভব নয়।

সুপ্রভা– এত ভঙ্গুরতা দিয়ে রচিত যে আসক্তির প্রাণ, সেই আসক্তি সুন্দর হলেই বা কি আসে যায় ঋষি? স্থিরতাবিহীন সেই আসক্তি আমাদের জীবনে পরিণয়ের বন্ধ হতে পারে না।

অষ্টাবক্র– সুন্দর আসক্তির প্রাণ তৃণশীর্ষের শিশির মত ভঙ্গুর নয়, সুন্দরাননা। সেই আসক্তি নিষ্ঠায় কঠিন। পৃথিবীর কোন বিম্বাধারার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার নয়ন মুগ্ধ হলেও আমার সেই মুগ্ধ নয়ন যে তোমাকেই অন্বেষণ করবে, সুপ্রভা।

সুপ্রভা– তাহলে এই কথা বলুন ঋষি, আমি আপনার আকাঙ্ক্ষার উৎসবে প্রয়োজনে এক প্রেয়সী মাত্র।

অষ্টাবক্র– তুমি শ্রেয়সী; আমি বিশ্বাস করি, তুমিই আমার আকাঙ্ক্ষার মহত্তমা তৃপ্তি। আমার এই বিশ্বাস মিথ্যা নয় বলেই আমার জীবনে তোমাকে আপন করে নেবার অধিকার আমি পেয়েছি।

পূর্ণশশিপ্রভার মত পূর্ণ এক বিশ্বাসের জ্যোৎস্না সুপ্রভার প্রীত নয়নের নীলিমায় উদ্ভাসিত হয়। সুপ্রভা বলে– আর কোন সন্দেহ নেই ঋষি। আমার প্রশ্নের সকল কুটিলতা ক্ষমা করুন। আমার মনে আর কোন প্রশ্ন নেই।

অষ্টাবক্র হাসে– কিন্তু আমার একটি প্রশ্ন আছে, সুপ্রভা।

সুপ্রভা– বলুন।

অষ্টাবক্র– তুমিও কি বিশ্বাস কর যে, এই জগতীতলের সকল যৌবনাঢ্য সুন্দরতার মধ্যে আমার কুঙ্কুমাঙ্কিত বক্ষ তোমারও বক্ষের ঐ বিপুলপীবর অভিলাষের শ্রেষ্ঠ তৃপ্তি? যদি জনি, তোমার মন এই ধরনীর যে-কোনও রমণীয়চ্ছবি মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হলেও শুধু আমারই আলিঙ্গনে তৃপ্ত হতে চায়, তবেই আমি তোমাকে আমার জীবনে আহ্বান করতে পারি, সুপ্রভা।

চকিত জ্যোৎস্নার মত হেসে ওঠে সুপ্রভার নয়ন। – চন্দ্রকিরণে বিমুগ্ধ হয়েও চক্রবাকী কখনও চন্দ্রমার বক্ষ অন্বেষণ করে না ঋষি, অন্বেষণ করে তার একান্তের সহচর সেই প্রিয়কান্ত চক্রবাকেরই কণ্ঠ। বিশ্বাস করুন ঋষি, আমিও এই সত্যে বিশ্বাস করি যে, আমার কেতকীমালিকার আরাধ্য আপনি, স্বপ্ন আপনি, শ্রেষ্ঠ তৃপ্তি আপনি। কিন্তু...।

সুপ্রভার কেতকীবাসিত জীবনের স্বপ্ন যেন এক অন্তহীন প্রতীক্ষার শঙ্কায় হঠাৎ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। কবে সমাপ্ত হবে এই ব্যাকুলতার অভিসার? কেতকীমালিকার তৃষ্ণা কি চিরকাল এই ভাবে এক রক্তপাষাণের বাধায় স্তব্ধ হয়ে থাকবে? কবে শেষ হবে কঠোর অঙ্গীকারে শাসিত এই বেদনাবহনের ব্রত?

–কিন্তু আর কতদিন? প্রশ্ন করেই সুপ্রভার অভিমান ভীরু যৌবনের বেদনা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে দুই নয়নের প্রান্তে দু'টি জলময় মায়া রচনা করে।

–আজই শেষ দিন সুপ্রভা। অষ্টাবক্রের কণ্ঠস্বরে উচ্ছল এক আশ্বাসের ভাষা হর্ষায়িত হয়। মনে পড়ে সুপ্রভার, পূর্ণ হয়েছে

বৎসরকাল। এবং মনে পড়তেই দুই নয়নপয়োবিন্দুর বেদনা জ্যোতিরুদ্ভাসিত রত্নকণিকার মত সুস্মিত হয়ে ওঠে। আজ এই প্রভাতে পিতা বদান্যের কাছে গিয়ে সুপ্রভার পাণি প্রার্থনা করবে সুপ্রভারই কেতকীমালিকার বাঞ্ছিত অষ্টাবক্র।

বদান্য বলেন– সুপ্রভার পাণি গ্রহণের অধিকার তোমার নেই।

অষ্টাবক্রের কণ্ঠস্বর হঠাৎ দুঃসহ বিস্ময়ে ব্যথিত হয়ে ওঠে– অঙ্গীকার পালন করেছি, এই সত্য জেনেও আমার প্রার্থনা কেন প্রত্যাখ্যান করছেন মহর্ষি?

বদান্য– নিতান্তই দেহসুখ লাভের অভিলাষে ব্যাকুল হয়েছে তোমাদের উভয়েরই মন, তাই তোমরা বিবাহিত হবার সংকল্প গ্রহণ করেছ।

অষ্টাবক্র– আপনার ধারণা মিথ্যা নয় মহর্ষি।

ঈষৎ শিহরিত ভ্রূকুটি সংযত করে বদান্য বলেন– এই অভিলাষকেই আসক্তি বলে।

অষ্টাবক্র– স্বীকার করি।

বদান্য– আসক্তি সত্য হলেই পরিণয় লাভের অধিকার সত্য হয় না। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরীক্ষা সহ্য করতে পারলেও আসক্তিকে কখনও প্রেম বলে স্বীকার করতে পারি না। মানব ও মানবীর জীবন বনেচর মৃগ ও মৃগীর জীবন নয়। আসক্তি দম্পতির মিলিত জীবনের প্রকৃত বন্ধনও নয়।

অষ্টাবক্র– প্রকৃত বন্ধনেরই প্রথম গ্রন্থি।

বদান্য– সে গ্রন্থি নিতান্তই ক্ষণভঙ্গুর।

অষ্টাবক্র– স্বীকার করি না।

বদান্য– আসক্তির নিষ্ঠা কয়েকটি মুহূর্তের পরীক্ষায় মিথ্যা হয়ে যায়, খর নিদাঘের কয়েকটির মুহূর্তে যেমন শুষ্ক হয়ে যায় ক্ষুদ্রজল গোষ্পদ।

অষ্টাবক্র– সুন্দর আসক্তি কখনও মিথ্যা হয় না।

বদান্য– কি বললে অষ্টাবক্র?

অষ্টাবক্র– ঠিকই বলেছি মহর্ষি। সুন্দর আসক্তি তপস্বীর সংকল্পের মত নিষ্ঠায় অবিচল। সে আসক্তি সদানীরা তটিনীর বক্ষের মত চিররসে উচ্ছল, নীলাকাশের ক্রোড়ের মত বিপুল মায়ায় অভিভূত। সে আসক্তি পরিচুম্বনচতুর বসন্ত দ্বিরেফের মনোবাসনার মত পুষ্পে পুষ্পে অবিরল তৃপ্তির উৎসব সন্ধান করে না। সে আসক্তি শুধু তার শ্রেয়সীকে, তার মহত্তমা তৃপ্তিকে সন্ধান করে। সূর্যসুখিনী জলনলিনীর কামনা কোনক্ষণেই দিক্‌ভ্রান্ত হয় না।

অষ্টাবক্রের মুখের দিকে জ্বালালিপ্ত দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকেন বদান্য। সহ্য করতে পারেন না অষ্টাবক্রের এই অবিরল হঠভাষণ। দেহজ কামনার চাঞ্চল্যে উদ্‌ভ্রান্ত এক যৌবনবানের আসক্তি যেন গর্বে আত্মহারা হয়েছে, এবং প্রলাপ বর্ষণ করে ঋষি-জীবনের এক পরম নীতিকে বিদ্রূপ করছে!

নীরব হয়ে বসে থাকেন, এবং ভ্রূকুটিখিন্ন ললাটের রুক্ষতাকে নিজেরই হস্তের রূঢ় স্পর্শে পিষ্ট করে চিন্তা করতে থাকে বদান্য, যেন তাঁর মনের গোপনের এক প্রতিজ্ঞার কঠিনতা স্পর্শ করে দেখছেন। না, এই তরুণ ঋষির চিন্তার ভয়ংকর ভুল এবং সেই ভুলের দর্প আর-এক পরীক্ষায় চূর্ণ করে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কী রূঢ় বিশ্বাস! মানব ও মানবীর জীবনে পতি-পত্নী সম্বন্ধের প্রকৃত বন্ধনের গ্রন্থি হল আসক্তি! হঠবিশ্বাসের দুঃসাহসে মুখর হয়ে উঠেছে চটুলচিন্তক এক ঋষিযুবা, এবং সেই দুঃসাহসকেই প্রেমাভিলাসের চেয়েও পরতর আকাঙ্ক্ষা বলে বিশ্বাস করেছে তাঁরই কন্যা সুপ্রভা। মিথ্যা বিশ্বাসে উদ্‌ভাসিত এই অন্ধতা দগ্ধ না করে দিলে জীবনে প্রকৃতি প্রেমের পথ ওরা কখনই চিনে নিতে পারবে না।

আর-এক পরীক্ষা, কিরাতরচিত লতাজালের মত নয়নরম্য ও মায়াবিকরাল এক পরীক্ষা। সে পরীক্ষাকে স্বয়ং মহর্ষি বদান্যই বহুদিন আগে আয়োজিত করে রেখেছেন। অষ্টাবক্রের সুন্দর আসক্তির উদ্ধত নিষ্ঠা চূর্ণ করবার জন্য দূরান্তরের এক নিভৃতে রচিত প্রবল ও প্রগল্‌ভ এক ছলনা। কেলিকুতুকিনী প্রমদার কটাক্ষে শিহরিত, অবিধিবশা অবধুর লোল প্রলোভে লসিত, অনধীনা স্বৈরিণীর শীৎকারে শ্বসিত এক জগৎ, যে জগতের একটি মুহূর্তের উদ্দামতার কাছে নতশির হয়ে লুটিয়ে পড়বে যে-কোন মানবের আসক্তির নিষ্ঠা।

এখান হতে অনেক দূরে, নগাধিপ হিমবানের তুহিনধবল শৈলপ্রদেশ ও রত্নাধীপ কুবেরের অলকাপুরীর অলকাবলিমোহিত মহীধরমালারও উত্তরে, মেঘসন্নিভ এক রমণীয় নীলবনে বাস করে প্রবীণা উদীচী। শুক্লাম্বরা, বিবিধ রত্নাভরণে ভূষিতা, এবং অপাররঙ্গপারঙ্গমা সেই বর্ষীয়সীর নিবিড় ভ্রূভঙ্গ যেন মদনমনোন্মদ বিভ্রম ধারণ করে রয়েছে। উত্তর দিগ্‌ভূমির অনল অনিল ও সলিল হতে উদ্ভূত সকল মোহ প্রতিপালনের জন্য এই নীলবনে অধিষ্ঠান গ্রহণ করেছে স্বতন্ত্রা স্ববশা ও চিরকন্যকা উদীচী। সেই নীলবনের পল্লবমর্মরে আসক্তির সংগীত, বিহঙ্গের কলরবে আসঙ্গবাসনার আহ্বান; যেন অবিরল লিপ্সার নিঃশ্বাসে উচ্ছ্বসিত দ্বিতীয় এক অনঙ্গনিকেতন পথিকনয়নে মোহ সঞ্চারের জন্য মেঘসন্নিভ নীলবনের রূপ ধারণ করে রয়েছে।

প্রবীণা উদীচী মহর্ষি বদান্যের অনুরোধ সানন্দচিত্তে গ্রহণ করেছে। শুনেছে উদীচী, তরুণ ঋষি অষ্টাবক্র বদান্যতনয়া সুপ্রভাকে তার আকাঙ্ক্ষার শ্রেয়সী বলে বিশ্বাস করে। আসক্তির একনিষ্ঠা সস্পর্ধকণ্ঠে ঘোষণা করেছে তরুণ এক ঋষি, শুনে হাস্য সংবরণ করতে পারেনি উদীচী। সেই ঋষির কামনাকে একটি মদবিভ্রমের আঘাতে নিষ্ঠাহীন করে দিতে কতক্ষণ? বহুদিন থেকে প্রস্তুত হয়েই আছে এবং প্রতীক্ষায় দিনযাপন করছে নীলবনচারিণী উদীচী। কবে আসবে অষ্টাবক্র? সেই ভুল স্বপ্নের স্তাবক অষ্টাবক্র?

দূর উত্তরে গগনবলয়ের দিকে দৃকপাত করে মহর্ষি বদান্য যেন তাঁর সংকল্পিত পরীক্ষার ভয়ংকরতাকে দেখছিলেন। একবার সেই পরীক্ষার সম্মুখীন হলে আর ফিরে আসবে না অষ্টাবক্র। উদীচীর নীলবনঘন বিভ্রমনিলয়ের মত্তসুখের অবিরল আলিঙ্গনে চিরকালের নির্বাসন লাভ করবে এই গর্বিত ঋষিযুবার আসক্তি। এবং মূঢ়া কন্যা সুপ্রভাও এই সত্য উপলব্ধি করবে যে, আসক্তি খলশিখ অনলের মত নিজের নিষ্ঠা নিজেই দগ্ধ করে। আসক্তিকে জীবনের এক দিব্য প্রেমাভরণ বলে মনে করে যে ভুল করেছে সুপ্রভা, ভেঙ্গে যাবে সেই ভুল।

দুরান্তরের নভঃপটে কুবেরগিরির ধবলিত শিকর আপন শোভায় উদ্ধত হয়ে রয়েছে, কিন্তু তারও চেয়ে যেন বেশি উদ্ধত তরুণ অষ্টাবক্রের মস্তকে ফুল্লমল্লিকামোদে পুলকিত ধম্মিল্লের শোভা। অষ্টাবক্রের দিকে একবার সহেল ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করে উদ্ধত এক আসক্তির প্রতি যেন নীরবে ধিক্কার বর্ষণ করলেন বদান্য।

বদান্য বলেন– আমার একটি প্রস্তাব আছে, অষ্টাবক্র।

অষ্টাবক্র– আদেশ করুন, মহর্ষি।

বদান্য– কুবেরগিরির উত্তরে রমণীয় এক নীলবনে বাস করেন প্রবীণা উদীচী, চিরকন্যকা উদীচী। আমার ইচ্ছা, তুমি সেই নীলবনে উদীচীর নিলয়ে কয়েকটি দিবস ও রাত্রি যাপন করে ফিরে এস।

অষ্টাবক্র– তারপর?

বদান্য– যে-দিনের যে-ক্ষণে তুমি ফিরে আসবে, সে-দিনেরই সে-ক্ষণে আমি কন্যা সুপ্রভাকে তোমার কাছে সম্প্রদান করব।

অষ্টাবক্রের নয়ন চকিত হর্ষে উজ্জ্বল হয়– আশীর্বাদ করুন।

বদান্য– এখনই আশীর্বাদ আশা কর কেন অষ্টাবক্র? সম্প্রদত্তা সুপ্রভার পরিণয়মাল্য গ্রহণ করে তোমরা দুজনে যে-ক্ষণে আমার সম্মুখে দাঁড়াবে, সেই ক্ষণে তোমাদের মিলিত জীবনকে আমি আশীর্বাদ করব, তার আগে নয়।

অষ্টাবক্র শ্রদ্ধাভিভূতস্বরে নিবেদন করে। – স্বীকার করি মহর্ষি, আপনার আশীর্বাদ গ্রহণ করে সেই ক্ষণে ধন্য হবে আমাদের জীবনের পরিণয়। একটি অনুরোধ, এখনি আপনার আশীর্বাদ দান না করুন, একটি প্রার্থিত বরদান করুন।

বদান্য– আমার কাছ থেকে এই মুহূর্তে কোনও শুভেচ্ছা আশা করো না অষ্টাবক্র, সেই অধিকার এখনও তুমি পাওনি। যে-ক্ষণে আমার আশীর্বাদ লাভ করবে তোমাদের পরিণীত জীবন, সেই ক্ষণে তোমাদের মিলিত জীবনের প্রার্থিত বর দান করব; তার আগে নয়।

অষ্টাবক্র– তথাস্তু মহর্ষি, আপনার এই প্রতিশ্রুতি আমার আজিকার যাত্রাপথের মাঙ্গল্য।

উত্তর দিগ্‌দেশের অভিমুখে চলে গেল হৃষ্টমানস অষ্টাবক্র। মহর্ষি বদান্যের মনে হয়, এক যৌবনবানের গর্বান্ধ আসক্তি নূতন এক মূঢ়তার আনন্দে চঞ্চলিত হয়ে চলে যাচ্ছে। এক মূর্খ শিশুসর্পের অহংকার নিজ বিষের জ্বালায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে নকুল-বিবরের অভিমুখে এগিয়ে চলেছে। আর ফিরে আসবে না অষ্টাবক্র। আশ্বস্ত হয়েছেন বদান্য।

কিন্তু তারপর? আশ্রমের প্রাঙ্গণের উপর অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন বদান্য, যেন তাঁর তাপিত চিন্তার ক্লেশগুলি আর-একটি আশ্বাসময় ছায়া খুঁজছে। মূঢ়া কন্যা সুপ্রভার পরিণামের কথা চিন্তা করেন বদান্য। নয়নমোহে উদ্‌ভ্রান্তা ঐ কেতকীরেণুকুতুকিনী কুমারীও যে তার আকাঙ্ক্ষার ভুল বুঝতে পারে না। কী হবে ওর জীবনের পরিণাম?

দেখতে পেলেন বদান্য, লতাগৃহের দ্বারোপান্তে দাঁড়িয়ে নববসন্তাগমে পুলকিত বনস্থলীর দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে সুপ্রভা। শাল রসাল ও শাল্মলীর কান্তিসমারোহের দিকে তাকিয়ে একটি তৃষ্ণা যেন সুস্মিত হয়ে রয়েছে। হ্যাঁ, উপায় আছে, মহর্ষি বদান্য দুঃখিতচিত্তে তাঁর চিন্তার মধ্যে আর-এক পরিকল্পনা আবিষ্কার করেন। তৃষ্ণাচারিণী নারীর সম্মুখে এমনই এক শোভাময় নয়নোৎসব এনে দিতে হবে। অন্য কোন উপায় নেই।

চলেছে অষ্টাবক্র। সিদ্ধচারণসেবিত হিমালয়ে উপস্থিত হয়ে ধর্মদায়িনী বাহুদ নদীর পুতসলিলে স্নান করে অষ্টাবক্র। তারপর ধনপতি কুবেরের কাঞ্চনময় পুরদ্বারে এসে দাঁড়ায়। গন্ধর্বের বাদিত্রনিঃস্বন আর নৃত্যপরা অপ্সরা অবিরল মঞ্জীরশিঞ্জনে মুখরিত যক্ষভবনের সমাদর গ্রহণ করে। তারপর কৈলাস মন্দর ও সুমেরু, একের পর এক সমুদয় পর্বপ্রদেশ অতিক্রম করে উত্তর দিগ ভূমির প্রান্তে এসে দাঁড়ায়। বিস্মিত হয়ে দেখতে পায় অষ্টাবক্র, অদূরে এক নীলচ্ছায়াঘন কাননে স্ফুট কুসুমের উৎসব যেন মত্ত হয়ে বিচিত্র বর্ণরাগচ্ছটা উৎসারিত করছে। বিহগকুজনে কম্পিত হয়েও বায়ু যেন এক যৌবনময় বনলোকের নাভিসুরভির ভার ধারণ করে মন্থর হয়ে রয়েছে।

কাননের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং অরণ্যক্রোড়ের নিভৃতে কুবেরনিলয়ের চেয়েও দীপ্ততর রত্নপ্রভায় ভাস্বর এক নিকেতন দেখতে পেয়ে আরও বিস্মিত হয় অষ্টাবক্র। নিকেতনের সম্মুখে মণিভূমিনিখাত সরোবর। পার্শ্বদেশে মন্দাকিনীর কলনিনাদিত প্রবাহের তটরেখা মন্দারকুসুমে অলংকৃত। স্তব্ধ নিকেতনের প্রবেশপথে মুক্তাজালময় তোরণের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত অষ্টাবক্র ডাক দেয়– আমি অতিথি।

অষ্টাবক্রের সেই আহ্বানে উদ্দীপ্ত ফণিমণিরাগের মত চমকে উঠে সেই অদ্ভুত নিকেতনের প্রভাময় শোভা। শুনতে পায় অষ্টাবক্র, নিকেতনের নীরবতা হতে হঠাৎ ঝংকার দিয়ে জেগে উঠেছে সুপ্তিনিবেশ কাঞ্চী কেয়ুর আর মঞ্জীরের উল্লাস। অকস্মাৎ, তন্বী তড়িল্লতার চেয়েও চকিতলাস্যচপলা, মন্দাকিনীর জলমালা ভঙ্গিমার চেয়েও তরলতর তনুভঙ্গে ছন্দায়িতা, সান্দ্রসিন্দুররেণুময়ী নবোষার চেয়েও সুনিবিড়স্মিতা সাতটি যৌবনবতী দেহিনী যেন অলক্ষ্য এক স্মরতূণীরের ভিতর হতে হঠাৎ উৎক্ষিপ্ত হয়ে সাতটি পুষ্পবিশিখের মত অষ্টাবক্রের বুকের কাছে এসে লুটিয়ে পড়ে।

বিস্ময়ে বিমুগ্ধ অষ্টাবক্রের দুই নেত্রে বিচিত্র এক সুখের বর্ণালী নর্তিত হতে থাকে। মায়ানিকেতনবাসিনী সাতটি সুযৌবনা যেন সাতটি অঙ্গমাধুরীর অধীশ্বরীর মত অষ্টাবক্রের বিস্ময়কে ধন্য করবার জন্য সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। অপলক নয়নে দেখতে থাকে অষ্টাবক্র।

ক্ষামকটিতটে ক্ষীণনিনাদিনী কিঙ্কিনী যেন মণিত রণিত করে, নিধুবনোৎসুকা কে এই বণিতা?

প্রিয় প্রাগল্‌ভ্যে অভীরু ভ্রূলতা বিলোল লালসা হানে; পীনপয়োধরভারে অলসা, কে এই ললনা সুরমা?

বদন যেন সুষমাসদন, মদয়িত স্মরামোদনিদান, বিবশ বাসনা হানে; রাকাশশিমুখী রুচিরময়ী কে এই নারী?

অপাঙ্গে ভঙ্গিমা ঝরে, অনঙ্গে উন্মাদ করে, আসঙ্গ আহবে উন্মুখিনী; রভসরঙ্গিনী কে এই অঙ্গনা?

কিবা গ্রীবাগৌরিমা, সিতমলয়জে অভিরামা, অনুপ রূপের অনলে অনল গোপন করে; কে এই রামা?

ক্ষণ ঈক্ষণে বহ্নি শিহরে, রাতুল অধরে তনুশোণিমার স্ফার জ্যোৎস্না স্ফুরে মুনিমনোবনে প্রালোয়কারিণী কে এই কামিনী?

অশাসিত যৌবন অশেষ উল্লাসে লসিত করে নিঃশ্বাস, নীবিবন্ধবিহীনা বিশ্লথবেণী ব্রীড়াবিরহিতা তনুকা, কে এই ভামিনী?

তরুণ ঋষির নয়নে বিস্ময়! যেন বিগলিত ইন্দ্রধনুর মায়ানুরাগে রঞ্জিত কাদম্বিনীর সুষমা ভূতলে লুটিয়ে পড়েছে, এবং সেই সঙ্গে সাতটি খরবাসনার বিদ্যুৎ। লীলাভঙ্গে চঞ্চল সেই সাত রূপসীর অবয়বশোভার দিকে তাকিয়ে অষ্টাবক্রের বিচলিত বক্ষের সমীর মুগ্ধ হয়ে যায়।

মণিবলয়ের চকিত ঝংকারে তরুণ ঋষির দুই উৎসুক শ্রবণ বন্দিত করে সাত সুন্দরী অভিবাদন জানায়। – উত্তর দিগ্‌ভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবী উদীচীর এই নিকেতনে প্রবেশ করুন, বরেণ্য।

বংশীনিনাদে মোহিত তরুণ কুরঙ্গের মত দুর্নিবার কৌতূহলে অভিভূত অষ্টাবক্র সাত সুন্দরীর মঞ্জীরিত চরণের ধ্বনি অনুসরণ করে নিকেতনের ভিতরে প্রবেশ করে, এবং দেখতে পায়, রত্নপর্যঙ্কের উপরে সমাসীন হয়ে রয়েছেন শুক্লাম্বরা এক বর্ষীয়সী। সীমন্তে সিন্দুরের রেখা নেই, কিন্তু দেহ বিবিধ হেমময় আভরণে বিভূষিত। দেখে মনে হয়, প্রবীণার আভরণের মধ্যে জগতের সকল কলধ্বনির মুখরতা যেন এক উৎসবের প্রতীক্ষায় উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছে।

বর্ষীয়সী বলে– আমি চিরকুমারী উদীচী।

অষ্টাবক্র– আমি ঋষি অষ্টাবক্র, মহর্ষি বদান্যের আদেশে আপনার ভবনের অতিথি হতে চাই।

উদীচী– আমার সৌভাগ্য। আমি ধন্য হব ঋষি, যদি এই ভবনের অতিথি হয়ে আপনি আমার সমাদর গ্রহণ করেন।

অষ্টাবক্র– গ্রহণ করতে চাই।

উদীচী– আমি প্রীত হব ঋষি, যদি আমার সমাদরে আপনি প্রীতি লাভ করেন।

অষ্টাবক্র– প্রীতি লাভ করতে ইচ্ছা করি, উত্তরদিগ্‌দেবী।

গ্রীবাভঙ্গে ঝংকৃত হয়ে, স্মিতায়িত অধরের স্পন্দন মুক্তাপঙ্‌ক্তিরও চেয়ে খরোজ্জ্বল দশনরেখার মৃদু দংশনে আহত করে উদীচী বলে। – আদেশ করুন ঋষি। বলুন, কি চায় আপনার ঐ সুন্দর নয়নের বিস্ময়? আপনার প্রীতি সম্পাদনের জন্য উত্তরদিগ্‌ভূমির সকল প্রীতির সুধাসাররসিতা উদীচী আপনারই কণ্ঠস্বরের একটি নির্দেশ শুধু শুনতে চায়।

অষ্টাবক্রের নিমেষবিহীন দুই নেত্রের নিবিড় বিস্ময় অকস্মাৎ চঞ্চল হয়। নারীর দুই ভ্রূবল্লী যেন দু'টি বিলোল অলজ্জা, আসক্তির এক অভিনব ভঙ্গিমনোহর রূপচ্ছবি। বর্ষীয়সীর সেই ভ্রূভঙ্গীর মধ্যে যেন কোদি মদিরাক্ষীর কটাক্ষপীযূষ পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে।

নীরব অষ্টাবক্রের দুই নেত্রের কৌতূহল চমকে দিয়ে প্রশ্ন করে উদীচী– বলুন ঋষি, কি চায় আপনার বক্ষের ঐ ঝঞ্ঝায়িত নিঃশ্বাস, পুলকাঞ্চিত কপোল আর অধীর অধরসন্ধি?

অষ্টাবক্র বলে–ক্ষণকালের মত আপনার সান্নিধ্য চাই।

বিভ্রমসঞ্চারিণী বর্ষীয়সীর ভ্রূকৌতুকে যেন এক স্বপ্নের আনন্দ বিপুল হর্ষে উৎসারিত হয়। উচ্চকিত স্বরে প্রশ্ন করে উদীচী। – শুধু আমারই সান্নিধ্য?

অষ্টাবক্র– হ্যাঁ, চিরকুমারী।

সেই মুহূর্তে সাত সুন্দরীর চরণমঞ্জীরের ঝংকারিত ধ্বনিও যেন ব্যাধবধূচিত্তের উল্লাসের মত হর্ষায়িত হয়। অষ্টাবক্রের অভিভূত মুখচ্ছবির দিকে, যেন এক পাশবদ্ধ বনকুরঙ্গের অসহায় মূর্তির দিকে সহেলচ্ছুরিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হেসে উঠে উদীচীর অনুচারিণী সাত সুন্দরী, পর মুহূর্তে কক্ষ হতে চলে যায়।

মণিজ্যোতিহ্বিল মায়াভবনের একটি একান্ত, যেন জগতের সকল লোকলোচনের শাসন হতে মুক্ত একটি নির্ভৃত, এবং সেই নিভৃতের অন্তরে মীনকেতুর নূতন কেতনের মত বিজয়াবহ আনন্দে চঞ্চল হয়ে ওঠে লীলাসঙ্গচতুরা এক বর্ষীয়সীর মসিনিবিড় ভ্রূপতাকা। উদ্‌ভ্রান্তির বন্ধনে রচিত একটি সান্নিধ্য। শুধু অষ্টাবক্র ও উদীচী, আর কেউ নয়। এই নিভৃতের আকাঙ্ক্ষাকে কোন প্রশ্নের স্পর্শে ব্যথিত করতে পারে, এমন কোন ছায়াও এখানে নেই।

উদীচী বলে– আমার সান্নিধ্য পেয়েছেন ঋষি, এইবার বলুন কি অভিলাষে বিহ্বল হয়েছে আপনার কুঙ্কুমপিঞ্জরিত বক্ষের স্বপ্নভার?

অকস্মাৎ, যেন নিজেরই বক্ষের তপ্ত নিঃশ্বাসের আঘাতে চঞ্চল হয়ে পাবক-তাপে উত্তাপিত শিশুভুজঙ্গের মত ব্যথিত হয়ে নিবেদন করে অষ্টাবক্র। – স্নানোদক চাই।

কলোচ্ছলা স্রোতস্বতীর মত তরলহাস্যে শিহরিত হয় উদীচীর কণ্ঠস্বর। – স্নানোদক নিঃশ্বাসের ঝঞ্ঝা, স্ফুর অধরের সুশোণ রৌদ্র, আর বহু কেতকীর গন্ধে পীড়িত ভুজভুজঙ্গের হিল্লোল?

নীলবনের ছায়াঘন রহস্যের কুহরে লুক্কায়িত সেই মণিময় মায়াভবনের বাহিরে নীড়াগত বিহগের ক্লান্ত কূজনস্বর শোনা যায় সন্ধ্যা হয়েছে অষ্টাবক্রের কণ্ঠস্বর শিহরিত হয়ে আবেদন করে। – সন্ধ্যা পূজার জন্য আসন চাই।

হেসে ওঠে ঝংকারময়ী উদীচী– এই রত্নপর্যঙ্কে উপবেশন করুন ঋষি।

চমকে ওঠে অষ্টাবক্র, এবং অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকে। উদীচী বলে– এই তো যথার্থ আসন। উত্তর দিগ্‌ভূমির নীলবনের ছায়ায় আবৃত এই সুখময় জগতে সন্ধ্যাবন্দনার জন্য কর্কশ কুশতৃণে রচিত আসনের প্রয়োজন হয় না ঋষি। এই জগতের সন্ধ্যাও মন্ত্র স্তব আর জপমালার বন্দিত হতে চায় না।

রত্নপর্যঙ্কের উপর উপবেশন করে অষ্টাবক্র আরও সুন্দর হয়ে ওঠে উদীচীর দুই ভ্রূবল্লীর বিলোল অলজ্জা। বর্ষীয়সী উদীচীর কজ্জলমসিমদির দৃষ্টিও নিবিড় সমাদন বর্ষণ করে অষ্টাবক্রের বিচলিত চিত্তের তৃষ্ণাকে আশ্বাস দান করিতে থাকে।

বিমুগ্ধ অষ্টাবক্র। নীলবনঘন অভিনব লালসার জগতে এক মায়াভবনের মণিপ্রদীপের প্রখর দ্যুতিনখরের স্পর্শে যেন উচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে অষ্টাবক্রের। স্মরণপথের সব আলো-ছায়া মনেও পড়ে না অষ্টাবক্রের, ত্রিলোকের কোন উপবনের লতাচ্ছায়ে সুযৌবনা এক অনুরাগিণী নারীর অভিলাষ অষ্টাবক্রের জন্য নয়নে কোন প্রভাতবেলায় কোন বননিভৃতের একান্তে তরুণ তপনের আলোকে শ্রেয়সীর যৌবনগরীয়সী কান্তির কল্লোলিত সুষমাকে মহত্তমা তৃপ্তি বলে চিনতে পেরেছিল অষ্টাবক্র। অষ্টাবক্রের দুই চক্ষু হতে কেতকীরেণুবাসিত এক ভঙ্গুর স্বপ্ন এই বর্ষীয়সী লালসাময়ীর মদির ভ্রূলাস্যের একটি কঠোর আঘাতে চূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

আর একবার চমকে ওঠে অষ্টাবক্র। উল্লাসচপল অথচ নিবিড়কোমল এবং হর্ষায়িত এক স্পর্শের উৎসব হঠাৎ এসে অষ্টাবক্রের বুকের উপর লুটিয়ে পড়েছে। উদীচীর উদ্যত দুই বাহু অকস্মাৎ মত্ত হয়ে আভরণমুখর মাল্যের মত ঝংকার দিয়ে কঠিন আলিঙ্গন গ্রহণ করেছে অষ্টাবক্রের কুঙ্কুমবাসিত কণ্ঠ, যেন গরল-প্রগল্‌ভা ব্যালবধূর সন্তাপিত দেহ চন্দনতরুর দেহ জড়িয়ে ধরেছে। অষ্টাবক্রের দুই চক্ষুর বিবশ বিস্ময়ে সম্মুখে শুধু ভাসতে থাকে প্রবীণা কেলিকলানিপুণার মসিমদির ভ্রূভঙ্গীর বিলোল অলজ্জা।

উদীচী বলে– বল ঋষি, সকল কুণ্ঠা অপহত করে মুক্তকণ্ঠে বল, উত্তর দিগ্‌ভূমির সুন্দর সন্ধ্যার এই মধুরক্ষণে কী চায় তোমার যৌবনাঞ্চিত জীবনের আকাঙ্ক্ষা?

অষ্টাবক্র–তৃপ্তি চায়।

উদীচী–সে তৃপ্তি এখানেই আছে। এই রত্নপর্যঙ্কের পুষ্পশয্যায় কোন নিশীথবিহ্বলতার বক্ষে সে তৃপ্তিকে অবশ্যই দেখতে পাবে, প্রতীক্ষায় থাক, ঋষি।

অষ্টাবক্র–প্রতীক্ষায় থাকতে পারি, কিন্তু প্রতিশ্রুতি দাও, আমার আজিকার আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিকে আমার চক্ষুর সম্মুখে এনে দেবে তুমি।

কুটিল হাস্য বিচ্ছুরিত করে উদীচীর অধরপুট শিহরিত হতে থাকে। – প্রতিশ্রুতি দিলাম ঋষি। কিন্তু শপথ করে বল, তোমার আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিকে সম্মুখে পেলে তাকে জীবনের চিরসহচারী করে নেবে।

অষ্টাবক্র– নেব, শপথ করে বলছি।

দূর উত্তরের দিগ্বলয়ে অলক বলাহকে বিভ্রাজিত আকাশপথের দিকে তাকিয়ে মহর্ষি বদান্যের দুই চক্ষুর আক্ষেপ হঠাৎ হাস্যায়িত হয়। সুন্দর আসক্তির গর্বে উদ্ধত সেই অষ্টাবক্র আর ফিরে এল

না। অনুমান করতে পারেন বদান্য, এতদিনে সেই হঠভাষা ঋষির সুখকামুক অভিলাষের একনিষ্ঠা এক কজ্জালমসিমদিরার দ্রুভঙ্গের গরলে প্রলিপ্ত হয়ে নীলবনের একান্তে নির্বাসন লাভ করেছে।

দিবসের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিবস, একের পর এক বহু দিবস-রাত্রি অতীত হয়েছে। বহু কুহেলিকালসা সন্ধ্যার পুলকবন্ধুর বনদ্রুমদেহ হতে শিথিল মঞ্জরীর ভার ভুতলে লুটিয়ে পড়েছে। যেমন রাকেন্দুবন্দিত রজনীর, তেমনি তরুণ তপনের নন্দিত প্রভাতের রশ্মিরাশি কলস্বনা স্রোতস্বিনীর দুই তটের শিশিরসিক্ত তৃণভূমির বক্ষে হেসেছে। কিন্তু সেই সুন্দর আসক্তির মানুষ, সুপ্রভাব কেতকীমালিকানার স্বপ্ন সেই অষ্টাবক্র সেই বনপথে আর আসে না। শুধু আসে আর ফিরে যায় সুপ্রভা। বৃথা প্রতীক্ষায় ব্যথিত হয় কেতকীমালিকার সুরভি। কোথায় গেল, গেল, কেন গেল এবং কবে ফিরে আসবে সুপ্রভাব কামনার বাঞ্ছিত সেই কুঙ্কুমিততনু ঋষি, সুকুমার কল্পনাও করতে পারে না সুপ্রভা, এবং বুঝতেও পারে না, সেই একনিষ্ঠ অভিলাস কেমন করে তারই শ্রেয়সীর অধরসুষমা না দেখতে পেয়েও শান্তচিত্তে দূরে সরে থাকতে পারে?

বদান্যের তপোবনস্থলীর উপান্তে এক লতাবৃত কুটীরের নিভৃতে মৃদুদীপশিখার দিকে তাকিয়ে বিহগের সান্ধ্য কূজন শোনে সুপ্রভা। কেতকীমালিকার সুরভি সুপ্রভার চিন্তাপীড়িত নয়নের মত জাগরণে যামিনী যাপন করে। প্রিয়বিচ্ছেদভীরু চক্রবাকীর মত চকিতশ্বসিত বক্ষের সন্দেহ শান্ত করবার জন্য কুটীরের দ্বারোপান্তে দাঁড়িয়ে সুপ্রভার সমগ্র অন্তর যেন উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু বৃথা; কোন প্রিয় পদধ্বনি, কোন গুঞ্জন, মৃদুতম কোন মর্মরও শোনা যায় না। কুঙ্কুমাঙ্কিত কোন বক্ষের বিহ্বল নিঃশ্বাস বদান্যতনয়ার কবরীসৌরভ অন্বেষণের জন্য মৃদুল নিঃস্বন সঞ্চারিত করে লতাগৃহের দিকে আসে না।

অষ্টাবক্রের রহস্যময় অন্তর্ধান সুপ্রভার সকলক্ষণের ভাবনার আকাশে যেন এক মেঘদুরতা ঘনিয়ে রেখেছে। সবই সহ্য করতে পারে সুপ্রভা শুধু সহ্য করতে পারে না একটি সংশয়। তীক্ষ্ণমুখ কুশসায়কের মত সেই সংশয় যখন সুপ্রভার কল্পনাকে বিদ্ধ করে, তখনই সবচেয়ে বেশি বিচলিত হয় সুপ্রভার অন্তরের প্রশান্তি। মনে হয়, সুন্দর অথচ কপট এক আসক্তির হঠভার্ষিত প্রতিশ্রুতি নিষ্ঠুর বিদ্রূপে সুপ্রভার কণ্ঠের কেতকীকে তুচ্ছ করে চলে গিয়েছে। নয়নোপান্তে অদ্ভুত এক জ্বালাময় সিক্ততা অনুভব করে সুপ্রভা। মনে হয় অশ্রু নয়, তারই যৌবনের প্রথম অনুরোগে উদ্দীপ্ত বিশ্বাস যেন নিষ্ঠাহীন এক পৌরুষের চটুল কৌতূকলীলার আঘাতে মথিত হয়ে রুধিরবিন্দুর মত ফুটে উঠেছে।

এইভাবে প্রতিক্ষণ সংশয়খিন্ন ভাবনার ভার নীরবে সহ্য করে, আর সুপ্তিহীন নয়নের কৌতূহল নিয়ে প্রতি নিশান্তের আকাশে ও বনতরুশিরে নবোষার অরুণিত সঞ্চার লক্ষ্য করে সুপ্রভা। দীপ নিভিয়ে দেয়, স্নান সমাপন করে। পুষ্পে ও পরাগে প্রসাধিত তনুতে যেন এক নূতন আশা আবেশ ভরে ওঠে। বননিভৃতের রক্তপাষাণের নিকটে এসে দাঁড়ায় সুপ্রভা। দেখতে পায়, রক্তপাষাণের বক্ষের উপর কোমল দ্রুমমঞ্জরীর পুঞ্জ ছিন্নভিন্ন হয়ে রয়েছে, যেন পদাঘাতে পীড়িত এক বাসকশয্যা। আসেনি অষ্টাবক্র, কে জানে, ত্রিজগতের কোন্ বনলোকের নিভৃতে কোন্ স্রোতস্বিনীর কাছে এখন তৃষ্ণার্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই আসক্তির পুরুষ অষ্টাবক্র?

চলে যায় সুপ্রভা, এবং এক নিশান্তে লতাগৃহের দীপ নিভিয়ে দিয়েও চুপ করে বসে থাকে। ব্যর্থ অভিসারে শুধু চরণ ক্লান্ত করে আর লাভ কী? অতনুতাপিত তনুর দুর্ধর তৃষ্ণা অধরে ধারণ করে ঐ রক্তপাষাণের কাছে ছুটে যাবার আর কিবা প্রয়োজন? সুপ্রভাব যেন কল্পনায় তার হতমান আকাঙ্ক্ষার শোণিত বেদনার দিকে অমেয় মায়ায় অভিভূত নয়নের করুণা নিয়ে তাকিয়ে থাকে। মনে হয়, ব্যর্থ অভিসারে আহত তার যৌবনময় জীবন যেন অধঃপতিত জ্যোৎস্নার মত ধূলিপুঞ্জের উপর পড়ে রয়েছে।

এই অবহেলার ধূলিময় মালিন্য হতে মুক্ত হবার জন্য হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে সুপ্রভার মন। আকাশের শেষ তারকা নিভেছে, বনতরুশিরে প্রভাময় ঊষাভাস দেখা দিয়েছে। স্নিগ্ধ স্নানোদকের জন্য অস্থির হয়ে ওঠে সুপ্রভার তাপিত দেহের তৃষ্ণা। লতাগৃহ হতে বের হয়ে আশ্রমতড়াগের নিকটে এসে দাঁড়ায় সুপ্রভাব।

তড়াগসলিলে দেহ নিমজ্জিত করে স্নান করে সুপ্রভা সুতনুকা সুপ্রভার অনাবরণ অঙ্গশোভা যেন মৃণালবন্ধচ্যুত স্ফুট কোকনদের মত সলিলের শীতল সিক্ততায় লিপ্ত হয়ে তড়াগের বক্ষে হিল্লোলিত হতে থাকে। অকস্মাৎ চমকে ওঠে সুপ্রভাব, বিস্ময়ে বিকশিত নূতন এক কৌতূহল দুই নেত্রে অপলক হয়ে তড়গেতটের পুষ্পময় বীথি কার দিকে তাকিয়ে থাকে।

অরুণিত তটবীথিকায় অপরিচিত। পথিকের মূর্তি দেখা যায়। একজন নয়, দুই জনও অনেক জন। একে একে আসে আর আশ্রমস্থলীর প্রাঙ্গণের দিকে চলে যায়। সুন্দরদর্শন এক এক জন ঋষিযুবা। দেখতে পায় সুপ্রভাব, কোন আগন্তুকের কপোলমণ্ডল যেন উষালোকে লিপ্ত ঐ পূর্বাকাশের মত নবীনযৌবনরাগে উদ্ভাসিত। কোন জনের বিশাল বক্ষঃপটে রক্তচন্দনের আলিম্পন, যেন পুষ্পহাস শাল্মলীর কান্তিচ্ছটা রম্যতর আশ্রয় লাভের লোভে সেই উন্নতকায় ঋষিযুবার বক্ষের উপর এসে লুটিয়ে পড়েছে। ইন্দীবরবিনিন্দিত দুই নীলনিবিড় নয়নে ক্ষুব্র কামনার কল্লোল, কে ঐ তরুণ ঋষি? কুসুমস্রগাসক্ত কণ্ঠ আর স্মিত দশনদ্যুতি নিয়ে চলে যায়, কে ঐ পুরুষপ্রবর, ঋতুরাজনীরাজিত রতিরাজোপম সুকান্ত?

সলিলহীন দেহের স্নানোৎসুক চাঞ্চল্য সংযত করে তড়াগকমলের মৃণাল আলিঙ্গন করে সুপ্রভা, যেন হিল্লোলিত কোকনদের প্রাণ এক আকস্মিক বিস্ময়ে বিবশ হয়ে গিয়েছিল। কমলবনের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কমলাননা ঋষিকুমারী যেন সূর্যালোকিত এক স্বপ্নের দিকে তাকিয়ে আছে। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে এক তৃষ্ণার কুসুম। কিংবা, সুপ্রভার সিক্তোজ্জ্বল ঐ দুই আভময় নয়ন যেন যামিনীচারিণী এক চক্রবাকীর চক্ষু চন্দ্রালোকে লিপ্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে তাঁর নিজেরই বক্ষের উষ্ণশ্বাসময় অথচ মধুরায়িত এক বেদনার উৎসব লক্ষ্য করছে। দুঃসহ এই বেদনা স্ফুট কোকনদের সৌরভময় আকাঙ্ক্ষার বক্ষে তৃষ্ণাকুল ঝঞ্ঝানিলের নিঃস্বন সঞ্চারিত হয়েছে।

অনেকক্ষণ সুপ্রভার দেহ-মন যেন এক অভিনব স্বপ্নের সলিলে নিমজ্জিত হয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ দেখতে পায় সুপ্রভা, তটবীথিকা জনহীন হয়ে গিয়েছে। নূতন এক বিস্ময় ও বিমুগ্ধতার ভার বক্ষে বহন করে লতাগৃহের দিকে ফিরে যায় সুপ্রভা।

– প্রস্তুত হও কন্যা।

লতাগৃহের দ্বারোপ্রান্তে এসে আর-এক আকস্মিক রহস্যের আহ্বান শুনে চমকে ওঠে সুপ্রভা। প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন মহর্ষি বদান্য।

বদান্য বলেন– প্রস্তুত হও সুপ্রভা, তুমি আজ পতি বরন করে ধন্য হবে। এই প্রভাতের শুভক্ষণে তোমার জন্য স্বয়ংবরসভা আহুত হয়েছে জ্ঞানী-গুণী ও প্রিয়দর্শন বহু ঋষিযুরবা আমার আহ্বানে আশ্রমোপবনে সমবেত হয়েছেন।

সুপ্রভার বিস্মিত ও বিমুগ্ধ নয়নের তৃষ্ণালস দৃষ্টি চকিত তড়িল্লেখার মত ক্ষণলাস্যে দীপ্ত হয়ে পরক্ষণে সলজ্জ ঘনপক্ষ্মাভারে অবনত হয়। মহর্ষি বদান্যের নেত্রে বিচিত্র এক শ্লেষের ছায়া ফুটে ওঠে। সুপ্রভার উৎফুল্ল মুখের দিকে তাকিয়ে এই সত্যই দেখতে থাকেন বদান্য, আসক্তির কেতকীও কেমন করে আর কত সহজে নিষ্ঠা হারায়। জয়ী হয়েছে মহর্ষির চিন্তার সেই রক্তপাষাণসদৃশ্য কঠিন তত্ত্ব, আসক্তি কখনও একনিষ্ঠা স্বীকার করে না।

কেতকীমালিকা হাতে তুলে নিয়ে প্রস্তুত হয়েছে সুপ্রভা। বনস্পতিময় উপবনের কাছে গিয়ে প্রিয়দেহ সন্ধানের জন্য আগ্রহের শিহর সহ্য করছে এক যৌবনবতীর দেহলতিকা। বনমৃগীর মত শুধু দেহজ অভিলাষের আবেশে জীবনসঙ্গী বরণ করবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছে এক ঋষিতনয়ার চিত্ত। দুঃখিত হন বদান্য। ঋষির আশ্রমের শিক্ষায় লালিত হয়েও প্রেম ও অপ্রেমের প্রভেদ অনুভব করবার মত মনের অধিকারিণী হতে পারেনি তার কন্যা। মনোময়ী নয়, নিতান্ত নয়নময়ী। যার মুখ দেখে মুগ্ধ হয় নয়ন, তারই কণ্ঠে জীবনের বরমাল্য দান করে।

দুঃখিত হয়েও চিন্তার গভীর একটি হর্ষের সঞ্চার অনুভব করছিলেন বদান্য। আসক্তি কখনও একনিষ্ঠা স্বীকার করে না, এই সত্য আজ স্বীকার করবে সুপ্রভা। সুপ্রভার জীবনের একটি মিথ্যা বিশ্বাসের মোহ সুপ্রভা আজ নিজের হাতেই চূর্ণ করে দিতে চলেছে। বাসনা যেন সুপীণ বিহ্বলতা উৎসারিত করে উৎসবের উৎসর্গ হবার জন্য উৎসুক হয়ে অষ্টাবক্রের বুকের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। অষ্টাবক্রের স্বপ্নই সুরভিত হয়ে গিয়েছে। কি আশ্চর্য, সেই সুরভি যে এক কেতকীমালিকার সুরভি! অষ্টাবক্রের আকাঙ্ক্ষা মহত্তম তৃপ্তি! সেই তৃপ্তিকে বক্ষোলগ্ন করবার জন্য সাগ্রহে বাহু প্রসারিত করে অষ্টাবক্র। ভেঙ্গে যায় স্বপ্নের আবেশ, চমকে জেগে ওঠে অষ্টাবক্র।

সেই মূহূর্তে এক হাস্যধরার সুস্বর ঝংকার দিয়ে বেজে ওঠে।

– আমি এসেছি ঋষি।

কে তুমি? বিস্ময়ে কম্পিতকণ্ঠে অষ্টাবক্র প্রশ্ন করেই দেখতে পায় রত্নপর্যঙ্কের উপর তারই বক্ষের সন্নিধানে এসে বসে রয়েছে উদীচী। বর্ষীয়সীর মূর্তি নয়, যৌবনরুচিরা ও সুচারুদেহিনী এক নবীনার নয়নমনোহারিণী মূর্তি। সেই ঝংকারমুখর মণিময় আভরণের ভার যেন ঝরে পড়ে গিয়েছে। তড়িল্লতার মত নিরাভরণা সুন্দর এক বহ্নির লতিকা অনাবরণ তরুণতনুর লাস্য স্ফুরিত করে অষ্টাবক্রের বুকের কাছে এসে লুটিয়ে পড়েছে। যেন খরকামনার সুবর্ণকশা।

– তুমি উদীচী? অষ্টাবক্রের কণ্ঠস্বরে আহত স্বপ্নের বেদনা। কম্পিত হতে থাকে।

– হ্যাঁ ঋষি, আমিই তোমার তৃপ্তি। অষ্টাবক্রের মুখের দিকে নয়নকিরণ বর্ষণ করে নীলবনের মায়া দিয়ে রচিত কামনাময়ী তরুণী।

অষ্টাবক্র বলে– তুমি মিথ্যা বিশ্বাসে উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছে, উদীচী।

নীলবনের মায়াভবনের মণিদীপ্তি কক্ষে রত্নপর্যঙ্কের উপর নিদ্রাভিভূত ঋষি অষ্টাবক্র। বাহিরে নিবিড় সন্তামসী রাত্রির অন্ধকার। পিকরবের শেষ ঝংকারও ক্লান্ত হয়ে নীলবনের অন্ধকারে সুপ্তিময় স্তব্ধবতার মধ্যে নীরব হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সুপ্ত অষ্টাবক্র যেন এক জ্যোৎস্নাময় উপবনের শোভা দেখছে, আর শুনছে মধুর পিকধ্বনির সংগীত। বক্ষঃপুটে সঞ্চিত সকল কামনার পরাগ ধমনীধারায় উচ্ছলিত সকল অনুরাগের শোণিমা এবং নিঃশ্বাসে আকলিত সকল তৃষ্ণার সমীর যেন তৃপ্তিরসরভসা এক অধর শোভাকে নিকটে পেয়েছে।

আর সময় নেই, শুভলগ্ন উপস্থিত।

বদান্য বলে– এস কন্যা।

মরালীর মত মৃদুলগতি, অথচ নয়নে খঞ্জনবধূর চঞ্চলতা, সুপ্রভা ধীর সঞ্চারিত চরণে মহর্ষি বদান্যের ছায়া অনুসরণ করে স্বয়ংবরসভার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। কেতনীমালিকার সুরভিত ও বিমুগ্ধ তৃষ্ণা তৃপ্তি লাভের জন্য নূতন এক জগতের দিকে চলেছে।

নীলবনের মায়াভবনের মণিদীপ্তি কক্ষে রত্নপর্যঙ্কের উপর নিদ্রাভিভূত ঋষি অষ্টাবক্র। বাহিরে নিবিড় সন্তামসী রাত্রির অন্ধকার। পিকরবের শেষ ঝংকারও ক্লান্ত হয়ে নীলবনের অন্ধকারে সুপ্তিময় স্তব্ধবতার মধ্যে নীরব হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সুপ্ত অষ্টাবক্র যেন এক জ্যোৎস্নাময় উপবনের শোভা দেখছে, আর শুনছে মধুর পিকধ্বনির সংগীত। বক্ষঃপুটে সঞ্চিত সকল কামনার পরাগ ধমনীধারায় উচ্ছলিত সকল অনুরাগের শোণিমা এবং নিঃশ্বাসে আকলিত সকল তৃষ্ণার সমীর যেন তৃপ্তিরসরভসা এক অধর শোভাকে নিকটে পেয়েছে। দেখছে অষ্টাবক্র, চঞ্চল দক্ষিণসমীরের প্রবল কৌতুকে শিথিলিত হয়েছে এক নিবিড় নীবিতটের নীলাংশুক মেখলা। বহুলচিকুরচ্ছায়া ও বিপুলনয়নমায়ার এক উচ্ছ্বাসময়ী ছবি। সে নারীর পুষ্পহারের সলজ্জ শাসন দীর্ণ হয়ে গিয়েছে; এক অশান্তা অভিসারচারিণীর বক্ষোজ

তুমি আমার তৃপ্তি হতে পার না।

উদীচীর খরনয়নের হর্ষ হঠাৎ আহত হয়। – সত্য স্বীকার করো ঋষি। তোমার ঐ তৃষ্ণাকাতর দুই চক্ষুর দৃষ্টি আমার এই দেহচ্ছবির দিকে নিবদ্ধ করে বল দেখি, বিচলিত হয় না কি তোমার আসক্তিময় বক্ষের নিঃশ্বাস?

অষ্টাবক্র– বিচলিত হয়, অস্বীকার করি না।

উদীচী– মুগ্ধ হয় না কি?

অষ্টাবক্র– মুগ্ধ হয়, স্বীকার করি। কিন্তু আমার এই বিচলিত নিঃশ্বাসের শান্তি তুমি নও। আমার এই বিমুগ্ধ চিত্তের তৃপ্তি তুমি নও। আমার তৃপ্তি কেতকীরেণুপরিমলে সুরভিত হয়ে আমারই প্রতীক্ষায় এই জগতের এক আশ্রমস্থলীর লতাবৃত কুটীরের নিভৃতে রয়েছে।

উদীচী– কে সে?

অষ্টাবক্র– মহর্ষি বদান্যের কন্যা সুপ্রভা।

উদীচী– সে কি এই উদীচীর চেয়েও সুন্দরতর অধরের মদিরতর ভ্রূভঙ্গের, আর খরতর নয়নপ্রভার নারী?

অষ্টাবক্র– না উদীচী, তবু এই সত্য তোমারই নীলবনঘন মায়ালোকের এই মণিদীপ্ত ভবনের কক্ষে, তোমারই সমাদর কোমলীকৃত এই রত্নপর্যঙ্কে সুশয়ান এই স্বপ্নময় অনুভবের মধ্যে উপলব্ধি করেছি, সেই বদান্য কন্যা সুপ্রভাই আমার আকাঙ্ক্ষার

মহত্তমা তৃপ্তি।

উদীচীর দৃষ্টি যেন বহ্নি উৎসারিত করে। – আমি অতৃপ্তি?

অষ্টাবক্র– তুমি বান্ধবী।

অভাবিত বিস্ময়ে নম্র হয়ে যায় উদীচির দৃষ্টি। – কি বললে ঋষি?

অষ্টাবক্র– তৃষ্ণাকে তৃষ্ণায়িত কর, বাসনাকে দাও বহ্নি, অয়ি কেলিকটাক্ষলক্ষ্মী তন্বী, তুমি মনোভবভবনের খরদ্যুতিময় দীপ্তি। কামিজনচিত্ত কর পুলকিত বিপুল হর্ষে, তুমি ভ্রূভঙ্গীময়ী প্রীতি। অভিলাষে কর উল্লসিত, নিঃশ্বাসে দাও ঝঞ্জা, তুমি মদবিলসিত উৎসব। তোমারই সমাদরে মদিরায়িত আমার স্বপ্ন কেতকীরেণুর সুরভি বক্ষে ধারণ করবার জন্য বাহু প্রসারিত করেছে। ব্যাকুল করেছ, বিহ্বল করেছ, আমার তৃষিত নয়নপথে তুমিই তাকে ডেকে এনে চিনিয়ে দিয়েছ, যে আমার আসক্তির উপাসনা, মহত্তমা তৃপ্তি, শ্রেয়সী। তুমি আমার বান্ধবী, অষ্টাবক্রের কৃতজ্ঞ অন্তরের শ্রদ্ধা গ্রহণ করে উদীচী।

উদীচীর দুই নয়নের পক্ষপল্লবে যেন কুহেলিকাপীড়িত। এক শীতসন্ধ্যায় বেদনাশিশির সঞ্চারিত করে উদীচী বলে– নীলবনলোকের এই চিরকুমারীকে যদি বান্ধবী বলে মনে করে থাক ঋষি, তবে তাকে জীবনের চিরসঙ্গিনী করে নাও। তোমাকে পতিরূপে বরণ করুক উদীচী।

অষ্টাবক্র– তা হয় না, ক্ষমা কর উদীচী।

উচীদীর কণ্ঠস্বর তীব্র আর্তনাদের মত বেজে ওঠে– তোমার আসক্তিময় বক্ষের কঠিন নিষ্ঠার নিষ্ঠুরতা অন্তত এই মুহূর্তে বর্জন কর ঋষি। আমাকে ক্ষণকালের প্রেয়সীরূপে গ্রহণ কর। তার পরে চলে যেও যেথা যেতে চায় তোমার আকাঙ্ক্ষা, আশ্রমবাসিনী সেই সুপ্রভাময়ী এক অমেয় মায়ার পূর্ণিমার কাছে।

অষ্টাবক্র– অসম্ভব, ক্ষমা কর, বিদায় দাও বান্ধবী।

– যাও! জ্বালাধ্বনির মত তীব্রস্বরে ধিক্কার দিয়ে সরে যায় খরকামনার সুবর্ণকশা।

নীরবে এবং মাথা নত করে চলেই যাচ্ছিল অষ্টাবক্র। কক্ষের অবারিত দ্বারের প্রান্তে এসে দাঁড়াতেই, পিছন হতে যেন চমকে ওঠে একটি অনুরোধ। – একবার থাম ঋষি।

দেখে বিস্ময় অনুভব করে অষ্টাবক্র, দাঁড়িয়ে আছে উদীচী, এক শান্তা স্নিগ্ধা স্মিতরুদিতার মূর্তি। প্রখর প্রগল্‌ভা অলজ্জার মূর্তি নয়, যেন হিমবায়ুলাঞ্ছিতা এক বনলতিকা। নতমুখিনী উদীচীর কপোলে অশ্রুসলিলের রেখা। যেন অমল ধারাসলিলে গলে গিয়েছে সেই কজ্জলমসিমদির ভ্রূভঙ্গী।

অষ্টাবক্রের বিস্ময়কেই বিস্মিত করে হেসে উঠে উদীচী। – ব্যথিত হয়ো না ঋষি, উদীচীর এই নয়নবারি বেদনার অশ্রু নয়, আনন্দের অশ্রু।

অষ্টাবক্র– আনন্দ?

উদীচী– হ্যাঁ ঋষি, নিষ্ঠায় সুন্দর এক আসক্তির কাছে জীবনে এই প্রথম পরাভূত হয়েছে নীলবনলোকের এক লালসাময়ীর অনিষ্ঠা। আমি তোমার পরীক্ষা।

অষ্টাবক্র– তুমি আমার শিক্ষা।

উদীচী– জয়ী তুমি।

অষ্টাবক্র– জয়দাত্রী তুমি।

জাগ্রত বিহগের ক্ষীণস্ফুট কলরব শোনা যায়। শেষ হয়েছে সন্তামসী রাত্রি। কক্ষের অবারিত দ্বারপথ অতিক্রম করে বনপথের উপর এসে দাঁড়ায় অষ্টাবক্র; এবং দূর দক্ষিণের গগনবলয়ের দিকে নেত্র সম্পাত করে পথ অতিক্রম করতে থাকে।

কার কণ্ঠে মাল্য দান করবে সুপ্রভা? শত প্রিয়দর্শনের মধ্যে প্রিয়তম বলে মনে হয় কার মুখ? কার কণ্ঠলগ্ন হলে তৃপ্ত হবে সুপ্রভার কেতকীমালিকার সুরভিত স্পৃহা?

শুভক্ষণ উপস্থিত। স্বয়ংবরসভায় প্রাণিপ্রার্থী বহু ঋষিযুবার সমাবেশ। যেন শত তরুণ তরুবরের বরতনুশোভায় বিনোদিত বাসন্ত প্রভাতের এক উপবন। সুপ্রভার কেতকীমালিকার সুরভিত স্পর্শ কণ্ঠসক্ত করবার জন্য বিচলিত চিত্তের আগ্রহ সহ্য করছে প্রবল

সুপ্রভার কবরী কপোল আর অধরের উপর যেন কুঙ্কুমবাসিত একটি বক্ষ হতে তরঙ্গিত বাসনার নিঃশ্বাস এসে লুটিয়ে পড়ছে; সুপ্রভার স্বপ্নের বক্ষে মৃগমদামোদিত কুঙ্কুমের উৎসব ঝরে পড়ছে; কেতকীমালিকার উৎসারিত পিপাসার সুরভি তার পরমা তৃপ্তির আঁধার এক বক্ষের পৌরুষোচ্ছল স্পর্শ নিকটে পেয়েছে। অষ্টাবক্র, আর কেউ নয়, মল্লিকাপুলকিত ধম্মিল্লের গুরুগৌরবে গরীয়ন্ সেই অষ্টবক্রের মূর্তি যেন ঋজুকান্ত বনস্পতির মত কামনাবিধুরা এক মাধবীলতিকার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। এই তো সুপ্রভার যৌবনের সকল আকঙ্ক্ষার উপাস্য, শ্রেষ্ঠ তৃপ্তি।

পৌরুষে পেশল শত অভিলাষ। সেই শোভার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে যায় বদান্য কন্যা সুপ্রভার নেত্রোত্থিত হর্ষ।

তবু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুপ্রভা। তার মুগ্ধ নয়নের দৃষ্টি যেন হঠাৎ এক স্বপ্নের আবেশে অন্য জগতে চলে গিয়েছে। সুপ্রভার কবরী কপোল আর অধরের উপর যেন কুঙ্কুমবাসিত একটি বক্ষ হতে তরঙ্গিত বাসনার নিঃশ্বাস এসে লুটিয়ে পড়ছে; সুপ্রভার স্বপ্নের বক্ষে মৃগমদামোদিত কুঙ্কুমের উৎসব ঝরে পড়ছে; কেতকীমালিকার উৎসারিত পিপাসার সুরভি তার পরমা তৃপ্তির আঁধার এক বক্ষের পৌরুষোচ্ছল স্পর্শ নিকটে পেয়েছে। অষ্টাবক্র, আর কেউ নয়, মল্লিকাপুলকিত ধম্মিল্লের গুরুগৌরবে গরীয়ন্ সেই অষ্টবক্রের মূর্তি যেন ঋজুকান্ত বনস্পতির মত কামনাবিধুরা এক মাধবীলতিকার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। এই তো সুপ্রভার যৌবনের সকল আকঙ্ক্ষার উপাস্য, শ্রেষ্ঠ তৃপ্তি। সেই তৃপ্তির কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণের জন্য সাগ্রহে বাহু প্রসারিত করে সুপ্রভা। ভেঙে যায় স্বপ্নময় আবেশ। স্বয়ংবরসভা হতে ছুটে চলে যায় সুপ্রভা, দাবানলভীতা মৃগবধূ যেমন কাননের লতাজাল ছিন্ন করে ছুটে যায়।

লতাগৃহের নিভৃতে ফিরে এসে কেতকীমালিকার উপর অশ্রুসিক্ত নয়নের চুম্বন অঙ্কিত করে ক্ষণোদ্‌ভ্রান্ত নয়নের জ্বালা শান্ত করতে চেষ্টা করে সুপ্রভা। কিন্তু হঠাৎ বাধায় ব্যথিতভাবে চমকে ওঠে।

এই আসক্তি কি সত্যিই প্রণয়নের প্রথম সঙ্কেত, পতিপত্নী সম্বন্ধের প্রথম হেতু, মিলনের প্রথম গ্রন্থি? মহর্ষি বদান্যের নেত্রে আর একটি কঠিন প্রতিষ্ঠার ছায়া দেখা যায়। যেন শেষবারের মত নির্মমতম এক পরীক্ষায় তাঁর এতদিনের বিশ্বাসের বক্ষ বিদীর্ণ করে দেখতে ইচ্ছা করছেন বদান্য, সে বিশ্বাস সত্য না মিথ্যা। জানতে ইচ্ছা করছে, দেহজ অভিলাষের সৌরভের মত ঐ আসক্তির বক্ষে কোন সত্যের গৌরব আছে কি না আছে।

শান্ত লতাগৃহের নীরবতা চূর্ণ করে দিয়ে মহর্ষি বদান্যের ভর্ৎসনা গর্জিত হয়। – এ কেমন আচরণ সুপ্রভা? আমারই ইচ্ছায় আহুত স্বয়ংবরসভাকে কেন তুমি এইভাবে অপমানিত করলে, রীতিদ্রোহিণী কন্যা?

সুপ্রভা– ক্ষমা করুন পিতা, আমার জীবনে স্বয়ংবরসভার কোন প্রয়োজন নেই। বদান্য– কেন?

সুপ্রভা– আমার কেতকীমালিকা জানে, কে আমার জীবনের সহচর হলে সবচেয়ে বেশি সুখী হবে আমার জীবন।

বদান্য– কে সে?

সুপ্রভা– আপনি জানেন পিতা, তার নাম অষ্টাবক্র।

তবু তারই নাম! বিস্মিত বদান্যের চিরকালের বিশ্বাসের সেই কঠিন তত্ত্বের গর্ব যেন কুলিশকঠোর একটি আঘাতে শিহরিত হতে থাকে। সেই অষ্টাবক্রের নাম উচ্চারণ করছে সুপ্রভা। নিতান্তই দেহজ অভিলাষ ব্যাকুল এক কেতকীমালিকার সৌরভে কি এত নিষ্ঠার গৌরব থাকতে পারে?

বদান্যের ভর্ৎসনাময় ভ্রূকুটি হঠাৎ হেসে ওঠে। জানে না সুপ্রভা, তার কেতকীমালিকার কামনার আস্পদ সেই অষ্টাবক্রের আসক্তির নিষ্ঠা যে এতক্ষণে নীলবনচারিণী এক লালসাময়ীর ঘনমসিময় ভ্রূভঙ্গের আঘাতে চূর্ণ হয়ে গিয়েছে। কল্পনাও করতে পারে না সুপ্রভা, কেতকীমালিকার আশা মিথ্যা হয়ে এক দুঃস্বপ্নের জগতে মিলিয়ে গিয়েছে। সুপ্রভার কামনার এই নিষ্ঠা নিষ্ঠাই নয়, কঠিন মোহ মাত্র। সত্য অবহিত হলে এই কঠিন মোহ এখনি আর্তনাদ করে ভেঙ্গে যাবে।

বদান্য বলেন– শোন কন্যা, তোমার মোহবিমূঢ় নয়নতৃষ্ণার বাঞ্ছিত সেই অষ্টাবক্র এক বর্ষীয়সী স্বৈরিণীর বিলাসলীলার বান্ধব হয়ে উত্তর দিগ্‌ভূমির নীলবনের নিভৃতে এক মায়াভবনের কক্ষে দিবস ও রাত্রি যাপন করছে। সে আর ফিরে আসবে না, ফিরে আসবার সাধ্য তার নেই।

– পিতা! সুপ্রভার কণ্ঠ ভেদ করে করুণ আর্তনাদ উৎসাতি হয়, যেন অকস্মাৎ এক কিরাতের বিষসায়ক ছুটে এসে বনমৃগীর হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ করেছে।

পর মুহূর্তে বনমৃগীর বাষ্পমেদুরিত করুণ নয়নের দৃষ্টি স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত হয়, এবং মহর্ষি বদান্যের ভ্রূকুটি অকস্মাৎ এক বিস্ময়ে আঘাতে যেন নীরবে আর্তনাদ করে ওঠে। লতাগৃহের দ্বারোপান্তে এসে দাঁড়িয়েছে এক আগন্তুক, মস্তকে মল্লিকামোদিত ধম্মিল্লের সেই উদ্ধত শোভা অনাহত, তরুণ ঋষি অষ্টাবক্র।

অষ্টাবক্রের স্মিতোৎফুল্ল মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে বিমূঢ় দুই অপলক চক্ষু তুলে সত্যই দেখতে থাকেন বদান্য, তার এতদিনের বিশ্বাসের কঠিন তত্ত্ব মিথ্যা হয়ে গিয়েছে। সত্যই জয়ী হয়ে ফিরে আসতে পেরেছে এক আসক্তির গর্ব। সত্যই পরাভূত হয়েছে নীলবনের সন্তামসী রাত্রির মসি। সত্যিই তপস্বীর মত অবিচল নিষ্ঠায় কঠিন এই আসক্তি। সত্যই সুন্দর এই সক্তি। কিন্তু...।

কিন্তু এই আসক্তি কি সত্যিই প্রণয়নের প্রথম সঙ্কেত, পতিপত্নী সম্বন্ধের প্রথম হেতু, মিলনের প্রথম গ্রন্থি? মহর্ষি বদান্যের নেত্রে আর একটি কঠিন প্রতিষ্ঠার ছায়া দেখা যায়। যেন শেষবারের মত নির্মমতম এক পরীক্ষায় তাঁর এতদিনের বিশ্বাসের বক্ষ বিদীর্ণ করে দেখতে ইচ্ছা করছেন বদান্য, সে বিশ্বাস সত্য না মিথ্যা। জানতে ইচ্ছা করছে, দেহজ অভিলাষের সৌরভের মত ঐ আসক্তির বক্ষে কোন সত্যের গৌরব আছে কি না আছে।

মহর্ষি বদান্য বলেন– স্বীকার করি অষ্টাবক্র সুপ্রভার পাণি গ্রহণের অধিকার তুমি পেয়েছে। এবং আমার প্রতিশ্রুতিও স্মরণ করি। সুপ্রভাকে তোমার কাছে এই ক্ষণে সম্প্রদান করতে চাই।

সুপ্রভা ও অষ্টাবক্রের নয়নে স্নিগ্ধ এবং হর্ষের জ্যোৎস্না ফুটে ওঠে। মহর্ষি বদান্যের সম্মুখে এগিয়ে আসে প্রীতিভারে বিনত দুটি মূর্তি।

মহর্ষি বদান্য বলেন– কিন্তু তোমারই আর একটি প্রতিশ্রুতির কথা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, অষ্টাবক্র।

অষ্টাবক্র– বলুন মহর্ষি।

বদান্য– তোমরা আমার মন্ত্রসংস্কারে পরিণীত হবার পর আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করে ধন্য হবে।

অষ্টাবক্র– অবশ্যই গ্রহণ করব, এবং ধন্য হব মহর্ষি।

বদান্য– কল্পনা করতে পার, কি আশীর্বাদ আমি দান করতে চাই?

অষ্টাবক্র– পারি না মহর্ষি।

বদান্য– আমি এই আশীর্বাদ দিতে চাই, তোমাদের দেহ মন ও প্রাণ হতে আসক্তির শেষ লেশও লুপ্ত হয়ে যাক। বল, প্রস্তুতি আছ, গ্রহণ করবে এই আশীর্বাদ?

– মহর্ষি! অষ্টাবক্রের কণ্ঠে অভিশাপভীরু, শঙ্কিতের সন্ত্রস্ত কণ্ঠস্বর শিহরিত হয়। শিহরিত হয় সুপ্রভার শান্ত কবরীভার, যেন তার সীমন্তের উপর দংশন দানের জন্য ফণা উদ্যত করেছে এক দুর্ভাগ্যের ভুজঙ্গ।

বদান্য বলেন– প্রতিশ্রুতির অবমাননা করতে চাও অষ্টাবক্র?

অষ্টাবক্র– চাই না মহর্ষি, কিন্তু এ কেমন আশীর্বাদ? আপনি ভুল করে আশীর্বাদের নামে অভিশাপ দান করতে চাইছেন। আপনার কাছ থেকে অভিশাপ গ্রহণ করব, এমন প্রতিশ্রুতি আমি আপনাকে দান করিনি মহর্ষি।

বদান্য– তুমি বুঝতে ভুল করছ, অষ্টাবক্র।

অষ্টাবক্র– আমার ভুল বুঝতে পারছি না মহর্ষি। আমি জানি অপরের জীবনে সুখ ও কল্যাণ আহ্বান করে যে বাণী, সেই বাণীই হলো আশীর্বাণী। কারও জীবনকে অসুখী করবার জন্য যে বাণী উচ্চারিত হয়, সে বাণী আশীর্বাণী নয়।

বদান্য– আমার এই আশীর্বাণীও তোমাদের জীবনকে সুখী করবার জন্য শুভ ইচ্ছার বাণী। তোমাদের জীবনে আসক্তি থাকবে না, তার জন্য অসুখী হবে না তোমাদের জীবন। তৃষ্ণা না থাকলে তৃষ্ণাহীনতার জন্য কেউ দুঃখ অনুভব করে না, অষ্টাবক্র। ইচ্ছা না থাকলে অক্ষমতার ব্যথা কেউ বোধ করে না। অননুভূত অভিলাস কখনও অতৃপ্তির ক্লেশ সৃষ্টি করে না। আসক্তিহীন জীবন সুখেরই জীবন।

অষ্টাবক্র– কল্পনা করতে পারি না মহর্ষি, সে কেমন সুখের জীবন।

বদান্য– জলমীনের মনে মহাকাশের জন্য কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই, যেহেতু মহাকাশের নীলিমা তার অনুভবে নেই। বনমধুকরের প্রাণে সুরলোকের পারিজাতের জন্য কোনো তৃষ্ণার গুঞ্জরণ নেই, যেহেতু সে পারিজাত তার অনুভবে নেই। অরণ্য মৃগের মনে সমুদ্রস্নানের জন্য কোনো ক্রন্দন নেই, যেহেতু সলিলোচ্ছল সমুদ্রের রূপ তার স্বপ্নের অনুভবে ও কল্পনায় নেই। যার জন্য আসক্তি নেই, তার অভাবের জন্য অতৃপ্তিও নেই। আসক্তিহীন এই জীবন এক বেদনাহীন সুখের জীবন। বিশ্বাস করতে পারছ কি অষ্টাবক্র?

অষ্টাবক্র– বিশ্বাস করছি।

বদান্য– তবে আমার আশীর্বাদ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হও অষ্টাবক্র, দেহ মন ও প্রাণ হতে আসক্তিকে চিরজীবনের মত বিদায় দান করবার জন্য প্রস্তুত হও।

অষ্টাবক্র– কেন মহর্ষি? আপনি তো আজ এই সত্যেরই প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছেন যে, আসক্তিও নিষ্ঠায় সুন্দর হতে পারে।

বদান্য– আসক্তি সুন্দর হলেই বা কি আসে যায় অষ্টাবক্র? বিষসলিল স্নিগ্ধ হলেই বা কি? সে সলিল প্রাণের পানীয় হতে পারে না। খলপাবক হেমবর্ণ হলেই বা কি? সে পাবক গৃহদীপের আলোক হতে পারে না। মরুসমীর উচ্ছ্বসিত হলেই বা কি? সে সমীর নিকুঞ্জের হিরণ্ময় আনন্দের বান্ধব হতে পারে না।

অষ্টাবক্র ও সুপ্রভার জীবন, পরিণয়োৎসুক দুই সুন্দর বাসনা যেন আসন্ন এক শুভ বাসকোৎসবের দিকে তাকিয়ে চিতানলের উৎসব দেখতে থাকে। দুর্বহ অঙ্গীকারের বন্ধনে আবদ্ধ দুই অসহায়ের মূর্তি। বদান্য প্রশ্ন করেন। – নিরুত্তর কেন অষ্টাবক্র? বল, কি তোমাদের ইচ্ছা?

অষ্টাবক্র ও সুপ্রভাব পরস্পরের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে, অপলক স্নেহে অভিষিক্ত দুটি দৃষ্টি। অষ্টাবক্র যেন তার জীবনের আলিঙ্গন হতে স্খলিত এক কেতকীরেণুবাসিত স্বর্গের দিকে মায়াময় নেত্রে তাকিয়ে আছে। সুপ্রভার নয়নের শিশিরেও সেই অমেয় মায়ার সুষমা অভিনব এক মদিরতায় আরও নিবিড় হয়ে ওঠে। অষ্টাবক্রের কুঙ্কুমপিঞ্জরিত বক্ষের উপর অলক্ষ্য চুম্বনধারার মত ঝরে পড়ে সুপ্রভার সিক্ত নয়নের দৃষ্টি। আসন্ন এক মৃত্যুর বজ্রনাদ শুনতে পেয়েছে, তাই যেন শেষবারের মত ভালবেসে বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হয় এক কুঙ্কুম আর কেতকীর আসক্তি।

মৃত্যু হবে আসক্তির, সত্য হবে শুধু মিলন, অদ্ভুত এই আশীর্বাদ সহ্য করবার জন্য হৃদয় কঠিন করতে চেষ্টা করে নবীন রসালসম যৌবনধর অষ্টাবক্র, চেষ্টা করে উপবনের সমীরপ্রিয়া লতিকার মত সরসতনুকা সুপ্রভা। কিন্তু পারে না।

বদান্যের আশীর্বাদ যেন দক্ষিণ পবনের বক্ষ হতে চন্দনগন্ধভার কেড়ে নিতে চায়। প্রজাপতির পক্ষপতাকায় বর্ণায়িত আলিম্পন থাকবে না? গোধূলি হারাবে আভা? আকাশ হারাবে নীলিমা, পুষ্প হারাবে সৌরভ, সমুদ্র হারাবে তরঙ্গ, যৌবন হারাবে আসক্তি? আসক্তিহীন সেই মিলন যে দুই নিঃস্ব রিক্ত চলকঙ্কালের বেদনাহীন সুখের মিলন। সে মিলন মিলনই নয়, সে জীবন জীবনই নয়। আসক্তিহীন সেই মিলনের বেদনাহীন সুখ এক মুহূর্তের জন্যও সহ্য করা যাবে না। তার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়।

সুপ্রভার সেই দৃষ্টির ভাষা বুঝতে পারে অষ্টাবক্র এবং অষ্টাবক্রের সেই দৃষ্টির ভাষা বুঝতে পারে সুপ্রভা। সুস্মিত হয়ে ওঠে উভয়ের ক্ষণবিষাদমেদুর নয়নের দৃষ্টি, সে দৃষ্টি নূতন এক সংকল্পের আলোকে উদ্ভাসিত।

অষ্টাবক্র বলে– আপনিও একটি প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করুন মহর্ষি। বলুন, আপনার মন্ত্রসংস্কারের পুণ্যে পরিণীত আমাদের জীবনে আপনার ঐ আশীর্বাদ দানের পর আপনি আমাদের প্রার্থিত বর প্রধান করবেন।

বদান্য– হ্যাঁ, মনে আছে। বল, কি বর প্রার্থনা করতে চাও তোমরা?

অষ্টাবক্র– আপনার আশীর্বাণী ধ্বনিত হবার সঙ্গে সঙ্গে যেন আমাদের মৃত্যু হয়, এই বর পেতে চাই মহর্ষি।

চিৎকার করে ওঠেন মহর্ষি বদান্য। – মৃত্যু চাও তোমরা?

অষ্টাবক্র– হ্যাঁ, মহর্ষি।

নীরব, স্তব্ধ, শিলীভূত বৃক্ষের মত সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বদান্য, যেমন এইবার তাঁর সেই বিশ্বাসের হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। আর, আসক্তির গৌরব ঘোষণা করে তাঁরই সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে মিলনোৎসুক কেতকী আর কুঙ্কুমের অপরাভূত দুই সংকল্প।

মহর্ষি বদান্যের দুই চক্ষুর কঠিন দৃষ্টি হঠাৎ বাষ্পাসারে প্লাবিত হয়। সুপ্রভার কণ্ঠস্বর ব্যথিতভাবে চমকে ওঠে। – পিতা?

বিস্মিত অষ্টাবক্র ডাকে। – এ কি মহর্ষি?

মহর্ষি বদান্য বলেন– নির্মম পরীক্ষার প্রাণ আনন্দে গলে গিয়েছে অষ্টাবক্র, এই অশ্রু আনন্দেরই অশ্রু। স্বীকার করি সুপ্রভা, তোমদের সুন্দর আসক্তিই সত্য। স্বীকার করি অষ্টাবক্র, আসক্তিই এই মর্ত্যের মানব ও মানবীর মিলিত জীবনের মালিকা, প্রকৃত বন্ধনের প্রথম গ্রন্থি।

সস্নেহ, আগ্রহে সুপ্রভা ও অষ্টাবক্রের দুই পাণি সমন্বিত করে মন্ত্র পাঠ করেন মহর্ষি বদান্য। তার পরেই আশীর্বাণী উচ্চারণ করেন। – কুঙ্কুম ও কেতকীর জীবন চিরসুখী হোক।

অষ্টাবক্র– বর প্রদান করুন মহর্ষি।

বদান্য– বল, কী বর চাও?

অষ্টাবক্র– চাই আপনার পদধূলির স্পর্শ।

মহর্ষি বদান্যের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করে অষ্টাবক্র ও সুপ্রভা। অষ্টাবক্র ও সুপ্রভার শির চুম্বন করেন মহর্ষি বদান্য।

সুবোধ ঘোষ কথাসাহিত্যিক

প্রবন্ধ

ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী
প্রয়াণের ৫০ বছর

ফয়সাল আহমেদ

কিছু মানুষ পৃথিবীতে আসেন সময়কে বদলে দেয়ার জন্যে। ইতিহাস লেখা নয়, তৈরি করাই তাঁদের জীবনের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের কল্যাণ ও মানুষের মুক্তিকেই যাঁরা জীবনের ব্রত হিসেবে নেন। পৃথিবীতে এমন মানুষের আগমন নিত্য ঘটে না। তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী। লোকে যাঁকে বিপ্লবী মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী নামেই চেনেন, জানেন।

ব্রিটিশ শাসকদের ভিত কাঁপিয়ে দেয়া বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতীক। বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের কারণে অগ্নিযুগে যে কয়েকজন মানুষ ভারতবর্ষে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন, ব্রিটিশ শাসকদের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী তাঁদের অন্যতম। বাংলার নির্যাতিত-নিপীড়িত, মুক্তিকামী মানুষের প্রিয় মহারাজের জন্ম ১৮৮৯ সালের ৫ মে, বঙ্গাব্দ-২২ বৈশাখ ১২৯৬ সালে ময়মনসিংহ জেলা, বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর উপজেলার কাপাসাটিয়া গ্রামে। এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হয় তাঁর। মহারাজের বাবার নাম দুর্গাচরণ চক্রবর্তী, মাতা প্রসন্নময়ী দেবী। ছয় ভাই-বোনের মধ্যে তিনি পঞ্চম।

এক পাতানো যুদ্ধে ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন, বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের মধ্য দিয়ে ইংরেজরা ভারতবর্ষে ক্ষমতায়িত হয়, চূড়ান্তভাবে স্বাধীনতা হারায় ভারতবাসী। ছিনিয়ে নেয়া সেই স্বাধীনতা ব্রিটিশদের কাছ থেকে ফিরিয়ে আনতে জীবনের সবটুকু সময় বিসর্জন দিয়েছেন ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী। শুধু কী সময়! দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, জেলে বন্দী থাকা থেকে শুরু করে অসহনীয়, শারীরিক ও মানষিক নির্যাতন সইতে হয়েছে তাঁকে। তবু তিনি দমে যাননি, দমে যাওয়ার মানুষ তিনি নন। ভয়-ডর বলতে কোন বিষয় তাঁর জীবনে ছিল না। জেল-পুলিশের নির্যাতনে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন কিন্তু কখনও আর্দশিক অবস্থান থেকে বিন্দুমাত্র সরে আসেননি। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আবার বিপুল উদ্যমে অনুশীলন সমিতির হয়ে কাজ করে গেছেন অকুতোভয় মহারাজ। মহান এই বিপ্লবীকে সবাই পছন্দ করতেন। এমনকী প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা পর্যন্ত তাঁকে সমীহ করতেন। উদ্দেশ্য এক হলেও অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দলের মধ্যে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য বিরোধ ছিল। কিন্তু ব্যক্তি পর্যায়ে মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর সাথে কারো বিরোধ ছিল না। অসাধারণ এক ব্যক্তিত্বগুণে তিনি তা অর্জন করেছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মত বিশ্ববরেণ্য নেতারা তাঁকে স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন। মহারাজকে শ্রদ্ধা করতেন বাংলার আরেক স্বাধীনতাকামী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান।

মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী শুধুমাত্র একজন বিপ্লবী ছিলেন না। তিনি একাধারে লেখক, কবি, চিন্তাবিদ, একজন রাজনৈতিক বিশ্লেষকও। তিনি যেমন কবিতা লিখেছেন, তেমনি লিখেছেন গীতার ভাষ্য। লিখেছেন জেলখানার অভ্যন্তরের সমস্যা ও সংকট নিয়ে। স্কুলের জন্য পাঠ্য বইও রচনা করেছেন। সবকিছু ছাপিয়ে *জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম* বইটির জন্য তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ লেখক ও রাজনৈতিক ভাষ্যকার হিসেবে আর্বিভূত হয়েছেন। কালের বিবর্তনে গ্রন্থটি অগ্নিযুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে উঠেছে। ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস জানতে হলে বইটির পাঠ আবশ্যিক। অন্যথায় তা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

অসামান্য দেশপ্রেমিক এই মানুষটি ব্রিটিশ শাসনের সময় ত্রিশ বছর জেল খেটেছেন। আত্মগোপনেও থেকেছেন পাঁচ-ছয় বছর। এরপর স্বাধীন দেশেও তাঁকে অত্যাচার-নির্যাতন সইতে হয়েছে। পাকিস্তান সরকার তাঁকে কারা অন্তরীণ করেছে। অকৃতদার মহারাজ মানুষের জন্য একটি গণতান্ত্রিক সমাজ, উন্নত সমাজ নির্মাণের জন্য আমৃত্যু লড়াই করেছেন। আরও ব্যাপকভাবে মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি অংশগ্রহণ করেন। দেশভাগের পরও মহারাজ কংগ্রেসের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তখন কংগ্রেসের নাম ছিল পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস। কিন্তু একসময় দলের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। এটি অবশ্য নীতি ও আদর্শগত কোনও বিরোধ ছিল না। বিরোধ তৈরি হয়েছিল দলের রণনীতি নিয়ে। দলের মধ্যে দুটি বিভাজন স্পষ্ট হয়ে উঠে। দুই পক্ষের এক অংশে ছিলেন মনোরঞ্জন ধর, নেলি সেনগুপ্তা ও বসন্তকুমার দাস। তাঁরা পাকিস্তানে কংগ্রেস দল টিকিয়ে রাখার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু এর বিরোধিতা করেন মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রভাস লাহিড়ি প্রমুখ। মহারাজ অংশের মত ছিল, পাকিস্তানের কংগ্রেস যেহেতু হিন্দুদের সংগঠনে রূপ নিয়েছে, তাই এর আর প্রয়োজন নেই। এই কংগ্রেস পার্টিকে দিয়ে আর বৃহত্তর জাতীয় উদ্দেশ্য সাধন করা সম্ভব নয়। এবিষয়ে তাঁরা একমত হতে না পেরে পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস থেকে বের হয়ে আসেন। পরবর্তী সময়ে তাঁরা এক হতে না পারায় বিভিন্ন দল থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী 'সংযুক্ত প্রগতিশীল দল' [ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ পার্টি] থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর নির্বাচনী এলাকা ছিল পূর্ব-ময়মনসিংহ। নেত্রকোনা মহকুমার ১২টি থানা ও কিশোরগঞ্জ মহকুমার ৮টি থানা নিয়ে এই আসনটি গঠিত হয়।

নির্বাচনে সর্বাধিক ভোট পেয়ে জয়ী হন মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ। দ্বিতীয় হয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী নগেন সরকার। নির্বাচনে জয় লাভ করে যুক্তফ্রন্টের সময়ে সরকার পক্ষের এম. পি. এ হয়েছিলেন মহারাজ। তবে এই জয় পেয়েও শেষ পর্যন্ত সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি তিনি। কারন যে ভোটাররা ভালবেসে ভোট দিয়ে তাঁকে নির্বাচিত করেছে, তাঁদের জন্য কয়েকটা টিউবওয়েল বসানো ছাড়া তেমন কিছু করতে পারেননি তিনি। এজন্য দুঃখ প্রকাশও করেছেন। এখানেই শেষ নয়, এম. পি. এ নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁকে আরও যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে।

ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর নির্বাচনীকাজে সে সময় নেত্রকোনা এলাকায় দায়িত্ব পালন করেছিলেন বর্তমান সময়ের বাংলাদেশের অন্যতম চিন্তাবিদ লেখক অধ্যাপক যতীন সরকার। তিনি সে সময় মেট্রিক পরীক্ষার্থী ছিলেন। ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসের ছিল তাঁর পরীক্ষা। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় মার্চ মাসে। পরীক্ষার প্রস্তুতি বাদ দিয়ে তিনি মহারাজের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারের কাজ করেন। তিনি তাঁর *পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন* গ্রন্থে লেখেন– ' ...৬ জন প্রার্থীর মাত্র একজনকে আমি তখন নিজের চোখে দেখেছি। তিনি ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী। ত্রৈলোক্য মহারাজ নামেই যার সমাধিক পরিচিতি। ত্রৈলোক্য মহারাজ রামপুর বাজার এসে সভা করেছিলেন। তার সঙ্গে এসেছিলেন আরেকজন নেতা জ্ঞান মজুমদার। এদেরকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন আমাদের আশুলিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নিশিবাবু– নিশিকান্ত ভট্টাচার্য। আমার প্রিয় শিক্ষক কুমুদ ভট্টাচার্য ও জয়চন্দ্র রায়, আর আমার পিতৃবন্ধু কামিনী কুমার চক্রবর্তী ও সুরেন্দ্র চক্রবর্তীসহ আমাদের গায়ের ও আশপাশের সকল গায়ে আমরা যারা গুরুজনস্থানীয়, তাদের প্রায় সবাই ছিলেন ত্রৈলোক্য মহারাজের সমর্থক। মহারাজকে দেখে ও তার কথা শুনে সেদিন আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম। চেহারায় তার তেমন কোন আকর্ষনীয় বৈশিষ্ট কিছু নেই। অথচ, এই ছোটখাটো মানুষটিই কিনা ছিলেন ব্রিটিশ শাসকদের ত্রাস, ৩০ বছর তারা তাকে জেলে আটকে রেখেছিল। কোন জেল জুলুমই যে মানুষটিকে নতি স্বীকার করাতে পারেনি সেই মানুষটিই এসেছেন আজ আমাদের কাছে ভোট চাইতে। এঁকে তো আমরা কিছুতেই ফিরিয়ে দিতে পারি না। নিশিবাবু আর কুমুদবাবু আমাকে ত্রৈলোক্য মহারাজের পক্ষে প্রচার কাজ চালাতে উদ্বুদ্ধ করলেন। সহপাঠী বন্ধু অনঙ্গমোহন সরকারকে নিয়ে আমি সোৎসাহে সে কাজে লেগে গেলাম। এরপর সিংহের গ্রামের গোপাল দাস ও সে গ্রামেরই কর বাড়ির আরেকজন যুবক আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। তবে প্রচার কাজে আমার আর অনঙ্গর উৎসাহই ছিল সবচেয়ে বেশি। টিনের চোঙায় মুখ লাগিয়ে হাটে হাটে গিয়ে বক্তৃতা দিতাম। আমাদের আশেপাশের গ্রাম গুলোর বর্ণহিন্দুদের বাড়ি বাড়ি ঘুরেও প্রচারকাজ চালিয়েছি'। [পৃষ্ঠা- ২০৪-০৫]

জীবনসায়াহ্নে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ভারত যান ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী। প্রথমে অসম্মতি জানালেও ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিশেষ তদারকিতে ভিসা দিতে সম্মত হয় পাকিস্তান সরকার। প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে ভারতে যাবার প্রাক্কালে বিবৃতি দেন তিনি। জীবদ্দশায় এটিই তাঁর শেষ বিবৃতি। ১১ জুন (১৯৭০) বিবৃতিটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত *দৈনিক আজাদ* ও *দৈনিক সংবাদ* পত্রিকায় ছাপা হয়। সে সময় পাকিস্তানে নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছিল। ৭০ সালের এই নির্বাচনটি ছিল পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহারাজের বিবৃতিটিও ছিল এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই। আগামী নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে তিনি দেশবাসীকে সৎ ও দেশপ্রেমিক প্রার্থীদের নির্বাচিত করার আহবান জানান।

তিনি বলেন– 'আগামী নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগামী নির্বাচনের উপর জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। কারণ যাহারা নির্বাচিত হইবেন, তাঁহারাই শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন। এজন্য প্রয়োজন যাহাতে উপযুক্ত ও যোগ্য লোক নির্বাচিত হয়। এখন উপযুক্ত লোক কে? যিনি দেশপ্রেমিক, বিদ্বান ও সৎলোক তিনিই উপযুক্ত লোক। এইরূপ নির্বাচিত সদস্যগণ জাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া জাতির কল্যাণের জন্য শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন। সদস্য নির্বাচিত হইবে ভোটারদের ভোটে। ভোটারগণ যেরূপ বীজ বপন করিবেন, ফলও সেইরূপ পাইবেন। এজন্য ভোটারদের দায়িত্ব অত্যন্ত অধিক। ভোটারগণ যেন স্বাধীনভাবে ভোট দেন। তিনি প্রসঙ্গত বলেন, স্বাধীনতা লাভের পর হইতে এ পর্যন্ত কোন স্থায়ী শাসনতন্ত্র রচিত হইল না, ইহা জাতির পক্ষে অত্যন্ত কলংকের বিষয়। কিছু লোকের মনে সন্দেহ আছে ইলেকশন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে না, আবার মার্শাল ল' জারি হইবে। একশ্রেণীর লোক নির্বাচন পণ্ড করিতে চান, দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করিতে চান। যাহারা দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করিতে চান তাহারা জাতীর কল্যাণকামী নহেন। আগামী নির্বাচনের সময় যাহাতে দেশে শান্তি বজায় থাকে এবং নির্বাচন পর্ব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় সেদিকে দেশবাসীর সর্তক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।'

অবশেষে ১৯৭০ সালের ২৪ জুন যশোরের বনগাঁ সীমান্ত দিয়ে মহারাজ ভারতে প্রবেশ করেন। এসময় সীমান্তে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ অশ্রুসজল নয়নে তাঁকে বিদায় জানান। ভারতে পৌঁছে নানা অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। পুরনো বন্ধু, সহযোদ্ধা, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা করেন, কথা বলেন। সফরে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ হয় ভারতের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী, ও সংসদ সদস্যদের সাথে। সেখানে পাকিস্তানী শাসক দ্বারা নির্যাতিত পূর্ব-বাংলার মানুষের পাশে থাকার জন্য ভারতের শীর্ষ নেতৃত্বের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। তবে সে আহ্বান প্রকাশ্যে ছিল না। পূর্ব বাংলার স্বাধীনতাকামী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের পক্ষে তিনি আলোচনা করেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রশংসা করেন। তাঁর পাশে থাকার জন্য তাঁদের পরামর্শ দেন মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ। এর প্রমাণ পাওয়া যায় 'বাঙালির জাতীয় রাষ্ট্র' বইতে- 'শেখ মুজিব শ্রী চিত্তরঞ্জন সূতারকে ভারতে গিয়ে ইন্দিরা গান্ধী ও ভারতীয় সরকারের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার দায়িত্ব দিয়ে বঙ্গবন্ধুর বিশেষ দূত হিসেবে কলকাতায় অবস্থান করার ব্যবস্থা করেন। '৬৯ সালে হাইকোর্টে রিট আবেদনের মাধ্যমে শ্রী সূতার জেল থেকে বেরিয়ে মুজিবের দূত হিসেবে কলকাতায় অবস্থান নেন। অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও দক্ষতার সাথে শ্রী সূতার ভারত সরকারের কাছ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে সাহায্য, সহযোগিতা ও সহানুভূতি আদায় করতে সক্ষম হন। এই সময়ে মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী চিকিৎসার জন্য ভারতে যান এবং তিনিও দূতিয়ালিতে সাহায্য করেন। এমনকি হানাদারবাহিনির আক্রমণে দিশেহারা বাঙালিকে ভারতে আশ্রয় দেয়ার ব্যাপারে ভারতকে সহজে রাজি করানোর বিষয়ে শ্রী সূতার এবং ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর অবদানকে ভোলা যায় না। [নিউক্লিয়াস বিএলএফ স্বাধীনতা-বাঙালির জাতীয় রাষ্ট্র- কাজী আরেফ আহমেদ (আবদুর রাজ্জাক ও সিরাজুল ইসলাম খান) সম্পাদনায়- স্কোয়াড্রন লিডার আহসান উল্লাহ্ (অব.)পৃষ্ঠা- ৪৯- ৫০]

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আর সময় নেই, তাই সবকিছু দ্রুততার সাথে চালিয়ে যান। প্রায় ৪৭ দিনের ভারত সফরের একদিনও বিশ্রাম নেননি তিনি। প্রতিটি দিন পার করেছেন অত্যন্ত ব্যস্ততার সাথে। ভারতের পার্লামেন্টেও ভাষণ দিয়েছেন। এটি তাঁর জন্য বিশাল এক প্রাপ্তি। মৃত্যুর তিনদিন পূর্বে ১৯৭০ সালের ৬ আগস্ট দিল্লির পার্লামেন্টে এমপিদের সংবর্ধনার উত্তরে তিনি এই ভাষণ প্রদান করেন। মহারাজ সেদিন বাংলা ভাষাতেই ভাষণ রেখেছিলেন।

ভাষণে তিনি বলেন– 'আজ যদিও আমি পাকিস্তানী নাগরিক কিন্তু ভারতবর্ষ যখন ব্রিটিশের অধীন ছিল তখন ইন্দো-পাক মিলিত এই অখণ্ড মহাদেশের স্বাধীনতার জন্য আমিও সংগ্রাম করেছি। আজ দেশ স্বাধীন– একজন স্বাধীনতা-সংগ্রামী হিসেবে আমি আজকের ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়কে এর জন্য গর্ববোধ করতে বলবো। আমি মনে করি এ উপদেশ দেওয়ার অধিকার আমার আছে। কারণ আজ তারা যে স্বাধীনতা উপভোগ করছে আমি সেই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একজন। উভয় দেশের যুবসম্প্রদায়ের কাছে আমি এই আবেদন রাখবো তারা যেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, সংগ্রাম করে অনগ্রসরতার বিরুদ্ধে এবং সর্বোপরি চেষ্টা করে শঙ্খলাপরায়ণ হতে, যাতে করে তাদের মাতৃভূমি জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করে।'

এর ঠিক দুই দিন পর ভারতের স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে ৯ আগস্ট রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে অনন্তের পথে পাড়ি জমান মহারাজ। তাঁর প্রায়ানের সংবাদ পেয়ে শ্রী সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের বাসভবনে মহারাজকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ছুটে আসেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। রাষ্ট্রপতির পক্ষে শ্রদ্ধা জানান তাঁর এডিসি। এসময় অনেক সংসদ সদস্য সেখানে উপস্থিত হয়ে মহারাজের মৃতদেহে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে গভীর শ্রদ্ধা জানান। শ্রদ্ধা জানান পাকিস্তানের হাই কমিশনার সাজ্জাদ হায়দার। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারি তাজউদ্দীন আহমদ মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে এক বিবৃতিতে বলেন, 'মহারাজ ছিলেন এই যুগের একজন মহামান্য ব্যক্তি। তাঁহার পরলোক গমনে আমরা এই উপমহাদেশের একজন মহান দেশপ্রেমিককে হারাইলাম।'

সেই মহান বিপ্লবীর ৫০তম প্রয়াণে আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা।

ফয়সাল আহমেদ
লেখক ও গবেষক

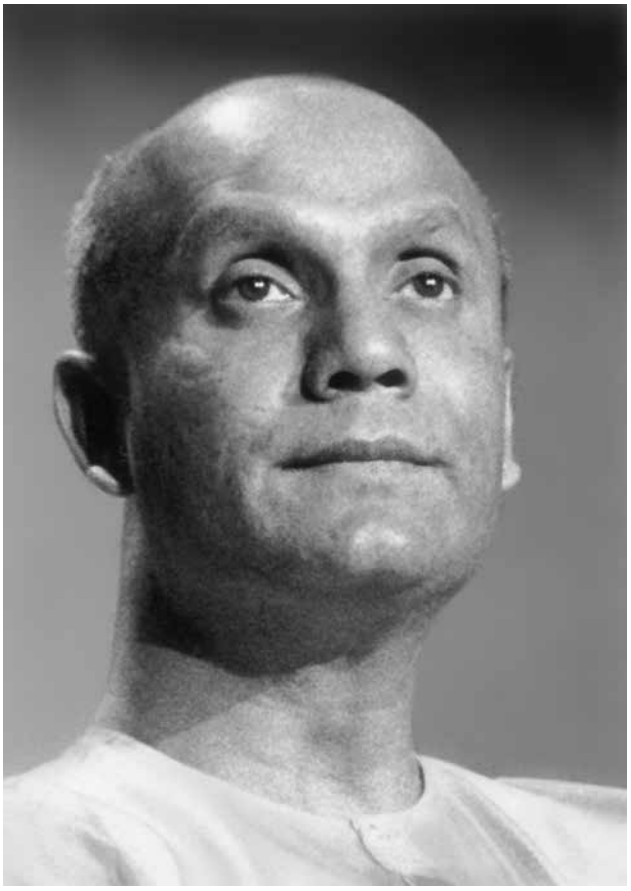

শ্রদ্ধাঞ্জলি

অচেনা শ্রীচিন্ময়

গাঁয়ের যোগী সাগরপারে

শংকর

সাম্প্রতিককালে পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় প্রবাসী বাঙালির নাম কী? এ বিষয়ে আমার মনে যত জিজ্ঞাসা ছিল তার অবসান ঘটেছিল ১৯৮৬ সালে আচমকা নিউইয়র্কে ইউনাইটেড নেশন্স ভবনে এসে।

না, এই শ্রদ্ধেয় মানুষটি কলকাতার নাগরিক নন, যদিও কলেজ স্ট্রিটের চক্রবর্তী-চ্যাটার্জির দোকানে তিনি বেশ কয়েকবার বই কিনতে এসেছেন। আমাদের বইপাড়া তাঁর খুব ভাল লেগেছিল। পৃথিবীর সবচেয়ে ঐশ্বর্যময়ী নগরী নিউইয়র্কে যিনি পরম সম্মানের সঙ্গে তাঁর প্রিয় সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন সেই মানুষটির সঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশের বৃহত্তম জনপদের প্রায় কোনওরকম যোগাযোগ ছিল না বলতে একটু সংকোচ বোধ করছি। স্বামী বিবেকানন্দ জন্মেছিলেন খাস কলকাতা শহরে। বিশ্বব্যাপী ইসকন কৃষ্ণ আন্দোলনের নেতা প্রভুপাদ এ সি ভক্তিবেদান্ত ওরফে অভয়চরণ দে জন্মেছিলেন কলকাতায়। বিরাট এক নগরীতে গড়ে-ওঠার মানসিকতা নিয়েই ভারতবর্ষের জন্যে পশ্চিমের সিংহদ্বার খুলতে তাঁরা সাগরপারে পাড়ি দিয়েছিলেন এবং অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

এবার অবশেষে নিউইয়র্কে আমি যার মুখোমুখি দাঁড়াবার সৌভাগ্য অর্জন করলাম তাঁর জন্ম চট্টগ্রামে বোয়ালখালী থানার অন্তর্গত এক গণ্ডগ্রামে। প্রথম দর্শনে গ্রামের নামটা জানা হয়নি, কারণ এই ধরনের সাধকরা নিজের অতীত সম্পর্কে বিশেষ কথা বলতে আগ্রহ দেখান না। কিন্তু নিকটতম নদীর নাম জানা হয়ে গিয়েছে– কর্ণফুলী। এই নদীই দীর্ঘ দ্বাদশ বছর ধরে একটি দুরন্ত বঙ্গীয় বালকের সংখ্যাহীন খেয়ালিপনার সঙ্গিনী হয়েছিল। সেই নদীর প্রাণশক্তিই এই ১৯৮৬-তে প্রাণময়ী হয়ে রয়েছে পঞ্চান্ন বছরের বিনম্র মানুষটির মধ্যে, যিনি এখনও পাতলা টেরিকট্সের শাদা পাঞ্জাবি, শাদা ধুতি এবং পাম্পশু পরে আমাদের প্রজন্মের টিপিক্যাল বাঙালির ভাবমূর্তি বিদেশে সম্পূর্ণ অক্ষত রেখেছেন। আর প্রবাসী মানুষটি নিরন্তর এমন সব অসম্ভব কাজ করেছেন যার মুগ্ধ স্বীকৃতি রয়েছে জানা-অজানা নানা দেশের নতমস্তক কিন্তু কীর্তিমান নরনারীর সশ্রদ্ধ নমস্কারে।

অথচ কী আশ্চর্য! আমাদের এই বাংলায় শ্রীচিন্ময়কুমার ঘোষের নাম এখনও প্রায় অজানা বললেই হয়। ১৯৬৭ সালের প্রথম বিদেশযাত্রার প্রায় বিশ বছর বাদে সাতদিনের নোটিসে আবার যখন মার্কিন দেশ পুনঃভ্রমণের সুযোগ এল তখনই ঠিক করেছিলাম বিদেশের মাটিতে এবার এমন কিছু ভারতীয় কীর্তিমানের সন্ধান করব যাঁরা নিজেদের প্রতিভায় ও সাধনায় বিদেশি হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনটি সংগ্রহ করেছেন।

বিদেশে যাবার আগেই আনন্দবাজার পত্রিকাঅফিসের উদ্যোগী সম্পাদক অভীককুমার সরকারের ঘরে বসে কিছু নামধাম সংগ্রহ হল। সম্পাদকীয় কক্ষে কেউ কেউ বললেন– অমুকবাবু জীব-বিজ্ঞানে বিদেশে খুব নাম করেছেন, অমুক এখন শল্যচিকিৎসায় বিশ্ববিদিত, অমুক এখন অর্থনীতিতে প্রায় একনম্বর, অমুকবাবু সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক যন্ত্র তৈরি করে এমন এক ব্যবসায় নেমেছেন যার খ্যাতি এখন বিশ্বজোড়া। খুব ভাল লেগেছিল এই তালিকা সংগ্রহ করতে। আরও ভাল লেগেছিল সেই তালিকার মধ্যে কয়েকজন বোস, চক্রবর্তী, সেন, গুপ্ত ইত্যাদির সহজ সন্ধান পেয়ে। কিন্তু অস্বীকার করতে লজ্জা নেই, সেই তালিকার তলার দিকেও কোনও ঘোষের উল্লেখ্য ছিল না।

আমার এই হঠাৎ দ্বিতীয়বার বিদেশে পাড়ি দেওয়ার ভিতরের কাহিনিটা অন্যত্র সবিস্তারে পাঠকের কাছে নিবেদন করেছি। স্বদেশ অথবা বিদেশ কোনও ভ্রমণই যে আমার ধাতে সয় না তা অনেকেরই এখন অজানা নয়। আমি হচ্ছি সেই ধাতের ঘরকুনো যে শুতে পেলে বসতে চায় না, বসতে পেলে দাঁড়াতে চায় না, দাঁড়াতে পেলে যার হাঁটার কথাই ওঠে না! যে নামহীন বঙ্গীয় মনীষী বহু বছর আগে বাঙালির কানে-কানে অঋণী এবং অপ্রবাসী হয়ে ঘরের দুধ-ভাত খেয়ে নিজের চেনা পল্লী-বটছায়ায় জীবনযাপনের মহামূল্যবান পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনিই আমার নমস্য। সেই দুরদর্শী পুরুষও আমার শ্রদ্ধাভাজন যিনি হুজুগে বাঙালিকে হুঁশিয়ার করেছিলেন– ঘরের খাও, কিন্তু প্লিজ বনের মোষ তাড়িও না। রক্তের মধ্যে ঘুরে বেড়াবার নেশা চাগাড় দিলে যতখুশি ভ্রমণসাহিত্য পড়, তাতে মন না ভরলে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিনের গ্রাহক হও, কিন্তু কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে, বুক পকেটে পাসপোর্ট নিয়ে কিছুতেই বিদেশ-বিভূঁইয়ে রওনা দিও না।

ট্রাভেল এজেন্সির বড় মেমসায়েব, অথবা ট্যুরিজম কর্পোরেশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানকে তামা-তুলসী ছুঁয়ে স্বীকারোক্তি করতে বলুন, সবাই চুপি চুপি মেনে নেবেন, নিজের ঘরের কোণের মতন নিরাপদ সুখপ্রদ স্থান বিশ্বভুবনে নেই– নার্থিং লাইক হোম। নার্থিং লাইক নিজের চৌকি– সে যতই নড়বড়ে হোক!

এই সব অকাট্য যুক্তির পরেও যদি জাম্বো জেটের বিমানবালাদের মোহিনী হাসি রঙিন ম্যাগাজিনের বিজ্ঞাপন-পাতা থেকে বেরিয়ে এসে কাউকে নীতিভ্রষ্ট হবার আমন্ত্রণ জানায়, তাহলে অগতির গতি রবি ঠাকুরের শরণ নিতে হবে। মহাকবি অতি চমৎকার ভাষায় অযথা বহুদেশ ঘুরে ঘুরে ঘরের কাছে শিশিরবিন্দুকে অবহেলা না-করার স্ট্রং অ্যাডভাইস দিয়েছেন।

আমাদের ঘরকুনো সোসাইটি এখনও রেজিস্ট্রিকৃত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেনি। কিন্তু আমরা কয়েকজন সমভাবাপন্ন বঙ্গপুঙ্গব প্রায়ই জনসাধারণকে বলে আসছি, যদি কিছু দেখতেই হয়, ঘরের কাছে কলকাতা দেখুন। এক নয়, পর পর সেভেন জেনারেশন ধরে এ শহরের লীলাখেলা অবলোকন করলেও সিকিভাগ দেখা হবে না। জেনুইন বাঙালি হয়ে জন্মে আপনার কিসের দুঃখ যে আচমকা বিবাগী সেজে বিদেশে যাবেন?

শুনুন, বিদেশ যাবার হাজার হাঙ্গামা। পাসপোর্ট অফিসে সিভিলিয়ান ড্রেসে বিদেশের চোরাগোপ্তা পুলিশ নতুন নামে বসে আছেন। তাঁদের চাপা হুঙ্কার– তুমি কে বট হে? সুখে থাকতে কেন বিদেশে যাবার ভূত তোমায় কিলোচ্ছে? তাঁরা গোপনে-গোপনে মোটা মোটা সরকারি খাতাপত্তর মেলাবেন– কবে কোথায় কোন নাম আপনি কী গর্হিত কম্মো করেছেন। কোন অভিযোগে স্বনামে অথবা বেনামে আপনি জেল হাজতে বসবাস করেছেন? আপনার বিরুদ্ধে কোথাও কোনও দেওয়ানী অথবা ফৌজদারী মামলা ঝুলছে কি না? রাষ্ট্রবিরোধী কিংবা বিচ্ছিন্নতাবাদী কোন কোন অপকর্মের সঙ্গে আপনার প্রকাশ্য অথবা গোপন যোগসাজশ রয়েছে? কিংবা কিঞ্চিৎ বিদেশি মুদ্রার লোভে আপনি দেশের শত্রুদের সঙ্গে ক্রিকেট যোগাযোগ রেখে ভারতমাতাকে কোন গভীর গাড্ডায় ফেলবার তালে আছেন, ছা-পোষা লোক হিসেবে বিখ্যাত কপি-পোসা আইনের খপ্পরে আপনার পড়বার চান্স আছে কি না, তা-ও বাজিয়ে দেখা হবে– অর্থাৎ বিদেশি মুদ্রায় বিদেশি বাণিজ্যে টু-পাইস করে আপনি গরিব ভারতমাতাকে কাঁচকলা ঠেকাচ্ছেন কি না তা-ও অতি সাবধানে বিচার-বিবেচনা করা হবে।

বিদেশি সাব-ইনস্পেক্টরবাবুর দরবারে এই সব প্রশ্নের আশানুরূপ সমাধান হলেও আপনার হাঙ্গামা শেষ হচ্ছে না। বিদেশের সরকার যদি আপনাকে তাঁদের দেশ থেকে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দেন তাহলে আপনাকে জননী-জন্মভূমির নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরিয়ে আনার খরচাপাতি কীভাবে মেটানো হবে তার আগাম হিসাবও আপনাকে দাখিল করতে হবে।

নিজের দেশে জন্মে একই চৌহদ্দির মধ্যে সারাজীবন চরে বেড়ানোর একটা মস্ত সুবিধে, কারও পিতৃদেবের সাহস হবে না আপনাকে এই সব আজেবাজে প্রশ্ন করে ঘাঁটাবার।

স্বদেশের মাটিতে দিশিভায়ের খোঁচামারা কোশ্চেন তবু তো সহ্য হয়! কিন্তু অজানা দেশের এয়ারপোর্টে পাসপোর্ট ও ভিসা থাকা সত্ত্বেও ভিনদেশের ইমিগ্রেশন-রমণী আপনার দিকে রবফ-ঠাণ্ডা চোখে এমনভাবে বিষদৃষ্টি হানবেন যেন আপনি কোনও মহা অপকর্ম করবার জন্যেই নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে ভিনদেশের দরজায় হাজির হয়েছেন।

মিষ্টি-মিষ্টি কণ্ঠে হাড় জ্বালানো সব প্রশ্ন: কেন আসা হয়েছে? কী কী কাজে এখন মন দেওয়া হবে? পরের দেশে ঢুকে পড়ে পাকাপাকি

গেড়ে বসবার কোনও কুমতলব নেই তো? টক-ঝাল প্রশ্ন শুরু হলে আর থামতে চাইবে না।

ইমিগ্রেশন-দিদিমণিকে আপনি হয়তো অনেক কষ্টে সন্তুষ্ট করলেন। কিন্তু তাতেও মুক্তি নেই। তিনি কম্পিউটারের সঙ্গে টুকটাক কথাবার্তা বলে আপনাকে আর এক কদম এগোতে দিলেন। অমনি ফ্রাইং প্যান টু ফায়ার– অর্থাৎ আপনি কাস্টমসের খপ্পরে পড়লেন।

কাস্টমস বলতে ছোটবেলায় ইংরেজি অভিধানে পড়েছিলাম আচার-ব্যবহার– কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এঁরা ইউনিফর্ম-পরা একদল সন্দেহবাজ লোক, যাঁদের ধারণা আপনি স্পেশাল কায়দাকানুন করে গাঁজা-সিদ্ধি-চরম অথবা সোনা-রুপোর বাট নিয়ে নিরীহ একটি দেশের নৈতিক চরিত্র এবং অর্থনীতি ডোবাতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন, কিন্তু সদাসতর্ক 'কাস্টমসদা' তা কিছুতেই হতে দেবেন না।

এ ছাড়াও তৃতীয় এক ভাবনা সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে ভ্রমণ-হাঙ্গামায়। বেশ, আপনি পরের দেশে ঘরজামাই থাকতে কিংবা গাঁজা বেচতে আসেননি ভাল কথা, কিন্তু আপনি যে বিমান অথবা বিমানবন্দর বোমা মেরে উড়িয়ে দেবার প্যাঁচপয়জার কষছেন না তার গ্যারান্টি কোথায়?

আপনি বলবেন, রাইস ইটিং ভেতো বাঙালি আমি। মুখের ভাব দেখে মানুষ চিনলেন না, এতদিন আরক্ষা লাইনে থেকেও! তাহলে শুনবেন, তথাকথিত নিরীহ, যারা ভাজা মাছ বা ফ্রায়েড ফিশ উল্টে খেতে পারে মনে হচ্ছে না, তাদের মাসতুতো ভাইরাই মহাশূন্যে বিরাট-বিরাট প্লেন হাইজ্যাক করেছে। চান্স পেয়ে পাঁচ টাকার চোর কোটি-কোটি ডলার পণ দাবি করেছে। আগে বাঙালি পুত্রের ভাগ্যবান বাপই মেয়ের বাপের কাছ থেকে বরপণ দাবি করত। এখন মওকা পেলেই দুনিয়ার যে-কোনও লোক মুক্তিপণ চেয়ে বসে। অথচ পণপ্রথার কালিমা কেবলমাত্র ইন্ডিয়ান জাতের ওপরেই থেকে গেল!

যাই হোক, এই সব দুঃখেই কুড়ি বছর আগে পাওয়া নিজের পাসপোর্টকে চিরকালের জন্য অকেজো করে মনের সুখে গঙ্গার হাওয়া খাচ্ছিলাম। কিন্তু কপালে দুঃখ লেখা ছিল, কুড়ি বছরের পুরনো বিষ আবার শরীরে ফুটে বেরুল, আমি পাকেচক্রে সাতদিনের নোটিসে মৃত পাসপোর্টকে পুনর্জীবিত করে আবার আমেরিকায় হাজির হলাম।

কোথায় কী অঘন ঘটল? কে যাতায়াতের ব্যবস্থা করল? ইমিগ্রেশন রমণী আমাকে কীভাবে একাধিকবার হাতের লেখা প্র্যাকটিস করতে বললেন, জন এফ কেনেডি এয়ারপোর্ট দেখে আমার দিশেহারা অবস্থার কী পরিণতি ঘটল এবং কীভাবে হাতে-বাঁধা তাবিজের কল্যাণে সব বাধাবিপত্তি ডোন্টকেয়ার করে আমি ওয়াহো রাজ্যের ক্লিভল্যান্ড শহরে ধুতি-চাদর পরা প্রবাসী বঙ্গীয় সমাজের খপ্পরে পড়লাম সেসব সংবাদ অন্যত্র যথাসময়ে নিবেদন করেছি। আপাতত ধরে নিন আমি নিউইয়র্কে।

আমি আছি ম্যানহাটান দ্বীপপুঞ্জে ইউএন বিল্ডিংসের খুব কাছে। যিনি আমাকে পরমানন্দে সাময়িক আশ্রয় দিয়েছেন, বয়সে তরুণ হলেও তিনি এক কেষ্ট-বিষ্টু ব্যক্তি– ইউএন অফিসের তাবড়-তাবড় স্থায়ী প্রতিনিধি তাঁকে কথায়-কথায় হিজ এক্সেলেন্সি বলে সম্মান প্রদর্শন করেন। নাম জনাব আনোয়ার-উল করিম চৌধুরী, আমার 'জয়'। ইউএনও-তে বাংলাদেশ সরকারের দু'নম্বর স্থায়ী প্রতিনিধি। এক নম্বর পদ খালি, সুতরাং অস্থায়ী চার্জ দ্য মিশন।

এত সায়েবসুবো টেলিফোনে এবং সামনাসামনি আমার স্নেহভাজন এই বঙ্গসন্তানটিকে 'ইওর এক্সেলেন্সি' বলছে শুনে কান জুড়িয়ে গেল। মনে হল বঙ্গজনম সার্থক হল। জিন্দা রহো বাংলাদেশ! জয় বাংলা বলতে লোভ হচ্ছিল, কিন্তু সম্প্রতি-ছড়ানো চোখের রোগটির ডাকনাম স্মরণ করে চুপচাপ থাকাই প্রশস্ত মনে হল।

ম্যানহাটানে আনোয়ারের বাড়িতে বসেই বিদেশে বিখ্যাত বাঙালিদের সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। সম্পাদক অভীক সরকার নিজের ঠাণ্ডাঘরে বসিয়ে পই-পই করে বলে দিয়েছেন, নতুন-নতুন জিনিস দেখে আসতে হবে। 'মনে রাখবেন, সাতষট্টি সালের বিদেশ-ভ্রমণ থেকে 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' লিখে খোলা মাঠে গোল করেছিলেন। এখন এই ১৯৮৬ সালে আমেরিকা সবার অত্যন্ত জানা দেশ, ওদেশ সম্বন্ধে যত লেখার বিষয় ছিল তা এই ক'বছরে প্রায় সব লেখা হয়ে গিয়েছে– সুতরাং অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে অনাবিষ্কৃত দৃষ্টিকোণ খুঁজে বার করতে হবে।'

সম্পাদকের এই সাবধানবাণী বিদেশে আমার সব সুখ কেড়ে নিয়েছে, কিছুই প্রাণভরে উপভোগ করতে পারছি না। হাজার-হাজার শিক্ষিত বাঙালি ঘন-ঘন আমেরিকায় আসছেন-যাচ্ছেন। তাঁদের সবারই চোখদুটো ভগবান একই জায়গায় এঁকেছেন– সুতরাং দৃষ্টিকোণ নতুন হবে কী করে? ক'দিনে বিদেশে ঘুরে-বেড়িয়ে অজানা এমন কী দেখা যাবে যার সম্বন্ধে এখনও লেখা হয়নি? ঘরে ফিরে গিয়েই লিখতে বসতে হবে এই দুশ্চিন্তা নিয়ে যে মানুষ ভ্রমণে বের হয় তার মত অভাগা এই পৃথিবীতে কে আছে?

বিখ্যাত বাঙালি বলতে নিউইয়র্কে বিশ বছর আগে (১৯৬৭) রবিশঙ্করকে দেখেছিলাম। তখন সারা বিশ্বে প্রচণ্ড নাম-ডাক তাঁর। আমার নামের পাশেও একটা শংকর থাকায় কিছুটা সুবিধেও হয়েছিল। দু'একটি কিশোরী শ্বেতাঙ্গিনী জানতে চেয়েছিলাম আমি ও রবি আত্মীয় কি না? রবিশঙ্কর ইতিমধ্যে দেশে ফিরে গিয়েছেন। চোখের সামনে সারাক্ষণ না থাকলে এদেশের মানুষ কাউকে মনে রাখতে চায় না, একমাত্র যিশুখ্রিস্ট ছাড়া। আর একজন কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই অন্য রেকর্ড করবেন– বাংলাদেশের হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী, ইউএন জেনারেল অ্যাসেমব্লির গদিতে বসবার আগেই আমি নিউইয়র্ক ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

বিদেশে বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিতে, ব্যবসায় ও পেশায় কৃতী ভারতীয়র তালিকা আমার নোটবইয়ে ইতিমধ্যে কিছু লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু আনোয়ার-উল করিম চৌধুরী হঠাৎ শ্রীচিন্ময়কুমার ঘোষের কথা তুলল। আমি ওঁর সম্বন্ধে কোনও খোঁজখবর রাজি না শুনেও সে কিছুটা অবাক হল। 'শ্রীচিন্ময়ের নাম সত্যিই কলকাতায় আপনারা শোনেননি?'

অপরাধ নতমস্তক স্বীকার করে নিতে হল। স্বভাবে আনোয়ার অতি শান্ত ও বিনয়ী। কিন্তু হাবেভাবে সে যা বলল– গেঁয়োযোগী নিজের গাঁয়ে ভিখ পায় না, কিন্তু অন্য গাঁয়ে পূজা পেলে সে খবর তার নিজের গাঁয়েও অবিলম্বে ছড়িয়ে পড়ে। বাঙালিদের চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা– কোনও মানুষের সামান্য মঙ্গলও পরশ্রীকাতরদের পক্ষে অসহনীয় হয়ে ওঠে।

আনোয়ার বলল, 'চলুন আপনাকে ইউএন ঘুরিয়ে আনি।'

বিশাল ভবনটির একের পর এক তলা ওর সঙ্গে যন্ত্রবৎ ঘুরে বেড়াচ্ছি। সেইসব জায়গা দেখছি, যা প্রায়ই সংবাদপত্রের শিরোনামায় উপস্থিত হয়। সেই সব সভাকক্ষ, যেখানকার আলাপ-আলোচনায় বিশ্বের 'কোটি-কোটি অসহায় মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হয়।

বেশ কয়েকটি তলা ঘোরার পর কফিশপে এসে আমার প্রদর্শক জিজ্ঞেস করল, 'স্পেশাল কিছু নজরে পড়ল?'

'নজরে পড়েছে, কিন্তু তুমি বয়োকনিষ্ঠ, বলতে সংকোচ বোধ করছি। মহিলাদের বেশবাস লক্ষ্য করে একটু উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠছি– আটলান্টিক পেরিয়ে এসে এত বেশি শাড়ি ব্লাউজ দেখব আশা করিনি। শাড়ি কি শেষ পর্যন্ত ইউ-এন বিজয় করবে? মেমসায়েবদের বেশ দেখায় কিন্তু এই শাড়িতে।'

'এই তো পয়েন্টে এসে গিয়েছেন!' বললেন আমাদের আর একজন বাংলাদেশি সঙ্গী, যিনি ইউনিসেফে কাজ করেন। তাঁর কাছে জানা গেল 'পৃথিবীর পাঁচ মহাদেশের শত শত মহিলাকে এখানে শাড়ি পরতে দেখবেন। শাড়ির নমনীয়তা ও সহজাত সৌন্দর্য এঁদের আকৃষ্ট করেছে ভেবে ভুল করবেন না। এর পিছনে রয়েছেন একজনই– তিনি শ্রীচিন্ময়কুমার ঘোষ।'

আমি আরও সজাগ হয়ে উঠলাম। শ্বেতাঙ্গিনী, কৃষ্ণাঙ্গিনী, চীনা, জাপানি সব রকমের শাড়ি পরিহিতা মহিলাই নজরে পড়ল। ইন্ডিয়ান সিল্কের প্রচারকরা নিজের চোখে এই দৃশ্য দেখলে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নৃত্য করতেন।

হাঁটতে-হাঁটতে এবার আরও বিস্ময়! শুনলাম, এইসব মহিলা নাকি শুধু শাড়িই পরেন না, সবাই বাংলা গান জানেন। এক আধটা নয়, কয়েক শত। আনোয়ার বলল, 'কিছুদিন আগে কার্নেগি হল-এ এক অনুষ্ঠানে এরা আমাকে অবাক করেছিল। কয়েকশ সায়েব-মেম শ্রীচিন্ময়ের নির্দেশে কয়েকডজন বাংলা গান শোনাল, এমন কি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতও।'

সেই সভায় ইউএনও-র অসংখ্যা দেশের জাঁদরেল সব প্রতিনিধি দল বেঁধে গিয়েছিলেন। সভাগৃহ একেবারে বোঝাই। ইউ-এন সেক্রেটারি জেনারেল তো বিশেষ ভক্ত, হুট বলতে চলে আসেন শ্রীচিন্ময়ের ডাকে। এবং এ ব্যাপারটা আজকের নয়– শুরু হয়েছিল উ-থান্টের সময়ে। তারপর যিনিই এ পদে বসেছেন তিনিই শ্রীচিন্ময়কে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছেন– কুর্ট ভেল্ডহাইম, দ্য কুয়েলার পর্যন্ত। কিছুদিন আগে জেনারেল অ্যাসেমব্লির সভাপতি ছিলেন Jorge Illueca (বাংলা উচ্চারণ জর্জ ইউয়েকো)– এখান থেকেই তিনি পানামার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন। ইনিও শ্রীচিন্ময়ভক্ত।

এবার আমার কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছে। খবরাখবর নেওয়া শুরু করলাম। সরকারি ব্যাপারে এই ইউএনও– নিজের দেশের সরকারি তকমা পরে এখানে সবাই আসেন। এর মধ্যে অদ্ভুত এক ব্যতিক্রম এই শ্রীচিন্ময় ঘোষ। সেক্রেটারি জেনারেলের আমন্ত্রণে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইউ-এস মেডিটেশন সেন্টার– প্রতি সপ্তাহে দু'দিন দুপুরে লাঞ্চ ব্রেকের সময় শ্রীচিন্ময় উপস্থিত থাকেন। তখন বেসমেন্টের সভাঘরে প্রবল উদ্দীপনা দেখা যায়। হয়তো দেখবেন কানাডার রাষ্ট্রদূতের পাশেই হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছেন সুইডেনের স্থায়ী প্রতিনিধি, তাঁর পিছনেই বসেছেন জাপানের সহকারী রাষ্ট্রদূত এবং কোরিয়ার প্রাবীণ প্রধান। একটু পরেই হয়তো হাজির হলেন ইউ-এন-ওর এক নম্বর দু'নম্বর কর্ণধাররা তাঁদের পাশের আসনটিতেই হয়তো একজন সাধারণ মহিলাকর্মী।

সপ্তাহে দু'দিন এঁরা এখানে আসবেনই– মনে হয় একশ পঁচিশটা দেশেই রয়েছে কিছু শ্রীচিন্ময়-অনুরাগী।

এই দু'দিন ছাড়াও প্রতি মাসে ইউএনও-র নিমন্ত্রণ শ্রীচিন্ময় ড্যাগ হ্যামারশিল্ড স্মৃতি-বক্তৃতা করেন। নানা বিচ্ছিন্নতাবোধের মধ্যেও ড্যাগ হ্যামারশিল্ড এখানে একটি অতি শ্রদ্ধেয় নাম। তাঁর একটি কথা শ্রীচিন্ময়ের খুব প্রিয়– 'যে শান্তি সবাইকে শান্তি দিতে পারে না তা শান্তি নয়।' এই স্মৃতি-বক্তৃতা চলেছে বছরের পর বছর ধরে, কিন্তু শ্রোতার এবং ভক্তের অভাব হয় না, প্রায়ই বসবার সব আসন বোঝাই হয়ে যায়।

যেখানে পদে-পদে এক দেশের প্রতিনিধির সঙ্গে আর-এক দেশের প্রতিনিধির মতভেদ সেখানে শ্রীচিন্ময়ের ব্যাপারে অনেকের একমত হওয়া বেশ আশ্চর্য ব্যাপার। এই তো কিছুদিন আগে ইউ-এন-ও-র চল্লিশতম জন্মবর্ষ উদ্‌যাপিত হল, কিন্তু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কোনও অফিসিয়াল বাণী দেওয়া হল না, এ বাণীর বয়ান নিয়ে দু'দলের মধ্যে প্রবল মতভেদ হল। কিন্তু বেসরকারিভাবে অনেকেই এলেন শ্রীচিন্ময়ের মেডিটেশন সেন্টারে। কর্তাব্যক্তিরা তাঁকে শুভদিন উপলক্ষে অভিনন্দন জানালেন। সেই ১৯৭০ সাল থেকে তিনি এখানে অসংখ্য মানুষের মধ্যে অধ্যাত্মচেতনা জাগ্রত করেছেন– ধর্মমত বিভিন্ন, কিন্তু তাতে কোনও বাধা সৃষ্টি হচ্ছে না।

আমার প্রদর্শকদের জরুরি কাজকর্ম ছিল। তারা একটি শ্বেতাঙ্গিনী শাড়ি পরিহিতার সঙ্গে আমার পরিচয় করে দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য বিদায় নিল। মেয়েটি আমাকে অবাক করে দিলে বলল, 'আমাকে ডেকো 'ঋজুতা' বলে।' এটা যে আমাদের দিশি নাম তা বুঝতে একটু সময় লাগল। মিষ্টি হেসে মেয়েটি বলল, 'পৃথিবীর নানা দেশ থেকে আমরা এসেছি এখানে। আমাদের সেতু হচ্ছেন শ্রীচিন্ময়।'

'মিস্টার চিন্ময় ঘোষ বলো না কেন?'

'বাঃ রে, শ্রীকথাটা কি কম মিষ্টি? দেখো, উনি আমাদের কোনও বন্ধের মধ্যে ফেলেন না। কিন্তু আমরা যখন ওঁর খুব কাছে আসতে চেষ্টা করি তখন ভাবি উনি কবে খুশি হয়ে আমাদের একটা বাংলা নাম দেবেন। বাংলা নাম পাবার জন্যে কত লোক পাগল! আমাদের মধ্যে এখানে পাবেন 'নয়না', 'নীলিমা', 'রঞ্জনা'।'

'বাংলা তো জানি না, কিন্তু ওঁর কাছে শব্দের মানে জেনে নিই– আমার নামের অর্থ স্ট্রেট– কোনও আঁকা-বাঁকা নেই। শ্রীচিন্ময় কখনও-কখনও আবার মজার নাম রাখেন ইচ্ছে করে– আমার এক বান্ধবীর নাম রেখেছেন 'লোভনীয়া'। হাউ সুইট!'

'এই মেয়েটির কি একটু-আধটু খাবারের লোভটোভ আছে?'

'ও নো। না না! শী ইজ অ্যাট্রাকটিভ! এই দুর্লভ শিক্ষা আমরা শ্রীচিন্ময়ের কাছে পেয়েছি।'

শুধু মেয়েদের নয়, পুরুষ সায়েবদের মধ্যেও বাংলা নাম পাবার জন্যে হুড়োহুড়ি। পৃথিবীর সেরা শহরের সেরা দরজির তৈরি সর্বাধুনিক সুট পরিহিত সুদর্শন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ, কিন্তু তার নাম 'কাঙাল'। ওই কাঙাল আসছে– কিন্তু নিজের চোখে ইউ-এন ভবনে তাকে রাজকীয়ভাবে না দেখলে মনে হত স্বপ্নে উলটোপুরাণের দেশ দেখছি।

কাঙাল শব্দটির ইংরেজি অর্থ যে 'বেগার' তা আমার নতুন পরিচিতাকে বিব্রত করল না। বলল, 'কাঙাল নিজেই বলেন উনি হলেন 'ডিভাইন বেগার'।'

আর একটি শাড়ি পরিহিতা শ্বেতাঙ্গিনী আমাদের দলে যোগদান করলেন। তরুণী, তন্বী ও সুন্দরী। আমার পরিচয় পেয়ে বললেন, 'তুমি কত ভাগ্যবান! তুমি বাংলায় জন্মেছ, তুমি বাংলা জানো। আমরা বাংলা জানি না, শ্রীচিন্ময় অনেক সময় বাংলায় কথা বলেন, আমরা আন্দাজে বুঝে নিই। তোমার মতন বাংলা জানা থাকলেও ওঁর আরও কাছে আসতে পারতাম।'

এঁদের প্রায় কেউই ভারতবর্ষে বা বাংলাদেশে আসেননি। কিন্তু

বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্মতা হয়ে যাবার জন্যে কী আন্তরিক চেষ্টা!

'কে তোমাদের শাড়ি পরতে বলেছে?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'কেউ না! শ্রীচিন্ময় খুশি হলেও হতে পারেন এই ভেবে নিয়ে আমরা শাড়ি পরে অফিসে আসি। উনি তো আমাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কিছুই বলেন না। মনে রেখো, অনেকেই ওঁর সভায় আসেন, নিজের-নিজের পোশাক পরে। ও-নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই কারুর।'

ইতিমধ্যে আমরা আবার একটা কফিকেন্দ্রে ঢুকে পড়েছি। শাড়ি পরিহিতা নবাগতা যে একজন ফরাসিনী তা বোঝা গেল। ফরাসিনীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী এমন শিক্ষা তোমার ওঁর কাছে পাও যা তোমাদের এমনভাবে বিস্মিত করে?'

'একদিন দুপুরবেলা আমাদের মেডিটেশনে এসো নিজেরা কানেই শুনবে। আজকাল বেশিরভাগ সময় অবশ্য নিস্তব্ধতা– কোনও কথাই হয় না, কিন্তু এমন একটা পরিবেশ গড়ে ওঠে যে আমরা আমাদেরা প্রশ্নের উত্তর নিজেরাই খুঁজে পাই। তারপরা কিছু কিছু গান হয়, আমরা যে যা পারি গাই– বেশিরভাগ বাংলা গান। এত বিভিন্ন ভাষার মানুষ উপস্থিত থাকেন, কিন্তু অসুবিধা হয় না– বাংলার সুর ওঁদের হৃদয়ে পৌঁছে যায়।'

আমি শিক্ষা সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ প্রকাশ করি। ফরাসি যুবতী কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'উনি আমাদের বলেন মানুষকে দেখলেই প্রথমে তার কী নেই তা মনে আনবে না– প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই তো রয়েছে সীমাহীন সম্ভাবনা।'

আমি বললাম, 'এই কথা আমাদের দেশে যুগযুগান্ত ধরে বলা হচ্ছে।'

'হাউ লাকি ইউ আর!' ফরাসি সুন্দরী এবার যেন আমাকে হিংসে করতে আরম্ভ করল। 'তোমরা, পূর্বদেশের লোকরা, মানুষের অমূল্য চিন্তার মণিমাণিক্য হাজার-হাজার বছর ধরে লুকিয়ে রেখেছ। এবার আমরা শ্রীচিন্ময়কে পেয়েছি, আস্তে-আস্তে কুড়িয়ে নেব আমরা, তোমাদের মত সব বুঝে নিতে একটু সময় লাগবে এই যা।'

আমাদের টেবিলে আর এক মহিলা এসে যোগ দিলেন। বললেন, 'আমি নতুন এসেছি– সবাইকে চিনি না– কিন্তু ধ্যানসভায় গিয়ে খুব শক্তি পাই। ওই দু'দিন আমি লাঞ্চ খাই না, সোজা ওখানে চলে যাই। সব বুঝি না, কিন্তু ভাল লাগে।'

ফরাসিনীর কাছে আমার এখনও কিছু জানবার আছে– জীবনযাত্রা সম্বন্ধে শ্রীচিন্ময়ের কোনও বিশেষ নির্দেশ আছে কি না?

'অনেকদিন ধরে যোগাযোগ রেখেছি। কখনও কিছু নির্দেশ দেন না। খুব ধরাধরি করলে বলেন, দিনি একবার ধ্যানে বোসো। যারা আরও এগোতে চায় তারা দিনে দু'বার। তবে আমরা সারাক্ষণ চেষ্টা করি খুঁজে বার করতে কিসে চিন্ময় খুশি হন। যেমন ধরো আমি স্মোক করতাম– ছেড়ে দিয়েছি। নিজের মন থেকেই যেন নির্দেশ পেলাম। ড্রাগের নেশা আমার ছিল না– দু'একজন নিজের অন্তরের তাগিদেই ড্রাগকে গুডবাই করেছে। মাংস আমি অফিসিয়ালি ছাড়িনি– কিন্তু মাংস আমার আর ভাল লাগে না, আমি এখন ওঁর মতন ভেজিটেরিয়ান হতে চাই।'

আমি সুন্দরীর দিকে তাকিয়ে আছি। সে হেসে বলল, 'আমি একবার ওঁকে একান্তে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনি সরল শিশুর মতন হেসে বললেন, 'যা নিজে ভাল মনে করবে তাই করবে'– ডুইং দ্য রাইট থিং– তাই চেষ্টা করি, মনে অনেক শান্তি পেয়েছি।'

উল্টোপুরাণের দেশে গভীরে ঢুকে যাচ্ছি আমি! এইসব যোগাযোগ, তন্ত্রমন্ত্র-তপস্যায় আমার তেমন বিশ্বাস নেই। যদিও ছোটবেলা থেকে মঠে-মিশনে আমার যাতায়াতের সুযোগের অভাব হয়নি। পশ্চিমের বিজ্ঞানী মন এখনও খুব বিচক্ষণ এবং যুক্তির ছাঁকনিতে যাচাই না করে কোনও কিছুই তারা গ্রহণ করে না, এই খবর আমার জানা ছিল। কিন্তু আমার অবস্থা বুঝুন। খোদ নিউইয়র্ক শহরে, ইউ-এন ভবনের কফি টেবিলে বসে আমি অতীত ভারতবর্ষের আকর্ষণে সম্মোহিত যুবক-যুবতীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছি। তারা বিশ্বাস করে সুখী হতে চায়।

মেয়েরা আমার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যে এবার নিচু গলায় গান ধরল। মেমরা গাইছে বাংলায়:

'নামিছে আজ আনন্দ প্লাবন
মৃদুল পবন প্রাণে করে আনন্দ বহন
ভাঙিছে মোর সকল বন্ধন
খুলিছে সব দ্বার
মিলি গেছে ব্যথাভার
যত অন্ধকার।'

মার্কিন, ফরাসী এবং ব্রিটিশ উচ্চারণেরা অবিশ্বাস্য ঐকতান! বাংলা কথাগুলো কিছু বুঝছি, কিছু হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না। কিন্তু বিপুল উদ্দীপনা বোধ করছি। মনে হচ্ছে এবার নিউইয়র্কে না এলে আমার ভারতসন্ধান অপূর্ণ থেকে যেত।

মেয়েটি খুব লজ্জা পাচ্ছে– উচ্চারণে দীনতার জন্য ক্ষমা চাইছে বার-বার। আর আমার লজ্জা ততই বাড়ছে। গানটি আমি বাংলায় লিখে নেবার চেষ্টা করে সফল হচ্ছি না দেখে একজন সুন্দরী বলে উঠল, 'আমি বাংলা অক্ষর জানি না। কিন্তু যদি তুমি কিছু মনে না করো, রোমান অক্ষরে লিখে দিতে পারি।'

অবাক কাণ্ড। অতি দ্রুত ছ'টা লাইন ইংরেজি অক্ষরে লেখা হয়ে আমার হাতে চলে এল। মার্কিন সুন্দরী বলল, 'গান শেখবারা আগে আমি এইভাবে লিখে নিই– দরকার হলে কম্পিউটার জমা করে রাখি।'

'কত বাংলা গান জানা আছে?'

আবার অবাক হবার পালা। দুশো-তিনশো বাংলা গান এদের কাছে কিছুই নয়। ওরা ততক্ষণে আমাকে নিজের নামে ডাকতে আরম্ভ করেছে। 'তুমি জানো শংকর, ওঁর যখন মুড আসে তখন শত-শত গান লিখে ফেলেন। তারপর নিজেই সুর দেন। আমরাও অভ্যেস করে নিই।'

'কিন্তু তোমারা কি অন্ধের মত অনুকরণ করো? না কিছু কিছু বুঝতে পারো?'

হাসল ফরাসিনী। 'আনন্দ প্লাবন আমরা বুঝতে পারি– ফ্লাড অফ ডিলাইট। কিন্তু তেমন বুঝতে পারি না– মৃদুল পবন প্রাণে করে আনন্দ বহন। 'লম্বু'র কাছে একবার বুঝতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ও বলেছিল ইন্ডিয়ান ওয়েদার এবং মেটিরিওলজি সম্বন্ধে ক্লিয়ারকাট আইডিয়া না থাকলে টোটাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং সম্ভব নয়।'

আমার ভাল লাগছে, আবার ভয়ও লাগছে। পূর্বদেশীয় গুরুদের সম্বন্ধে এখন সমস্ত মার্কিন দেশের জনসাধারণের যথেষ্ট সন্দেহ। এঁদের কয়েকজনেরা কীর্তিকাহিনি ফলাও করে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে– খুন জখম গুণ্ডামি স্বেচ্ছাচার কোনও কিছুই এই সব কাহিনি থেকে বাদ থাকেনি।

অধ্যাত্মবাদীদের সম্পর্কে জনগণের এই সন্দেহের কথা আমি

ইচ্ছে করেই তুললাম। মার্কিন যুবতী হাসল। 'ঠিক একই প্রশ্ন শ্রীচিন্ময়কে করেছিলেন একজন স্থানীয় সাংবাদিক। উনি কোনও রকম বিরক্তি না দেখিয়েই চমৎকার উত্তর দিলেন। বললেন, 'একই পরিবারের একজন ভাই হয়তো ভাল, আরেক ভাই হয়তো, খুব খারাপ। কিন্তু এই খবর থেকে সেই পরিবারের অন্য লোকেরা ভাল কি মন্দ আন্দাজ করাটা কি যুক্তিযুক্ত হবে?' কাগজটা আমার বাড়িতে আছে, তোমাকে দিতে পারি– এখানকার কাগজওয়ালারা কাউকে অন্ধভাবে স্তুতি করে না, লেখারা আগে অনেক কিছু বাজিয়ে দেখে।'

মহিলারা অতিমাত্রায় অতিথি-বৎসলা। আমাকে একবারও কফির দাম দেবার সুযোগ দিল না। শ্রীচিন্ময়ের দেশের লোক পেয়ে মৃদুল পবন কেমন করে প্রাণে আনন্দ বহন করে নিয়ে যায় তা জানবার চেষ্টা করতে লাগল পূজারিণীর প্রসন্নতায়।

ইতিমধ্যে আমার স্থানীয় গার্জেন নিজেদের কাজকর্ম সেরে কফিশপে ফিরে এল আমাকে বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে। আনোয়ার বলল, 'সুখবর আছে। আগামীকাল দুপুরে আপনি ইচ্ছে করলে ইউএন মেডিটেশন সেন্টারে উপস্থিত থাকতে পারেন। তার থেকেও সুখবর, শ্রীচিন্ময়ের সঙ্গে আপনার একান্তে দেখা হবার এবং কথাবার্তা বলার সম্ভাবনা রয়েছে। কোথায় দেখা হবে, কখন দেখা হবে তা আজ রাত্রেই জানা যাবে। আপনি একজন বিখ্যাত বাঙালির সঙ্গে পরিচয়ে জন্যে তৈরি হয়ে থাকুন।'

মেয়েরা বলল, 'কাল আবার দেখা হচ্ছে প্রার্থনাসভায়।'

আমি বললাম, 'আরও বাংলা গান গাইবে তো?'

ওরা বললো, 'সেটা নির্ভর করবে শ্রীচিন্ময়ের নির্দেশের ওপর। উনি যা চাইবেন আমরা তা করব।'

'সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই তীর্থক্ষেত্রে এসে শেষ পর্যন্ত গুরু-ফুরুর ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লেন!' শ্রীচিন্ময়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য আমি প্রস্তুতি হচ্ছি জেনে নিউ ইয়র্কের এক বাঙালি শুভানুধ্যায়ী মিস্টার সেন একটু চিন্তিত হয়ে উঠলেন।

এই ভদ্রলোক সন্ধেবেলায় বললেন, 'জ্ঞানকে কিভাবে মানুষের ভোগে নিয়োগ করা যায় তার জন্যে পৃথিবীর বৃহত্তম কর্মযজ্ঞ চলেছে নবীন এই মার্কিন মহাদেশে। জাপান-টাপান যাই বলুন, কেউ এখনো এর নখের যোগ্য নয়। সমস্ত কিছু মন দিয়ে লক্ষ্য করে দেশে ফিরে গিয়ে মানুষকে কোথায় বলবেন– হচ্ছে-হচ্ছে হবে-হবে মনোবৃত্তি ত্যাগ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাধনায় ঝাঁপিয়ে পড়ো, তা নয় এই বিদেশেও সাধু-সন্ন্যাসীর দিকে মন দিলেন!' আমার বিজ্ঞানীবন্ধু সেনসায়েবের কণ্ঠে কিছুটা উদ্বেগ, কিছুটা সমালোচনার সুর।

বললাম, 'যতটা খবর পেয়েছি, এই শ্রীচিন্ময় সাধুও নন, সন্ন্যাসীও নন। ভারতের যুগ-যুগান্তের চিন্তাধারার একজন বিশ্লেষক ও প্রচারক মাত্র।'

আরও বললাম, 'আমাকে ক্ষমা করুন, এই আধ্যাত্মিক মানুষদের সম্পর্কেই তো সায়েবদের যত আগ্রহ– রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, বিজ্ঞানে আমরা যতটুকু করছি তা পশ্চিমের মনে এখনও শ্রদ্ধার উদ্রেক করে না। স্রেফ জাপানের মতন স্বীকৃতিটুকু পেতেই বহু যুগ কেটে যাবে। অথচ অধ্যাত্মবাদের ভারতবর্ষ সম্পর্কে এদেশে এই মুহূর্তে সুবিপুল কৌতূহল।'

সেনসায়েব বললেন, 'শুনুন শংকরবাবু, গুরুর ভেক ধরে কত লোকা যে এদের ঠকাচ্ছে। এক-একজন এক-একটা 'কাল্ট'-এর সৃষ্টি করছে– তারপর রঙিন ফানুস ফেটে যাচ্ছে, ভারতবর্ষের বদনাম হচ্ছে। একটা কথা জেনে রাখবেন, এই দেশ ঠকতে রাজি নয়– কেউ ঠকালে এদের মেজাজ ঠিক থাকে না।'

'স্বামী বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, প্রভুপাদ এ সি ভক্তিবেদান্ত– কেউ তো এঁদের ঠকাননি। বাঙালি প্রভুপাদ সত্তর বছর বয়সে দুর্জয় মনোবল নিয়ে এই তো সেদিন নিউইয়র্ক সেন্ট্রাল পার্কে খোল-করতাল বাজিয়ে কীর্তন শুরু করে যে অবিশ্বাস্য সাফল্য অর্জন করলেন তা ভারতের ইতিহাসে এক আশ্চর্য ঘটনা। কিন্তু নিজের ঘরে বিবেকানন্দের মতন স্বীকৃতি তিনি আজও পেলেন না।'

সেনসায়েব সুরসিক, এককালে প্রচুর বাংলা চর্চা করতেন তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। মিষ্টি হেসে তিনি উদ্ধৃতি দিলেন; 'একদিকে প্রভুপাদের শেষ জীবন খুবই ড্রামাটিক।'

'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম/সর্বত্র হইবে প্রচার মোর নাম। দেশে থাকতে ছোটবেলায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবমঠে আমিও শুনেছিলাম। শ্রীচৈতন্যের এই বাণী যে এমনভাবে কারও সাধনায় সত্য হবে তা কল্পনার অতীত ছিল। আমেরিকায় খোল করতাল বাজিয়ে কৃষ্ণনাম প্রচার করে ভক্তিবেদান্ত তা সার্থক করলেন ১৯৬৫ সালে জীবনের সায়াহ্নবেলায়। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে কী হচ্ছে দেখুন!'

বিখ্যাত সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনে সেবারেই ইসকন সম্পর্কে কিছু দুশ্চিন্তা করার মতন খবর বেরিয়েছে– এঁদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল থাকছে না।

সেনসায়েব এবার একটি ছোটখাটো বিস্ফোরণ ঘটালেন। 'প্রভুপাদকে আমি শ্রদ্ধা করি, মাত্র বারো বছর বয়সে কার্তিক বোস ল্যাবরেটরির প্রাক্তন কর্মচারী বিদেশে যা করেছেন তা তুলনাহীন, কিন্তু সায়েবদের বোধহয় তিনি পুরোপুরি চিনতে পারেননি।'

'কী বলছেন, মিস্টার সেন!'

'আমি ঠিকই বলছি। ভারতীয় গুরুর সায়েব-ভক্ত দেখলে আমরা খুব আনন্দ করি। আমার কথা হচ্ছে, ভক্ত হিসেবে এদের সম্মান দেখান, কিন্তু ভুল করেও সায়েবদের কখনও গুরুর পদে বসাবেন না।'

আমার মুখের দিকে তাকালেন মিস্টার সেন। 'অভয়চরণ দে ওরফে ভক্তিবেদান্তের প্রথম ভুল হল– তিনি ওভার এস্টিমেটেড দ্য অ্যামরিকানস্। আমেরিকানরা কোনওদিন গুরু হতে পারবে না, এর জন্য ভারতীয়রা শত শত গুণ উপযুক্ত। যতই বলুন, এরা কৌতূহল দেখাতে পারে, ভক্তি করতে পারে, কিন্তু এদেশে সন্ন্যাস নেওয়া অসম্ভব ব্যাপার– নেক্সট টু ইম্পসিবল্। অপ্রিয় কথাটা হল, এদেশের ডিসিপ্লিন অফ লাইফ নেই যা ভারতবর্ষে অঢেল রয়েছে। সায়েব যদি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান হয়, তাহলে সে-প্রতিষ্ঠানও কোম্পানির মতন হয়ে যাবে। সন্ন্যাসী আমেরিকান অনেকটা সোনার পাথরবাটির মতন।'

'আপনি কি ভক্তিবেদান্তর কোনও গুণ দেখতে পান না।'

সসম্ভ্রমে জিভ কাটলেন মিস্টার সেন। 'একটা কথা ইতিহাসে থেকে যাবে– এত অল্প সময়ে প্রভুপাদের মতন কেউ কখনও ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে বিশ্বজয় করতে পারেনি।'

আমরা এবার আগামী দিনের প্রোগ্রামে ফিরে এলাম। জানালাম, শ্রীচিন্ময়ের ধ্যানকেন্দ্রে আমি যাচ্ছি এবং তাঁর সঙ্গে কিছু কথাবার্তা হবে আমার।

ইতিমধ্যে কী করছি জানতে চাইলেন আমার বিজ্ঞানীবন্ধু। বললাম, 'একটু লেখা-টেখা পড়ে নিচ্ছি। ভদ্রলোকের জন্ম ১৯৩১

সালের চট্টগ্রামে। বারো বছর বয়সে কোনও আশ্রমে চলে যান।'

'আশ্রমটা হল পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, আমি জানি।'

'একুশ-বাইশ বছর ওখানে ছিলেন। তারপর অভয়চরন দে'র মতন কী ইচ্ছা জাগল, সাগরপারে পাড়ি দিলেন। বিদেশে প্রতিষ্ঠিত হবার একটা মস্ত অ্যাডভেঞ্চার স্টোরি নিশ্চয় আছে তাঁর।'

সেন বললেন, 'এই অ্যাডভেঞ্চার স্টোরিগুলোই আসল গল্প– ভারতীয়দের এসব জানা দরকার। আমরা এমনিতে বড্ড নরম, কিন্তু বাঙালি যখন বেঁকে বসে কিংবা একটা কিছু করবে বলে গোঁ ধরে তখন সে দুনিয়ার নমস্য! এই গোঁয়ার বাঙালির সংখ্যা যাতে কমে না যায় তা দেখবার দায়িত্ব সাহিত্যিকদের। গোঁয়ার বাঙালি পারে না এমন কাজ নেই চাটগাঁয়ের ইংরেজি উচ্চারণ নিয়ে আপনার কলকাতায় এখনও হাসিঠাট্টা করেন, কিন্তু সেই চাটাগাঁইয়া এখানে হাজার হাজার সায়েবের নাকে দড়ি পরিয়ে ওঠাচ্ছেন বসাচ্ছেন।'

'যে শক্তিতে তা সম্ভব হচ্ছে তা বোধহয় অধ্যাত্মশক্তি। এই আধ্যাত্মশক্তির সামনে পশ্চিমের একটা অংশ শ্রদ্ধার মাথা নত করে, অথচ বৈজ্ঞানিক শক্তিতে আমরা যে নতুন ভারতবর্ষে গড়বার চেষ্টা করছি তার সম্বন্ধে অনুকম্পা ছাড়া আর কিছু নেই।'

আমিও আরও বললাম, 'শুনুন সেনসায়েব, শ্রীচিন্ময়কুমার ঘোষ যা লিখছেন বা বলছেন ভারতবর্ষের পক্ষে হয়তো না নতুন কোনও কথা নয়। তিনি বিদেশির জন্যে সরলভাবে প্রাচীন কথা বিশ্লেষণ করেছেন– 'যেখানে আনন্দ অনুপস্থিত সেখানে ভালবাসাও অনুপস্থিত। যেখানে ভালবাসা নেই সেখানে কোনও কিছুই নেই। যেখানে সত্য রয়েছে সেখানেই তো পূর্ণতা, যেখানে পূর্ণতা সেখানেই তো ঈশ্বরের উপস্থিতি।'

সেনাসায়েব আবার তাঁর প্রিয় বিষয় অ্যাডভেঞ্চারে ফিরে গেলেন। বললেন, 'শোনা যায়, শ্রীচিন্ময়কে এদেশে থাকবার জন্যে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। এখানকার দূতাবাসে কেরানির কাজও করেছেন বেশ কিছুদিন। সুযোগটা করে নিয়েছিলেন তাই ভাল, কারণ এদেশের ইমিগ্রেশন অফিসাররা বড়ই বেরসিক। গ্রিনকার্ড না থাকলে স্বয়ং যিশুখ্রিস্টকেও এরা নির্দ্বিধায় দেশছাড়া করে দেবে। একমাত্র রক্ষাকর্তা সব দূতাবাস– ডিপ্লোম্যাটরা যাকে খুশি টেমপোরারি নিয়োগপত্র দিতে পারে, নিরীহ আশ্রয়প্রার্থীকে নগর কোটালের হাত থেকে বাঁচাতে পারে। তাই দেখবেন, এমএ, পিএইচডি ডিগ্রি নিয়েও বাইরের লোক বিদেশি দূতাবাসে ড্রাইভারের চাকরি করছে– এইভাবে কয়েকটা বছর চালালে যদি আসল সবুজপত্র মিলে যায়।'

যে ভদ্রমহিলা দয়াপরবশ হয়ে চিন্ময়কুমার ঘোষকে ভারতীয় দূতাবাসে একটা কেরানির চাকরি জুটিয়ে দিয়েছিলেন তাঁকে মনে মনে নমস্কার জানালাম। ঐটুকু সাহায্য না পেলে, যিনি এক বিশ্বজোড়া অধ্যাত্ম আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যিনি হার্ভার্ড, ইয়েল, কেমব্রিজ, অক্সফোর্ডের মত শত শত বিশ্ববিদ্যালয় চষে বেড়াচ্ছেন তিনি পুনর্মুষিক হয়ে আমাদের দেশের কোনও মফস্বল শহরে জীবনের শেষ অধ্যায় রচনা করতেন। যে মানুষ একদিন গ্রিনকার্ডের জন্য কনিষ্ঠ কেরানি হয়েছিলেন আজ সমস্ত বিশ্বে তাঁকে নিয়ে টানাটানি– রবিবার তিনি নিউইয়র্কে তো সোমবার তিনি ওয়াশিংটনে, পরের দিন লন্ডন, তার পরের দিন প্যারিস কিংবা স্টকহোমে। জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, সুইডেন সর্বত্র তাঁর মেডিটেশন সেন্টার রয়েছে। সম্প্রতি আফ্রিকাতেও পা বাড়িয়েছেন– জামবিয়াতে একটি কেন্দ্র স্থাপিত হচ্ছে। জাপানেও কেন্দ্র রয়েছে।

সেনসায়েবকে বললাম, 'ভদ্রলোক নিশ্চয় একটি হিউম্যান ডাইনামো বিশেষ। লোকমুখে শুনলাম, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র ঘণ্টা দেড়েক বিশ্রাম নেন, বাকি সময় হাজার কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। ইউ-এন-ওর এক জাঁদরেল অফিসার বললেন, শত শত বই লিখেছেন ইংরেজিতে।'

সেনসাহেবের মন্তব্য, 'গেঁয়ো বাঙালিরা হঠাৎ আমেরিকায় এসে কিভাবে ইংরেজিতে তুখোড় হয়ে যায় বুঝতে পারি না! আপনি বিবেকানন্দের অসাধারণ ইংরেজি বাকপটুতার কথা ভাবুন– এখনকার নর্থ ক্যালকাটা শিমুলিয়ার ছেলেরা তো ইংরেজির নাম শুনলে ভয় পায়। স্বামী অভেদানন্দও চমৎকার ইংরেজি লিখতেন। ভক্তিবেদান্ত তো ইংরেজি ভাষার মাস্টার– ওই সামান্য ক'বছরে তিনিও চল্লিশ খণ্ড বই লিখে ফেলেছেন। আর শ্রীচিন্ময় তো শুনেছি ছ'-সাতশ বই ইতিমধ্যেই প্রকাশ করে ফেলেছেন।'

'এঁর ইংরেজি পড়লাম। পূর্বদেশের সরলতা এঁর রচনায় লক্ষ্য করা যায়। বাংলাভাষার দু-একটি বিশিষ্টতা ইংরেজিতেও চালু করার ইচ্ছে রয়েছে মনে মনে। কিন্তু আজ সকালে একজন ইউ-এন কর্তার সঙ্গে দেখা হল, তিনি নিজে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যচর্চা করেছেন, তিনি তো খুব প্রশংসা করলেন ওঁর ইংরেজি লেখার।'

'আর আপনি গদগদ হয়ে সায়েবের সব কথা হজম করে ফেললেন!'

'মোটেই না। আমি বরং মার্কিনি সাংবাদিক স্টাইলে গম্ভীরভাবে শুনিয়ে দিলাম, মহাশয়, এই পৃথিবীতে সব মানুষেরই কিছু-কিছু দুর্বলতা থাকে। ভগবান এখনও নিখুঁত কোনও মডেল তৈরি করেননি। সুতরাং এক-আধটা দোষ খুঁজে দিন। ভদ্রলোক খুব হাসলেন, তারপর বললেন, 'ওঁর হাতের লেখা আমি দেখেছি, এক-আধবার বানান সম্বন্ধে পিছলে পড়েছেন!' সাহেবের কথা শুনে ভরসা পেলাম।'

বিজ্ঞানী মিস্টার সেন বললেন, 'ওঁর লেখা থেকে আপনি কী পেলেন?'

'এই ক'ঘণ্টায় আর কতটা আন্দাজ করব বলুন? যেটা দেখছি, এদেশের বসবাস করলে অগোছালো বাঙালির চিন্তাতেও একটা গোছালো ভাব এসে যায়– যাকে অনেকে বলেন, মানসিক পরিচ্ছন্নতা। ওঁর লেখা থেকেই নোটবইতে কপি করেছি– 'ঈশ্বরের একজন স্পেশাল অ্যাসিসটেন্ট প্রয়োজন। ভাবছি, মাথা নত করে আমি ওই পদের জন্য আবেদন করব।'

'আর একটি কথা লিখে নিয়েছি– 'তোমার জীবনপথে অসংখ্য ট্রাফিক লাইটের লাল চোখ রাঙানি, তার কারণে তোমার হৃদয় কোনওদিন প্রাণভরে সবুজ আলোর সংকেত চায়নি।' অথবা, 'একবার কোনওরকমে নিজেকে বিশ্বাস করাও, তুমি অপরিহার্য নও। তোমার মন শান্তিতে প্লাবিত হবে।' অথবা, 'আমি সোজাসুজি জ্ঞানের আলোক চাই। অপরের ব্যাখ্যা মানেই তো বাধা'।'

'আরও একটি লাইন মন্দ লাগল না– 'ব্যক্তিমানুষ পার্থিব সম্পদের মধ্যে, সুখের মধ্যে এবং কখনও-কখনও ত্যাগের মধ্যেও শান্তি চায়। এই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আলাপ-আলোচনা, ডিপ্লোম্যাসি অথবা যুদ্ধের মাধ্যমে শান্তি সুনিশ্চিত করতে চায়। এই সব প্রাইভেট অথবা পাবলিক কৌশল দীর্ঘ সময়ের স্থায়িত্ব আনে না। বাইরের জগৎ থেকে শান্তি আসে না, তার উৎপত্তি মানুষের হৃদয়ে'।'

মিস্টার সেনের বাড়ি থেকে ফিরে এসে চুপি-চুপি অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করলাম। আমার অবিশ্বাসী মন বেশ সজাগ

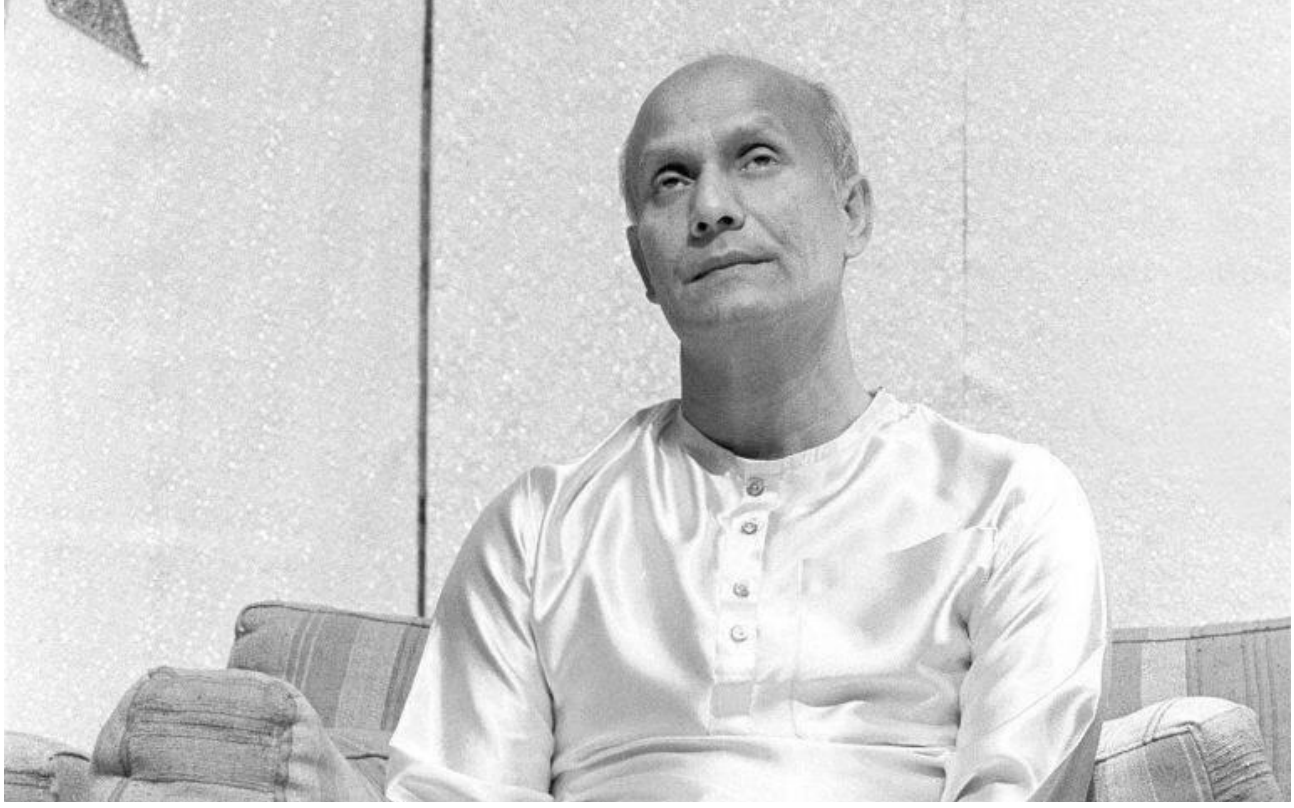

হয়ে রয়েছে– বিশ্বাস করে করে আমরার দেশের অভাগা মানুষ যে বারবার ঠকেছে। কিন্তু এ কথাও তো সত্য, বাজিয়ে না দেখে সবকিছু ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করলেও মানুষের অগ্রগতি হতে পারে না। পশ্চিমের বিজ্ঞানী-মন তাই সারা পৃথিবীর প্রাচীনতম ঐতিহ্যগুলি চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখছে কোথায় সত্য লুকিয়ে রয়েছে। গত কয়েক হাজার বছর ধরে নানা দেশে নানা সময়ে মানুষ কী ভেবেছে তার পুনর্মূল্যায়ন হচ্ছে। এই অনুসন্ধিৎসু পশ্চিমী-মনের কাছে ভারতবর্ষ অবশ্যই একটি স্বর্ণখনি, যদিও আমরা ভারতীয়রা নিজেরা কোনও খোঁজখবরে না নিয়ে সায়েবরা কী করে তা দেখবার জন্যে উঁচিয়ে বসে আছি।

পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বাড়ি বলতে একসময় এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং বোঝাত। এখন নয়। নিউ ইয়র্কের সবচেয়ে উঁচু জায়গা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার দেখতে যাবার কথা ছিল সকালে, কিন্তু আমি তার বদলে শ্রীচিন্ময় ঘোষেরর সঙ্গেই দেখা করতে চাই।

অবশেষে শ্রীচিন্ময়ের সঙ্গে দেখা হল। টার্কিশ সেন্টারে বাংলাদেশ মিশনের একটি ঘরে তিনি নিজেই আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

খোদ সাহেবের দেশে সন্ন্যাসী নয়, সাধু নয়, হানড্রেড পার্সেন্ট বাঙালিবাবু– শ্রীচিন্ময়কুমার ঘোষ। বয়স পঞ্চান্ন, রঙ কালো, সুশাসিত শরীর, ওজন একশ ষাট পাউন্ড (সাহেব ভক্তদের মহৎ গুণ সব বিবরণ অনুসন্ধিৎসুদে'র জন্য রেডি!)। শ্রীচিন্ময় সাদা পাঞ্জাবি পরেছেন, সেই সঙ্গে ধুতি এবং পাম্পসু– যে ধরনের মানুষকে একসময় হাওড়ার বাজারে এবং শিয়ালদহ রেল স্টেশনের শত শত দেখা যেত। এখন অবশ্য সিনথেটিকস-এর কল্যাণে সব বাঙালি পুরুষই সাহেব– খাঁটি বাঙালি বেশবাস দেখতে হলে আপনাকে এখন বিয়ের লগনসার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে, অথবা পাসপোর্ট-ভিসা করে এই নিউ ইয়র্কে হাজির হতে হবে।

মানুষটির সবই সাধারণত, শুধু চোখ দুটি ছাড়া। ফিলিপস্ কোম্পানির বিজ্ঞাপনী ভাষায়– একজোড়া আর্জেন্টা ল্যাম্প– যেখানে শুভ্র আলোর স্নিগ্ধতা আছে কিন্তু ক্ষতিকারক উত্তাপ নেই। আলো দিচ্ছে, কিন্তু জ্বলে-পুড়ে মরতে হচ্ছে না। এই প্রসন্ন আলোই অতিমাত্রায় সফিসটিকেটেড পশ্চিমকে টানছে আজ চট্টগ্রামের বোয়ালখালি থানার দিকে। হাডসন রিভার হার মানছে কর্ণফুলির কাছে।

কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল। অতি সাধারণ সব বাঙালি কথাবার্তা– দেশ কোথায়, তবে দেশ ছাড়লেন। দেশে যান না কেন? শ্রীচিন্ময় পরিচয় দিলেন নিজের বাংলা সাহিত্যপ্রীতির। এক সময় রবি ঠাকুর, নজরুলে বুঁদ হয়ে থাকতেন। কুড়ি বছর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে নানা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন– এই নলিনীকান্ত গুপ্তর ব্যক্তিগত সেক্রেটারি কাজ করেছেন– এই নলিনীকান্তর জন্মশতবার্ষিকী ১৯৮৮তে। বললেন, 'নলিনীকান্তর কিছু লেখা অনুবাদ করেছিলাম, অরবিন্দর একটা জীবনীও লিখেছিলাম। তারপর কী ছিল বিধাতার মনে, চলে এলাম সাত সাগরের পারে।'

'ওঁর সঙ্গে রয়েছে লম্বা-চওড়া এক সাহেবভক্ত– ডাক নাম লম্বু, ভাল না অধীরতা।

না, এঁরা নিজেদের ঘরসংসার কাজকর্ম বিসর্জন দিয়ে গুরুসেবার জন্যে আশ্রমে ঢুকে পড়েননি। ইউএন আফিসে ভাল কাজ করেন লম্বু। টুক করে একবার ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে এলেন গত বছরে, এবারেও ওই ধরনের কিছু একটা করবেন। শরীর-স্বাস্থ্য ভাল রাখায় বিশ্বাস করেন শ্রীচিন্ময়– সকালবেলায় পেট ভুটভাট করলে, নাভিদেশে মোচড় মারলে, মাথা ধরলে, দন্তশূল হলে মানুষ ঈশ্বর উপলব্ধির চেষ্টা চালাবে কী করে? শরীরকে নিজের কন্ট্রোলে রাখতে হবে সবসময়। এই তো আজ সকালে শ্রীচিন্ময় নিজেই একশো ষাট পাউন্ডের দেহ নিয়ে পঞ্চান্ন বছর বয়সে তিনশো ত্রিশ পাউন্ড ওয়েট লিফটিং করে এলেন। আমাদের কথা যেন হতে চায় না। এবার আমরা চললাম ইউ-এন মেডিটেশন সেন্টারে। বিরাট একটি ঘর ততক্ষণে নানা বেশের পুরুষ ও রমণীতে ভরে উঠেছে। পুরুষদের সবাই কোট-প্যান্ট পরেন ডিপ্লোম্যাসির এই সুরসভায়। এত নিখুঁতভাবে ড্রেস করা পুরুষ একসঙ্গে পৃথিবীর আর কোথাও দেখতে

পাবে না। মেয়েরা অনেকেই নিজেদের ড্রেস পরেছে, আবার কেউ কেউ শাড়ি পরিহিতা।

আমি চুপি-চুপি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি এদের শাড়ি পরতে নির্দেশ দিয়েছেন?'

শ্রীচিন্ময় বললেন, 'মোটেই না। আমি ধুতি পরি তো, তাই ওরা ভেবে নিয়েছে ওরা শাড়ি পরলে আমি সন্তুষ্ট হব।'

রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রার্থনাকক্ষ ভরে উঠল। চেয়ার না অনেকেই কার্পেটের ওপর হাঁটুমুড়ে বসে পড়লেন পরম আনন্দে। অনেক মহিলা জুতো খুলে চেয়ারের উপর পা মুড়ে নিলেন।

মহাশক্তিমান রাজপুরুষ ও রমণীদের এই সভায় আমি একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। জুতো খোলা আমার ধাতে নেই।

সর্বত্র এক আশ্চর্য শৃঙ্খলা। কেউ কেউ নীরবে একটু-আধটু সভার কাজ করে দিচ্ছে। স্বদেশে আদের প্রার্থনাসভায় যে অব্যবস্থা, অনিশ্চয়তা এবং হই হই থাকে তার কিছুই নেই।

স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বধর্ম মহাসভা দেখেছিলেন, আমি দেখলাম বিশ্বমানবের মিলনসভা। আশ্চর্য এই সভা। কোনও বক্তৃতা নয়, কোনও শাস্ত্রপাঠ নয়, কোনও মন্ত্র উচ্চারণ পর্যন্ত নয়– শ্রীচিন্ময় এঁদের মুখোমুখি বসে ক্রমশ ধ্যাননিমগ্ন হলেন। শতাধিক অপরিচিত বিশ্বাসীও তাঁকে অনুসরণের চেষ্টা করলেন ঐকান্তিকভাবে। কেউ ধীরে– ধীরে চোখ বন্ধ করলেন, কেউ নতমস্তকে পাথরের মতন স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

এইভাবে চলল অনেকক্ষণের নীরবতা। আমার মনে পড়ল, ইউএনও-র কক্ষে চলেছে মানুষের দলবদ্ধ ঘৃণার দ্বন্দ্ব, কোথাও চলেছে গোপন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, কোথাও সৃষ্টি হচ্ছে অবিশ্বাসের অসহ্য জ্বালা। আর এখানে হঠাৎ কিসের আকর্ষণে মানুষ স্বেচ্ছায় মাথা নত করছে বোয়ালখালি থানার এক কৃষ্ণাঙ্গ বঙ্গসন্তানের কাছে? কী সে দিতে পেরেছে, যা এই বিশাল বিশ্বসভার আর কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়?

দীর্ঘ নীরবতার শেষে সুবেশী নরনারীর ধ্যান ভঙ্গ হল। শ্রীচিন্ময় এবার সংগীতের ইঙ্গিত দিলেন এবং এবার আমার চোখ ও কানের বিস্ময় শুরু হল! সাদা কালো মঙ্গোলীয় ককেশীয় সবাই একসঙ্গে বাংলা গান শুরু করলেন। এঁরা কেউ বাংলা ভাষা জানে না, কিন্তু হৃদয়ের গভীর থেকে এমন পবিত্র নিবেদনের গান আমি বাংলাতে কখনও শুনিনি:

হিয়াপাখি এগিয়ে চলো
দেখো না আর ফিরে
বিশ্ব যাহা দিতে পারে
তা যে তুচ্ছ মিছে।'

ও বার্ড অব মাই হার্ট ফ্লাই অন, ফ্লাই অন– আমি নিজেই তখন ইংরেজিতে চিন্তার ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছি।

গানের পর গান। পৃথিবীর মানুষের কণ্ঠে গভীর আকুতি:

ভুলিতে দিও না প্রভু
যদি আমি ভুলে যাই প্রভু।
তীব্র বেদনে জাগাবে আমায়
ভুলিতে দিও না কভু
বেদনার তাপে যদি ভুলে যাই
'মরণের ঘুম যদি কভু পাই
অমর পরশে জাগাতে আমায়
ভুলিতে দিও না কভু..'

একের পর এক বাংলা গানের আসর চলেছে। ভক্তের হৃদয়ে তার মূর্ছনা–

'জাগে না জাগে না পরান জাগে না
ঘুমঘোর আর ভাঙে না...'

আজ ইউএনও-র অন্যত্র বড় মিটিং আছে। শক্তিমান রাষ্ট্রদূতরা প্রত্যেকে রাঙতায় জড়ানো 'কুকি' শ্রীচিন্ময়ের হাত থেকে নতমস্তকে গ্রহণ করে একে-একে বিদায় নিলেন। তিনি কারও সঙ্গে কোনও কথা বললেন না সেদিন।

পুরুষ ভক্তদের বাংলা নামগুলি এই সুযোগে শুনিয়ে দিই। স্টিভেন হাইন হয়েছেন 'ধ্রুব'। কেভিন কীফ-এর নাম হয়েছে 'অধিরথ'। কীথ ফরম্যান নাম পেয়েছেন 'আশ্রিত'। দুই প্রাক্তন ফুটবল খেলোয়াড়-ভ্রাতা ম্যাথু ও ল্যারি হেগান হয়েছেন 'ভীম' ও 'তেজিয়ান'। শুনছি এক জ্যাজ গায়ক মাইকেল ওয়াল্ডেন হয়েছেন 'নারদ'। এবং এক ওলিম্পিক ট্র্যাক চ্যাম্পিয়ন কার্ল লুইস 'সুধাহোতা'। কার্লো সানতানা নাম পেয়েছেন 'দেবদীপ'।

অধীরতা ও ধ্রুব দুই বিশিষ্ট ইউএন কর্মীর সঙ্গে শ্রীচিন্ময় আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দুপুরের খাবার খেয়ে আসতে। ভারি স্নেপ্রবণ মানুষ। কে খেল কে না সব দিকে নজর রাখেন।

আমার এক প্রশ্নের উত্তরে স্টিভেন হাইন বললেন, 'একজন ইউরোপীয় ওঁকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি যা প্রচার করেছেন, তা কি ধর্মমত?' উনি বললেন, 'না আমি ধর্মপ্রচার করি না, কেবল পথের ইঙ্গিত দিচ্চি। যে-কোনও ধর্মে বিশ্বাস রেখেই এই পথ ধরে চলা যায়'।'

কেভিন কীফ বললেন, 'ওঁর শিক্ষা অনুযায়ী আমরা সমাজে কোনও বিপ্লব ঘটাতে যাচ্ছি না। সমাজকে মেনে নিয়েই আমরা সমাজের পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটাতে উৎসাহী। একাজে সকলেরই সহযোগিতা প্রয়োজন হবে।'

স্টিভেন হাইন বললেন, 'ইউএন ছাড়া অন্যত্রও শ্রীচিন্ময়ের ধ্যানসভা বসে। অনেকে নানা প্রশ্ন করেন, শ্রীচিন্ময় উত্তর দেন।'

পশ্চিমীদের মনে কী ধনের প্রশ্ন জাগে তা জানবার আগ্রহ চেপে রাখতে পারলাম না। শুনলাম, নানা ধরনের প্রশ্ন ওঠে। কেউ জিজ্ঞেস করেন– কীভাবে ধ্যান করতে হয়? কেউ প্রশ্ন করেন– ধ্যানের সময় যাতে ঘুমিয়ে না পড়ি তার জন্যে কী করতে হবে? কেউ বলেন– ধ্যান করতে বসে এই মনে হয় কিছু হবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু হয় না, এর কারণ কী? কেউ জানতে চান– ধ্যান থেকে কী পাওয়া যেতে পারে? কেউ বলেন– নাভিচক্রে মনঃসংযোগ করছি, কিন্তু তেমন কিছু হচ্ছে না!

আমি বুঝছি, ভক্তিযোগের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় প্রচারক বলতে যাঁদের বোঝায় শ্রীচিন্ময় তাঁদের একজন।

অন্য ধরনের প্রশ্নও আছে। কিছু কিছু নোটবইতে লিখে নিয়েছি। কিছু নমুনা না দিয়ে পারছি না:

প্রশ্ন: চারদিকে সংঘাত, চারদিকে সংঘর্ষ, এই কি ঈশ্বরের ইচ্ছা?

শ্রীচিন্ময়: কখনও-কখনও ঈশ্বরেরই এই লীলা। ভাল এবং মন্দ দুই-ই প্রকাশমান হয়, অবশেষে ন্যায়ের জয় হয়। বর্তমান পৃথিবীর সংঘাত ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলে মনে হয় না, মানুষের দুর্বলতা থেকেই সংঘাতের উদ্ভব। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ দেখাতে চান, আমি যা বলি তাই ঠিক, তুমি যা বলো সব ভুল। আমি দেখাতে চাই আমি একজন কেউকেটা, তোমার ওপর প্রভুত্ব করার মতন শক্তি আমার আছে, আমার চরণতলে তোমাকে পতিত হতে হবে। আমরা

সবাই আমাদের অন্ধ অথরিটির প্রসার সুনিশ্চিত করতে ব্যস্ত।

অনেকগুলি প্রশ্নের মধ্যে পশ্চিমী মানসিকতার গতিপ্রবাহ কিছুটা ধারণা করা যায়। বিজ্ঞানের হিমালয়শিখরে আরোহণ করেও মানুষ এখন নিজেকে খুঁজে পাবার জন্যে কী পরিমাণ উদ্‌গ্রীব তা বোঝা যায়।

প্রশ্ন: চিন্তা এবং ধ্যান কি এক জিনিস?

শ্রীচিন্ময়: মোটেই এক জিনিস নয়– বরং উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরুর মতন। যখন আমরা ধ্যান করি তখন আমাদের লক্ষ সমস্ত চিন্তা থেকে মুক্ত। চিন্তা হল ব্ল্যাকবোর্ডে একটা ফুটকির মতন। ধ্যানের সময় ওটা মুছে ফেলার চেষ্টা করতে হয়। ধ্যানের প্রথম স্তরে কিছু চিন্তা এসে যায়, কিন্তু গভীরতম পর্যায়ে চিন্তার কোনও স্থান নেই।

প্রশ্ন: যে লোক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, সে কি ধ্যানের চেষ্টা চালাতে পারে?

শ্রীচিন্ময়: যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না সে ধ্যান করতে পারে, কিন্তু তার কিছু লাভ হবে না। ধ্যানের পথ আমাদের ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়। যদি আপনার ঈশ্বর বিশ্বাস না থাকে তাহলে আপনি ওই পথ ধরবেন না এটাই স্বাভাবিক। ধরুন, আপনি অফিসে রয়েছেন। যদি আমি বলি আপনার অফিসের অস্তিত্ব নেই, অথবা আপনার নিজের অস্তিত্ব নেই, তাহলে কি আমি আপনার অফিসটা কোথায় তা জানবার চেষ্টা করব?

প্রশ্ন: যে লোক কিছুই জানে না সে কীভাবে ধ্যানের 'একসারসাইজ' শুরু করতে পারে?

শ্রীচিন্ময়: যারা অধ্যাত্মপথে প্রবেশ করতে চায় তাদের সবচেয়ে প্রয়োজন সরলতা, নিষ্ঠা এবং পবিত্রতা। ধ্যানে বসে প্রথমে আপনার মাথার কথা ভাবুন এবং 'সরলতা' কথাট নিঃশব্দে সাতবার চিন্তা করুন। এবার আসুন হৃদয়ে এবং সাতবার 'নিষ্ঠা' শব্দটি ভাবুন। তারপর নাভিতে মনঃসংযোগ করে 'পবিত্রতার' কথা ভাবুন। সাতবার। এবার আপনার দুই ভ্রূর সংযোগস্থলের একটু ওপরে তৃতীয় নয়ন সম্বন্ধে সচেতন হোন নএবং চিন্তা করুন যে আপনি দ্বিধাহীন। এবার হাতটি মাথার ওপর দিন এবং নিঃশব্দে তিনবার বলুন আমি সরল, আমি সরল, আমি সরল।। এবার বুকে হাত দিয়ে তিনবার বলুন আমার হৃদয়ে নিষ্ঠা রয়েছে। এবার নাভি স্পর্শ করে তিনবার বলুন, আমি পবিত্র। এবার তৃতীয় নয়ন স্পর্শ করে বলুন, আমি দ্বিধাহীন।

ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে এবার সজাগ হোন। যদি আপনার প্রেমময় ঈশ্বরকে পছন্দ হয় তো তাহলে মনের মধ্যে সাতবার বলুন– প্রেম, প্রেম। যদি আপনার শান্তি পছন্দ হয়, তাহলে এইভাবে সাতবার শান্তি আবৃত্তি করুন। যদি আপনার আলো ইচ্ছা হয়, তাহলে বলুন আলো– শুধু প্রাণহীন আবৃত্তি নয়, আপনার সমস্ত সত্তা দিয়ে এমন গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করুন যেন আপনি ভালবাসা, শান্তি ও আলোর ঝরনাধারায় অবগাহন করছেন।

আর একটি অনুশীলন চাই। অনুভব করার চেষ্টা করুন যেন আপনি নিজের হৃদয়ের দ্বারপ্রান্তে আপনার কয়েকজন স্বর্গীয় বন্ধুকে স্বাগত জানাবার জন্যে অপেক্ষা করছেন। এঁদের আপনি নিমন্ত্রণ করেছেন– ভালবাসা, শান্তি, আলো আনন্দ। এঁদের আপনি এক একটি মানুষ হিসেবে কল্পনা আনবার চেষ্টা করুন, যাতে আপনি মানসচক্ষে এঁদের দেখতে পান। যদি সব বন্ধুকে একই দিনে হৃদয় না আনতে পারেন– এক-একদিন এক-একজনকে নিমন্ত্রণ করুন।

এরপর আর একটি অনুশীলন। শ্বাস নিয়ে কয়েক মুহূর্ত ধরে থাকুন এবং অনুভব করুন আপনি এই প্রাণশক্তি ধরে রাখছেন তৃতীয় নয়নে। এতে আপনার মনঃসংযোগ বাড়বে। দ্বিতীয়বার শ্বাস নিয়ে হৃদয়কেন্দ্রের কথা অনুভব করুন। তৃতীয়বার নাভিকেন্দ্রের কথা ভাবুন। এতেও আপনার কিছুটা সুবিধে হবে।

প্রশ্ন: ধ্যানের শ্রেষ্ঠ সময় কোনটি?

শ্রীচিন্ময়: শ্রেষ্ঠ সময় সকাল তিনটে থেকে চারটে, যাকে আমরা ব্রাহ্মমুহূর্ত বলি। বৈদিক ঋষিরা এই সময়টিতেই সবচেয়ে পছন্দ করতেন। কিন্তু পশ্চিমে যাঁরা রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত জেগে থাকেন তাঁদের ওই সময়ে শয্যাত্যাগ করতে বললে উলটো ফল হতে পারে। কারণ যাঁরা অধ্যাত্মপথের নতুন যাত্রী তাঁদের সাত-আট ঘণ্টার ঘুম প্রয়োজন। আমি বলব, সকাল সাড়ে-চারটে অথবা পাঁচটায় ধ্যান আরম্ভ করুন। অধ্যাত্মপথে কিছুটা অগ্রগতি হলে আপনি ঘুমের মাত্রা কমিয়ে আনতে পারবেন। আমার জানাশোনা অনেকে সাড়ে-পাঁচটা এবং ছ'টার মধ্যে ধ্যান করেন।

প্রশ্ন: আমি শান্তি খুঁজছি। আমার পক্ষে কখনও ধ্যান করা যুক্তিযুক্ত হবে?

শ্রীচিন্ময়: যদি শান্তির প্রয়োজন থাকে তাহলে শ্রেষ্ঠ সময় সন্ধ্যা ছ'টা এবং সাতটার মধ্যে– প্রকৃতি এই সময় জীবকে সান্ত্বনা দেয়।

যদি আপনি শক্তির পূজারী হন, তাহলে শ্রেষ্ঠ সময় দুপুর বারোটা। – দিনের মধ্যে এইটাই সবচেয়ে কাজের সময়।

যদি আপনার আনন্দ প্রয়োজন থাকে তাহলে সকাল পাঁচটা-ছ'টায় ধ্যান করুন। জননী বসন্ধুরা আপনাকে সাহায্য করবেন।

যদি আপনার ধৈর্যের প্রয়োজন থাকে তাহলে সুযোগ মত একটি গাছের তলায় বসে সন্ধ্যার শেষে ধ্যান করুন।

যদি ভলোবাসাই আপনার লক্ষ্য হয় তাহলে মধ্যরাত্রই শ্রেষ্ঠ সময়। নিজের ছবি সামনে রাখুন– আপনার হৃদয়-মাঝিই আপনাকে সাহায্য করবে।

যদি আপনার পবিত্রতার প্রয়োজন থাকে তাহলে ভোরে বিছানা ছাড়বার আগে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে ধ্যান করুন। আপনার আত্মা আপনাকে সাহায্য করবে।

প্রশ্ন: যদি আমি এই সময়-শৃঙ্খলা মানতে না পারি?

শ্রীচিন্ময়: প্রত্যেক প্রচেষ্টার একটা শ্রেষ্ঠ সময় আছে, কিন্তু তা বলে ঈশ্বরের দ্বার অন্য সময় বন্ধ থাকে না। ধরুন ব্রেকফাস্ট– সকালে খাওয়াটাই রীতি। কিন্তু ওই খাবারগুলো যদি আপনি সন্ধ্যায় খেতে চান– খেতে পারেন, পুষ্টির অভাব হবে না– খাবারগুলো তো খারাপ নয়।

প্রশ্ন: অধ্যাত্মপথে এগোবার জন্যে কি নিরামিষ খাওয়া প্রয়োজন?

শ্রীচিন্ময়: নিরামিষ আহার অধ্যাত্মজীবনে একটা বড় ভূমিকা নেয়। এ আহার আমাদের পবিত্র হতে সাহায্য করে। আমরা যখন মাংস খাই তখন কিছু পশুপ্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করে। মাছ তো আরও খারাপ। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আলস্য, সঙ্কীর্ণতা এবং বিবেকহীনতা। শাকসবজি, ফল আমাদের নম্রতা দেয়, মিষ্টতা দেয় এবং পবিত্রতা দেয়। সুতরাং নিরামিষাশী হলে ভাল। কিন্তু পৃথিবীর এমন অনেক ঠাণ্ডা দেশ আছে যেখানে কেবল শাকাহার করে জীবনধারণ করা শক্ত। সেখানে অবশ্যই মাংসাহার করতে হবে। কারণ, তা না হলে মন চাইলেও শরীর বিদ্রোহ করবে। শাকাহারী না হলে ঈশ্বর-অনুভূতি হবে না এ কথা ঠিক নয়। যিশুখ্রিস্ট, বিবেকানন্দ

এবং আরও অনেক মহাপুরুষ মাংস খেতেন।

অধ্যাত্মপথ ছাড়াও শত-শত অন্য প্রশ্ন আছে। এই প্রশ্ন করেন এমন সব মানুষ যাঁরা নিজেদের কর্মক্ষেত্রে কৃতী, কারও কারও বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

একজনের প্রশ্ন: দুনিয়ার সবাইকে সন্দেহ করার প্রবৃত্তি আমি কীভাবে ত্যাগ করতে পারি?

শ্রীচিন্ময়: প্রথমে নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে এই সন্দেহ প্রবৃত্তি থেকে আমার কোনও উপকার হয়েছে কি না। দেখবেন, কিছুই হয়নি। সন্দেহ-বশবর্তী হয়ে আপনি আরও নিচে নেমে গিয়েছেন। তারপর নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে, আমি কি বোকা? না বুদ্ধিমান? আপনি নিশ্চয় বোকা নন, সুতরাং আপনাকে বুদ্ধিমানের মতন কাজ করতে হবে।

তারপর খুঁজতে হবে, সন্দেহটা কোথায়? মনে না শরীরে? মনের সন্দেহ পর্বতের মত অনড়। মনের এই সন্দেহকে বলুন– আপনার কাছ থেকে জ্বালাযন্ত্রণা ছাড়া আমি কিছুই পাইনি, অথচ এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন আপনি আমার বন্ধু। এখন বুঝছি, আপনি আমার শত্রু, সুতরাং সত্বর আমার এই গৃহত্যাগ করুন। আমার এই স্বল্পপরিসরে আপনার জন্য কোনও স্থান নেই।

আরও মনে রাখতে হবে, চিরকাল কেউ শত্রু থাকে না। আপনার অন্তর যখন প্রকৃত আলোকে ভরে উঠবে তখন সন্দেহ আপনার মনে প্রবেশ করলেও কোনও ক্ষতি করতে পারবে না, বরং নিজেই আলোকিত হয়ে উঠবে।

অবশেষে নানা বিষয়ে দীর্ঘ সময় ধরে কথা বলার সৌভাগ্য হয়েছিল শ্রীচিন্ময় ঘোষের সঙ্গে। সায়েব-মেমরা সামনে বসে রয়েছেন, কিন্তু তিনি সস্নেহে আমার সঙ্গে বাংলা কথায় মশগুল হয়ে উঠলেন। সায়েবরা কিছু মনে করলেন না– বাংলাকে এঁরা এমনভাবে শ্রদ্ধার আসনে বসালেন কেন কে জানে!

মানুষের অন্তরের শান্তি, পুর্ব-পশ্চিম সম্পর্ক, মানবসমাজের অনন্ত জিজ্ঞাসা থেকে শুরু করে সুদূর বাংলাদেশ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, নলিনীকান্ত গুপ্ত অনেক কথাই উঠল। ধর্মীয় পরিবেশের মধ্যে শৈশব ও বাল্যকাল কাটিয়েও আমি যে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী হয়ে উঠিনি তা হয়তো শ্রীচিন্ময় আন্দাজ করলেন। আমি বললাম, 'আমার মধ্যে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের পেন্ডুলাম সারাক্ষণ দুলছে। আমি এই ভাবনাকে বাধা দিইনি, কারণ পরিপূর্ণ সমর্পণ করলে গল্প-লেখকের 'অপ্রত্যাশিত' হবার শক্তি শেষ হয়ে যায়।'

শ্রীচিন্ময় মৃদু হেসে এমারসন থেকে উদ্ধৃতি দিলেন, 'তুমি নিজে ছাড়া কেউ তোমার মধ্যে শান্তি আনতে পারবে না।'

আমি ভাবছি, আমার সমস্ত বিস্ময়ের পর্ব চুকিয়ে একবার জিজ্ঞেস করব, 'আপনি কোন শক্তিতে বিদেশে এবং বিপুল শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন? এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েও, অন্য অনেকের মত সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করলেন না, অথবা বিপুল বৈভবের মধ্যে ডুবে রইলেন না– যা এদেশে করা খুব সহজ ছিল।' (আমার কাছে খুব আছে, তাঁর নিজের একটা গাড়িও নেই– ইউএন অফিসের কোনও কোনও স্বেচ্ছাসেবী তাঁকে পালা করে বাসস্থান জামাইকা থেকে মেডিটেশন সেন্টারে নিয়ে আসেন এবং পৌঁছে দেন)

কিন্তু ওই সব ব্যক্তিগত প্রশ্নের সময় পাওয়া গেল না। শ্রীচিন্ময় তখন কলকাতার কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় তাঁর ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতার কথা বলছেন। চক্রবর্তী-চ্যাটার্জির দোকানে বই কিনেছেন। কিছুদিন আগে জন্মভূমি বাংলাদেশ ঘুরে এসেছেন– সে-সব গল্পও চলতে লাগল। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শিশির ঘেষের কথাও উঠল।

বুঝলাম, শ্রীচিন্ময় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ডুবে আছেন। সুদূর প্রবাসে নিজের লেখা গানের মধ্যে বারেবারে ওঁর ছায়া এসে যায়।

কথা বলতে-বলতে আমরা দু'জনে সুবিশাল রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছি। আমাদের পিছনে ইউএন ভবন গগন স্পর্শ করছে। সামনেই পরম পরাক্রান্ত মার্কিনীদের ইউএন সংক্রান্ত দপ্তর এবং তারই পাশে টার্কিশ সেন্টার, আমার পরবর্তী গন্তব্যস্থল।

আমার খুব আশ্চর্য লাগল, ধুতি-পাঞ্জাবি ও পাম্পশু পরে, নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে শ্রীচিন্ময়কুমার ঘোষের মতন বিশ্ববিজয় করা আজও তাহলে সম্ভব!

শ্রীচিন্ময় ওইসব ব্যাপারে মোটেই ব্যস্ত বলে মনে হল না।

'দেশের জন্যে চিন্তা হয় না?' আমি জানতে চাইলাম।

'যাদের রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ রয়েছেন তাদের আবার চিন্তা কী?' এই বলে উদাসী শ্রীচিন্ময়কুমার ঘোষ নিউ ইয়র্কের রাজপথ ধরে আপন মনে হাঁটতে লাগলেন।

শংকর
জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক

শংকর

শংকরের আসল নাম মণিশংকর মুখোপাধ্যায়। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাস *চৌরঙ্গী*, *সীমাবদ্ধ* এবং *জন অরণ্য* নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। শেষের দুটির পরিচালক সত্যজিৎ রায়। *চৌরঙ্গী*তে মুখ্য চরিত্র স্যাটা বোসের ভূমিকায় অভিনয় করেন উত্তমকুমার। জন্ম ১৯৩৩ সালের ৭ ডিসেম্বর যশোরের বনগ্রামে। আইনজীবী বাবা হরিপদ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগেই চলে যান কলকাতার ওপারে হাওড়ায়। সেখানেই শংকরের বেড়ে ওঠা, পড়াশোনা ও সাহিত্য সাধনার শুরু। জীবনের শুরুতে ফেরিওয়ালা, টাইপরাইটার ক্লিনার, প্রাইভেট টিউটর, শিক্ষক অথবা জুট ব্রোকারের কনিষ্ঠ কেরানি– নানা বৃত্তি অবলম্বন করেন। কলকাতা হাই কোর্টের জ্যেষ্ঠ ব্যবহারজীবী বারওয়েল সাহেবের অনুপ্রেরণায় লেখালেখির সূত্রপাত। ১৯৫৫ সালে শংকরের প্রথম বই প্রকাশিত হয়। অল্প বয়সে *কত অজানারে* বইটি লিখে জনপ্রিয়তা লাভ করেন। এ পর্যন্ত *চৌরঙ্গী*র ১২০তম সংস্করণ ছাড়িয়েছে। *বোধোদয়* প্রকাশের পর শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সপ্রশংস মন্তব্য: 'ব্রাইট বোল্ড বেপরোয়া।' তাঁর *জন্মভূমি* উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়ে শরদিন্দুর মন্তব্য, 'তোমার এই লেখায় জননী-জন্মভূমিকেই আমি সারাক্ষণ উপলব্ধি করলাম।' সত্তর দশকের অশান্ত কলকাতা নিয়ে তার *স্থানীয় সংবাদ*, *সুবর্ণ সুযোগ* ও *জন্মভূমি* ট্রিলজির শততম সংস্করণ বেরিয়ে গেছে অনেক আগে। ২০১৬ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.লিট সম্মানে ভূষিত করে।

মহালয়ায় দেবীস্তোত্রপাঠরত প্রবাদপ্রতিম বীরেন্দ্রকিশোর ভদ্র

নিবন্ধ

মহিষাসুরমর্দিনী

বাঙালির মহালয়া

শঙ্খ অধিকারী

পুণ্য মহালয়ার ভোরে যে সুর, যে সংগীত, যে ভাষ্য না হলে আমাদের পুজোটাই শুরু হয় না সেই লহরীর নাম মহিষাসুরমর্দিনী। আকাশবাণী কলকাতার সবচেয়ে জনপ্রিয় এই অনুষ্ঠানটি পুজোর আবহাওয়া বয়ে আনে। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত প্রবাদপ্রতিম তিনজন মানুষ হলেন পঙ্কজকুমার মল্লিক, বাণীকুমার, এবং এক ও অদ্বিতীয় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। রেডিওর কোনও অনুষ্ঠান যে কতটা জনপ্রিয় হতে পারে, এই অনুষ্ঠানটিই তার প্রমাণ। কিন্তু এই অনুষ্ঠানটির মধ্যেও লুকিয়ে আছে অনেক ইতিহাস এবং ইতিহাসের অন্ধকার।

১৯৩০ সালে ভারতীয় বেতারের সরকারিকরণের পর নাম হয় 'ইন্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস'। এই সময় সংগীত নির্ভর অনুষ্ঠানের জনপ্রিয়তা ছিল সবচেয়ে বেশি। ১৯৩২ সালের মার্চ মাসে বাণীকুমার মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর বিষয়বস্তু অবলম্বনে বসন্তেশ্বরী নামে একটি চম্পু রচনা করেন।

মহিষাসুরমর্দিনীকে বাদ দেওয়ার জন্য ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল সাধারণ মানুষ। তৎকালীন আকাশবাণীর জনপ্রিয় উপস্থাপক মিহির বন্দ্যোপাধ্যায় এক জায়গায় লিখেছেন, 'দেবীদুর্গতিহারিণী অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারের মধ্যপথেই টেলিফোনে শ্রোতাদের অবর্ণনীয় গালিগালাজ আসতে শুরু করে অকথ্য ভাষায়। অনুষ্ঠান শেষ হতে না হতেই আকাশবাণী ভবনের সামনে সমবেত হয় বিশাল জনতা। ফটকে নিয়োজিত প্রহরীরা সামাল দিতে হিমশিম খেয়ে যান। ফটকের গেট ভেঙে ঢুকে পড়তে চায় উত্তাল মানুষের দল।' শোনা যায়, পরবর্তীকালে উত্তমকুমারও তাঁর সিদ্ধান্ত নিয়ে আক্ষেপ করেছিলেন।

পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র বালী, পঙ্কজকুমার মল্লিক এই অনুষ্ঠানের সুর সংযোজন করেন। রাইচাঁদ বড়ালের সংগীত পরিচালনায় এ অনুষ্ঠানটি নির্মিত হয়। নাট্যকথাসূত্র ও গীতাংশ গ্রহণ করেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবং বাণীকুমার চণ্ডীর কয়েকটি শ্লোক আবৃত্তি করেন। এটি সে বছর অষ্টমীর দিন বাজানো হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানটির মত করে ১৯৩২ সালে অন্য একটি অনুষ্ঠান করা হয়েছিল। মহিষাসুর বধের ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি গীতিআলেখ্য। তখন অবশ্য এ অনুষ্ঠানের নামকরণ করা হয়নি। 'বিশেষ প্রত্যুষ অনুষ্ঠান' হিসেবে এর প্রচার হয়। ১৯৩৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর মহালয়া তিথিতে সকাল ৬টা-৭টা এই অনুষ্ঠান প্রথম প্রচারিত হয়। মহিষাসুরমর্দিনীর সংগীত পরিচালক পঙ্কজকুমার মল্লিক হলেও 'অখিল বিমানে', 'আলোকের গানে'– এই গানগুলির সুর দেন হরিশ্চন্দ্র বালী। 'শান্তি দিলে ভরি'র সুর দেন সাগির খাঁ।

বর্তমান রেকর্ডে আমরা বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের যে ধরনের চণ্ডীপাঠ শুনি, প্রথমদিকে কিন্তু উনি ওইভাবে উচ্চারণ করতেন না। পুরো দলটিকে যথাযথ পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন অধ্যাপক অশোকনাথ শাস্ত্রী বেদান্ততীর্থ। এই অনুষ্ঠানটি আবার ষষ্ঠীর সকালে ফিরে এসেছিল ১৯৩৬ সালে। নাম ছিল মহিষাসুর বধ। ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হতে থাকে এই অনুষ্ঠান। আর হবে নাই বা কেন, প্রচুর গুণী মানুষের সমাবেশ, তাঁদের আলোচনা, নতুন কিছু করার অদম্য চেষ্টা এবং বিষয়ের প্রতি নিষ্ঠা তাঁদের এই অনুষ্ঠানকে শ্রোতাসাধারণের কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। এই অনুষ্ঠানের গায়কেরা ছিলেন পঙ্কজ মল্লিক, কৃষ্ণ ঘোষ, আভাবতী, মানিকমালা, প্রফুল্লবালা, বীণাপাণি প্রমূখ।

অনুষ্ঠানটি জনপ্রিয় যেমন হয়েছিল তেমনি এটিকে ঘিরে একটি বিতর্ক তুলেছিলেন তৎকালীন গোঁড়া ব্রাহ্মণসমাজ। তাঁরা বলেছিলেন, পুণ্য মহালয়ার ভোরে অব্রাহ্মণের কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ শোনানোর কোনও যৌক্তিকতা নেই। এই ঘটনার পর অনুষ্ঠানটিকে সরিয়ে ষষ্ঠীর ভোরে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শ্রোতাদের বিপুল চাপে ১৯৩৬ সাল থেকে পুনরায় অনুষ্ঠানটিকে মহালয়া তিথিতেই বাজানো শুরু হয়। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক শিল্পীর অনুষ্ঠানটির সঙ্গে একাত্মতা ছিল দেখবার মত। লাইভ সম্প্রচারের সময় সমস্ত কলাকুশলী ভোররাতে স্নান সেরে শুদ্ধ আচারে উপস্থিত হয়ে যেতেন। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ পরতেন গরদের জোড়, কপালে চন্দনের ফোঁটা।

এভাবে যখন অনুষ্ঠানটির জনপ্রিয়তা তুঙ্গে সেইসময় ১৯৭৬ সালে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এই অনুষ্ঠানটি বাতিল করে একটি অন্য অনুষ্ঠান বাজানো হবে মহালয়া তিথিতে। এই অনুষ্ঠানটির নাম দেবীদুর্গতিহারিণী। এটি লিখেছিলেন ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী। সংগীত পরিচালনায় ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। গান লিখেছিলেন শ্যামল গুপ্ত। নির্বাচিত কিছু ভাষ্যপাঠ করেছিলেন উত্তমকুমার। এ অনুষ্ঠান দর্শকেরা একেবারেই গ্রহণ করেননি। মহিষাসুরমর্দিনীকে বাদ দেওয়ার জন্য ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল সাধারণ মানুষ। তৎকালীন আকাশবাণীর জনপ্রিয় উপস্থাপক মিহির বন্দ্যোপাধ্যায় এক জায়গায় লিখেছেন, 'দেবীদুর্গতিহারিণী অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারের মধ্যপথেই টেলিফোনে শ্রোতাদের অবর্ণনীয় গালিগালাজ আসতে শুরু করে অকথ্য ভাষায়। অনুষ্ঠান শেষ হতে না হতেই আকাশবাণী ভবনের সামনে সমবেত হয় বিশাল জনতা। ফটকে নিয়োজিত প্রহরীরা সামাল দিতে হিমশিম খেয়ে যান। ফটকের গেট ভেঙে ঢুকে পড়তে চায় উত্তাল মানুষের দল।' শোনা যায়, পরবর্তীকালে উত্তমকুমারও তাঁর সিদ্ধান্ত নিয়ে আক্ষেপ করেছিলেন।

এভাবে মহিষাসুরমর্দিনীকে সরিয়ে দেওয়ায় মর্মাহত হয়েছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবং পঙ্কজকুমার মল্লিক। একটা অনুষ্ঠানের প্রতি মানুষের কী রকম ভালবাসা থাকলে এ রকম প্রতিক্রিয়া সম্ভব, তা বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। সে বছর ষষ্ঠীর দিন এ অনুষ্ঠান বাজানো হয় এবং ১৯৭৭ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত মহালয়ার ভোরেই বাজানো হয় মহিষাসুরমর্দিনী অনুষ্ঠানটি।

কিন্তু যে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের উদাত্ত কণ্ঠের জাদুতে এই অনুষ্ঠান এখনও পর্যন্ত স্বমহিমায় জীবিত সেই মানুষটিকে শেষজীবনে অনেক দুঃখ সহ্য করতে হয়েছে। আকাশবাণীকে নিজের সন্তানের মত করে গড়ে তুলেছিলেন তিনি। নাটক প্রযোজনা, অভিনয়, গানের অনুষ্ঠান, চাষবাসের অনুষ্ঠান– সবরকম অনুষ্ঠানে তিনি ছিলেন সমান সাবলীল। এমন কি, বেতারের পাক্ষিক পত্রিকা *বেতার জগত*-এর কপি তিনি জিপিও-র সামনে দাঁড়িয়ে নিজে হাতে বিক্রি করেছেন। শ্রীবীরূপাক্ষ ছদ্মনামে লিখেছেন অনেক লেখা। এহেন প্রবাদপ্রতিম মানুষটি অবসরের পরও 'সাপ্তাহিক মহাভারত পাঠ' এবং 'মজদুর মণ্ডলীর আসর'-এ আসতেন। এসময় একদিন আকাশবাণীর জনৈক দ্বাররক্ষী তাঁর কাছে পাস চেয়ে বসেন। সেদিন প্রচণ্ড অপমানিত বোধ করে ক্রোধে মেজাজ হারিয়ে ফেলেন তিনি। চিৎকার করে বলতে থাকেন, 'এই রেডিও'কে জন্ম দিয়েছি আমি, আমার কাছে অনুমতিপত্র চাইছ!' সত্যিই তো, আকাশবাণী কর্মীরা তো এখনও এই নামটিকে (বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র) পুজো করেন।

প্রতি বছর শিশিরে পা ভিজিয়ে বঙ্গে মহালয়ার যে পুণ্যপ্রভাত উপস্থিত হয়, সেখানে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এখনও অমর হয়ে রয়েছেন। প্রতি বছর উনি কাঁদেন। আমাদের কাঁদান। বাঙালির জন্য দুর্গোৎসবের দরজাটাকে উনি হাট করে খুলে দেন। অপমানের আওয়াজগুলোকে ঢাক আর কাঁসরের আওয়াজ দিয়ে ঢেকে রাখেন।

শঙ্খ অধিকারী প্রাবন্ধিক, সংগঠক

নিবন্ধ

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
সামগ্রিক কর্মকাণ্ড

বিষ্ণুকুমার সরকার

'হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট' বাংলাদেশে সনাতন হিন্দু জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় কল্যাণসাধনের লক্ষ্যে আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একমাত্র সরকারি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৩ সালের ৬৮নং অধ্যাদেশ বলে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গঠিত হয়। পরবর্তীকালে ২০১৮ সালের ৪২নং আইন হিসেবে মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়। ট্রাস্টের একমাত্র কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। এদেশে সনাতন হিন্দু জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। সারাদেশের হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে ২১জন ট্রাস্টি, পদাধিকার বলে ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, মাননীয় স্পীকার মনোনীত দুইজন সংসদ সদস্য সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান, পদাধিকার বলে ট্রাস্টি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং মনোনীত ট্রাস্টিদের মধ্যে থেকে একজন ভাইস চেয়ারম্যান সমন্বয়ে ট্রাস্টের পরিচালনা বোর্ড গঠিত হয়।

বোর্ডের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য ট্রাস্টে সচিবের সঙ্গে একজন উপপরিচালকসহ মোট ১১জন দাপ্তরিক জনবল রয়েছে। সরকার প্রদত্ত ১০০ (একশত) কোটি টাকার লভ্যাংশ দিয়ে নিয়মিত কার্যক্রমের বাইরে ট্রাস্টের অধীনে সময়ে সময়ে গৃহীত প্রকল্পের মাধ্যমে হিন্দুধর্মাবলম্বী বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন এবং প্রশাসনের আন্তরিক সহযোগিতায় ট্রাস্ট সনাতন হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে আস্থা অর্জনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ট্রাস্ট তার জন্মকাল থেকে সরকার প্রদত্ত স্থায়ী আমানতের লভ্যাংশের ওপর নির্ভর করে মঠ-মন্দিরে কিছু অনুদান প্রদানের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল। বর্তমান সরকার আসার পর এর কার্যপরিধি অনেক বেড়েছে।

একনজরে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যাবলি

ক. হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, উপাসনালয়, শ্মশান ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা, সংস্কার, সংরক্ষণ, উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনায় আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান;

খ. হিন্দুধর্মীয় উপাসনালয়ের পবিত্রতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ;

গ. দেবোত্তর সম্পত্তি উদ্ধার ও সংরক্ষণ;

ঘ. হিন্দুধর্মীয় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র বা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান;

ঙ. হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবন উন্নয়নের লক্ষ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ, মানবতাবোধ, সহিষ্ণুতা, সহমর্মিতা, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার কাজে সহযোগিতা প্রদান;

চ. হিন্দুধর্মীয় আদর্শ ও দর্শন বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;

ছ. হিন্দুধর্মীয় গ্রন্থাদি প্রণয়ন ও অনুবাদ এবং সাময়িকী ও প্রচারপত্র প্রকাশ;

জ. ধর্মীয় ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন, ন্যায়বিচার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর সম্মেলন, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, সেমিনার, প্রদর্শনী ইত্যাদির আয়োজন;

ঝ. পুরোহিত ও সেবাইতদের ধর্মীয় শাস্ত্র ও সংস্কৃত ভাষা বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঞ. হিন্দুধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণার জন্য অনুদান, পুরস্কার, পদক ও বৃত্তি প্রদান;

ট. প্রাচীন তীর্থস্থান ও পীঠস্থান চিহ্নিতকরণ এবং উন্নয়ন ও সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান;

ঠ. হিন্দু সম্প্রদায়ের দুঃস্থদের আর্থিক সহায়তা প্রদান;

ড. দেশে বিদেশে তীর্থভ্রমণে সহায়তা প্রদান;

ঢ. হিন্দু ধর্ম সংক্রান্ত সমৃদ্ধ লাইব্রেরি ও তথ্য ভাণ্ডার স্থাপন;

ণ. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বক্ষেত্রে যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণ; এবং উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্য বা বিষয়াদি সম্পাদন করতে পারবে।

উপর্যুক্ত কার্য বিবরণীর ধারাবাহিকতায় ট্রাস্ট অফিস সীমিত জনবল দিয়ে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। এ বছরই প্রথম শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিশেষ পূজাবার্ষিকী প্রকাশিত হচ্ছে। সম্মানিত ট্রাস্টি শ্রী নান্টু রায় এজন্য অবশ্যই ধন্যবাদ পাবার দাবি রাখেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে এমন একটি প্রকাশনা ট্রাস্ট কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হল। আশা করি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে ট্রাস্ট তার কার্যক্রমকে জনমানুষের আস্থা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

এখানে কাজ করতে এসে আমার কাছে নিজস্ব ভবন ও জনবলের অভাব বার বার অনুভূত হয়েছে। সরকার অথবা সনাতন হিন্দু জনগোষ্ঠীর কাছে আমার নিবেদন থাকবে, একটি স্থায়ী অফিস করার ব্যবস্থা যেন অচিরেই গ্রহণ করা হয়।

বর্তমান সরকারের সময়কালে ট্রাস্টের অর্জন

- হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সিড মানি (মূলধন) ২১ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০ কোটি টাকায় উন্নীতকরণ করা হয়েছে।
- সমগ্র দেশের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন ও সংস্কার প্রকল্পকের মাধ্যমে ২২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৮১২টি মন্দির/মঠ/শ্মশান সংস্কারের জন্য এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে।
- ৩টি কর্মসূচির অধীনে শ্রীশ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির ও শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, ঢাকাসহ চট্টগ্রাম, গোপালগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলায় মোট ১৯৯টি মন্দির/মঠ/শ্মশান সংস্কারের জন্য ২৩ কোটি টাকার কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে।
- ২০১৭ থেকে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে দেশ-বিদেশে তীর্থযাত্রী প্রেরণের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান পরিভ্রমণে একটি টিম ও দেশের মধ্যে তিনটি টিম বিভিন্ন তীর্থস্থান ভ্রমণ করেছেন। ভবিষ্যতে এটি আরও বৃদ্ধি করা হবে।
- এ বছর থেকেই ট্রাস্ট প্রথম মেধাবী দরিদ্র হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বৃত্তি প্রদান করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারে দেশব্যাপী গীতাপাঠ প্রতিযোগিতার আয়োজন করার উদ্যোগ গ্রহণ করার প্রস্তাব আছে। আশাকরি করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এসব কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে।

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম– ৫ম পর্যায় শীর্ষক প্রকল্প

'মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম' ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। প্রাক-প্রাথমিক, গীতা শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা প্রকল্পের প্রধান কাজ। বর্তমানে প্রকল্পটির ৫ম পর্যায় চলমান যা ২০১৭ সালের জুলাই মাস থেকে শুরু হয়েছে এবং ডিসেম্বর ২০২০ সালে শেষ হবে। ৫ম পর্যায় প্রকল্পে সারাদেশে মন্দির আঙ্গিনাকে ব্যবহার করে ৫৭৯৮টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে তিন বছরে ৫,২৭,৮৮০ জন শিশুকে প্রাক প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাদান করা হবে। ২৫০টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় ১৮,৭৫০ জন বয়স্ক শিক্ষার্থীকে নিরক্ষর মুক্ত করে উন্নত জীবন যাপন সম্পর্কে সচেতন করা হবে। ৪০২টি গীতা শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ২৭,১২০ শিক্ষার্থীকে গীতা শিক্ষায় পারদর্শী করা হবে। মন্দিরভিত্তিক প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলা কার্যালয়ের ৩২২জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং ৬৫৭৮জন শিক্ষক/কনটিনজেন কর্মচারীর পার্টটাইম কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে যা দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে চলেছে।

এ প্রকল্পের মাধ্যমে শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার্থীদের অক্ষরজ্ঞান ও আধুনিক শিক্ষা দানের পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা, শরীরচর্চা ও ধর্মীয় জ্ঞান চর্চার সুযোগ রয়েছে। ধর্মীয় জ্ঞান চর্চা মানুষের আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনার উন্মেষ ঘটায়। আধ্যাত্মিক চিন্তা আমাদের অন্তরে আদর্শ, নৈতিকতা, সততা, সহনশীলতা এবং মানবিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করে। ৫ম পর্যায় প্রকল্পের প্রধান

আকর্ষণ গীতা শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা। তাই মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্প সমাজ থেকে সহিংসতা দূরীকরণে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে । অধিকন্তু, এ কার্যক্রম হিন্দুধর্মীয় উপাসনালয়গুলোকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলছে। প্রকল্পটি ধর্মীয় সংহতি ও সম্প্রীতির ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের উদ্দেশ্য

১. নিরক্ষরতা দূরীকরণ;
২. বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ১০০% শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং ঝরে পড়া রোধ করা;
৩. টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন;
৪. সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন;
৫. নারীর ক্ষমতায়ন;
৬. সরকারের 'Vision-২০২১ ও ২০৪১' অর্জন;
৭. দরিদ্রতা দূরীকরণ এবং
৮. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন সুনাগরিক গড়ে তোলা।

'ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত, সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত, সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পুরোহিত ও পরিচালকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ২০১৫ সাল থেকে প্রকল্পটি কাজ করে যাচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ০৭(সাত) টি বিভাগে বিভাগীয় অফিসের মাধ্যমে সারা দেশে ২৮,৭১১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

'ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত, সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের উদ্দেশ্য

১. প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পুরোহিত ও সেবাইতদের ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দক্ষতা বৃদ্ধি;
২. পুরোহিত ও সেবাইতদের নেতৃত্বদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
৩. নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, ইভটিজিং ও বাল্যবিবাহ রোধ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবেলা ইত্যাদি সম্পর্কে সুপ্রশিক্ষিত;
৪. ধর্মীয় সহাবস্থান ও আর্থ-সামাজিক বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি।
৫. ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং আইসিটি (তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি) সম্পর্কে ধারণা।
৬. ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য ধর্মীয় গ্রন্থাদির আলোকে মন্দির/আশ্রমে ধর্মীয় প্রশিক্ষণ।
৭. হিন্দু আইন সম্পর্কে দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।
৮. ভূমি আইন ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে ধারণা প্রদান।
৯. খাদ্যপুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে ধারণা প্রদান।
১০. কৃষি, সামাজিক বনায়ন ও হর্টিকালচার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান।
১১. গবাদি পশুপালন সম্পর্কে ধারণা প্রদান।

প্রকল্পটির প্রথম মেয়াদের কার্যক্রম শেষ হবার পর আমরা আশা করছি এটির দ্বিতীয় পয়ায়ের কাজ অচিরেই শুরু হবে।

বিষ্ণুকুমার সরকার
সচিব, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

মন্দির পরিক্রমা

শ্রীশ্রী বোদেশ্বরী শক্তিপীঠ

পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলায় ত্রিস্রোতা শ্রী শ্রী বোদেশ্বরী শক্তিপীঠ মন্দির অবস্থিত। সমগ্র পৃথীবিতে ৫১টি শক্তিপীঠ (মতান্তরে ৫২টি) রয়েছে, ত্রিস্রোতা শ্রী শ্রী শক্তিপীঠ মন্দির সেগুলোর মধ্যে একটি। সনাতন ধর্মের পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত, জ্ঞানার্নবতন্ত্র, শাক্তনন্দতরঙ্গীনি ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থে এই শক্তিপীঠের বর্ণনা রয়েছে। এখানে মাতা দেবী সতীর বামপদ (গোঁড়ালি) পতিত হয়েছে। এখানে মাতা ভ্রামরী নামে এবং মহাদেব ভৈরব অমর নামে বিরাজিত ও পূজিত হচ্ছেন। এই শক্তিপীঠের বর্ণনা মোঘল সম্রাট আকবরের আমলেও ইতিহাসে বর্ণিত রয়েছে। এই বোদেশ্বরী নাম হতেই বোদা চাকলা এবং পরবর্তীতে মোঘল সম্রাট আকবরের মন্ত্রী টোডরমল এটিকে বোদা পরগনায় পরিনত করেন। এরপর ব্রিটিশ শাসনামলে এই অঞ্চলটি বোদা থানায় পরিনত হয় এবং এটিই তৎকালীন জলপাইগুড়ি জেলার বৃহত্তম থানা ছিল। কালের বিবর্তনে এখানে বিভিন্ন ভক্তবৃন্দের দ্বারা মাতার পুজার্চনা চলতো। সর্বশেষ ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে কুচবিহার মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ন ভূপ বাহাদুর একটি মাতৃমন্দির নির্মাণ করেন, যেটি বর্তমানে দণ্ডায়মান আছে এবং মাতা ভ্রামরী দেবী সেখানেই পুজিত হচ্ছেন। এই প্রাচীন মন্দির ভবনটি বর্তমানে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতাধীন। ১৯৪৭খ্রিস্টাব্দে দেশভাগের পর মন্দিরটির আশে পাশের অধিকাংশ এলাকা ছিটমহলে পড়ে যায়, সেই কারনে মন্দিরসহ এই অঞ্চলের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন দীর্ঘদিন স্থবির হয়ে থাকে। পরবর্তীতে ২০১৫ খ্রিঃ ভারত বাংলাদেশ ছিটমহল বিনিময়ের পরে বর্তমান কার্য্যনির্বাহী কমিটি, জনপ্রতিনিধি ও ভক্তবৃন্দের আন্তরিকতায় মন্দিরের ব্যাপক প্রসার ও পরিচিতি লাভ করে। প্রাচীন মাতৃমন্দিরটি ছাড়াও এখানে একটি বিষ্ণু মন্দির এবং একটি শিব মন্দির নির্মিতি হয়েছে। তাছাড়াও এখানে একটি পাঠাগার ও পর্যটকদের একটি বিশ্রামাগার রয়েছে। বর্তমানে মন্দিরটির ৩.০২ একর জমি রয়েছে। এর মধ্যে পূর্বেকার ২.৭৬ একর এবং বাকি ০.২৬একর জমি ভক্তবৃন্দের অর্থায়নে ক্রয় করা হয়। এখানে দৈনন্দিন প্রায় শতাধিক ভক্তবৃন্দের সমাগম হয় এবং প্রতিবছর মহালয়া তিথিতে প্রায় ১৫/২০ হাজার ভক্তবৃন্দ স্নান, তর্পণাদি ও পূজা দিতে আসেন। যেহেতু এটি রংপুর বিভাগের মধ্যে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের একমাত্র পীঠস্থান (তীর্থস্থান) সেহেতু এটিকে একটি মডেল মন্দির তৈরি করা গোটা রংপুর বিভাগের মানুষের প্রানের দাবি। এই মন্দিরটির প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে অত্র অঞ্চলের ধর্মীয় ও সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হবে বলে সকলের দৃঢ় বিশ্বাস।

নিজস্ব সংবাদদাতা

শ্রীশ্রী অদ্বৈতজন্মধাম পণাতীর্থ

বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যের (১৪৮৫-১৫৩৩ খ্রি.) শীর্ষস্থানীয় সহচরদের অন্যতম শ্রীশ্রী অদ্বৈতাচার্যই (১৪৩৪-১৫৫৮ প্রথম শ্রীচৈতন্যকে অবতার রূপে স্বীকার করেন। শ্রী শ্রী অদ্বৈতাচার্য লাউড়ের রাজা দিব্য সিংহের মন্ত্রী কুবের আচার্যের পুত্র ছিলেন। তাঁর জন্ম লাউড়ের নবগ্রামে। রাজার গাঁয়ের মধ্যবর্তী এই গ্রাম এবং শ্রীশ্রী অদ্বৈতাচার্যের আশ্রমটি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। শ্রীশ্রী অদ্বৈতাচার্যের ভক্তদের আপ্রাণ চেষ্টায় নবগ্রামের হদিস পাওয়া যায়, আবিষ্কৃত হয় তাঁর বাড়ির ধ্বংসাবশেষ। কিন্তু গ্রামটি তখন নদীর অতলে তলিয়ে গেছে। রেঙ্গুয়া বা রেনুকা নদীর ভাঙনেই তাহিরপুরের মানচিত্র থেকে নবগ্রাম বিলুপ্ত হয়েছে। যাহোক, তাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্য ভক্তরা ১৮৯৮ সালে রাজার গাঁয়ে 'শ্রীশ্রী অদ্বৈতের আখড়া' স্থাপন করেন। এটি বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ জেলায় অবস্থিত।

১৮৯৭ সালে কলকাতার অমৃতবাজার পত্রিকার কার্যালয় থেকে অদ্বৈতাচার্যের শিষ্য ইশান নাগরের লেখা ২২ অধ্যায়ে সমাপ্ত জীবনীগ্রন্থ অদ্বৈত প্রকাশ প্রকাশিত হয়। সমালোচকদের মতে, চৈতন্যচরিতগ্রন্থাবলীর পরেই মধ্যযুগের সাহিত্যে অদ্বৈত প্রকাশ একটি উল্লেখযাগ্যে জীবনীগ্রন্থ। ইশান নাগর তাঁর এ কালজয়ী গ্রন্থে পণাতীর্থের উৎপত্তি বর্ণনা করেছেন। অদ্বৈতাচার্য বা কমলাক্ষের সাত বছর বয়সে তাঁর মা লাভা দেবী এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন। তিনি দেখেন, তিনি নানা তীর্থজলে স্নান করছেন। রাতের শেষ প্রহরের স্বপ্ন সঠিক হয় বলে সবাই বিশ্বাস করত। তবু ভোরে লাভা দেবী এ স্বপ্ন নিয়ে চিন্তা করে বিমর্ষ হলে কমলাক্ষ তার কারণ জানতে চান। তিনি স্বপ্নের কথা খুলে বললে বালক কমলাক্ষ প্রতিজ্ঞা করলেন, সেখানেই সব তীর্থের আবির্ভাব ঘটাবেন। মনঃশক্তির অসীম প্রভাব ও অসাধারণ যোগবলে বালক তীর্থসমূহকে লাউড়ের এক ক্ষুদ্র শৈলের উপর নিয়ে এলেন। ঐ শৈলখণ্ডের একটি ঝরনা তীর্থবারি পরিপূরিত হয়ে ঝরঝর করে পড়তে লাগল। কমলাক্ষজননী সেখানে স্নান করে পরিতৃপ্ত হলেন। এ ঘটনা পাঁচশো বছর আগেকার। কমলাক্ষের মত তীর্থসমূহও পণ করেন প্রতি বারুণীতেই সেখানে তাদের আবির্ভাব ঘটবে। এই পণ শব্দ থেকেই পণাতীর্থের নামের উৎপত্তি। সনাতন হিন্দুদের বিশ্বাস, তীর্থসমূহ তাদের পণ ভঙ্গ করেননি এবং পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত বারুণীতে তারা সেখানে আসবেন। কথায় বলে, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। বারুণীর সময় পণাতীর্থস্নানে লাখ লাখ সনাতন ধর্মাবলম্বী পুণ্যার্থীর সমাবেশ ঘটে। অসম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারেও এর উল্লেখ আছে।

সনাতন পুণ্যার্থীদের মধ্যে একটি কথা চালু আছে, 'সব তীর্থে বার বার, পণাতীর্থে একবার'। অর্থাৎ পণাতীর্থে কায়মনোবাক্যে একবার স্নান করলে অতীতের সব পাপ স্খালন হয়, অর্জন করা যায় অশেষ পুণ্য এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদ। প্রতি বছর চৈত্র মাসে মধুকৃষ্ণ ত্রয়োদশীতে (গৌর পূর্ণিমার পরের ত্রয়োদশী) হাজার হাজার সনাতন ধর্মাবলম্বী নরনারী ও শিশ স্রোতস্বিনী যাদুকাটা নদীর স্বচ্ছ জলে পণাতীর্থ বা বারুণীস্নান করে কলুষমুক্ত হন। তাদের বিশ্বাস, পণাতীর্থস্নানের মাধ্যমে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, ঈশ্বরের কৃপা লাভ হয়। এ উপলক্ষে আকর্ষণীয় এক মেলাও বসে। শুধু দেশ নয়, বিদেশ থেকেও কয়েক লাখ মানুষ প্রতি বছর এখানে স্নান করতে আসেন। এখন পর্যন্ত কোনওপ্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই এ পুণ্যস্নান অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ইতিহাস ও ঐতিহ্য ধারণ করেই শ্রী শ্রী অদ্বৈতার্যের জন্মধাম পণাতীর্থ অন্যতম তীর্থস্থান হিসেবে বিশ্বের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে বিশিষ্ট হয়ে আছে।

নিজস্ব প্রতিবেদন

মন্দির পরিক্রমা

সীতাকুণ্ডের শ্রীশ্রী চন্দ্রনাথ ধাম

চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড উপজেলায় অবস্থিত সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রাক-ঐতিহাসিক কালের তীর্থস্থান শ্রীশ্রী চন্দ্রনাথ ধাম চট্টগ্রাম শহর থেকে ৩৭ কিলোমিটার উত্তরে, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক সীতাকুণ্ড সদর হতে সাড়ে তিন কিলোমিটার পূর্বে, সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৩০০ মিটার উচ্চতা, ১৫ শত একর আয়তনের, উত্তরে সহস্রধারা ও লবনাক্ষ, দক্ষিণে বাড়বকুণ্ড ও কুমারী কুণ্ড, পূর্বে হাটহাজারী ও ফটিকছড়ি উপজেলা সীমান্ত এবং পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরের মোহনা পর্যন্ত এর পরিধি বিস্তৃত। চন্দ্রনাথ পাহাড় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের একটি উল্লেখযোগ্য তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিত। প্রতিবছর বাংলা বর্ষের ফাল্গুন মাসের চর্তুদশী তিথিতে (ইংরেজি ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস) শিব-চতুর্দশী মেলা হয়, যা এশিয়া মহাদেশের বড় মেলা হিসাবে পরিচিত। এ সময় অনেক সাধু-সন্ন্যাসী এবং পুণ্যার্থীগণ বিশেষ করে ভারত, নেপাল, শ্রীলংকাসহ পৃথিবীর বহু দেশ থেকে এখানে আসেন। এ ছাড়া সারা বছরই দেশী বিদেশী পর্যটকদের পদচারণায় মুখরিত থাকে এই পুণ্য তীর্থভূমি।

পৌরাণিক তথ্য ও ধর্মগ্রন্থ থেকে জানা যায়, নেপালের একজন রাজা স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ভারতবর্ষের পাঁচ কোণে পাঁচটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এগুলো হল নেপালের পশুপতিনাথ, কাশিতে বিশ্বনাথ, পাকিস্তানে ভূতনাথ, মহেশখালীর আদিনাথ এবং সীতাকুণ্ডে চন্দ্রনাথ। চন্দ্রশেখর পর্বতের সুউচ্চ শৃঙ্গে রয়েছেন শ্রীশ্রীচন্দ্রনাথ এবং তার পাশে রয়েছেন শ্রী বিরুপাক্ষদেব। শ্রীচন্দ্রনাথ শিবের কিঞ্চিত নীচে এবং সমতল ভূমি থেকে অর্ধ কিলোমিটার উচ্চতায় রয়েছেন শ্রীস্বয়ম্ভুনাথ শিব এবং শ্রীশ্রীভবানী দেবী। এ শিবলিঙ্গ এবং বিগ্রহ কোনও ব্যক্তিবিশেষের তৈরি বা প্রতিষ্ঠিত নয়। ঘন জঙ্গল ও পাহাড়ের মধ্যে এ বিগ্রহ প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট। তাই ইহা শ্রীশ্রীস্বয়ম্ভুনাথ নামে পরিচিত।

শিবপুরাণে উল্লেখ আছে, শিবের স্ত্রী সতীর পিতা রাজা দক্ষ যজ্ঞানুষ্ঠান করছিলেন, কিন্তু তিনি জামাতা শিবকে ছাড়া আর সব দেবদেবীকে সে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করেন। এই অপমান সহ্য করতে না পেরে সতী সে যজ্ঞে আত্মাহূতি দিয়ে দেহত্যাগ করেন। দেবাদিদেব শিব তখন সতীর মৃতদেহ নিয়ে প্রলয় নৃত্য করতে থাকেন। পুরো সৃষ্টি ধ্বংস হবে দেখে ভগবান বিষ্ণু শিবের প্রলয় নৃত্য বন্ধ করার জন্য তার সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড করে ফেলে দেন। এই দেহাবশেষ ৫১ খণ্ড করে ৫১ স্থানে ফেলা হয়। তা থেকে ৫১ মাতৃপীঠ বা শক্তিপীঠের সৃষ্টি হয়েছে। সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে সতীর ডান হাত পড়েছিল। এই পীঠস্থানটিই ভবানী মন্দির। এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালীমাতা।

প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ও ইতিহাসে উল্লেখ আছে, অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র তার বনবাসের সময় তারা শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে গিয়েছিলেন। তখন মুনি তাদের পূর্বদেশ ভ্রমণ করতে বলেন। যেখানে মহামুনি ভার্গব স্বয়ম্ভুনাথ পাহাড়ে বসবাস করতেন। তিনি ধ্যানযোগে জানতে পারেন যে, রাম লক্ষণ ও সীতা চন্দ্রশেখর পর্বতে আসবেন। তাই তাদের স্নানের জন্য ৩টি উষ্ণজলের কুণ্ড সৃষ্টি করেন। তারা উক্ত পাহাড়ে ভ্রমণের সময় এই কুণ্ডগুলোতে স্নান করেন। তাই সীতার কুণ্ডের নামানুসারে এ স্থানটি সীতাকুণ্ড নামে পরিচিতি লাভ করে।

'পুরাণ' অনুসারে মহামুনি ব্যাসদেব এবং অন্যান্য ঋষিগণ এখানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত আছে যে, শিব চর্তুদশী তিথিতে স্বয়ম্ভুনাথ মন্দির দর্শনের আগে এ কুণ্ডে স্নান করতে হয়। পূর্বে এটি প্রায় ৬ বর্গফুটের সমান ছিল। কিন্তু তীর্থ যাত্রীদের সুবিধার্থে এটিকে পুকুরের আকার দেওয়া হয়েছে, যেটি ব্যাসকুণ্ড নামে পরিচিত। ব্যাসকুণ্ডের পাড়েই ভৈরবমন্দির অবস্থিত।

চন্দ্রশেখর পাহাড় ও চন্দ্রনাথ মন্দিরের পাশেই বর্তমানে তৈরি করা হয়েছে সীতাকুণ্ড ইকো পার্ক। পার্কের ভিতরে রয়েছে প্রাকৃতিক ঝরনা। ১৯৯৮ সালে পার্কটি উদ্বোধন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা, যিনি বর্তমানেও প্রধানমন্ত্রী। পার্কের রাস্তা ব্যবহার করেই তীর্থযাত্রীগণ সহজেই চন্দ্রনাথ দর্শন করতে পারেন।

ঐতিহাসিক এ ধর্মীয় স্থানে ত্রিকালদর্শী মহাযোগী, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মচারী লোকনাথ বাবা ১৩৩ বৎসর বয়সে চন্দ্রনাথ দর্শন শেষে লোকহিতের জন্য সমতলে অবতরণ করেন। ওঁর স্মৃতি রক্ষার্থে লোকনাথ মন্দির ও সেবাশ্রম রয়েছে।

ইংরেজি ১৯০১ সালে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর মাকে নিয়ে চন্দ্রনাথমন্দির দর্শনে এসেছিলেন। বিপজ্জনক এবং গভীর জঙ্গল হওয়ার কারণে চন্দ্রনাথে মাকে নিয়ে উঠতে পারেননি। তাই নিচে বসেই মহাদেবের ধ্যান করেছিলেন। তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও সেবাশ্রম।

সার্ধক পুরুষ শংকরাচার্যের অনুসারীরা প্রতিষ্ঠিত করেন শংকর মঠ ও মিশন। এখানে অনেক সাধক পুরুষ দীর্ঘকাল থেকে বসবাস করে আসছেন। তাদের কঠোর পরিশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হয় অনাথ আশ্রম, সংস্কৃত কলেজ (সরকার অনুমোদিত), দাতব্য চিকিৎসালয় এবং একটি অতিথিশালা। নাম মাত্র ফি দিয়ে যে কোন পর্যটক তিন বেলা প্রসাদ গ্রহণ করতে পারেন।

এই মহাতীর্থ সীতাকুণ্ডে আরও আছে ক্রমধেশ্বরী কালী মন্দির, বিষ্ণুমন্দির, হনুমানমন্দির, পাতালকালী, সহস্রধারা, অগ্নিকুণ্ড, ভোলানন্দগিরি সেবাশ্রম, কাছাড়িবাড়ি, শনিঠাকুর বাড়ি, প্রেমতলা, গিরিশ ধর্মশালা, দোল চত্তর, এনজি সাহা তীর্থযাত্রী নিবাস, তীর্থগুরু মোহন্ত আস্তানা, বিবেকানন্দ স্মৃতি পঞ্চবঠি, জগন্নাথ আশ্রম, শ্রীকৃষ্ণমন্দির, গয়া ক্ষেত্র, পাতালপুরী, অন্নপূর্ণা মন্দির, শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, শ্রীশ্রীরামঠাকুর সেবাশ্রমসহ অসংখ্য মঠ মন্দির।

সীতাকুণ্ড শুধু তীর্থস্থান নয়, এটি একটি সুপ্রাচীন পর্যটননগর। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সীতাকুণ্ডকে জাতীয় তীর্থস্থান ও পর্যটননগর ঘোষণা করলে আন্তজার্তিকভাবে পর্যটনখাত সমৃদ্ধিলাভ করবে বলে মনে করি। এজন্যে প্রশস্ত রাস্তা, ক্যাবল কার, পর্যটন হোটেল স্থাপন, ইকো টুরিজম পার্ক এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রয়োজন।

উত্তমকুমার শর্মা ট্রাস্টি, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

তাহেরপুর রাজবাড়ি, এখন তাহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ

নিবন্ধ

কংসনারায়ণের দুর্গোৎসব
বাংলার প্রথম দুর্গাপূজা

রুমঝুম ভট্টাচার্য

শারদীয়া দুর্গোৎসবের রূপ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে, বদলেছে উৎসবের আঙ্গিক। তবু জানতে ইচ্ছা করে বাঙলায় ঠিক কবে উৎসবের আকারে দুর্গা পুজার চল শুরু হল। সেই উৎসব পালনের পটভূমি কি বা কি প্রেক্ষিত কাজ করেছিল এই উৎসব পালনের ক্ষেত্রে। অনুসন্ধিৎসু মন হু হু করে ছুটল পিছন পানে। সময়কাল তেরশো শতক। বাঙলায় মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন হল ১২০৩ সালে। ইতিহাসে কথিত আছে, তুর্কি জেনারেল ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি মাত্র সতেরো জন ঘোড়-সৈনিক নিয়ে রাজা লক্ষণ সেনের অস্থায়ী রাজধানী নদীয়া জয়ের উদ্দেশ্যে পৌঁছলে বৃদ্ধ অশক্ত লক্ষণ সেন নৌকায় চেপে পূর্ববঙ্গে পালিয়ে যান।
তাই অনায়াসে বিনা যুদ্ধে বখতিয়ার খিলজি বাঙলায় মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য সমগ্র বাঙলাকে একই মুসলিম শাসনের অধীনে আনতে আরও দেড়শো বছর সময় লেগেছিল।

তাহেরপুর রাজবাড়ির নাটমন্দিরের ভগ্নদশা ॥ পুরনো মন্দির, তাহেরপুর

সেন রাজারা ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। তাঁদের শাসনকালে ব্রাহ্মণ্যবাদ ও কৌলিন্য ধর্মের প্রবর্তন করা হয়। তার আগে বাঙলায় পাল রাজাদের চারশো বছরের শাসনকালে বৌদ্ধ ধর্মের রমরমা ছিল। পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ কিন্তু তাদের অধিকাংশ প্রজা ছিল হিন্দু। নিজেরা বৌদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও হিন্দু দেব-দেবতা বা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় পাল রাজাদের অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে। পাল রাজারা বাঙলার জনজীবনে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার এক অনন্য নজীর তৈরি করেছিলেন। ১০৭০ সালে হেমন্তসেন, বৌদ্ধ পাল বংশকে পরাস্ত করে বাংলায় সেন বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। সেন-রা ছিলেন দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণ। তারা সেখান থেকে বাঙলায় আসেন। হাজার বছরের বেশি সময়ের ইতিহাস দেখলে বোঝা যায় ক্রমান্বয়ে বাংলায় বৌদ্ধ, হিন্দু এবং পরবর্তীতে ইসলাম আমল শুরু হয়েছে। মুসলিম শাসনের প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছরের মধ্যে বাংলা মাত্র দুশো বছর দিল্লির কেন্দ্রীয় শাসনের অধিনস্ত ছিল। তেরশো শতকের পর থেকে বাংলা মূলত স্বাধীন সুলতান, স্থানীয় রাজা বা জমিদার দ্বারা শাসিত হয়েছিল। ১৩৪২ থেকে ১৫৭৫ সালের মধ্যে বাংলায় স্বাধীন ও স্থানীয় সুলতান বা রাজার উত্থানের ইতিহাস পাওয়া যায়। এই সময়ে 'শাহী বাংলা'-র প্রবর্তন করেন সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহী। পরবর্তীকালে হুসেন শাহীর জমানায় ইসলামের আধিক্য বৃদ্ধি পাওয়ায় হিন্দুধর্ম চর্চা কিছুটা ব্যাহত হয়। সে সময়ে হিন্দু জমিদার বা রাজারা হিন্দুধর্ম চর্চা বজায় রাখতে উদ্যোগ নেন। এমন এক পটভূমিতেই বোধহয় প্রথমবার ছেলেপুলে নিয়ে মা দুগগার মর্ত্যে আগমণ।

মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তনের আগে বাংলার বিভিন্ন অংশ বরেন্দ্র, পুণ্ড্র, সমতট, চন্দ্রদ্বীপ, হরিকেল ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল। এইগুলো এখন বাংলাদেশের অন্তর্ভূক্ত এবং যথাক্রমে রাজশাহীসহ উত্তরবঙ্গ, বগুড়া, কুমিলা, বরিশাল, সিলেট ইত্যাদি নামে পরিচিত। আর রাঢ, গৌড়, লখনৌতি, সাতগাঁ, তাম্রলিপ্ত, ও হুগলী নামে যে এলাকা ছিল তা এখন ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। বরেন্দ্র নামে পরিচিত ভূমি যা কিনা এখন রাজশাহী জেলা, তার অন্তর্গত বাগমারা উপজেলার এক ছোট্ট জনপদ হল তাহেরপুর। পুঠিয়া থেকে সতেরো কিলোমিটার উত্তরে তাহেরপুর তার স্বমহিমায় বিরাজমান। তাহেরপুরের পশ্চিম পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটা ছোট্ট মরা নদী, নাম তার বরাহী। স্থানীয় বাসিন্দারা ভালবেসে ডাকেন বরনঙ্গী। আজ সময়ের দাপটে এ নদী শুকিয়ে গেলেও এককালে ভরা যৌবনে নদীতে প্রচুর জল ছিল। নদীপথই ছিল যোগাযোগের অন্যতম সাধন। বরাহি নদীর পূর্বপারে রমরমা গ্রাম। এই গ্রামই এককালে সাক্ষী থেকেছিল এক অদ্ভুত পালা বদলের।এখানে উত্তোলিত হয়েছিল অবিভক্ত বাংলার এক স্বাধীন বাঙালি জমিদার বংশের জয়ধ্বজা। কথিত আছে স্থানীয় শাসক তাহির খানের নামে এই জনপদের নাম হয় তাহিরপুর পরবর্তীকালে যা লোকমুখে হয়ে দাঁড়ায় তাহেরপুর। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর সাতাশতম বংশধর কামদেব ভট্ট, ছিলেন তাঁর বংশের অন্যান্য পুরুষদের থেকে আলাদা। তাঁর পূর্বপুরুষরা বাংলার বুকে বিদ্যাচর্চা ও ধর্মচর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন। কামদেব সে সবের পাশাপাশি হয়ে উঠলেন দক্ষ তীরন্দাজ ও কুস্তিগীর। এছাড়া তিনি তলোয়ার চালানোতেও দক্ষ হয়ে ওঠেন। পরে স্থানীয় কিছু যুবককে এই সব যুদ্ধবিদ্যায় প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজের এলাকায় গড়ে তুললেন নিজস্ব সৈন্যবাহিনী। পাঠান শাসক তাহির খান ছিলেন দুর্বল শাসক। সেই সুযোগ নিয়ে কামদেব তার নিজস্ব সেনাবাহিনীর সাহায্যে তাহির খান কে আক্রমণ করে পরাজিত করেন ও সমগ্র তাহেরপুর অঞ্চল দখল করেন। কামদেব ছিলেন করিতকর্মা মানুষ। দিল্লির সম্রাটের পক্ষপাতিত্বও আদায় করলেন তিনি। প্রতিষ্ঠিত হল তাহেরপুর জমিদারী। কামদেবের ছেলে বিজয়ও ছিলেন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, দৃঢ়চেতা পুরুষ। সে সময় অনেকক্ষেত্রেই বাঙলার বিদ্রোহী জমিদারদের সঙ্গে সুলতানের সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ছে। বিজয় কিন্তু গৌড়ের সুলতানের নেকনজরে পড়েন। স্বভাবতই সুলতান খুশি হয়ে তাকে চব্বিশটি পরগণার শাসনভার ন্যস্ত করেন। এর ফলে তাহেরপুর জমিদারী বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। বরনই নদীর পূর্বপারে রমরমা গ্রামে বিজয় রাজবাড়ি তৈরি করেন।

জমিদার বিজয়ের তিন পুত্র যথাক্রমে ভূপনারায়ণ, হৃদয়নারায়ণ এবং হরিনারায়ণ। হরিনারায়াণের ছেলে কংসনারায়ণ ছিলেন তাহেরপুর রাজবংশের অপর এক প্রজাদরদী জমিদার। তাঁর উৎসাহে তাহেরপুরে জোর কদমে হিন্দু ধর্মের চর্চা চলতে থাকে। কংসনারায়ণই প্রথম বাংলায় খুব জাঁকজমক সহকারে দূর্গাপুজো উদযাপন করেন। কথিত আছে আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে প্রায় নয় লক্ষ টাকা খরচ করে বাংলায় প্রথম দুর্গোৎসব পালন করেন কংসনারায়ণ।

এ নিয়ে কিছু মতপার্থক্য আছে বটে। যেমন লোকমুখে প্রচলিত আছে যে মালদা ও দিনাজপুরের জমিদার বংশ প্রথম দুর্গা পুজোর প্রচলন করেন। দুই ক্ষেত্রেই সময়কাল সেই ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ। মতের অমিল যাই থাক, অবিভক্ত বাংলার যে প্রান্তেই বেজে উঠুক প্রথম শারদীয়া উৎসবের ঢাক, নিঃসন্দেহে সে উৎসবের পটভূমি আর প্রেক্ষিতে বিশেষ ফারাক ছিল না। যখন পৃথিবী জুড়ে বেজে উঠেছে আধুনিক ইতিহাসের শুভ সূচনার শঙ্খনিনাদ। দিল্লিতে মোঘল রাজবংশের তিন পুরুষ রাজত্ব করে ফেলেছে, ভাস্কো-দা-গামা গোয়ায় পৌঁছে গেছেন হয়তো বা, গুরু নানক পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম শিখ ধর্মের প্রবর্তন করেছেন, লিও নার্দো দা ভিঞ্চি এঁকে ফেলেছেন তাঁর বিখ্যাত ছবি মোনা লিসা। এমনই কোন এক সময়ে, বাংলার বুকে বেজে উঠেছিল মায়ের আগমনী গান, আজ এই একবিংশের প্রভাতলগ্নে যা সার্বজনীন উৎসবের আকার ধারণ করেছে।

প্রযুক্তি আর বিজ্ঞানের লম্বা দৌড়ে মানুষ যখন হতক্লান্ত তখন এমন এক সার্বজনীন উৎসবের ছায়া বা কায়া বদলালেও তা যেন আপামর জনসাধারণের জীবনে মানবিকতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে।

রুমঝুম ভট্টাচার্য ভ্রামণিক, প্রাবন্ধিক

রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকের মধ্যে
অনলাইন ব্যাংকিং এ ১ম
এজেন্ট ব্যাংকিং এ ১ম
রেমিট্যান্স আহরণে ১ম

অগ্রণী বৈদেশিক
কর্মসংস্থান সহায়ক ঋণ

পরপর ৩ বছর
আইসিএবি
অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী

অগ্রণী সঞ্চয় প্রকল্প
(এবিএস ও এপিএস)

বিদ্যুৎ উন্নয়ন
খাতে অর্থায়ন

এটিএম সার্ভিস

এসএমই লোন-
নারী অগ্রণী

বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৮ বিজয়ী

সারা দেশে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর সকল শাখায় **"রিয়েল টাইম অনলাইন ব্যাংকিং"** এর আওতায় সব ধরণের ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। কোন একক ব্যাংকের অনলাইন সেবাভুক্ত শাখার সংখ্যার বিচারে এটি সর্বোচ্চ।

আমানত সেবাসমূহ

- সঞ্চয়ী হিসাব
- চলতি হিসাব
- স্বল্প মেয়াদী আমানত
- স্থায়ী আমানত
- অগ্রণী ব্যাংক পেনশন স্কীম (এপিএস)
- অগ্রণী ব্যাংক বিশেষ সঞ্চয় প্রকল্প (এবিএস)
- অগ্রণী এডুকেশন স্কীম
- অগ্রণী সুপার সেভিংস স্কীম

ঋণ সেবাসমূহ

- শিল্প বাণিজ্যে চলতি মূলধন ঋণ
- কৃষি/পল্লী ঋণ (৪%,৪.৫০% ৫% এবং ৮.৫% হারে)
- কৃষিভিত্তিক শিল্প ঋণ
- মাইক্রো ক্রেডিট ঋণ
- শিল্প ঋণ/মেয়াদী ঋণ
- আমদানি/রপ্তানী বাণিজ্যে অর্থায়ন
- এসএমই লোন, নারী অগ্রণী ঋণ
- অগ্রণী বিদেশ গমন ঋণ (৯% সুদ)
- পল্লী গৃহ নির্মাণ ঋণ (৯% সুদ)
- সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ ঋণ
- Personal Loan

অন্যান্য সেবাসমূহ

- ১০টি শাখার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং সেবা
- সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, কানাডা প্রভৃতি দেশে নিজস্ব এক্সচেঞ্জ হাউজের মাধ্যমে দেশে রেমিট্যান্স প্রেরণ সুবিধা
- বিশ্বের সকল দেশ থেকে প্রেরিত প্রবাসীদের অর্থ তাৎক্ষনিক পরিশোধের ব্যবস্থা
- সকল ব্যাংকের ATM বুথের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন সুবিধা
- যে কোন সময়ে রেমিট্যান্সের অর্থ উত্তোলনের জন্য রয়েছে "প্রবাসী অগ্রণী রেমিট্যান্স কার্ড"
- ২০০টি এজেন্ট ব্যাংকিং পয়েন্ট আপনাদের দোর গোড়ায় এজেন্ট ব্যাংকিং এ আমরাই ১ম।
- সকল শাখার মাধ্যমে E-GP ই- টেন্ডারিং সুবিধা প্রদান
- BEFTN ও RTGS সেবা চালু আছে।

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
Agrani Bank Limited
Committed to serving the nation

website : www.agranibank.org

গ্রাম হবে শহর - মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

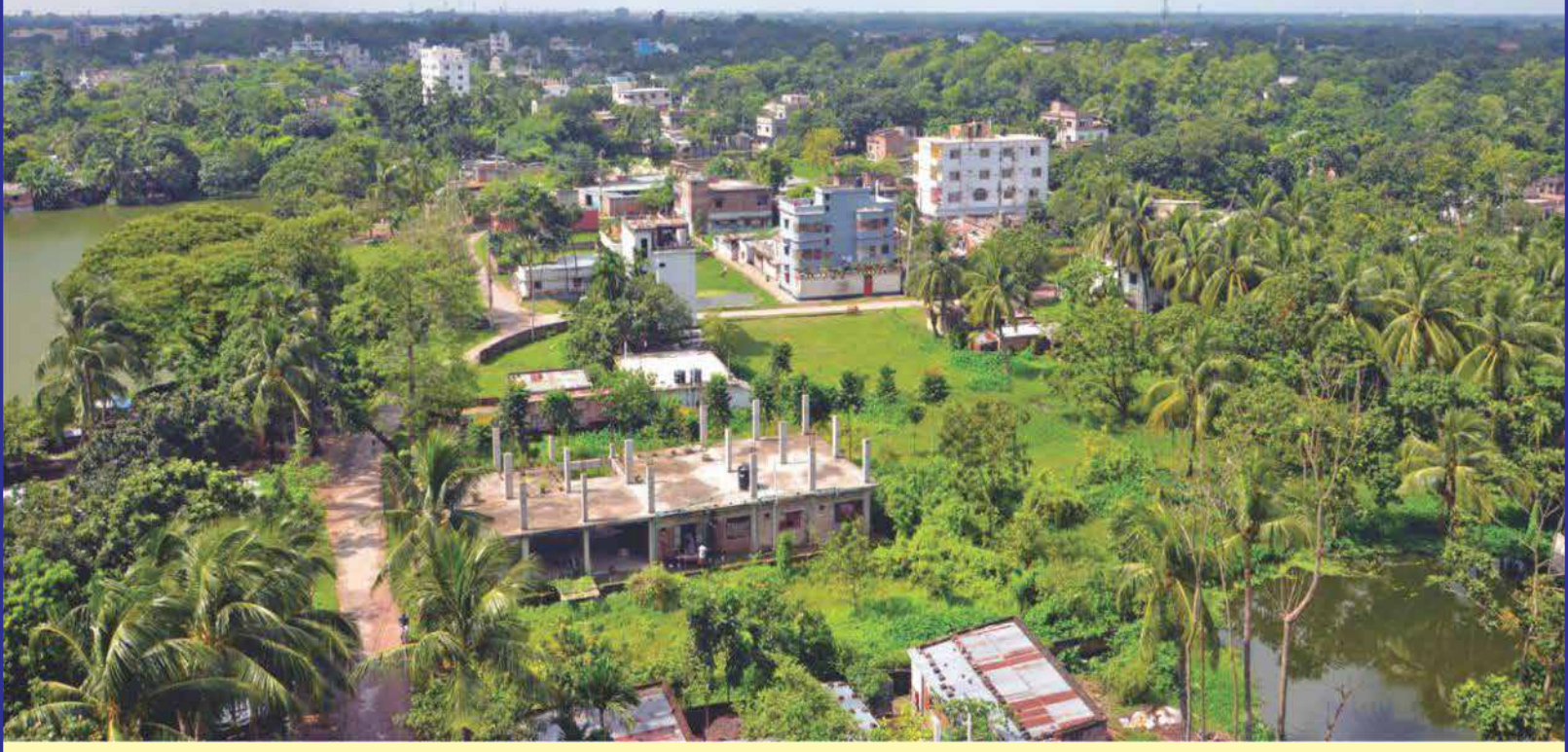

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই স্বপ্ন পূরণে

আমরা গ্রামকে শহর বানাই

ব্যাংকিং সেক্টরে এই প্রথম সোনালী ব্যাংক নিয়ে এলো মাত্র ৭ শতাংশ সুদে গ্রামীণ আবাসন সুবিধা 'সোনালী নীড়'।

- সেমি পাকা বাড়ি ও পাকা বাড়ি নির্মাণে ঋণ সুবিধা।
- গ্রেস পিরিয়ড ৯ মাস ও ১২ মাস।
- মেয়াদ ১০ বছর ও ১২ বছর।
- শহরের সন্নিকটে গ্রাম্য এলাকা এবং এর আশপাশের এলাকা, উপজেলা সদর, ইউনিয়ন পরিষদ গ্রোথ সেন্টারসমূহে (প্রযোজ্য শর্তাদি পরিপালন সাপেক্ষে) বাড়ি নির্মাণের জন্য এই ঋণ প্রদান করা হবে।
- সোনালী ব্যাংক যে কোন শাখা থেকে গৃহ ঋণ গ্রহণ করে পল্লী অঞ্চলে সুখের নীড় গড়ে তুলুন।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, জেনারেল এ্যাডভান্সেস ডিভিশন
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা, ফোন ঃ ০২-৯৫৫০৪৮৩
মোবাইল ঃ ০১৭২৯-০৯০৭৯৫, ০১৭০৮-৫২২৫৪৮

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড

উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী

www.sonalibank.com.bd

গ্রীন লাইফ মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল

৩২ বীর উত্তম কে এম শফিউল্লাহ সড়ক (গ্রীন রোড), ঢাকা।
ফোনঃ ৯৬১২৩৪৫ হান্টিং (২০ টি লাইন) ০১৬১৮৮০০০৮৮, ০১৩০৪০২২৭৭১, ০১৮২৬৮০৮৯৯৯

সেবাই আমাদের মূল লক্ষ্য, আমাদের আনন্দ ও ভালবাসা

বিশ্বমানের হৃদরোগ চিকিৎসা এখন

গ্রীন লাইফ হার্ট সেন্টারে

Green Life Heart Center
Close to your Heart

গ্রীন লাইফ হার্ট সেন্টার
হৃদরোগ চিকিৎসার
আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীক।

এখানে রয়েছে-

- অত্যাধুনিক কার্ডিয়াক ইমার্জেন্সী
- হৃদরোগ বহির্বিভাগ
- বিশেষায়িত সিসিইউ
- ইকোকার্ডিওগ্রাম, ইটিটি
- ইসিজি ও হল্টার ইসিজি করার সুব্যবস্থা।

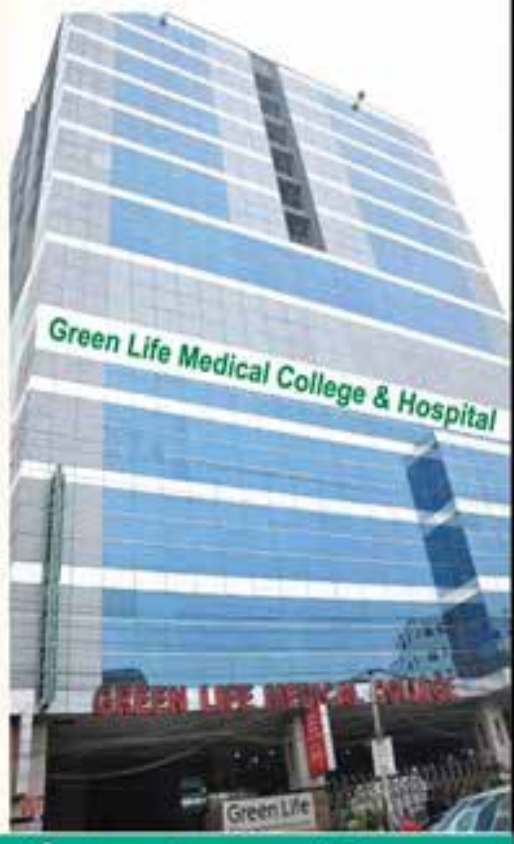

বাংলাদেশে স্থাপিত প্রথম সর্বাধুনিক মডেলের

ক্যাথল্যাব মেশিনে হার্টের চিকিৎসায় সকল প্রসিডিউর যেমন:

- এনজিওগ্রামসহ
  - পিটিসিএ, পিটিএমসি
  - পিডিএ ও এএসডি ডিভাইস
  - ভিএসডি ডিভাইস
  - পালমোনারি ভাল্বো প্লাস্টি
  - টেমপোরারি ও পারমানেন্ট পেস মেকার
- ওপেনহার্ট সাজারী (সিএবিজি)
  - এমভিআর ও এভিআর
  - পিডিএ ও এসডি ক্লোজার
  - ভিএসডি ক্লোজার

সু-স্বাস্থ্য উন্নতির পূর্বশর্ত —— আমরা সেই শর্ত পূরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ

হ্যালো... ১৬২২৫

24/7

মার্কেন্টাইল ব্যাংক কন্টাক্ট সেন্টারে আপনাকে স্বাগতম !

আমাদের সকল সেবার তথ্য পেতে

কল করুন ১৬২২৫ নম্বরে

রাতদিন প্রতিদিন

বাংলার ব্যাংক

মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড
Mercantile Bank Limited
দক্ষতাই আমাদের শক্তি

www.mblbd.com